পাকদণ্ডী

লীলা মজুমদার

পাকদণ্ডী

লীলা মজুমদার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য : ৪০·০০

আমার স্বামীর উদ্দেশে

এই লেখিকার অন্যান্য বই

বাতাস বাড়ি

কাগ নয়

খেরোর খাতা

সব ভুতুড়ে

প্রথম পর্ব

পাহাড়ের মাথায় স্কুল, সেইখানে দিদিকে আমাকে নিয়ে গিয়ে মা ভরতি করে দিয়ে এলেন। বোধহয় সাহস দেবার জন্য বড় মাসিমা আমাদের সঙ্গে গেলেন। দিদির বয়স সাত, আমার বয়স ছয়। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে তিন-চার অক্ষরের ইংরিজি কথা একটু একটু পড়তে পারি। কিন্তু কেউ ইংরিজি বললে এক বর্ণ বুঝতে পারি না, নিজেরা তো বলতে পারি না-ই। মেমদের স্কুল, লোরেটো কন্‌ভেন্ট ; যাঁরা পড়ান তাঁদের বেশির ভাগই সম্ভবত পাকা মেম, অন্তত সবাই সমান ফরসা। বিশেষত সাদা-কালো ঝোলা-ঝোলা পোশাক পরা, কান পর্যন্ত ঢাকা-চাপা দেওয়া—ফিরিঙ্গী সহপাঠিনীরা সানন্দে আমাদের জানাল যে ভেতরে ভেতরে সব নাকি ন্যাড়া মাথা—নান্‌দের এমনি সাদাতে গোলাপীতে মুখের আর হাতের রঙ যে আমরা দুই বোন হাঁ করে চেয়ে থাকতাম। ছাত্রীদের গায়ের রঙ দেখলাম বিচিত্র। খুব সুন্দর গোলাপীও ছিল, তারপর একটু হলদেটে একটু তামাটে করতে করতে আইরিস্ ডি-সিলভা ছিল আমাদের চেয়েও কালো। কিন্তু ওরা বলত ওরা সবাই খাঁটি মেম, এদেশের হরিড্ ক্লাইমেটে থেকে থেকে সত্যিকার রঙ চাপা পড়ে গেছে। তবে আছে ঠিকই তলায় তলায়। আইরিসের আত্মীয়স্বজনরা নাকি পর্তুগালে থাকে, বেজায় বড়লোক। আমাদের মতো নেটিভ নয়। ওরা যা বলত আমরা সব বিশ্বাস করতাম, যদিও মা শুনে হাসতেন।

বলা বাহুল্য এ-সব শুনে মন বড়ই দমে গিয়েছিল। ইংরিজি তো আর জানি না, তাই কথাগুলো অদ্ভুত এক হিন্দীতে বলা হয়েছিল। সেই ভাষায় বাবুর্চিকে বলে 'বোর্চি', জলের কুঁজো হল 'সেরাই'। যাই হক বাইব্‌ল্ স্টোরিজের ছোট্ট বইখানি খুলে একটা চেনা মুখের ছবি দেখে, মনে কিছু বল পেলাম। ছবিটা নাকি গড্-এর। ছয় দিনে তামাম জগৎ সৃষ্টি করে, সপ্তম দিনে মেঘের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে গড্ একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। এই লম্বা দাড়ি-গোঁফ, কাঁধ পর্যন্ত কোঁকড়া চুল, টানলে নিশ্চয় আরো লম্বা হয়। পরনে পায়ের কব্জি অবধি ঝোলা একটা জোব্বা। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথদের বাড়ির লোকদের ঐরকম পরতে দেখেছিলাম। সে যাই হকগে, গড্-এর মুখখানি দেখে মনে হল একে যেন কোথাও দেখেছি। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখাও নয়, অনেক দিন ধরে দেখেছি। গলার স্বরটাও মনে পড়ল। সেই সঙ্গে মনে হল চোখে ইস্টিলের ফ্রেমের চশমা থাকা উচিত ছিল, তার ভাঙা ডাঁটি সুতো দিয়ে বাঁধা। দিদিকে জিজ্ঞাসা করতেই

বলল, "গড়্-এর ছবি, দেখছিস্ না নাম লেখা রয়েছে। গড্ হল ভগবান, ভয়ঙ্কর ভালো উনি। আমাদের বানিয়েছেন।"

মনে ভারি খট্‌কা লাগল। ছোটবেলা থেকে শুনেছি ভগবানকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, তবে আবার তাঁর ছবি আঁকা হল কি দেখে? দিদি ভুল বলেছে, গড্ অন্য কেউ। রাতে শুয়ে শুয়ে হঠাৎ সেই অন্য কেউটিকে মনে পড়ে গেল। তাঁর নাম নীলমণিবাবু, সত্যি ভয়ঙ্কর ভালো, আমাকে ডাঁটা চিবুতে দিতেন। চেরাপুঞ্জিতে থাকতেন। তাঁর একটা সাদা-লাল্‌চে লোমশ কুকুর ছিল, তার নাম ভজহরি। সে বড় দুষ্টু ছিল, আমাদের ছোট ভাই কল্যাণের দুধ খাবার বোতল ভেঙে দিয়েছিল। কল্যাণের মুখে তখনো ভালো করে কথা ফোটেনি। সে ঘোর অনিচ্ছায় দুধের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলেছিল, 'ভজি বোতল ঠাঁই!' যাক্, নীলমণিবাবুই তাহলে গড্! এ ভুল ভাঙতে অনেক সময় লেগেছিল। পরে শুনেছিলাম ভজি বেচারা মোটেই বোতল ভাঙেনি। বোতল অভ্যাস ছাড়াবার জন্য কল্যাণকে ঐ রকম বলা হয়েছিল।

সে কথা থাক, এটুকু সত্যি যে নিজেদের বাড়ির লোকেদের ছাড়া প্রথম যে বাইরের মানুষের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে, তিনি হলেন নীলমণিবাবু। চেরাপুঞ্জি শিলং থেকে মাত্র ৩৩ মাইল দূরে হলেও, সেকালে সেখানে যেতে দু দিন লাগত। মটরগাড়ি বা রেল ছিল না। হয় দুই চাকাওয়ালা এক ঘোড়ায় টানা টঙায়, নয়তো মানুষে টানা পুশ-পুশে যেতে হত। মাঝপথে ভাম্‌পেপ্ বলে একটা জায়গা ছিল, সেখানকার সুন্দর ডাকবাংলায় রাত কাটাতে হত।

ভাম্‌পেপে পৌঁছনোর কথা আমার খুব মনে আছে। তখনো আমার তিন বছর পূর্ণ হয়নি। পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেছিল, আমাদের গাড়িতে বড়রা কেউ ছিলেন না। কল্যাণ ঘুমিয়ে আমার গায়ে গড়িয়ে পড়ছিল, আমি তাকে সামলাতেই ব্যস্ত। দাদা কাঠ হয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিল আর দিদি সে-সময় ফোঁৎ-ফোঁৎ করে একটু কেঁদে নেবার সুযোগ পেলে কখনো ছাড়ত না। চারদিক ভয়ঙ্কর চুপচাপ, আকাশটাকে বেজায় নিচু মনে হচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ দেখি সারি-সারি আলো-জ্বলা একটা বাড়ি, লোকজনের হাঁক-ডাক, ঘোড়ার পা-ঠোকার, লাগাম ঝন্-ঝন্ করার শব্দ। ঐ আরেকটি সুন্দর জিনিস আমার মনের মধ্যে লেগে রইল; বিপদ অন্ধকার কাটিয়ে আলো-জ্বলা ঘরে এসে পৌঁছনো। বলা বাহুল্য, কতক পাকদণ্ডী বেয়ে হেঁটে, কতক ঘোড়ায় চড়ে, বড়রা অনেক আগেই পৌঁছে গেছিলেন। মা লম্বা কাঠের বারান্দায় আমাদের পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। অমনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাদের কোলে করে নামালেন। মায়ের মতো আছে কি! আলো-জ্বলা ঘরের মতো মিষ্টি আশ্রয় আর কোথায়?

গড়-এর ছবি দেখে ঐ একদিনেই অবিশ্যি এত কথা মনে পড়েনি, থেকে থেকে একটু একটু করে স্মরণ হয়েছিল ! নীলমণিবাবু ছিলেন ব্রাহ্ম প্রচারক। চেরাপুঞ্জিতে ছিল তাঁর ডেরা। বহু দুঃখী পর্বতবাসী তাঁর বাড়িতে খেত, খাসিয়া ভাষায় লিখতে পড়তে শিখত। নিরক্ষর গাঁয়ের লোক সব, তখনো সভ্যতার আলো অতদূর পৌঁছয়নি, প্রাকৃতিক শক্তির পুজো করত তারা, সাপের পুজো করত, আদিম সব বিশ্বাস ছিল। তাদের মধ্যে নীলমণিবাবু কাজ করতেন। যতদূর মনে হয় যার খুশি তাঁর বাড়িতে যেতে পারত। নিরামিষভোজী সাত্ত্বিক মানুষটি বিয়ে-থা করেননি। এ সমস্তই পরে শোনা ; এর জন্য তিনি আমার মনে দাগ কাটেননি। যে-জন্য তাঁকে মনে আছে সে হল তাঁর বাড়িতে যার খুশি আসছে, খাচ্ছে, আমিও ডাঁটা চিবুতে পাচ্ছি আর তাঁর ঐ অবিস্মরণীয় ভজহরি

তার ওপর এতকাল পরে দেখছি গড়-এর ছবির সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য বোধহয় অন্য লোকেরও চোখে পড়ে থাকবে, কারণ যখন আমার কৈশোর শেষ হয়ে আসছে, সেসময় একজন ভক্ত ব্রাহ্ম আমাদের বাড়িতে এসে ঐ কথা শুনে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, খুব খাটতেন সত্যি, অনেক গ্রামবাসীকে পাহাড়-পথের জীব-জন্তুর পুজো ছাড়িয়ে একমাত্র ভগবানের উপাসনা করতে শিখিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেছিল যে, নীলমণিবাবুই হলেন সেই একমাত্র ভগবান যার উপাসনা করা উচিত !"

যার তিন বছর পূর্ণ হয়নি, সে আবার কতখানি প্রভাবিত হতে পারে ? তবে মনে হয় যা দেখা যায়, যা শোনা যায়, যা করা যায়, সব দিয়ে তিলে তিলে একেকটা মানুষ তৈরি হয়। ঐ যে আমার ছোটবেলাটি কেটেছিল পাহাড়ের বুকে, ছোট্ট নদীর কলধ্বনিতে, ঝরনার ঝরঝর শব্দে, বর্ষার প্রচণ্ড বরিষণে, গ্রীষ্মের মিষ্টি রোদে, শীতের বরফজমা স্পর্শে, দিনরাত অবিরাম সরলগাছের শোঁ-শোঁ শব্দের মধ্যিখানে, জন্তু-জানোয়ার, পাখি-প্রজাপতি, পোকা-মাকড় পরিবেষ্টিত হয়ে, তারা আমার মনের পটে যে দাগ রেখে গেছিল, কোনো মানুষের প্রভাবের চাইতে সে কম নয়।

বাইরের এই বিশ্ব-প্রকৃতি আর ঘরের নিরাপত্তা, মানুষের ছেলেমেয়ের আর কিছুর দরকার নেই। ইকড়ার দেয়াল, টিনের ছাদ, ওখানকার বাড়িগুলো খুব যে নিরাপদ ছিল তা-ও নয়, নিরাপত্তাটি অন্য দিক থেকে আসত। সে মনের জিনিস। তাকে ভাঙা যায় না, কারণ সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। বড় নিশ্চিন্ত সুখে আমাদের শৈশব কেটেছিল। নিরাপদ নিশ্চিন্ত সুখে ছোটবেলাটি কাটলেও, বাবা বেজায় কড়া ছিলেন। তাঁর মনে কোনো সন্দেহই ছিল না যে ছেলেপিলেকে কষে না পেটালে তারা মানুষ হয় না। আমাদের জন্য বাবা সম্ভবত সব কিছু

ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কথার এতটুকু নড়চড় হলেই এমনি এক হুঙ্কার দিতেন যে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা! সত্যি কথা বলতে কি, ছোটবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে আমার একটুও বনত না এবং পরে একেবারে ছাড়াছাড়িই হয়ে গেছিল। কিন্তু তখনো টের পেতাম যে দুজনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। সে যাই হক, ছোটবেলায় বাবাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম, আবার বেজায় ভক্তিও করতাম। যেমনি কড়া, তেমনি গায়ের জোর। একবার কলতলা থেকে বাবার এঁটোপাতের কুলের বিচি চুষেছিলাম বলে এইসা চড় মেরেছিলেন যে এখনো মনে করলেই কান ঝিমঝিম করে। যেমনি কড়া, তেমনি গায়ে জোর ছিল। হকি-ক্রিকেট খেলানো, ঘোড়ায় চাপা ইটের মতো শক্ত শরীর ছিল। চড়-চাপড়গুলোও নেহাৎ ছেলে-খেলা ছিল না। আমার বড় জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন রায় বাবাকে মানুষ করেছিলেন। তিনিও ছেলেদের পিটিয়ে সিধে করার পক্ষপাতী ছিলেন। মেয়েদের কিছু বলতেন না। বাবা ছিলেন আরেক কাটি বাড়া।

আরেকটা দিক-ও ছিল তাঁর। মনে আছে চেরাপুঞ্জিতে আমাদের হাতি চাপিয়েছিলেন। হাওদা-টাওদা ছিল না, বোধহয় হাতির পিঠে কম্বলটম্বল জাতীয় কিছু পাতা ছিল, লবড়-ঝবড় করছিল। দিলেন তুলে আমাদের চারজনকে। প্রথমটা ভয়ে হাত-পা হিম। হাতিটা দুলে দুলে চলতে শুরু করল! তারপরেই ভয় ভেঙে গেল, অদ্ভুত একটা অহঙ্কারের ভাব এল মনে। কিন্তু নামবার সময় এ-ওকে আঁকড়ে ধরেছিলাম। হাতিটা ছিল ভারত-জরীপ-বিভাগের, অর্থাৎ বাবার আপিসের। একটা নয়, অনেকগুলোকে সারি বেঁধে যেতে দেখেছিলাম। শুনেছিলাম ঐ সব হাতি, ঘোড়া আর খচ্চর বলে কিছু নিয়ে বাবারা ঘনবনে কাজ করতে যান। সেখানে বাঘ ভালুক থাকে। তাই শুনে বুকের ভিতরটাতে হাতুড়ি পিটতে লেগেছিল। ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

গল্প বলার লোকের অভাব ছিল না আমাদের। অবিশ্যি তার বেশির ভাগ বলত আমাদের খাসিয়া ঝিরা; সবাই তাদের 'কান্থাই' বলত; কিন্তু মা বলতেন, 'কান্থাই বলবে না, নাম ধরে ডাকবে। তোমাদের কেউ যদি মেয়ে! মেয়ে! বলে ডাকে তবে কেমন লাগবে? তবে খাসিয়া ঝিদের নাম বের করা মুশকিল ছিল। ছোটবেলায় একটা করে নাম থাকত বটে, কিন্তু যেই না বিয়ে হল, ছেলে কি মেয়ে হল, অমনি তাদের সবাই ডাকত 'অমুকের মা' বলে, তাদের নিজেদের নাম কেউ মুখেও আনত না, আনলে তারা বিরক্ত হত। আমাদের বাড়িতে কত কাকমি-উবিন, কাকমি ডোরেন, কাকমি মেডিলা কাজ করে গেছে তার ঠিক নেই। অথচ তাদের মাতৃ-প্রধান জাত। এরাই আমাদের গল্প বলত, ভয়াবহ সব গল্প, যদি নায়ককে বাঘে না খেত, কি কাত্তুরে না তীর মারত, তাহলে

অপদেবতারা পিছু নিত, নিদেন হতাশ হয়ে তারা আত্মহত্যা করত ! ঐ সুন্দর জায়গায় ওরা বাস করত, অথচ কখনো একটা হাসির গল্প বলত না। হয়তো জীবনযাত্রা বড্ড কঠিন ছিল। যাই হক, আমরা বিকট গল্প শুনতে বেজায় ভালোবাসতাম।

চেরাপুঞ্জিতে মৌসমাই জলপ্রপাতের গল্প শুনেছিলাম। কোনো রাজার মেয়ে তার বাপের শত্তুরের ছেলেকে ভালোবাসত, কিন্তু তার সঙ্গে বিয়ে হল না, কিম্বা দুঃখময় কিছু একটা ঘটে ছাড়াছাড়ি হল। সেই মেয়ে ঐ জলপ্রপাতের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে মল। তাই এখনো নিচে থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্পের বিন্দু ওঠে ! যদি কেউ বলে ছোটরা ভালোবাসার গল্প বোঝে না, সে ভুল বলে। ভালোবাসা দিয়ে মোড়া থাকে ছোটদের জগৎ, ভালোবাসার মানুষকে হারানোর দুঃখ তারা যেমন বোঝে তেমন আর কেউ নয়।

অত ছোটবেলার স্মৃতি সব ভাঙা ভাঙা, একটা দুটো টুকরো কথা, অসমাপ্ত ঘটনা মনের মধ্যে লেগে থাকে। চেরাপুঞ্জি থেকে আমরা লাবান পাড়ার ব্রাহ্ম মন্দিরের ওপরে ছোট একটা বাড়িতে এসে উঠলাম। হয়তো প্রথমে কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে উঠে, সেখান থেকে এই বাড়িতে। আমরা চারজন আগে গেলাম মা আর যামিনীদার সঙ্গে। বাবা আসবেন পরে, শেষ জিনিসপত্র ঠেলাগাড়িতে তুলে। কাকমি-উবিনও আসবে সেই সঙ্গে।

পাহাড়ের ঢালের ওপর বাড়ি, নিচে রাস্তা, চারদিকে ইউকালিপটাস গাছ। এককালে কেউ ফুলগাছও লাগিয়েছিল, তখন সব আগাছায় ভরা। চারধারে ঝোপ-ঝাপ। তাতে লাল-হলুদ গোছা-গোছা ফুল, তার বিশ্রী একটা গন্ধ। কোনো কোনো ঝোপে ফল ধরেছে, ছোট্ট ছোট্ট আঙুরের মতো থোপা-থোপা, বেশির ভাগই সবুজ। কয়েকটা পেকে টুকটুক করছে। দাদা বলল, 'লাল ফল ভালো।' বলে একমুঠো তুলে নিজেও খেল, আবার দিদিকেও দিল। বদ্‌ খেতে, থু-থু করে ফেলেও দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মুখ দিয়ে কেবলি ফেনা উঠতে লাগল। সে আর থামে না। দাদা বলল, "বিষফল ! আমরা মরে যাব !" কল্যাণ আর আমি ওদের মরার অপেক্ষা করতে লাগলাম। মরা পাখিটাখি দেখেছি, কিন্তু জ্যান্ত মানুষের মরা দেখিনি। দাদা দিদি ততক্ষণে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়েছে আর কথাটথা বলছে না। মা আমাদের খুঁজতে এসে ঐ অবস্থা দেখে কেঁদেকেটে একাকার ! যামিনীদা গেল ডাক্তার ডাকতে।

এমন সময় বাবার সঙ্গে কাকমি-উবিনও জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির হল। বাবার তো চক্ষুস্থির ! কাকমি-উবিন একটুও ঘাবড়াল না। ছুটে রান্নাঘর থেকে মুঠো ভরে নুন এনে ওদের মুখে পুরে দিল। ওরা বমিটমি করে সুস্থ হয়ে উঠল। ততক্ষণে ডাক্তার এসে বললেন, "বিষ হলেও, ওতে মানুষ মরে না।"

বাগানের এককোণে ডালিমগাছের নিচে লম্বা একটা পাথর, তার পাশে কেউ একটা পাহাড়ি গোলাপলতা লাগিয়েছিল। পাশের বাড়ি থেকে সোনামণি বলে একটা ছেলে এসে বলল, "ওমা জান না! ওর নিচে মরা মানুষের ছাই আছে! এ-বাড়িটা যাদের, তাদের লীলা বলে একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল। অনেকদিন আগে বড় ভূমিকম্প হল, সবাই দৌড়ে বাড় থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঐ ছোট্ট মেয়েটা—মা কোথায়? মাকে দেখতে পাচ্ছি না!—বলে ছুটে যেই না ভিতরে ঢুকেছে, অমনি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। ঐ পাথরটা চাপা পড়ে লীলা মরে গেল! অথচ তার মা বাইরেই ছিলেন।"

মনে আছে সে গল্প শুনে আমরা কেঁদেকেটে একাকার করেছিলাম। তবে গল্প শুনে কাঁদার মধ্যে এক রকম মধুর ভাব আছে, কিন্তু সত্যিকার দুঃখ এলে চোখ-মুখ সব তিক্ততায় ভরে যায়।

সোনামণিরা পাশের বাড়িতে থাকত। তার দাদুর নাম ছিল বোস্ সাহেব। তাঁদের বাড়িতে সুন্দর একজন মেয়ে ছিলেন, পরে শুনেছিলাম তিনিই নাকি শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রী। সত্যি কি না জানি না। বোস সাহেবের এক ছেলে ভিখারি দেখলেই পয়সা দিতে চাইত, তাকে সবাই বকাবকি করত। সে নাকি বলত,'ওরা খায়নি, ওদের খেতে দাও!' সেই ছেলে মারা গেল। বছরে বছরে সেই দিন ওঁদের বাড়িতে কাঙালী ভোজন হত। আমরাও কত সময় গিয়েছি। ঐ সুন্দর মানুষটি আমাদের যত্ন করে খাইয়েছেন। মনে কেমন দুঃখ লাগত। মাকে খুঁজতে গিয়ে পাথর চাপা পড়ে মরা আমার নামে নাম সেই ছোট্ট মেয়েটির জন্যেও বড় কষ্ট হত। তখন বোধ হয় ১৯১০ কি ১৯১১ সাল, কারণ একটু একটু মনে পড়ে বিলেতে বুড়ো রাজা মরে গেলেন, তাঁর ছেলে রাজা হলেন। তাই চারদিকে আলো জ্বেলে আনন্দ প্রকাশ করা হল। আমাদের বারান্দার কড়িকাঠ থেকেও সুন্দর সুন্দর চীনে-লণ্ঠন ঝোলানো হল। সে বড় সুন্দর জিনিস, আজকাল আর দেখা যায় না, তার কোমল রঙীন আলোতে ছায়ার ভাগই বেশি। কি রস, কি রোমাঞ্চ! ভিতরে একটি ছোট মোমবাতি জ্বেলে, কাগজের ঘেরাটোপটি টেনে দিয়ে, তারের হুকটি কোথাও টাঙিয়ে দিতে হত। অমনি কাগজের ঘেরাটোপে আঁকা রঙীন ছবিটিও ফুটে উঠত। তার নিচে কেউ দাঁড়ালে আমার তাকে সুন্দর দেখতে লাগত।

বাড়ি সাজিয়ে আমরা গেছিলাম অন্যদের বাড়ি সাজানো দেখতে। ফিরে এসে দেখি মোমবাতি জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে, কাগজে আগুন লেগে রঙীন ছবি সব পুড়ে তো গেছেই, কড়িকাঠ সুদ্ধ জায়গায় জায়গায় ঝল্‌সে গেছে। আর যামিনীদা রেগে টং হয়ে আছে!

ও-বাড়িতে বোধহয় খুব কম সময় ছিলাম, সেখান থেকে যেখানে উঠে

এলাম, তার নিচে দিয়ে কুলকুল করে একটা নদী বয়ে যেত। নদীর ওপর কাঠের পুল, তাতে গাঢ় লাল রঙ করা। নদীর ওপারে ছিমছাম খেলার মাঠ। সেখানে সাহেবরা টেনিস খেলত, ক্রিকেট খেলত, গল্‌ফ খেলত। আমরা বাড়ি থেকে দেখতাম। খেলায় বাবার ভারি উৎসাহ, নিজে ভালো খেলতেন, তার জন্য রূপোর কাপ পেয়েছিলেন। বসবার ঘরের চিম্‌নির ওপরকার তাকে সেটি সাজানো থাকত। আমাদের কি গর্ব। আমার বড় জ্যাঠার খেলোয়াড় বলে খুব নামডাক ছিল। শুধু খেলোয়াড়ই ছিলেন না, এ-দেশে ক্রিকেট প্রতিষ্ঠা করার কাজে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তখন সারদারঞ্জন রায়ের নাম লোকের মুখে মুখে ফিরত। টাউন ক্লাবের গোড়া পত্তন তাঁর হাতেই হয়েছিল। মেট্রোপলিটান কলেজের—এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ—তিনি প্রিন্সিপাল হয়েছিলেন। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে গড়া বে-পরোয়া বাঙালী ছেলে। তিনিও একপুরুষ নির্ভীক বলিষ্ঠ ছেলে তৈরি করে দিয়েছিলেন, যারা খেলাধুলোয়, কাজেকর্মে জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিল। বাবা ছিলেন তাদের একজন ; আমার ছোট জ্যাঠা কুলদারঞ্জন ছিলেন আরেকজন। এত সব ঐ বয়সে জানতাম না, তবে ক্রিকেট খেলার সঙ্গে যে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তা বুঝতাম। ঐ বাড়িতে আমার সেজ ভাই অমিয় জন্মেছিল আর সেই দিনই গন্ধরাজ গাছের আড়ালে আমি বুড়ি কাকমি-উবিনকে ছাতাপেটা তো করেইছিলাম, খিমচেও দিয়েছিলাম। বাবা বারান্দা থেকে দেখতে পেয়ে কোথায় ধমকাবেন, না হো-হো করে হেসেছিলেন। তবুও কাকমি-উবিন আমাকে টেনে বেড়াতে নিয়ে গেছিল।

লাল পুলের অন্য মাথায় শশীবাবুর দোকান ছিল, সেখানে গোলাপী লজঞ্চুষ পাওয়া যেত। নিচে লম্বা লম্বা চালাঘর ছিল, সেখানে সপ্তাহে একদিন হাট বসত। তারই পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে নদীটি চলে গেছিল। নদীর ধারে কাঠের বাড়িতে এক পাগলী থাকত। সে দিনরাত কাঁদত। আর কিছু মনে নেই, এর পরের অনেকগুলো দিনরাত গুলিয়ে গেছে। তারি মধ্যে কোনো সময় আমরা যে-বাড়িতে উঠে এসেছিলাম, তার নাম ছিল 'হাই-উইণ্ড্‌স্'। এমন সুন্দর নাম আর আমি শুনিনি। কে দিয়েছিল কে জানে। বাড়ির মালিক ছিলেন খাসিয়া, কিন্তু তাঁর নাম ছিল জীবন রায়, বড় বড় পাকানো গোঁফ ছিল, সবাই বলত নাকি খুব ভালো লোক। লেখাপড়া জানতেন।

ঐ বাড়িতে আমরা আট বছর ছিলাম, একবারো মনে হয়নি ওটি আমাদের নিজের বাড়ি নয়। এমন বাড়ি আর চোখে দেখলাম না। ৪৫ টাকা ভাড়া ছিল। পাহাড়ের ঢালের ওপর বাড়ি। গেট দিয়ে ঢুকে কাঁকর বিছানো পথ দিয়ে নেমে, বারান্দায় পৌঁছতে হত। একহারা লম্বা বাংলো, সামনে টানা বারান্দা, তার কাঠের রেলিং। বাড়ির তিনদিক্‌ ঘিরে বৃষ্টির জল যাবার জন্য নালা কাটা। তার ওপর

দুটি চ্যাপ্টা পাথর ফেলা। তার ওপর দিয়ে বারান্দায় উঠতে হত। বারান্দার ছাদ থেকে তারের ঝোড়ায়, কাঠের ঝোড়ায় অর্কিড ফুল ঝুলত। তাদের তলায় সবুজ কাঠের বাক্সে জেরেনিয়ম ফুল ফুটত। লোকে এমন বাড়ির স্বপ্ন দেখে।

বাড়িতে কুকুর বেড়াল রাখার জো ছিল না, তবে লাল পুলের বাড়ির বাইরে ছোট একটা খুপরির নিচে আমাদের বড় মোরগ আর কয়েকটা মুরগি থাকত। খ্যাকশেয়ালের ভয়ে রাতে তাদের ঘরে তুলত কাকমি-উবিন। সকালে আবার যেই দরজা খুলে দিত ওরা কঁক্-কঁক্-কঁক্ করতে করতে বেরিয়ে আসত। একদিন দেখা গেল তিনটে বাসায় তিনটে ডিম! আমরা তো অবাক! ডিম যে এ-ভাবেও পাওয়া যায় এ আমাদের ধারণা ছিল না; আমরা দেখতাম ডিম-ওয়ালার কাছে 'হালি' হিসাবে ডিম কেনা হয়। চারটে ডিমে এক হালি। পরে শুনেছিলাম এক হালির দাম ছিল ৫ পয়সা।

অনেক দিন পরে কাক্মি-উবিন হঠাৎ এসে খবর দিল, ডিম ফুটে ছানা বেরিয়েছে দেখ গে! দাদা আগে ঢুকল; ঢুকেই বেরিয়ে এসে আমাদের ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। খালি বলে ঠক্‌রাবে! ঠক্‌রাবে! দেখলাম আমাদের পেয়ারের লাল মোরগের চেহারা বদলে গেছে, লাল ঝুঁটি উঁচু করে, চোখ পাকিয়ে, নখ্ বাগিয়ে পালক ফুলিয়ে ডবল বড় হয়ে, দাঁড়িয়ে আছে! দাদার হাত থেকে রক্ত পড়ছে! তাই দেখে সবাই মিলে সে যা চেল্লালাম!

ছোটদের জীবনের সবটা মোটেই আরামে-আদরে ভরা থাকে না, তার উল্টোটিও যথেষ্ট দেখা যায়। বাড়িতে সরোজিনী মাসিমা এসে ক'দিন ছিলেন। স্কুল ইন্সপেক্‌শনে এসেছেন, মা'র বন্ধু। আমাদের শোবার ঘরটি তাঁকে দেওয়া হল। তাতে আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না, তবে কোথায় শুতাম মনে নেই। দুপুরে কেউ কোথাও নেই দেখে সরোজিনী মাসিমার ঘরে গিয়ে দেখি টেবিলের ওপর রাশি রাশি নীল খাম আর চিঠির কাগজ; একটা দোয়াত, তাতে কালি ভরা, দুটি কলম! একসঙ্গে এত আমরা কখনো দেখিনি। দাদা অমনি পোস্টমাস্টার সেজে চেয়ারে বসে, কালি দিয়ে খামের ওপর ঠিকানা, কাগজে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে, দিদিকে আমাকে বিলি করবার জন্য দিতে লাগল। লিখতে জানত না বলে ওর কোনোই অসুবিধে হল না। দিদি আমি দুজনেই পিওন। চিঠির প্রাপক কল্যাণ। সেদিনের সেই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কথা আজ পর্যন্ত মনে আছে। কিন্তু বেশির ভাগ আনন্দের ব্যাপারের মতো এর শেষটিও বড়ই নৈরাশ্যময়। সরোজিনী মাসিমার রাগ-মাগ, কানমলা, বকুনি, কান্না। বলা বাহুল্য এ-সব ঘটনার কতখানি আমার মনে ছিল আর কতখানি মার কাছে শুনেছি, সব একাকার হয়ে গেছে। তবে চোখের সামনেই পোস্টমাস্টার আর পোস্টাপিস দেখতে পাই।

বাবা

মা, মাসিমা

মাসিমা, নোটন

হাজারি বাগের গ্রুপ ফটো ১৯২৫

সত্যেন বিশী

গণেশ বসু

যতি আর আমি ১৯৩২

রবীন্দ্রনাথ

আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছিল। মরে গেছেন তো মরে গেছেন, তাই বলে এই সুন্দর সকালে বেচারি দাদামশাইকে কৌটোয় ভরে মাটিতে পুঁতে ফেলবে, এ যে ভাবা যায় না! খুব খানিকটা কেঁদে নিয়েছিলেন, আর বলেছিই তো, দিদি কখনো কাঁদবার সুযোগ ছাড়ত না। চোখ লাল হয়ে যেত, নাক ফোলাত, সর্দি গড়াত, ফোঁৎফোঁৎ শব্দ করত, ভারি বিশ্রী লাগত। রাগে আমার কান্না সেরে যেত।

খুব ছোটবেলার কথা সঠিক মনে রাখা শক্ত, কেবলি আগের ঘটনার ওপর পরের ঘটনার ছায়া পড়তে থাকে। তার ওপর গল্প হয় কাটা কাটা, আলাদা আলাদা কয়েকটা ছবি, কারো সঙ্গে কারো কোনো যোগ নেই। কিন্তু তাই দিয়েই একেকটা মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়; তার একটা স্বকীয়তা এমনি করেই তিলে তিলে গড়ে ওঠে, একটা দৃষ্টিভঙ্গি রচনা হয়। আমার এই আমিত্বটা ঐভাবেই গড়ে উঠেছিল একথা বললে অবিশ্যি সবটুকু বলা হয় না। কারণ পুরুষানুক্রমেও নিশ্চয় কিছু নিয়ে এসেছিলাম আর শুধু মানুষই বা কেন, ঐ নীল পাহাড়ে ঘেরা, মাথার ওর উপুড়-করা নীল গামলার তলায়, মর্মর-মুখরিত, পাখির ডাকে চকিত যে পরিবেশে দিনগুলো কেটেছিল তারাও তাদের ছায়া রেখে গেছে। সরল-বনে যেই না পা দিয়েছি, অমনি টের পেয়েছি শির-শির সর-সর করে ছোট ছোট জানোয়ারের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে, গাছের কোটরে চকচকে চোখ বুজে গেছে, মগডাল থেকে শাঁখের মতো সাদা পাখি উড়ে গেছে—এরাও তাদের চলে যাবার একটু শব্দ একটু ডানার হাওয়া রেখে গেছে। এত কথা কি আর একখানি বইয়ের দুটি মলাটের মধ্যিখানে ধরে দেওয়া যায়? যা আমার নাগালের বাইরে রয়ে গেল, তাকে কোন ভাষায় বোঝাব, যাকে ভুলে গেলাম তার কি পরিচয় দেব?

দূরে নীল আকাশের ওপর রূপোলী রঙে আঁকা ছবির মতো বরফের পাহাড় দেখা যেত, তাও সব দিন নয়। যেদিন আকাশে কুয়াশা থাকত না, সেদিন একটু উঁচু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালে তবে দেখা যেত। একজন সুন্দর মানুষ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে এসে থাকত, সে আমার ছোটমাসি, তার নাম ছিল রমা, সাদা গোলাপের মতো সুন্দর, হাত-পাগুলি পদ্মফুলের মতো। তার তখনো বিয়ে হয়নি। আমি তার গলা জড়িয়ে ঝুলে থাকতাম, গালে নাক ঘষে বলতাম, "মন্না, আমি তোমার চশ্‌মা হব!" ছোটমাসি কি বলত মনে নেই, তবে আমার ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলে হাত বুলিয়ে দিত মনে আছে। একচল্লিশ বছর বয়সে ছয়টি ছেলেমেয়ে রেখে ছোটমাসি মারা গেছিল। মারা গেলে কি কেউ ফুরিয়ে যায়? ছোটমাসির স্মৃতি আমার মনের মধ্যে অফুরন্ত মধুর উৎস হয়ে রয়েছে।

তখন একেবারে মুখ্যু ছিলাম, বইয়ের ধার-ধারতাম না। ঠিক সেই সময়ই যে কলকাতায় আমাদের মেজ-জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর আর তাঁর বন্ধু

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছোটদের জন্য কেমন বই লেখা হবে, কোথায় ছাপা হবে, কেমনধারা ছবি হবে, কি করে তার ব্লক তৈরি হবে, এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভেবে আকুল হচ্ছিলেন, সেকথা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। ইতিমধ্যে জ্যাঠামশায়ের বেশ কতকগুলো বই বেরিয়েও গেছিল, হাফ-টোন-ব্লকে নিজের ছাপাখানায় তার জন্য চমৎকার সব নিজের হাতে আঁকা রঙীন ছবিও ছাপা হচ্ছিল, তাও জানতাম না। বেল পাকলে কাকের কি ? আমরা ছিলাম আকাট মুখ্যু—বইপত্রের সঙ্গে আমাদের কি ? আমাদের বাড়িতে কুকুর বেড়াল না থাকতে পারে, দু রকমের টিকটিকি ছিল। ঘরের ভিতরে ফিকে হলুদ টিকটিকি আর ঘরের বাইরে কালচে-পানা টিকটিকি। বাইরের দেয়ালের খাঁজে পেন্‌সিলকাটা ছুরি ঢুকিয়ে দাদা তিনটি সাদা ডিম বের করেছিল, এই আমার কড়ে আঙুলের নখের মতো। তার একটা আবার পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল, বাকি দুটো তাড়াতাড়ি আবার পুরে দেওয়া হল। দাদা বলল, না হলে মা-টিকটিকির কষ্ট হবে। এই সব নিয়েই আমাদের দিন কাটত।

এই সময় আমার মা'র বড্ড অসুখ করল, টন্‌সিল পেকে বিষিয়ে উঠল। সকলের বড় ভাবনার কারণ হল। আমরা এদিকে বাড়িতে দিনরাত মহা হট্টগোল করতাম, তাই আমাদের কয়েক দিনের জন্য নদীর ওপারে দিদিমার বাড়িতে পাঠানো হল। পুল অনেক দূরে, আমরা পাথরের ওপর পা রেখে নদী পার হতাম। যেদিন নদীর মাথায় বৃষ্টি হত, নদীতে ঢল নামত, সব পাথর ডুবে যেত। জল নামার জন্য বসে থাকতে হত। বেশিক্ষণ বসতে হত না, দেখতে দেখতে বৃষ্টি নেমে যেত, ঢলের জল বড়-পানিতে পৌঁছে যেত। আমাদের ছোট নদী যে-কে-সেই। মায়ের অসুখ শুনে ঐ নদী পার হয়ে দিদিমা এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য দিদি কেঁদেছিল। দিদিমা গরম জলে আমাদের হাত-মুখ মুছিয়ে দিয়ে, গরম লুচি আর মোহনভোগ খাইয়ে, মস্ত একটা খাটে, প্রকাণ্ড এক লেপের নিচে শুইয়ে দিয়ে, তাঁদের দেশের শেয়ালরা কেমন পাকা কাঁকুড় খেয়ে যেত, সেই সব গল্প বললেন। বাড়ির পিছনের নদীর কল-কল আর সরল-বনের শোঁ-শোঁ শব্দ এত দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল না, তবু আমরা খুব ঘুমিয়ে ছিলাম। সকালে দিদিমার ছেলে দেবপ্রসাদমামা ওদের খোবানি গাছের পাকা ফল পেড়ে দিয়েছিল। বাড়ির পিছন দিকে একটা ছোট্ট বারান্দা ছিল, সেখানে একটা দাঁড়করানো পায়া দেওয়া টুকরি ছিল, তার মধ্যে নানা রঙের নতুন কাপড়ের ছাঁট ছিল। হয়তো ওগুলো মনুমাসির প্রিয় জিনিস, কিন্তু দিদিমা ওর অনেকগুলো দিদির আমার হাত ভরে দিয়ে বললেন, "কেঁদো না। এই দিয়ে পুতুলের জামা কর !" জামা করব না আরো কিছু, দিদির সাড়ে পাঁচ, আমার সাড়ে চার বছর বয়স ! পরে কাক্‌মি-উবিন কাঁচি দিয়ে ছোট্ট চারকোণা ছাঁটগুলোর মধ্যিখানে

একটা করে ছ্যাঁদা করে দিয়েছিল। তার মধ্যে দিয়ে মাথা গলিয়ে আমাদের ইতু-পুতু-এলে-বেলেদের সে যে কি সুন্দর দেখিয়েছিল সে আর কি বলব!

তাছাড়া দিদিমার বসবার ঘরে একটা চার-কোণা জিনিস ছিল, তাতে হয়তো একশো দেড়শো রঙীন মাথাওয়ালা পিন গোঁজা থাকত। দিদিমা সেটি নামিয়ে দিয়েছিলেন। একটা কাঁচের গোল কাগজ-চাপা ছিল, সেটার ভিতরে ছোট্ট একটা বাড়ি দেখা যেত, তার পাশে একটা ন্যাড়া গাছ। কাগজ-চাপাটাকে ঝাঁকালে কাঁচের গোলাটার ভিতরে একরাশি সাদা বরফের কুচির মতো কি যেন উড়ত। এসব দেখে দিদি পর্যন্ত কান্না ভুলে গেছিল। মনে হয় সেই জন্যই দিদিমা তাঁর বাড়ির যা কিছু সুন্দর এবং ভঙ্গুর জিনিস ছিল সব আমাদের নামিয়ে দিয়েছিলেন। দিদিমা ওখানকার মেয়েদের মিড্‌ল্‌ ইংলিশ স্কুলে পড়াতেন। তাই দিয়েই বোধহয় ওঁর সংসার চলত। কি করে এত পারতেন জানি না।

এখন ভাবি কেমন মানুষ ছিলেন এঁরা সবাই? অনাত্মীয় পরের দিদিমা সেজে লেপের তলায় জায়গা করে দিতেন, ভালো জিনিস সব নামিয়ে দিতেন, হয়তো ভাঁড়ারে কখনো চাবি দিতেন না। আমরা তাঁকে কখনো কিছু দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। মা ডাকতেন 'মাসিমা' বলে, নিজের মাকে মায়ের বিশেষ মনে পড়ত না, সময়ে-অসময়ে দিদিমার কাছে ছুটে যেতেন। দিদিমার বড় মেয়ে সুবর্ণমাসির সঙ্গে ডঃ সুন্দরীমোহন দাশের ছেলের বিয়ে হয়েছিল। মেজ মেয়ে লাবণ্যমাসির সঙ্গে কর্ণেল মণীন্দ্র দাসের বিয়ে হয়েছিল। ভারি চমৎকার চেহারা ছিল তাঁর। সেজ মেয়ে আশামাসির সঙ্গে ডঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের বড় ছেলের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দিদিমা ছিলেন অন্য জগতের মানুষ। একদিকে গোঁড়া ব্রাহ্ম আর অন্য দিকে সমুদ্রের মতো উদার। শিলং-এর ব্রাহ্মদের সেকালের জীবন নিয়ে সুন্দর একখানি বইও লিখেছিলেন। বইটির নাম ভুলে গেছি, লেখিকার মতোই সরল, বলিষ্ঠ, অসঙ্কোচ, সুন্দর লেখা। নিজে এসে আমাকে দিয়ে একখানা কিনিয়েছিলেন, সেইজন্য আমিই ঋণী। আমার কোনো বই তাঁকে কোনো দিনও দিয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

ঐ যা বলছিলাম, দুইদিন ছিলাম দিদিমার বাড়িতে। বিকেলে কাকমি-উবিনের সঙ্গে আমাদের বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে, দিদিমা মাকে দেখে আসতেন। কাক্‌মি-উবিনের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার মাঠে যেতে হলে সেই পাগলীর বাড়ির সামনে দিয়ে যেত হত। এই ছিল মুশকিল। কিন্তু তারপরেই শশীবাবুর দোকান। সেখানে বড় বড় গোলাপী লজঞ্চুষ পাওয়া যেত, তার মধ্যিখানে এই বড় একটা করে বাদাম থাকত। পরদিন বেড়িয়ে ফিরে আসতেই দিদিমা একগাল হেসে বললেন, "ওরে তোদের মা ভালো আছে রে। তোরা সবাই কলকাতায় যাবি।"

শুনে আমরা থ'। কলকাতায় যাব! সেখানে আমড়া, বিলিতী আমড়া পাওয়া

যায়। জ্যাঠামশাইরা থাকেন ! সে কি আনন্দ, সে কি উত্তেজনা ! হয়তো তার পরেই আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম। ভাবতেই পারছিলাম না আমরা সত্যি বড় বড় মোটরে চেপে গৌহাটি যাব, সেখান থেকে রেলগাড়িতে কলকাতা যাব ! আমরা সবাই যাব, বাবা আমাদের নিয়ে যাবেন। তবে কাক্‌মি- উবিন যাবে না। গোঁড়া খাসিয়া মেয়েরা পাহাড় ছেড়ে কোথাও যেতে চাইত না। অন্য লোকের বাড়িতে খেত না, রাত কাটাত না। নিজেদের পোশাক ছাড়া কোনো বিদেশী পোশাক পরত না। সেলাই করা জামা-কাপড় ওরা ঘেন্না করত, ডান বগলের তলা দিয়ে, বাঁ কাধের ওপর দিয়ে তাঁতে বোনা একটা গাঢ় রঙের কাপড় বাঁধত, আবার বাঁ বগলের তলা দিয়ে ডান কাঁধের ওপর আরেকটা বাঁধত। মাথায় একটা চাদর বাঁধত, আবার পিঠের ওপর দিয়ে বড় একটা চাদর ঝুলিয়ে সামনে মস্ত গিট দিত। বড়লোকেরা গলায় সোনার আর লাল পলার বড় বড় পুঁতির মালা পরত, কানে কাঁচা সোনার চমৎকার গয়না পরত। বিদেশী জিনিস ওরা ঘেন্না করত। কাক্‌মি-উবিন যে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবে না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না। বাবা আমাদের পৌঁছে দিয়ে, আবার ফিরে গেলেন।

সেই কলকাতায় আসা থেকে আমার বড় হওয়া শুরু হল। আমার মেজ-জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠলাম, ২২ নং সুকিয়া স্ট্রীটে, দোতলা একটা ভাড়া বাড়ি। সামনে রক্‌, তারপরেই ছাপাখানা, আমরা ঢুকতাম খিড়কিদোর দিয়ে একটা গলি পেরিয়ে, পিছন দিকে একটা বারান্দার পাশের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির দেয়ালে উপেন্দ্রকিশোর নিজের হাতে চমৎকার নক্সা এঁকেছিলেন। তাই দেখে বাড়িওয়ালা মহা খুশি হয়ে, ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এ-কথা পরে শুনেছিলাম। বলেছিল অত কম ভাড়ায় নক্সা-করা বাড়ি পাওয়া যায় না।

ঐ সিঁড়িটি অনেক সময় ফেলে দেওয়া হাফ-টোন ছবির নানা রঙের চকচকে প্রুফে ভরে থাক্‌ত। আমরা মহানন্দে কুড়িয়ে আনতাম। তার কেমন একটা গন্ধ ছিল ; এখনো কোনো ছাপাখানায় গেলে ঐ রকম গন্ধ পাই, মন কেমন করে। নিচে প্রেস চলত তার একটানা ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ কানে আসত ; মনে হত বাড়িটা বুঝি দুলছে, যে-কোনো সময় ডানা মেলে পাখির মতো উড়ে যাবে ! সে-বাড়ির রোমাঞ্চের কথা মুখে বলার সাধ্য নেই আমার। অথচ খুব যে একটা সাজানো-গোছানো ছিল তাও নয়। তার দরকারও ছিল না। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে চারদিক ভরে রাখতেন। ঐ বয়সেও বুঝতাম ঐ যে ফরসা দাড়িওয়ালা লোকটি ছবি আঁকেন, বেহালা বাজান, হার্মোনিয়মের সঙ্গে গান করেন, ছাপাখানার লোকরা যেই লম্বা লম্বা কাগজ দিয়ে যায়, অমনি হাতে একটা কলম নিয়ে বসে পড়েন,—উনি একজন বিশেষ মানুষ। আর কেউ ওঁর মতো নয়।

এখন বুঝি যে তখনো তিনি ডাইবিটিসে ভুগতেন, যার জন্য দুই বছরের মধ্যে মাত্র ৫২ বছর বয়সে তাঁর অমূল্য জীবনটি শেষ হয়ে গেছিল। কি রকম চিকিৎসা হত কে জানে। শুনেছি বিলেত থেকে কোনো বিশেষ ওষুধ আসত, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সে-ওষুধের চালান বন্ধ হয়ে গেছিল, তাতেই জ্যাঠামশায়ের কাল হয়েছিল। মনে আছে বিকেলে তিনি এক প্লেট টুকরো করে কাটা পাকা পেঁপে আর কলা খেতেন, কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে। কল্যাণ আর আমি হাঁ করে দেখতাম। তার আগে কাউকে কাঁটায় ফুটিয়ে কিছু খেতে দেখিনি। কাছে গিয়ে হাঁ করতাম। জ্যাঠামশাই বলতেন, "আগে পেঁপে, তারপর কলা।" সেটা আমাদের খুব পছন্দ ছিল না, কিন্তু কি আর করা। এখন ভাবি না পেঁপে, না কলা, কোনোটাই তাঁর পক্ষে খুব উপযুক্ত খাদ্য ছিল না।

বাবার চাইতে মুখ সুন্দর ছিল জ্যাঠামশায়ের, রঙ অনেক ফরসা ছিল। কিন্তু বাবা মাথায় ছিলেন প্রায় ছয় ফুট, পিটানো বলিষ্ঠ শরীর ছিল। জ্যাঠামশাই খানিকটা বেঁটে, শরীরটাও নরম। তবু একদিন বাবার কাঁধে হাত রেখে কল্যাণকে বলেছিলেন, "জানিস্, আমি তোদের বাবার বড় ভাই। ইচ্ছে করলে তোদের বাবাকে আমি পেটাতে পারি!"

এ-কথা শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনি। কল্যাণ তো মুচ্‌কি হেসে সজোরে মাথা নেড়েছিল। বাবাকে পেটাতে পারে না আরো কিছু!! পেটানোর ক্ষেত্রে বাবার ব্যুৎপত্তি নিয়ে সেদিন মনে মনে ভারি গর্ব হয়েছিল।

বাড়িতে আরো লোক ছিল। আমাদের ছোট জ্যাঠামশাই, কুলদারঞ্জন, জ্যাঠাইমা মারা যাবার পর থেকে তাঁর ছেলে আর মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঐ-বাড়িতে উঠে এসেছিলেন। ছোট জ্যাঠামশাই নাকি বাবাকে ভয় পেতেন, অন্তত তাই বলতেন। দেশে ছোটবেলায় ওঁদের দুই ভাইয়ের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে পাড়ার লোকে ঠাকুমার কাছে দরবার করত। ছোট জ্যাঠামশাইকে ধমক-ধামক দিয়ে যদিবা ম্যানেজ করা যেত, বাবাকে সামলাবার জন্য একজন ষণ্ডামার্কা চাকর রাখতে হয়েছিল! ওঁদের নানান্ দুষ্টুমির গল্প শুনে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। তার অর্ধেকের অর্ধেক করলেও বাবা যে পিটিয়ে আমাদের মাটিতে বিছিয়ে দিতেন সেটা নিশ্চিত। বলা বাহুল্য বেশির ভাগ গল্প ছোট জ্যাঠামশায়ের মুখেই শোনা।

তিনি আমাদের প্রথম 'বায়োস্কোপ' দেখিয়েছিলেন, প্রথম 'সার্কাস' দেখিয়েছিলেন। কি আশ্চর্য জায়গা কলকাতা, নিত্যি নতুন জিনিস দেখতাম। পাল্‌কি চড়ে দিদি আর আমি একদিন মায়ের সঙ্গে বড় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে দেখি, ২২ নং সুকিয়া স্ট্রীটের খিড়কি দোরের বাইরে একটা লম্বা-ঠ্যাং টুলের ওপর, ড্রামের মতো কি একটা রঙচঙে জিনিস বসিয়ে একটা

লোক ডেকে ডেকে কি যেন বলছে। মা বললেন, "বায়োস্কোপ দেখবি ?" সে আর বলতে ! এ বায়োস্কোপ একজন একজন করে দেখতে হয়। মা লোকটাকে দুটো পয়সা দিলেন, একটা গোল মতন কাঁচের ভিতর দিয়ে আমি আগে দেখলাম। সে এক স্বপ্নরাজ্য ! সুন্দরী রাজকন্যে, মুখে-ফেনা তেজী ঘোড়ায় চাপা বীর রাজপুত্র, বিকট রাক্ষস, কেউ থেমে থাকছে না, শুধু ছুটছে আর ঘুরছে আর লোকটা সুর করে কি যেন বলে যাচ্ছে তার একবর্ণ মানে বুঝছি না। তারপর যেই কট্ শব্দ করে ছবি অন্ধকার হয়ে গেল, আমার পালাও শেষ হল। দিদি এসে চোখ লাগাল। পরদায় দেখা সেই বায়োস্কোপের চেয়ে এ যে কত বেশি ভালো, সে আর কি বলব। একেবারে কোলের কাছের ঘরোয়া জিনিস। দোতলায় উঠেও অনেকক্ষণ ধরে মনে হচ্ছিল এখানে আমি নেই ! সেইবারই বড়দিকেও প্রথম দেখলাম। বড়দির নাম সুখলতা রাও, তাঁর নাম জানে না এমন লোক সেকালে কম ছিল। দেশ-বিদেশের পরীদের গল্প তিনি সংগ্রহ করে সে যে কি মিষ্টি বাংলায় লিখেছেন সে আর কি বলব। আর অপূর্ব সব কবিতা। আমার মায়ের চাইতে বড়দি ছিলেন দেড় বছরের ছোট, একসঙ্গে মানুষ, আপনার বোনের মতো। মা বলতেন বড়দি জীবনে কখনো কোনো স্বার্থপর কাজ করেননি। কিন্তু সদাই গম্ভীর মুখ। একটা মজার গল্পও শুনেছি। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাব ছিল সেই সময় রাজর্ষি প্রকাশিত হয়েছিল, জ্যাঠামশাই বড় মেয়ে আর বড় ছেলে সুখলতার আর সুকুমারের ডাকনাম রাখলেন হাসি আর তাতা। সুকুমারের তাতা নাম থেকে গেল, কিন্তু সুখলতার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ আর তাকে 'হাসি' বলে ডাকবার সাহস পেল না। তবে এ-কথা আমার খুব ভালো করেই মনে আছে যে আমাদের পুতুল খেলার সময় বড়দি একবার যোগ দিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল কাগজের লুচি বানিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স হয়তো ২৬ বছর হবে। জ্যাঠামশায়ের স্বল্পায়ু ছোট মেয়ে শান্তিলতার তখনো বিয়ে হয়নি। আমরা তাকে ডাকতাম টুনিদি বলে। যেমনি সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি স্বভাবটি। রোজ রাতে আমাদের খাইয়ে দিতে দিতে টুনিদি গল্প বলত, ছড়া বানাত। তার লেখা দু-একটা কবিতা সন্দেশে বেরিয়েও ছিল। তার একটি হল, "ওগো রাঁধুনী শোন গো শোন !" এমন সরস কবিতা খুব বেশি হয় না। ছবি আঁকার হাত ছিল। আমরা শিলং-এ ফিরে গেলে আমাকে একটা পোস্টকার্ডে ছোট্ট ছোট্ট ছবি এঁকে লিখে পাঠিয়েছিল : "পিঠোপিঠি দুই বোন সুকু আর লীলা, পড়তে বসে বই ফেলে করছে পুতুলখেলা। তাই না দেখে প্রভাতরঞ্জন উঠলেন রাগে ফুলে। চুপিচুপি বেঁধে দিলেন দুই জনার চুলে। বাইরে গিয়ে যেই ডেকেছে লুচি খাবি আয় ! অমনি তারা হ্যাঁচ্‌কা টানে বাপরে কি চেঁচায় !"

এই টুনিদিকে আর দেখিনি। মাত্র ২৪ বছর বয়সে নিউমোনিয়া হয়ে, শেষ একটা "দাদা!" বলে ডাক দিয়ে সে মারা গেছিল। বড়দি আর টুনিদির মধ্যিখানে ছিলেন মেজদি পুণ্যলতা চক্রবর্তী। এঁরা সবাই জাত লেখিকা, কাউকে কিছু শেখাবার দরকার ছিল না। সবার ছোটভাই সুবিমল, আমাদের নান্‌কুদা। এমন সরস, কল্পনাপ্রবণ, খামখেয়ালী মানুষকে সঙ্গী পেয়ে আমরা আহ্লাদে আটখানা হতাম।

॥ ৩ ॥

নানকুদা বেজায় ভালো সঙ্গী হলেও বেশ একটু যে নিষ্ঠুর ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের বয়স চার, পাঁচ, ছয়: ও যা বলত সব বিশ্বাস করতাম, এক রকম বলতে গেলে ওর অনুগত ভক্ত ছিলাম। রোদে তাতানো ছাদে আমাদের খালি পায়ে হাঁটাত। অন্ধকার লোহার সিঁড়ি দিয়ে একতলায় নামাত। বিকট সব গল্প বলে আলো নিবিয়ে ঘর থেকে চলে যেত। আবার কেউ পড়ে গেলে, ছুটে এসে কোলে তুলে ওষুধ দিত। তখনো সে স্কুলের গণ্ডী ছাড়ায়নি। ওর সমবয়সী পান্‌কুদা ছিল ছোট জ্যাঠার ছেলে, বড় বেশি ভারিক্কে ধরনের। ছোটবেলায় মা হারিয়ে কেমন যেন নিজের মধ্যে নিজে বন্ধ হয়ে গেছিল, সে-কথা পরে বুঝেছিলাম। এরা দুজনে আমার মাকে বড্ড ভালোবাসত, ডাকত 'মান্তু' বলে। সুকুমার তখন বিলেতে: সুবিনয় নিশ্চয়ই বাড়িতেই থাকত, কলেজে পড়ত, আমাদের সঙ্গে খুব একটা মিশত না। তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা হত না। জ্যাঠামশায়ের বুড়ো চাকর প্রয়াগ আমাদের গল্প বলত। দেশের গল্প, জন্তু-জানোয়ারের গল্প।

মনে আছে আমরা আসার কিছুদিন পরেই দেওয়ালী হল। সুকিয়া-স্ট্রীটের সব বাড়িতে তেলের পিদ্দিম জ্বালা হল, আমাদের বাড়িতে ছাড়া। শুনলাম ব্রাহ্মদের কালীপুজোয় আলো জ্বালবার দরকার নেই। শুনে অবাক হলাম। শিলং-এ আমাদের পাড়ার কাউকেই কালীপুজোয় আলো জ্বালতে দেখিনি। লাবানে নিশ্চয়ই পুজো হত, কিন্তু তার কিছুই মনে নেই। আলো দিতে না পেরে মনমরা হয়ে ছাদে গিয়ে চক্ষুস্থির! চারদিক আলোয় আলো-ময়! আর মাথার ওপর এত ফানুস উড়ছে যে আকাশটা প্রায় ঢেকে গেছে। মনে আছে একটা ফানুস ঠিক একটা হাতির আকারে তৈরি। সেটা আবার খুব নিচে দিয়ে উড়তে উড়তে হঠাৎ জ্বলে উঠল আর দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমাদের সে কি দুঃখ!

আরো মনে পড়ে আমার পিসতুতো বোন ময়নার দুই বছরের জন্মদিন হল খুব ঘটা করে। অগুন্তি অতিথি এসেছিল। পিসেমশাইকে চিনত না এমন লোক ছিল না। তাঁর নাম ছিল হেমেন্দ্রমোহন বসু, কুন্তলীন তেল আর দেলখোস সেণ্ট তৈরি

করে তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। সে সময়ে আমাদের দেশে ও-সব বিলাস-দ্রব্য হতই না প্রায়। পিসেমশাই ছিলেন অগ্রণীদের একজন। নানান বিষয়ে উৎসাহ ছিল তাঁর। তখন গ্রামোফোনের জন্য ডিস্কের বদলে সিলিণ্ডার ব্যবহার হত। পিসেমশাই সেই সময় রবীন্দ্রনাথের গাওয়া বঙ্কিমের বন্দেমাতরম গানটি রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর ছেলেদের কাছে ঐ সিলিণ্ডারটি এখনো আছে, তবে কেমন অবস্থায় তা জানি না। বাড়িতে বায়োস্কোপ দেখাবার ব্যবস্থা করতেন তিনি। ময়নার জন্মদিনেও দেখানো হয়েছিল। তখনো পিসেমশায়ের নিজের বাড়ি হয়নি, কোনো আত্মীয়ের বাগানে জন্মদিন করা হল।

বাগানের মধ্যিখানে দেখলাম সবুজ একটা কাঠের টবে একটা সত্যিকার গাছ পোঁতা রয়েছে। তার ডালে ডালে রঙীন কাঁচের গোলা, মোমবাতি আর অজস্র খেলনা ঝুলছে। গাছের মগ্-ডালে একটা পরী-পুতুল। সব খেলনায় একটি করে নম্বর দেওয়া ছিল। সক্কলকে একটা ঝুড়ি থেকে ইচ্ছেমতো টিকিট তুলতে বলা হল। টিকিটের যে নম্বর, সেই নম্বরের খেলনা সবাই পেল। পরী-পুতুল কে পেল মনে নেই, কিন্তু আমি পেলাম রঙ-চঙে বাক্সে চমৎকার ছবি দেওয়া এ-বি-সি ব্লক। এত খুশি হয়েছিলাম যে তার পরদিনই বসে বসে এ থেকে জেড্ পর্যন্ত শেখা হয়ে গেল। ততদিনে বাংলা অক্ষরও চিনতে শিখেছি। বড়দি আমাদের হাসিখুশি আর মোহনভোগ বলে দুখানি বই দিয়েছিলেন। ঐ আমার নিজের প্রথম বই।

তারপর বাবা তাঁর বনে বনে জরীপের কাজ সেরে ফিরে এলেন। যামিনীদা দেশ থেকে ক্ষীরের ছাঁচ আর নারকেল নাড়ু নিয়ে ফিরল। আমাদের শিলং-এ ফিরবার সময় হয়ে এল। তার আগে হ্যারিসন রোডে পিসেমশায়ের ভাড়া বাড়িতে কয়েক দিন থাকা হল। কি প্রকাণ্ড বাড়ি আর কি ভয়ঙ্কর দুরন্ত পিসেমশাইয়ের যে-সব ছেলেরা আমাদের সমবয়সী, বিশেষত গণেশ আর কার্তিক বলে দুজন। তারা আমাদের যাকে বলে এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচে আসতে পারত। কিন্তু ও-বাড়িতে আমাদের বেজায় ভালো লাগত। ওদের যেখানে যা ছিল সব আমাদের নিতে দিত ; যখন খুশি যা খুশি নিজেরাও খেত, আমাদেরও দিত, সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা, কুলপী-বরফ। তবে বড়রা যেমন ভালো, ছোটগুলো তেমনি বাঁদর ছিল। মনে আছে আমার একটা পেয়ারের ডলি ছিল। একদিন গণেশদা বলল, 'বুঁদী একটা চোর, বুঁদীর বিচার হবে।' কার্তিকদা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো হবেই, চুরি করবে আর তার বিচার হবে না! বুঁদী ভেবেছে কি! চল, ওকে ছাদে নিয়ে চল।" [illegible] রির ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে ছাদে নিয়ে চলল। দেখলাম দাদা[illegible] কিছু বলছে না। [illegible] ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে সঙ্গে গেলাম। ব[illegible] দিদিও এমন সু[illegible] ছাড়ল না। পিসিমার

ছেলে বাপীর প্রায় আমার সমান বয়স, আমার ভাই কল্যাণ এক বছরের ছোট, এরা হল নীরব দর্শক। বিচারে বুঁদীর ফাঁসির হুকুম হল। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে চিল-ছাদের দরজার শিকলিতে দড়ি বেঁধে লটকেও দেওয়া হল। তবু মরছে না দেখে, ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ওর হাত পা খসিয়ে ফেলা হতে লাগল।

আমি আর সইতে না পেরে, চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নিচে নামতে লাগলাম। মুকুলদা তার নিজের ঘরে ছিল। সে আমাকে ধরে ফেলে, চোখ মুছিয়ে, তার সত্যিকার বাষ্প-এঞ্জিন-টানা ট্রেন চালিয়ে দেখাতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে এঞ্জিনটা আবার লাইন থেকে সরে হুড়মুড় করে পড়ল। ততক্ষণে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছিল। তখন মুকুলদার বয়স হয়তো তেরোর বেশি নয়।

এই মুকুলদা অন্য সকলের থেকে আলাদা একজন বিশেষ মানুষ। খুব ছোটবেলায় হাঁটু জখম হয়ে ওর একটা পা একটু ছোট হয়ে গেছিল। সারা জীবন ও সেই দুঃখ বয়ে বেড়িয়েছে। সিনেমা জগতে ফটোগ্রাফির জন্য ওর ভারত-জোড়া নাম! আমার চাইতে বছর আষ্টেকের বড় হবে, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান। এর পরেও আমার প্রয়োজনের সময় আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সুদর্শন এই মানুষটির তুলনা নেই। আমি ওকে কখনো কিছু দিইনি। দেওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য গণেশদাদের যথেষ্ট বকাবকি করা এবং আমাকে একটা চমৎকার চোখ-খোলা-চোখ-বোজা ডলি কিনে দেওয়া হয়েছিল। এমনি করে তিলে তিলে আমাদের জীবনে রস-রোমাঞ্চের অবতারণা হয়েছিল।

ফিরে যাবার আগে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল, আমাদের ওপর যার প্রভাব ছিল সুদীর্ঘ ও সুদূরপ্রসারী। সে হল উপেন্দ্রকিশোরের 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ। ১লা বৈশাখ ১৩২০। সেদিনটি আমার এখনো মনে আছে। সন্ধ্যেবেলা আমরা সকলে দোতলার বসবার ঘরে বসে আছি। দিদির, আমার, হাতের প্রথম সোনার চুড়ি হয়েছে, তার চকচকে রূপের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। এমন সময় জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে ওপরে উঠে এলেন। হাতে তাঁর 'সন্দেশে'র প্রথম সংখ্যা। কি চমৎকার তার মলাট! গাল-ভরা সন্দেশ, হাতে 'সন্দেশ' ভাই-বোন শোভা পাচ্ছে। যতদূর মনে হয় এইটেই ছিল প্রথম মলাট। পরের বছর বোধ হয় দাদু-প্যাটার্ণের একজন সন্দেশের হাঁড়ি আর 'সন্দেশ' উঁচু করে ধরে রেখেছে আর ভাই-বোন সেগুলো পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। প্রতি বছর জ্যাঠামশায়ের আঁকা নতুন রঙীন মলাট, হাফ-টোনে ছাপা, সাল-তারিখ গুলিয়ে যায়।

মা, বড়দিদি, টুনিদিদি সবাই মিলে যে-রকম আনন্দ কোলাহল করে উঠলেন, তাতে আমাদেরো বুঝতে বাকি রইল না যে আজ একটা বিশেষ দিন। কবিতা গল্প আমাদের পড়ে শোনানো হয়েছিল, কিন্তু তার কিছুই মনে নেই। 'সন্দেশে'র ছোট হরপের তখনো সুবিধা করতে পারতাম না। ঐ যে জ্যাঠামশাই "সন্দেশ" ঢুকিয়ে দিলেন আমাদের জীবনে, আমার মনে হয় কালে কালে ও-ই আমাকে যতখানি প্রভাবিত করেছিল, তেমন আর কিছু নয়। এমন কি জ্যাঠামশাই নিজেও না। ১৯১৩ সালের এই ঘটনার পর তিনি মাত্র দু বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আমার সমস্ত শৈশবের চিন্তার কেন্দ্রে ছিল ঐ একটি ছোট মাসিক-পত্রিকা, তার কবিতা গল্প ছবি ধাঁধা ; কোনো মানুষ না। জ্যাঠামশাই পরলোকে যাবার পরেও সে প্রভাব এতটুকু স্তিমিত হয়নি। কবে যে নিজে পড়ে বাংলা ভাষার রস গ্রহণ করতে শিখেছিলাম সে আর মনে নেই। কিন্তু সে যে "সন্দেশ" এবং জ্যাঠামশায়ের ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের প্রকাশিত নানান্ অবিস্মরণীয় বইয়ের জন্য-ই সম্ভব হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ ১৯১৪ সালে দিদি আমি লোরেটো কন্‌ভেণ্টে ভর্তি হয়েছিলাম। সেখানে বাংলা তো পড়ানো হতই না, তার ওপর সহপাঠিনীরা আর কোনো কোনো মাস্টারনীরাও যে 'নেটিভ'দের এবং নেটিভ্ ভাষা, নিয়ম, চালচলনকে ঘৃণা করে, সেটা বুঝতে আমাদের দেরি লাগেনি। এর ফলে আমাদের কেমন একটা জেদ্ চেপে গেছিল। ইংরিজিতে তো ওদের সমান সমান হয়ে উঠলাম-ই, তার ওপর বাড়িতে বাংলা বইয়ের সংগ্রহটি দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল। ছেলেদের রামায়ণ, তার ছবিই বা কি অপূর্ব, অমন বিকট তাড়কারাক্ষসী অমন রঙ দিয়ে এঁকে ক্রীম-লেড কাগজে অমন চমৎকার করে আজ পর্যন্ত কেউ এঁকেছে বলে শুনিনি। ছেলেদের মহাভারত আর সেই কবিতায় 'ছোট্ট রামায়ণ' বাংলা ভাষায় যার তুলনা নেই। ছোট জ্যাঠামশায়ের 'ইলিয়াড', 'ওডিসিয়স্', 'রবিন-হুড্', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'কথাসরিৎসাগর'। বড়দির 'আরো গল্প' ইত্যাদি আগ্রহের চোটে সময়কে ছাড়িয়ে যাচ্ছি, এ-সব হল ১৯১৪-১৫-র কথা। আমরা হয়তো ১৯১৩-র শেষের দিকে শিলং-এ ফিরেছিলাম। মনে আছে কোনো কারণে বাড়ি পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে গেছিল। তখন একে দিন ছোট হয়ে এসেছিল, তার ওপর পাহাড়-দেশের সূর্য বিকেল শেষ না হতেই টুপ করে পাহাড়ের পিছনে নেমে পড়ে। চুড়োয় চুড়োয় রোদ লেগে থাকে, অনেক উঁচুতে যে-সব বাড়ি তাদের জানলার সার্শিতে পড়ন্ত রোদ ঝিকমিক করে ওঠে, চোখ ঝলসে যায়। পাহাড়তলিতে তখন ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি-পোকা জ্বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে, গাছের তলায় তলায় অন্ধকার জমেছে। তারপর হঠাৎ কখন সব লেপেপুঁছে একাকার হয়ে যায়। পথের তেলের বাতি টিমটিম করে আর মাথার ওপরকার

নীল আকাশটাকে গাঢ় বেগুনি দেখায়, তার ওপর লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলতে থাকে। সে-তারার আলোই বা কি! চাঁদ না থাকলেও চারদিক ফুটফুট করে।

এই রকম দিনে, এই রকম সময়, আমরা ক্লান্ত শরীরে হাই-উইণ্ডস্-এ এসে পৌঁছুলাম। লাল গেটের কাছ থেকে দেখতে পেলাম কাঁচের জানলার পিছনে সারি সারি তেলের ল্যাম্প জ্বলছে, সামনের দরজা খোলা, বারান্দায় লোকজন। সব মিলিয়ে যেন হাত বাড়িয়ে আমাদের কোলে তুলে নিল। অমনি সব ক্লান্তি, সব বিরক্তি দূর হয়ে গেল। আমরা গেট্ থেকে এক দৌড়ে কাঁকর দেওয়া পথ দিয়ে নেমে বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে অমরকাকাবাবু, খুড়িমা, হরিচরণ, নন্দ আমাদের জন্যেই পথ চেয়ে ছিলেন। গত ছয়টা মাস সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে মুছে গেল। এই তো আমাদের নিজেদের জায়গাটিতে ফিরে এসেছি। এত আরাম, এত নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা আর কোথাও নেই।

অমরকাকাবাবু বাবাদের অপিসের অফিসার। তাঁরা যে আমাদের সত্যিকার কেউ নন্ এ-জ্ঞান যখন হয়েছিল, তখন বুকটা টনটন করে উঠেছিল। অন্যদের কি হয় জানি না, ছোটবেলা থেকে আমার কিন্তু বেজায় দুঃখ হলে বুকের ভিতর সত্যি সত্যি ব্যথা করতে থাকে। আমাদের বাড়ির সামনেই ফিরিঙ্গিদের সরকারি স্কুল, পাইনমাউণ্ট স্কুল। সেখানকার মেমরা আমাদের পাশের বাড়িতে থাকতেন। তার পরেই 'নরেস্ক', প্রায় অবিকল হাই-উইণ্ডস্-এর মতো, দুই বাড়ির একই মালিক। নরেস্ক্-এ অমরকাকাবাবুরা থাকতেন। ভারি ফ্যাশানেব্‌ল্ ছিলেন ওঁরা। কেমন সাদা পোশাক-পরা বাবুর্চি ওঁদের রান্না করত। কাকাবাবু কাঁটা চামচে খেতেন আর খুড়িমা যে কি সুন্দরী ছিলেন সে আর কি বলব। কি সুন্দর সব গোলাপী, নীল রেশমী শাড়ি পরতেন, দেখে দিদি আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমাদের বাড়িতে যে বাঙালী ব্যবস্থা এটাও তখন বুঝতাম না। শীতের দেশ, টেবিলে খাওয়া হত, এই যা তফাৎ। ২২নং সুকিয়া স্ট্রীটে পিঁড়ি পেতে বড় বড় কাঁসার থালায় সবাই খেতাম। তা হকগে; কাকাবাবুদের বাড়িতে কিছু ভালো রান্না হলে, আমরা ভাগ পেতাম। মাঝে মাঝে পার্টি হত, যা ঝড়তি-পড়তি বাকি থাকত, পরদিন তার খানিকটা আমাদের বাড়িতে আসত। রোজ দুবেলা যদি দেখা না হত, সে বড় আশ্চর্য ব্যাপার হত। থাকতাম দুই বাড়িতে, বড়রা যে যার নিজেদের জীবন কাটাবেন, কিন্তু আমাদের দিন কাটত এক সঙ্গে গাদাগাদি করে। শুধু খাবার সময় যে যার বাড়ি যেতাম।

ঐ বাড়িতে যাওয়াটা একেবারে নিরাপদ ছিল না। পাইন-মাউণ্ট স্কুলের মেট্রনের একপাল রাজহাঁস, বিলিতী মুরগী আর মস্ত মস্ত পেরু ছিল। হরিচরণ, নন্দ, দাদা, কল্যাণ, অমিদের একটা খেলাই ছিল তাদের তাড়িয়ে বেড়ানো। তার ফলে সব কটা পাখির মেজাজ একেবারে খিচড়ে গেছিল। বেঁটে কাউকে

দেখলেই গলা বাগিয়ে, ঠোঁট এগিয়ে সাপের মতো হিস্-হিস্ শব্দ করতে করতে তেড়ে আসত। আর ধরতে পারলে তো কথাই নেই, গোড়ালি ঠুকরে রক্তাক্ত করে দিত। দিদি, আমি ওর মধ্যে ছিলাম না, তবুও আমাদেরও বাদ দিত না। এমন কি সম্পূর্ণ অচেনা বেঁটে খাটো কাউকে দূর থেকেও দেখতে পেলে তেড়ে আসত। হাঁস পেরু যে কি ভয়ঙ্কর রকমের হিংস্র জানোয়ার তা খুব কম লোকেই জানে। হরিচরণদের বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে যাওয়া-আসাটা তাই সাধারণ ঘটনার পর্যায় থেকে একটা উত্তেজনাময় অভিযানে দাঁড়াত। ক্রমে দুই পক্ষই দক্ষ গেরিলা যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলাম। অতর্কিতে আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ। বলা বাহুল্য বড়রা এর কিছুই জানতেন না।

আরো সব কাকাবাবু ছিলেন আমাদের। তাঁদের অযাচিত স্নেহের কথা ভুলবার নয়। সবাই বাবাদের আপিসে কাজ করতেন। প্রফুল্ল কাকাবাবুরা লাল পুলের ওপর আমাদের সেই পুরনো বাড়িতে থাকতেন। ও-বাড়ির নাড়ু, নীলু, হরিচরণ, নন্দর মতোই আমাদের খেলার সাথী ও সমবয়সী। সারাজীবন আমরা এদের কাছাকাছি বাস করেছি। আজ পর্যন্ত এরা আমাদের অন্তরের অন্তরঙ্গ। কে বলেছে এরা আমাদের সত্যিকার আত্মীয় নয়? কয়েক বছর পরের ঘটনা মনে পড়ছে। আমরা সকলেই তখন কলকাতার বাসিন্দা। ভবানীপুরের অধিবাসী। মায়ের হল নিউমনিয়া, যায় যায় অবস্থা, চার বেলা ডাক্তার আসেন, কিছু টাকার টানাটানি পড়ল। কাকাবাবুরা বাবার জুনিয়র, তাঁদের সাহায্য নেবার কথা বাবা মনেও স্থান দিতে পারেন না। তাঁরা দুজনেই চুপিচুপি নোটের তোড়া এনে দিদির আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন, "বাবাকে বলিস না।" আমরা একটি কথাও বলতে পারিনি। বাবা যখন শুনলেন, আমাদের একটুও বকলেন না, অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মা ভালো হয়ে গেলে সেই টাকা কাকাবাবুদের দিয়ে আসা হয়েছিল। এইরকম নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায়, স্নেহে প্রেমে আমার ছোটবেলাটা কেটেছিল। তাই আমার আজ পর্যন্ত যত লোক দেখি, প্রায় সকলকে ভালো লাগে। ঐ ভালো-লাগাটা এক-তরফা হলেও ভালো লাগে। আমার সব চিন্তা, সব কাজের পিছনে, সবাইকে আর প্রায় সব কিছুকে এই ভালো-লাগাটা কাজ করে। আমার ব্যাঙ পর্যন্ত ভালো লাগে; মাকড়সাও ভালো লাগে, তবে একটু দূর থেকে।

কলকাতা থেকে ফিরেই আবার শিলং-এর পুরনো জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। বাড়ির পুবে সিসল-ঝোপের বেড়ায় দিনের বেলাও ঝিঁঝি-পোকা ডাকত। তার পিছনে বন-বিভাগের বড় সাহেব মিঃ ক.উই থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পাগল। তাঁকে বন্ধ করে রাখা হত, একেক দিন পালিয়ে এসে মায়ের সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করতেন। একবার বলেছিলেন, "আমাদের বাড়িতে পার্টি

হয়, সবাই আসে। কিন্তু আমাকে ওরা যেতে দেয় না।" অপূর্ব সুন্দরী মানুষটি। মায়ের খুব দুঃখ হয়েছিল। একটু পরেই আয়া, নার্স, বেয়ারা, সবাই ছুটে এসে তাঁকে বাড়ি নিয়ে গেছিল।

কাউই সাহেবের গোটা দশেক সোনালী রঙের বিলিতী বেড়াল ছিল। তাদের কি আহ্লাদ! দেখে আমাদের গা জ্বলে যেত। তারা টিনের মাছ খেত। গাছে চড়তে পারত না। পাড়ার বেড়ালরা তাদের ওপর হাড়ে চটা ছিল, দেখলেই তাড়া করত। তারাও ম্যাও-ম্যাও করতে করতে ঘরে পালাত আর বয়-বেয়ারা ঠ্যাঙা নিয়ে পাতি বেড়ালদের ভাগাত। বিশেষ করে একটা ছাই রঙের হুলো ছিল সব চাইতে গোঁয়ার-গোবিন্দ। একদিন একটা হলুদ বেড়ালকে একলা পেয়ে হুলো তাকে তাড়িয়ে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এল। সে বেচারা গাছে চড়তে পারে না, তবু মরিয়া হয়ে তরতর করে আমাদের সরল গাছের মগডালে চড়ে বসল। হুলোর গাছে চড়া হল না। হাঁকডাক শুনে বয়-বেয়ারারা বাঁশ নিয়ে এসে তাকে ভাগাল। তারপর হল মজা। আহ্লাদে আর নামতে পারে না! সাহেবের পেয়ারের চাকররা গাছে চড়তে পারে না! শেষটা একটা লম্বা মই এনে তাকে নামানো হল।

ঐ হুলো কিন্তু মহা পাজি ছিল। মাঝে-মাঝে আমাদের মাছ খেয়ে যেত। সেকালে ওখানে সপ্তাহে দুদিন বাজার বসত, তখন মাছ পাওয়া যেত। সকলে মাছ ভেজে দু-তিন দিন ধরে খেত। ঠাণ্ডা জায়গা, নষ্ট হত না। আমাদের রান্নাঘরের ছাদ থেকে শিকে ঝুলত, শেষটা যামিনীদা সেই শিকেতে ভাজা-মাছ তুলে রাখল। হুলোও হন্যে হয়ে, স্কাই-লাইটে চড়ে, সেখান থেকে লাফ দিয়ে, মাছ নামিয়ে, কতক খেয়ে, কতক নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল। ভয়ানক রেগে গেছিলাম।

সেই রাতে স্বপ্ন দেখলাম আমি বসে আছি, একেবারে আমার গা-ঘেঁষে হুলো যাচ্ছে! হাতে কোনো হাতিয়ার নেই, কিন্তু এমন সুযোগ তো ছাড়া যায় না, দিলাম কষে হুলোর গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত! দিদি শুত আমার পাশে, মস্ত বড় একটা লেপের নিচে, ওর নরম-গরম পায়ে পা লাগিয়ে আমার ঠাণ্ডা গা গরম করতাম বলে এমনিতেই এ ব্যবস্থা ওর পছন্দ ছিল না। তার ওপর আজ রাতের চড়টা গিয়ে ওর গালে পড়াতে, ঠাণ্ডা মানুষটা রেগেমেগে উঠে বসে বলল, "ও কি হচ্ছে! আমাকে চড় মারছিস কেন?" আমি বললাম, "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, স্বপ্নে মারছি রে, ও সত্যিকার চড় নয়।" দিদি বলল, "আমিও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে তোকে মারছি!" এই বলে আমাকে দু-ঘা দিয়ে পাশ ফিরে শুল! এর পরে জালের ডুলি কেনা হল, তাতে মাছ বন্ধ করে রাখা হত।

এর মধ্যে কলকাতা থেকে চিঠি এল বড়-মাসিমা তাঁর ছোট মেয়ে নোটনকে নিয়ে শিলং-এ আসছেন। মেসোমশাই তখন বিলেতে, তিনি না ফেরা অবধি মাসিমারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। খুব খুশি হয়েছিলাম। সেকালে কেউ বড় বড় পরিবারে আপত্তির কারণ, আমরাও ততদিনে বাড়তে বাড়তে দুই বোন চার ভাইতে দাঁড়িয়েছি। বোনের সংখ্যা এবার বাড়বে ভেবে দিদির, আমার মহা উৎসাহ। আর মায়ের নিজের মানুষ বলতে ঐ দুটি বোন, আর তাঁর কেউ ছিল না। সেই বোন দুটি মায়ের চোখের মণি। বড় মাসিমা মায়ের চেয়ে দু বছরের বড় ছিলেন। আমরা মোটর আপিসে আনতে গেলাম। মস্ত গাড়ি থেকে নামলেন। এখন হলে বলতাম বাস্, কিন্তু তখনো বাস্ কথাটার চল হয়নি। কলকাতার রাস্তাতেও বাস চলত না, শুধু ট্রাম চলত।

বড় মাসিমার চমৎকার চেহারা ছিল, মার চাইতে মাথায় সামান্য লম্বা, শক্ত বলিষ্ঠ শরীর, চোখে সোনার চশমা, মায়ের মতো অতটা ফর্সা না হলেও খুবই সুন্দর রঙ। আর নোটন একটা মোমের ডলির মতো সুন্দর। দুঃখের বিষয়, আমরা কোলে নেবার চেষ্টা করলে, চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে মুখ ফিরিয়ে, হাত দিয়ে আমাদের ঠেলে দিত। মাসিমা তাড়াতাড়ি ওকে তুলে নিয়ে বললেন "আহা, ওকে বিরক্ত কর না, তোমাদের তো আর চেনে না।" আমাদের ফূর্তি কোথায় উবে গেল।

বড় সুন্দর ছিল নোটন, যেমনি নাক-মুখ, তেমনি সুন্দর কোঁকড়া চুল, ভুরু যেন তুলি দিয়ে আঁকা, বড় বড় চোখ দুটো খুললে, পদ্মগুলো ভুরুতে ঠেকত। এমন সুন্দর মেয়ে আমি কম দেখেছি। তবে ঐ যা বললাম, বেজায় আহ্লাদী, নিজের মাকে ছেড়ে এক মিনিট থাকবে না, আমাদের খেলায় যোগ দেবে না। বয়স প্রায় তিন। ওর সঙ্গে ভাব করতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। পরে দেখলাম স্বভাবটাও তেমনি মিষ্টি। কারো সঙ্গে ঝগড়া করে না, কটু কথা বলে না। আমার সেজ ভাই অমিয় ওর চাইতে তিন মাসের বড়, সে কেবলি ওর পেছনে লাগত। ভাব-ও ছিল যথেষ্ট, একসঙ্গে খেলাধুলো হত, পরীদের মতো দেখতে নোটন আর কালো-কোলো গাঁট্টা-গোঁট্টা অমি। মনে আছে সেই সময় আমাদের নিজেদের চেহারা সম্বন্ধে আমাদের চোখ ফোটেনি। একদিন শুনেছিলাম মাসিমা মাকে বলছেন "এই সব কালো মেয়ে নিয়ে তোকে মুশকিলে পড়তে হবে!" মা সেদিকে কানই দিলেন না, বললেন, "কিচ্ছু মুশকিলে পড়তে হবে না। ওরা খুব ভালো।" কিন্তু আমার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়েছিল। হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেছিল। নোটনের সুন্দর চেহারায় আমাদের ভারি আনন্দ, ভারি গর্ব ছিল। অসতর্কে বলা ঐ একটি কথা বড় আঘাত দিয়েছিল।

॥ ৪ ॥

বড়মাসিমা লোকটি সাধারণ লোকদের থেকে একটু আলদা ছিলেন। সে সময় ভাবতাম তাঁকে বেজায় বেরসিক, ঠাট্টা বুঝতেন না, যা বলা যেত অমনি তাকে বাস্তব সত্য বলে ধরে নিতেন। পরে বুঝেছিলাম ছোটবেলায় যে স্নেহের পরিবেশে সব মানুষের ছেলেমেয়েদের বড় হওয়া উচিত, বড়মাসিমা তার কিছুই পাননি। পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারিয়ে, কুড়ি বছর বয়সে, বি-এ পাশ করে, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়া অবধি, মধ্যিখানের অতগুলো বছর স্নেহশূন্য বোর্ডিং-এ কেটেছিল। সেখানে শারীরিক যত্ন পেয়েছিলেন, শিক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু বড়দের ভালোবাসা পাননি। তবে বন্ধুবান্ধব অনেক জুটেছিল। পরে দেখেছিলাম কলকাতার শিক্ষিত সমাজের এমন মানুষ কম ছিল, মাসিমা যাদের চিনতেন না। সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। কিন্তু আমরা ভাবতাম কাঠখোট্টা। নিজের মেয়েকে ছাড়া কাউকে আদর করতেন না, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন না। তবে মাকে যে বড্ড ভালোবাসতেন, সেটা আর বলে দিতে হত না।

ভারি জ্বালাতন-ও করতাম। তরতর করে বাঁদরের মতো একটি ন্যাসপাতি গাছে উঠতাম। বাকি দুটিতে সুবিধা করতে পারতাম না। অমনি নোটনকে নিয়ে গাছতলায় এসে মাসিমা বলতেন, "ওরে নুটুর জন্য একটা ভালো দেখে পেড়ে দিস তো।" 'নুটু' শুনেই পিত্তি জ্বলে যেত। তার ওপর সরোজ আরো দু বছরের ছোট, তার নাম করছেন না বলে আরো রেগে যেতাম। সরোজের তখন হয়তো দেড় বছর বয়স, ন্যাসপাতির ওপর আগ্রহ নেই। তবু। ভালো দেখে একটা ন্যাসপাতি পেড়ে মাসিমাকে ডেকে বলতাম, "এটা দেব ? ভালো মনে হচ্ছে।" মাসিমা বললেন, "ভালো হলে দে, নইলে নয়।" বলতাম "দাঁড়াও দেখছি।" বলে এক কামড় দিয়ে আবার বলতাম, "খুব ভালো, এই নাও ধর !" বলে ছুঁড়ে ফেলতাম। জানতাম আমার মুখেরটা কখনোই নোটনকে দেবেন না। যদিও আমরা অকাতরে পরস্পরের মুখেরটা খেতাম। মাসিমা আমাকে বকতেন। তাই শুনে ঘর থেকে মা বেরিয়ে আসতেন। অমনি আমি তিন চারটে ভালো ফল ছুঁড়ে দিয়ে, গাছের আরো মগ-ডালে চড়ে ফল বাছতে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। মাকে ভয় করতাম না, বেজায় ভক্তি করতাম আর ভয়ঙ্কর ভালোবাসতাম। মা মুচকি হেসে আবার ঘরে ঢুকে যেতেন। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন আমাদের এই মা-টি। আমাদের পাঁচ ভাই তিন বোনকে, তার ওপর বাড়তি আরো জনা দুইকে দিব্যি সুন্দর মানুষ করে দিয়ে গেলেন, কাউকে চড়-চাপড়টা পর্যন্ত না দিয়ে। হয়তো ভাবতেন সে-কাজটি বাবার হাতে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দেওয়া যায়। 'কাউকে না' বলতে অবিশ্যি আমাকে বোঝায় না। মার হাতে চড় কানমলা খাবার গৌরব আমার

একার ছিল। একবার স্নানের ঘরে বন্ধও করে রেখেছিলেন। সেবার কল্যাণকে পিটিয়েছিলাম। খুব জল ঘেঁটেছিলাম, সাবান গুলে হাত দিয়ে চোঙা বানিয়ে বুদ্‌বুদ্‌ উড়িয়েছিলাম। লাল, নীল রাধধনুর রঙ ধরে সেগুলো ঘরময় উড়ে বেড়িয়েছিল। বাইরের দরজার চৌকাঠে ফিকে হলুদ, ফিকে গোলাপী, ছাই রঙের ছোট্ট ছোট্ট ব্যাঙের ছাতা দেখেছিলাম। দরজার ফাঁক দিকে এক ফালি রোদ এসে টিনের টবের জলে পড়ছিল। টবটাতে একটু ঠেলা দিতেই হাজার হাজার ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তৈরি হয়ে, যেই সেই রোদের কাছে আসছিল, ঝিকমিক করে উঠছিল। দেখে দেখে আর আশ মিটছিল না। একা কত দেখব? কাঁধ দিয়ে দরজায় ঠেলা দিতেই, বাইরের ছিট্‌কিনিটা পড়ে গেল, বেরিয়ে এসে ডাক দিলাম, "ওরে তোরা মজার জিনিস দেখবি আয়।" অমনি যে যার জলখাবার ফেলে, টেবিল ছেড়ে ছুটে এসেছিল। নোটন-ও, তার পিছন পিছন মাসিমা-ও। কেন জানি মনে হয়েছিল আমার শাস্তি পাওয়াটা তাঁর পছন্দ ছিল না। কিন্তু আমি ভালো করেই জানতাম মা ঠিক কাজই করেছিলেন। লোক আমি ভালো ছিলাম না। আমার কথামতো না চললে দাদাকে পেটাতাম, দিদিকে পেটাতাম। ওরা মাথায় আমার চাইতে লম্বা, বয়সে বড়, গায়ে জোর বেশি। তবু পেটাতাম। দাদা উলটে মারত আর দিদি ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদত। তাই দেখে বলতাম, 'ছিঃ! ছিচকাঁদুনি!' বলে আরো দু-এক ঘা দিয়ে দিতাম। তবু দিদিকে বেজায় ভালোবাসতাম। সে না হয় বোঝা গেল। ও যে কেন আমাকে ভালোবাসত সেটা আজ পর্যন্ত ভেবে পাইনি। সেইজন্যই আজ পর্যন্ত ও আমার প্রাণের প্রাণ, আমার অন্তরের দোসর।

বলেছি তো মাসিমা আসলে খুব ভালো ছিলেন। রাতে আমার পা কামড়াত, আমি কাঁদতাম। আমাদের আয়া ইল্‌বন নিচে বিছানা করে শুত। তাকে বলতাম, "ও ইল্‌বন, আমার পা টিপে দাও। বড্ড ব্যথা করছে।" ইল্‌বন বলত "পায়ে এঁটে দড়ি বেঁধে, পা টান করে শোও, ব্যথা সেরে যাবে।" কিছুতেই উঠত না। কিন্তু মাসিমা উঠতেন। শীতের রাতে গরম বিছানা ছেড়ে এসে আমার পা টিপে দিতেন। আমি ঘুমোলে তবে আবার শুতে যেতেন। এর অনেককাল পরে, আমার আদরের ছোটমাসিমা ৪২ বছর বয়সে পাটনায় মারা গেলে, বড় মাসিমা তাঁদের বাড়িতে একখানা চিঠিও লেখেননি। ছোটমেসোমশাই দুঃখ করে আমাকে লিখেছিলেন। তখন আমি কলেজে পড়ি।

বড়মাসিমার সঙ্গে দেখা হতেই সে-কথা বলেছিলাম। তাঁর চোখের কোণে জল দেখলাম। বললেন, "ওরে, আমি ছোটবেলায় ভালোবাসার কথা শুনিনি বলে দুঃখ কিম্বা ভালোবাসা প্রকাশ করতে শিখিনি।" বড্ড দুঃখ হয়েছিল, মনে হয়েছিল এ কেমন দুঃখী যে ভালো করে কাঁদতেও শেখেনি।

চমৎকার গানের গলা ছিল বড়মাসিমার। নোটন-ও সেটি পেয়েছিল। আমার বড় মেসোমশাই সুরেন মৈত্র যেমন ভালো গাইতেন তেমনি ভালো লিখতেন। সুরেশ্বর শর্মা নামে তাঁর কবিতা প্রবাসী ইত্যাদি কাগজে বেরুত। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন ; পি-ই-এনের সভ্য ; সব গাইয়ে, আঁকিয়ে, লিখিয়েদের পরম বন্ধু। ওদিকে বিজ্ঞানের ছাত্র এবং অধ্যাপক। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এঁরা সব মেসোমশায়ের ভক্ত ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাড়িতেই এঁদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল। মেসোমশাই বিদেশী কবিদের রচনার তর্জমা করতেন, বাংলা কাব্যে। আশ্চর্য ভালো লেখা। তিন-চারখানি বই-ও বেরিয়েছিল। তার মধ্যে 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা' আর 'জাপানী ঝিনুকে'র নাম না করে পারছি না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ৬৭ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। আমিও একজন ব্যথার ব্যথী, রসের রসিক, আজন্মের বন্ধু হারিয়েছিলাম। তাঁর কাছে কত যে ভালোবাসা পেয়েছি সে আর গুণে বলা যায় না। আমার কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে শিবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে তাঁর কোয়ার্টারে নোটনের সস্নেহ সঙ্গতে, মাসিমার যত্নে আর মেসোমশাইয়ের সান্নিধ্যে ছুটির পর ছুটি কাটিয়েছি। তাঁর হৃদয়ের একরকম উদারতা ছিল, যাতে তিনি যেমন গুণগ্রাহী তেমনি বিচক্ষণ সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন। কোনো ভালো জিনিসকে তিনি অশ্রদ্ধা করতেন না, তা মতের যতই অমিল থাকুক। বাড়িতে দেয়াল-ভরা বইয়ের আলমারি ছিল, তার বেশির ভাগ ইংরিজি বইতে ঠাসা। আমার মন গড়ে তুলতে এই মেসোমশায়ের অনেকখানি হাত ছিল। বলতেন, "তোমার উচিত ছিল আমার মেয়ে হয়ে জন্মানো।" তা কিন্তু নয়। আমার ঐ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, অসহিষ্ণু, রাগী বাবা ছাড়া, কেউ আমার বাবা হতে পারত না। কি রসজ্ঞান, কি ছবি আঁকার হাত, কি গল্প বলার নেশা। প্রচণ্ড শক্তির কি অবাধ প্রকাশ!

এমনিতে ভয়ে আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত, কিন্তু যেই না সন্ধ্যেবেলায় আমাদের স্কুলের পড়া তৈরি হয়ে যেত, বালিশে ঠেস-দিয়ে বসা বাবা অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তখন আমরা তাঁর কোলে, পিঠে, পেটের ওপর চেপে বসে, গল্প শুনতাম। সব সত্যি গল্প। দেশে বাবাদের ছোটবেলার গল্প ; জরীপ-বিভাগে কাজ করতে গিয়ে ঘোর বেঘো জঙ্গলে বাবার নানান্ লোমহর্ষণ অভিজ্ঞতার গল্প ; কত হাসির, কত কান্নার গল্প। অমন গল্প বলতে পারে আমি সারা জীবনে আর একটিও লোক পাইনি। বাবার ডাইরি থেকে তুলে "বনের খবর" প্রকাশ করেছিলেন সিগ্‌নেট প্রেস্। বাবা তখন ইহলোকে নেই। একাধিক সংস্করণ হয়েছিল তার। এখন আর পাওয়া যায় না। এমন তথ্যে, এমন সরসতায়, এমন পৌরুষে পরিপূর্ণ বই বাংলায় বেশি নেই। বাবাদের ছোটবেলার গল্প কিছু কিছু

আমার 'বাঘের বই'তে ভরে দিয়েছি। কিন্তু বাবার সেই চোখের দৃষ্টি, গলার স্বর, ঘরের সেই নিস্তব্ধতা আর ঘরের বাইরের সেই ঝোড়ো হাওয়ায় পাতা খসে পড়ার শব্দ দিয়ে যে ইন্দ্রজাল তৈরি হত, সে আমি কোথায় পাব ? বাবার সঙ্গে আমার চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল, কিন্তু ঐ একটি মানুষ ছাড়া কেউ আমার বাবা হতে পারত না। সব ঐ বাড়িটি, বাড়ির ঐ মানুষগুলি, বাইরের ঐ বিশেষ বিশ্বপ্রকৃতি, সব মিলে একটা পরিপূর্ণতা সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্যিখানে আমাদের নিজেদের জায়গাটি খুঁজে পেয়েছিলাম। আর কোনো জায়গার কথা ভাবতেই পারতাম না।

দিনরাত ছোট নদী কলকল করে বয়ে যেত। বর্ষায় সেকি ভীষণ চেহারা ধরত। তীর ছাপিয়ে, পাথর ডুবিয়ে, ফেনা ছড়িয়ে, গর্জন করে ছুটে যেত। আবার বৃষ্টি থামলেই আস্তে আস্তে জল নেমে যেত। তখন দেখতাম, এখানে ওখানে, পাহাড়ের খাঁজে, পাথরের গর্তে, জল আটকা পড়ে, ছোট বড় পুকুর তৈরি হয়েছে। তাতে ছোট মাছরা খেলা করছে। মুগ্ধ হয়ে দেখতাম। তারপরদিন জল আরো শুকিয়ে যেত, পুকুর আরো ছোট হত, মাছদের জায়গা কমে যেত। আরো দুদিন যেতেই পুকুরের জল শুকিয়ে যেত, মাছরা মরে যেত, পচা দুর্গন্ধ বেরোত। আমাদের সে কি দুঃখ।

নদীর ধারে ধারে একটুখানি জায়গা, তার পাশ দিয়েই আমাদের বাড়ির ঢালু জমি উঠে গেছে। সেইখানে নদীর ধারে নিচু একটা গুহামতো। তার ভিতর উঁকি মেরে দাদা বলল, "কি জানি চকচক করছে।" দেখলাম একটা নয়, দুটো চকচকে জিনিস। ধনরত্ন নয়তো ? অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে দেখলাম একটা চকচকে-চোখ মেঠো ইঁদুর, কোলের কাছে চারটে বাচ্চা নিয়ে, সামনের দুটো নখওয়ালা ছোট্ট ছোট্ট থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওর বাচ্চাদের কেউ ধরতে গেলে মজাটা টের পাবে !

আরেকদিন এক নির্জন জায়গায় পাহাড়ের গায়ে একটা গর্তে দেখেছিলাম সবুজ একটা সাপ, নীল দুটি চোখ খুলে, চুপ করে পড়ে আছে। আমাদের চাকর পন্নু বলেছিল, "ও ঘুমোচ্ছে। সারা শীত ওরা ঘুমোয়।" আমরা অবাক ! "ঘুমোচ্ছে তো চোখ খোলা কেন ?" পন্নু বলেছিল, ওদের চোখের ঢাকনি থাকে না, তাই চোখ বন্ধ করতে পারে না। শীত কাটলে জেগে উঠবে, ঐ খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। ওটা পড়ে থাকবে, সাপের নতুন নরম খোলস হবে। তখন ওর গায়ে জোর থাকে না, যে কেউ ওকে মেরে ফেলতে পারে।"

পন্নুর বাড়ি ছিল হাজারিবাগের দিকের কোনো গ্রামে। ওরা নাকি সাপ খেত। আমরা বললাম, "তোমরা তখন ওদের মেরে ফেল বুঝি ?" পন্নু চটে গেছিল, "দুব্‌লা শত্রু কখনো মারতে হয় ! মোটা হলে তবে মেরে খাই।"

আমরা বললাম, "বিষ লাগে না ?" পন্নু আশ্চর্য হয়ে গেছিল । "বিষ লাগবে কেন ? মুণ্ডুতে তো বিষ, সেটা কেটে ফেলে দিলেই হল ।"

প্রকৃতির বড় কাছাকাছি থাকতাম । টোমাটো গাছে, গায়ে নীল চোখ আঁকা, ল্যাজের দিকে সবুজ শুঁড়, চার পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, সবুজ শুঁয়োপোকা থাকত । তাদের গায়ে একটাও লোম ছিল না । পুষেছিলাম একটাকে । সাবানের বাক্সে ঢাকনিতে ছ্যাঁদা করে, তাতে রেখেছিলাম, ইস্কুলের মেয়েদের দেখা-দেখি । তাকে রাশি রাশি টোমাটো-পাতা খেতে দিতাম । রাশি রাশি ময়লা পরিষ্কার করতাম । তা সে কিছুতেই গুটি বাঁধল না । আইরিস্ বলল, "খেতে দিও না, গুটি বাঁধবে । আমারটা বেঁধেছে ।" দিলাম খাওয়া বন্ধ করে । কিন্তু মা শুনে রেগে গেলেন, "তোদের এক বেলা খাওয়া বন্ধ করলে কেমন লাগবে ? যা, টোমাটো গাছে ছেড়ে দিয়ে আয় ।" তাই দিতে হল । মার কথা না শুনবার সাহস পেতাম না । পরে ন্যাসপাতি গাছ থেকে একটা সোনালী গুটি ভেঙে এনেছিলাম । জালি-জালি দেখতে, ভিতরের মূক-কীটটাকে দেখতে পাচ্ছিলাম । সেই গুটি কেটে প্রকাণ্ড বড় প্রজাপতি বেরিয়েছিল । ফিকে সবুজের ওপর গোলাপী চোখ আঁকা । মাসিমা বলেছিলেন, "ওটা মথ্, তাই ডানা পেতে বসেছে । প্রজাপতি ডানা তুলে রাখে । তাই মথের ডানার ওপরে নক্সা, প্রজাপতির ডানার তলায় !" জানতেন অনেক রকম মাসিমা, খুব পড়াশুনো করতেন ।

একটা ড্র্যাগন-ফ্লাইকে দেখেছিলাম মুখে করে কি যেন এনে, আমাদের বসবার ঘরে সাজানো শিংয়ের খেলনার কলসীতে ভরে তার ওপর কিছুক্ষণ বসে থেকে আবার উড়ে গেল । ভারি কৌতূহল হল, কলসীটা তুলে দেখি মাটি দিয়ে মুখটা বোজা । কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে সেটা বের করে ফেলতেই একটা মরা মাকড়সা বেরুল, তারপর আরেকটু মাটি, তারপর আরেকটা মাকড়সা । আমি তো অবাক ! মাসিমা বললেন, "দুর্দিনের জন্য খাবার জমা করে রাখছে । ভগবানের এইরকম ব্যবস্থা ।" ভগবানের ব্যবস্থার আরো প্রমাণ পেয়েছিলাম । একদিন স্কুলে আমাদের টিচার বললেন, "বাইরে থেকে যার যা ইচ্ছা, ফুল, ফল, পাতা এনে আঁকো ।" আমি পাথরের খাঁজ থেকে একটা সিল্‌ভার ফার্ণের গাছ উপড়ে, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম প্রত্যেকটা সুতোর মতো মিহি শিকড়ের আগায় একটা ছোট্ট টুপি পরানো । টিচার বললেন, "যাতে জলের খোঁজে পাথরের মধ্যে নেমে ওর ব্যথা না লাগে, তাই ভগবান ওর আগায় টুপি পরিয়ে দিয়েছেন । তিনি সব জানেন, সব পারেন ।"

সবাই বললেও কিন্তু কথাটা মেনে নিতে পারতাম না, কারণ ভগবানের অব্যবস্থারও অনেক নমুনা চোখে পড়ত । একবার মাকে বলেছিলাম, "সবাই যদি পারেন তাহলে আমাকে শিলাকের মায়ের ছেলের মতো ফর্সা করেননি কেন ?

তাহলে বোধ হয় দয়ালু নন্ ?”

মা বলেছিলেন, “দয়া দিয়ে তৈরি তিনি। আমাদের মা মরে গেল, বাপ সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল, কই তবু তো আমরা জলে পড়লাম না। তিনি আমাদের এখানে ওখানে ব্যবস্থা করে দিলেন। ও কথা বলিস না।” তবু আমার খট্‌কা যায়নি, বলেছিলাম, “হয় পারেন না বলে ফর্সা করেননি, না হলে খুব নিষ্ঠুর বলে ইচ্ছা করে কালো করেছেন।” মা বেশি কথা বলতেন না, তবু বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, “শিলাকের মায়ের ছেলের বাবা সায়েব বলে সে ফরসা। তোদের বাবা বাঙালী।” শিলাকের মায়ের ছেলের বাবা সায়েব শুনে এমনি অবাক হয়ে গেছিলাম যে ফর্সা হবার কথা ভুলে গেছিলাম। কই, ওদের বাড়িতে তো কত গিয়েছি, সায়েবটায়েব তো দেখিনি। শিলাকের মা আমাদের জামাটামা সেলাই করত। লাবানে তার সুন্দর বাড়ি ছিল, ভারি মিষ্টি ভদ্র ব্যবহার ছিল তার, তাকে আমার বেজায় ভালো লাগত। সায়েবের রহস্যটা কেউ আমাকে খুলে বলল না।

এখন জানি ওদের ছিল মাতৃপ্রধান জাত, মায়ের পরিচয়ে ছেলে-মেয়েদের পরিচয় ছিল। অবাঞ্ছিত শিশু বলে কোনো কিছু ছিল না ওদের। সব শিশুই বাঞ্ছিত শিশু। সে জন্মালেই তার মা নিজের নাম ছেড়ে দিয়ে, তার মা বলে পরিচিত হত। বাপের সম্পত্তি পেত মেয়েরা, কিম্বা তাদের ছেলেরা। অবিশ্যি কাজ-কর্ম বেশির ভাগ করত মেয়েরা, পুরুষরা বড় শৌখিন ছিল। রাস্তায় পাথর ভাঙার কাজ করত মেয়েরা, অথচ তারা রোজ পেত চার আনা পয়সা, পুরুষরা পেত ছয় আনা-আট আনা! সেখানে পয়সা দেবার মালিক ছিল সভ্যভব্য শিক্ষিত মানুষরা কি না। এতদিনে হয়তো ওখানকার হালচাল সব বদলে গেছে। ষাট বছর কি কারো একভাবে চলতে পারে ?

ভয়ঙ্কর ভালোবাসতাম জায়গাটাকে। নদীর ওপারেই লুমপারিং পাহাড়ের ফায়ার-লাইনের ঘাস-জমি। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে দুপুরের খাবার আগে, আমরা বড়রা পাঁচজন নদী পার হয়ে ফায়ার-লাইন বেয়ে উঠতাম। কোনো পথ-টথ ছিল না, সোজা খাড়া উঠে যেতাম, দেখতে দেখতে অনেকটা উপরে পৌঁছে যেতাম। সেখান থেকে আমাদের বাড়িটাকে ছোট্ট খেলনার বাড়ি মনে হত। দেখতাম ন্যাসপাতি গাছ-তলায় মাসিমা, নোটন, ছোট্ট সরোজ দাঁড়িয়ে আমাদের পাহাড়-চড়া দেখছে।

ফায়ার-লাইনটা একেবারে ন্যাড়া হলেও ভারি আশ্চর্য জায়গা। নদী পার হয়েই দেখতাম কেমন মোলায়েম দেখতে কালচে সব পাথরের টুকরো, অনেকটা মোমবাতির গা দিয়ে গড়িয়ে পড়া গলা মোমের মতো চেহারা। কেউ বলেছিল ওগুলো নাকি ‘লাভা’র টুকরো। আগে এখানে সব আগ্নেয়গিরি ছিল, এখন নিবে

গেছে। এ তারি গলন্ত পাথর, জমে শক্ত হয়ে পড়ে আছে। পাহাড়টা বাস্তবিকই অদ্ভুত। জোরে পা ফেললে মনে হত জায়গায় জায়গায় ফাঁপা। বর্ষায় কোথাও কোথাও ওপরের মাটি বসে যেত, তলাকার হলদে হলদে কালচে কালচে মাটি বেরিয়ে পড়ত। সে মাটিগুলো বেজায় তেল-তেলা, জুতোর তলায় চট্‌চট্‌ করত। আমরা বলাবলি করতাম ওখানে মাটির নিচে তেলের খনি আছে। সত্যিই আছে হয়তো। পোলো-গ্রাউণ্ডের ওদিকে একটা নদী বয়ে যেত, তার জল থেকে আমাদের স্কুলের বড় মেয়েরা একেবার শিশিতে ভরে ঝকঝকে পারা এনেছিল। আছে হয়তো তারো খনি। তবে সে নদীটা যে ঠিক কোথায় সে আর এখন মনে নেই। বড় ভালো এই পৃথিবীটা, আশ্চর্য জিনিস দিয়ে ঠাসা। সরল-গাছে এক রকম বিকট শুঁয়োপোকা গাছের সঙ্গে গায়ের রঙ মিলিয়ে থাকত। তাদের গায়ে কাঠি ছোঁয়ালে, ফ্যাঁশ করে একটা শব্দ হত, পিঠে সারি সারি খুদে ঢাকনি খুলে যেত। তার মধ্যে থেকে তিনটে করে লোম বেরুত, তার আগায় আঠা মতো লাগা। সে আঠা নাকি ভারি বিষাক্ত। শুঁয়োপোকারও শত্রু ঠেকাবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন ভগবান! হিন্দুরা ঠাকুর-দেবতাকে ভক্তি করত; ব্রাহ্মরা মন্দিরে গিয়ে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না এক ভগবান, তাঁর উপাসনা করত। আমার ভক্তিটক্তি হত না। মাঘোৎসবের সময় যখন প্রার্থনা হত, আমি আস্তে আস্তে বেঞ্চিতে পা ঠুকতাম। কিন্তু যখনি চারদিকে চেয়ে দেখতাম গাছপালা ফুল-ফল, নদী, ঝর্ণা, পোকা, পাখি, নীল আকাশ আর তার বুকে আঁকা রূপোলী হিমালয়, আর হাতের কাছে এই আমাদের বাড়ি, মা, বাবা, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব, কি এক গভীর নিশ্চিন্ত আনন্দে মন ভরে যেত।

আজ পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে আমার মন সায় দেয় না। এসমস্ত ঘটনার সময় মেসোমশাইকে চোখে দেখিনি। আমরা যখন কলকাতায় গিয়েছিলাম, তিনি বোধহয় সেই সময়ই বিলেত যান। যতদূর মনে হয় ফিরেছিলেন ১৯১৬ সালে, আই ই এস্‌ হয়ে। তাঁর ফেরার আগে পর্যন্ত মাসিমারা আমাদের কাছে ছিলেন; একদিনের জন্যেও মনে হত না তাঁরা বাইরের কেউ। এরও অনেক পরে, আমার যখন ১৭ বছর বয়স, মেসোমশাই আমার অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছিলেন,

"গ্রামোফোনের চাকতিখানার নানান্‌ রেখার ফাঁকে
সুরের পাখি গুটিয়ে পাখা লুকিয়ে যেমন থাকে
তেমনি তোমার খাতার পাতার হিজিবিজি লেখায়
আমার গানের মৌন তানের সুরের লিপি ঘুমায়।
যদি সে ঘুম ভাঙতে পার, খুলে যাবে কান,
শুনতে পাবে জড়ের ফাঁকে পরমাণুর গান।"

আমি হয়তো সেই ছোট বয়সেই গাছপালায় ফুলে ফলে হাওয়ায়, নদীর জলে, আকাশে, বাতাসে, দূরের পাহাড় পর্বতে সেই পরমাণুর গান শুনবার জন্যই কান পেতে থাকতাম।

চারদিকের পাহাড়-বন-ঝর্ণার ধারে চড়িভাতি করা হত। কি যে ভালো লাগত বলতে পারি না। একবার আমরা 'লাইকর পীকে' পিকনিক করতে গেলাম। অনেকটা ওপরে উঠতে হল। ঠিক আগেই ভারি একপশলা বৃষ্টি পড়ে গেছিল। তখনো সরল-গাছের ছুঁচলো পাতা বেয়ে টুপটুপ করে জল পড়ছিল। লুচি, মাংস ভাগ করা হচ্ছিল। হঠাৎ চারদিকে চেয়ে দেখি আকাশটা ধোয়া-মাজা নীল ঝকঝক করছে আর তার তলায় মাইলের পর মাইল সারি সারি সাজানো ঘন সবুজ গাছে ঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড়, শুধু দুটি পাহাড় ছিল, তাতে একটিও গাছ নেই। বনের মধ্যে কু-কু পাখি ডাকছিল। কোকিলের মতো মিষ্টি ডাক। শিলং থেকে চলে এসে অবধি এ-ডাক আর শুনিনি। সেদিন আরো দেখেছিলাম আগের মার্চ মাসের দাবানলে মাইলের পর মাইল ধরে যে গাছপালা ঝলসে লাল হয়ে গেছিল, তাদের ওপর আবার সবুজের ছোঁয়া লেগেছে। সেই বিশাল প্রকৃতির মধ্যে এই আমরা কটি মানুষ কি নিশ্চিন্ত নিরাপদ, এ-কথা যতবার মনে হত, মনের মধ্যে কি একটা কোমল উষ্ম ভাব জাগত, কথায় তাকে প্রকাশ করা এখন পর্যন্ত শক্ত। আর তখন তো গলা অবধি কথা এসে মুখ দিয়ে আর ঝরত না। তবু আমি ঠোঁট ফাঁক করলেই মা-মাসি ধমক দিয়ে বলতেন, "জ্যাঠামি কর না!"

॥ ৫ ॥

১৯১৪ সাল, ছয় বছর বয়স। পড়ি কিণ্ডারগার্টেনে ; ইংরিজি, অঙ্ক, ছবি আঁকা, নেচার স্টাডি আর রঙীন রেশমী সুতো দিয়ে কার্ডবোর্ডে আঁকা ছবি সেলাই, হলদে কেট্‌লি, গোলাপী টিকটিকি, এইসব। ভয়ানক ভালো লাগত। আস্তে আস্তে স্কুল অভ্যাস হয়ে গেল, সকাল নটা থেকে বেলা তিনটে, মধ্যিখানে বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা টিপিনের ছুটি, তখন ক্লাসে বসে থাকা বারণ। পড়ার নিয়ম ভালোই বলতে হবে। দিদিকে আমাকে আলাদা বসিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে ইংরিজিতে রপ্ত করে দিল। বছর শেষ হবার আগেই আমরা গড়গড় করে ইংরিজি বলতাম। বছরের শেষে আমাদের একটা ক্লাস্ ডিঙিয়ে স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়ানে তুলে দিল। তখন আর আলদা বসানো নয়।

ততদিনে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জুটেছিল। আরো কটি বাঙ্গালী মেয়ে জুটেছিল, প্রায় সবাই আমাদের চেনা। দশ বছরের নিচে ছেলেরাও পড়ত, বোর্ডিং-এও থাকত। তারা প্রায় সবাই খুব ভালো ছিল। মেয়েগুলোর মধ্যে কেউ কেউ আমাদের নেটিভ্, নিগার বলত, ব্ল্যাকি বলত। টিচারদের মধ্যেও

কেউ কেউ নিগার না বললেও, ভারি অসম্মানজনক ব্যবহার করতেন। রাগে আমার গা জ্বলে যেত। মাকে জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "নেটিভ তো খারাপ কথা নয়। নেটিভ মানে এই দেশে যাদের জন্ম।" মানেটা ভালো হতে পারে, কিন্তু ঘৃণাটা চিনতে একটুও দেরি লাগত না। খানিকটা হিংসার ব্যাপার ছিল এর মধ্যে, কারণ বাঙ্গালী মেয়েরাই সব ক্লাসে প্রথম স্থান, দ্বিতীয় স্থান নিত।

আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম পাকা মেমরা ভালো আর আমাদের ঘৃণা করে যত ফিরিঙ্গী টিচাররা। ঐটুকু বয়সে এই নিয়ে আমার মনে যে কত তিক্ততা জমে ছিল, এখন ভাবলে নিজেরি আশ্চর্য লাগে। আমিও ফিরিঙ্গীদের কম ঘেন্না করতাম না। ভারি লোভী ছিল ওরা। কারো কাছে কোনো ভালো জিনিস রিবন, ক্লিপ, পুঁতির মালা, পেনসিল, যাই হক না, দেখলেই বলত, "দাও, দাও, আমাকে দাও। যীশুর কাছে একটা পাপ স্বীকার করে, আমাকে ওটা দিলেই তোমার পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে। যীশু বড় দয়ালু।" তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু যীশু দয়ালু বলে তোকে আমার জিনিস দেব কেন, সেইটে বুঝতে পারতাম না। তাছাড়া সেরকম পাপটাপের কথা মনেও পড়ত না। বাবা পাপের জায়গা রাখলে তবে তো, কিছু করলাম কি না করলাম, এক চড়ে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। মেয়েগুলো জিনিস আদায় করতে না পারলে চটে গিয়ে আমাদের টুপি, বই, শ্লেট লুকিয়ে রেখে দিত। তখন আমার বেজায় কান্না পেত। ঐ একটা শিক্ষা হয়ে গেছিল, লোককে ঘৃণা করা। আবার বেজায় ভালো সব ছেলে-মেয়েও ছিল। একদিন মিছিমিছি ড্রইং ক্লাসে বকুনি খেয়েছি, কিছুতেই কাঁদব না, গলার ভিতরে ব্যথা করছে। এমন সময় ওলাম সিং নামের একজন ছেলে, সে নাকি খাসিয়া রাজার ছেলে, আমার হাতে ছোট্ট একটা পেতলের ক্রুশ গুঁজে দিয়ে বলল, "তোমার রবারটা দিয়ে এই দাগটা একটু মুছছি, কেমন?" ওর দিকে চেয়েই বুঝলাম আমার জন্য ওর দুঃখ হয়েছে বলে ক্রুশটা দিচ্ছে। বলা বাহুল্য, দুজনার মধ্যে কেউ খ্রীশ্চান ছিলাম না।

খ্রীশ্চান না হলেও বেজায় যীশু-ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম দিদি আর আমি। রোমান ক্যাথলিকরা ধর্ম জিনিসটাকে রূপ-রস দিয়ে এমন সুন্দর করে ঘিরে রাখে যে ভক্ত না হয়ে উপায় ছিল না। ফিরিঙ্গী মেয়েরা গলায় চওড়া নীল রিবনে সেন্টদের নাম লেখা দস্তার মেডেল, পেতলের ক্রুশ ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখত। আমাদেরো বড্ড ইচ্ছা করত, কিন্তু বাড়িতে যে ওসব চলবে না, সেটা ভালো করেই জানতাম। চমৎকার সব সোনালী পাড় দেওয়া ছবি রাখত মেয়েরা, ওদের প্রেয়ারবুকের পাতায় পাতায়। আমি আর প্রেয়ারবুক কোথায় পাব, একটা বিস্কুটের টিনে অনেক ছবি জমিয়েছিলাম। কি সুন্দর যীশুর মায়ের মুখ, তাঁর দুঃখে আমাদের বুক ফেটে যেত। কত যে চমৎকার সব গল্প বলতেন নানরা, মুগ্ধ

হয়ে শুনতাম। ভগবানের জন্য কত বেদনা সয়েছিলেন সেন্টরা, কিন্তু মা মেরীর মতো কেউ নয়। আজ পর্যন্ত যীশুর প্রেমের মন্ত্রের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। মাদার মার্গারিটা একদিন বাইবেল থেকে বলেছিলেন, "চাইলেই, লাভ করবে। খুঁজলেই, পাবে। দরজায় ঘা দিলেই দরজা খুলে যাবে।" কি যে ভাল লেগেছিল কথাগুলো বলতে পারি না। তার ওপর স্কুলবাড়ি আর বোর্ডিং-এর মধ্যিখানে কতকগুলি ঘর ছিল তাতে নানরা থাকতেন। তারি পাশে ছিল চ্যাপেল, প্রার্থনার ঘর। সেখানে খ্রীশ্চান অ-খ্রীশ্চানের অবাধ গতি। সে যে কি চমৎকার জায়গা সে আর কি বলব। মেঝের ওপর পুরু গালচে, চারদিকে সুন্দর সব মূর্তি, ছাদ থেকে ঝাড়বাতি ঝুলছে, বেদীর ওপর সোনালী-রূপোলী সব সামগ্রী, যেদিকে চোখ ফেরানো যায় কেবলি যীশুর মুখ। মায়ের কোলে ছোট্ট যীশু, পণ্ডিত সমাজে কিশোর যীশু, শেষ রাতে শিষ্যদের নিয়ে টেবিলে বসে আছেন যীশু আর সব চাইতে বেদনাময় কাঁটার মুকুট পরে ক্রুশ কাঁধে যীশু, তারপর ক্রুশবিদ্ধ যীশু। কি যেন একটা সুগভীর ভাবে আকণ্ঠ ভরে যেত। ছোট বড় ফুলদানিতে ফুলের গোছা, ধূপ-ধুনোর গন্ধ। নানদের দীক্ষার দিনে তাঁদের জন্য প্রার্থনা হত, আমরা ফুল নিয়ে যেতাম, তাঁদের দেবার জন্য। বলতেন, "যাও, চ্যাপেলে গিয়ে দিয়ে এসো, তবেই সব চাইতে ভালো হবে।" চ্যাপেলের দরজা বন্ধ থাকত, কিন্তু ঠেললেই নিঃশব্দে খুলে যেত। একজন নান্ অমনি এগিয়ে আসতেন, তাঁর হাতে ফুল দিতাম, তিনি আমাদের কপালে এক ফোঁটা জর্দান নদীর জল ছুঁয়ে দিতেন। মন ভরে যেত।

মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মদের শুধু ফুল দিয়ে সাজানো ন্যাড়া মন্দিরটাতে আকর্ষণীয় কিছু পেতাম না। কলকাতি-পাড়ায় দুর্গাপুজোর সময় ঠাকুরকে ঘিরে ঢাক-ঢোল পেটানোর মধ্যে রঙ-রস থাকলেও, চ্যাপেলের সেই নিবিড় শান্তির লেশমাত্র পেতাম না। অথচ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে মন মানত না। আজ পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক ধর্ম আমার মনে স্থান পায় না। শুধু মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের গানের সেই কথাগুলি মনে হয়, "এসো আমার ঘরে এসো, এসো আমার ঘরে, বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।" আমাদের ক্লাসের দেয়ালে একটা মস্ত রঙীন ছবি ঝোলানো ছিল। ছোট্ট একটা ছেলে পুকুরের জলের ওপর বড্ড বেশি ঝুঁকছে আর তার পিছনে দাঁড়িয়ে তার গার্ডিয়ান এঞ্জেল তাকে ধরবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। নানরা বলতেন সক্কলের একজন করে গার্ডিয়ান এঞ্জেল থাকে, তাকে বাঁচাবার জন্য, সৎপথে রাখার জন্য। ভাবতাম তাহলে গার্জিয়ান এঞ্জেলরা সবাই নিশ্চয় সমান দক্ষ নয়। এইভাবে সে বছরটা শেষ হয়ে ১৯১৫ সাল শুরু হয়ে গেল। বাড়িতে মা-মাসির মুখে মাঝেমাঝে শুনতাম ইউরোপে যুদ্ধ হচ্ছে। আমাদের নতুন আয়া ইল্‌বন প্রায়ই বলত,

"আমার ভাই ফ্রাং-এ গেছে লড়াই করতে, আমার ছেলে হেড্রিক্সনের বাপ ফ্রাং-এ গেছে,এখন আর তার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।" আমাদের গায়ে লাগত না, এ যুদ্ধ রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধের মতো অনেক দূরের জিনিস। তারপর একদিন স্কুলের পাশে বড় গির্জাতে যুদ্ধে যারা প্রাণ দিচ্ছে তাদের জন্য উপাসনা হল। যুদ্ধটা যেন একটু কাছে সরে এল। আজকাল আমাদের সেলাই ক্লাসে উলবোনা শেখানো হত। শুনলাম সোল্‌জারদের জন্য গলা-বন্ধ বোনা হবে, ফ্রান্সে লড়াই হচ্ছে, সেখানে বড্ড শীত।

আরো শুনলাম মেমরা, অর্থাৎ আমাদের ফিরিঙ্গী সহপাঠিনীরা বুনবে সায়েব সোল্‌জারদের জন্য, স্কুল থেকে তাদের খাঁকি উল্ দেওয়া হল। মাদার হায়াসিন্থ নিজে ফরাসী মেয়ে, তিনি আমাদের সেলাই শেখাতেন, এমন চমৎকার সেলাইয়ের হাত কম দেখেছি। তিনি বলতেন, "তোমরা ইণ্ডিয়ান সোল্‌জারদের জন্য বুনবে। বাড়ি থেকে উল্ কিনে নিয়ে এসো।" বাবা তখন ট্যুরে, যামিনীদা উল কিনে এনে দিল। সে আমাদের রান্নার লোক হলেও, বাবা-মার পরেই তার প্রাধান্য ছিল। আমাদের দেশের গ্রামেই বাড়ি, হয়তো ঠাকুমা ওকে দিয়েছিলেন। অন্ততঃ হাবভাব দেখে তাই মনে হত। যামিনীদাকে খাঁকি উলের নমুনা দেওয়া সত্ত্বেও, গাঢ় লাল উল্ এনে দিল। এবং বদলে আনতে অস্বীকার করল। ভয়ে ভয়ে মাদার হায়াসিন্থকে উল্ দেখালাম। তিনি বললেন, "ঠিক আছে। সব রঙ-ই সমান গরম।" তাই বোনা হল, সাদা কালো মেমের মেয়েরা বুনল সায়েবদের জন্য খাঁকি গলাবন্ধ আর আমরা বুনলাম আমাদের দেশভাইদের জন্য লাল, নীল, হলদে, সবুজ, যার যেমন ইচ্ছে, কিম্বা যামিনীদাদের যেমন ইচ্ছে। এই ব্যাপারে অনেকদিন পর্যন্ত মনে একটা খট্‌কা থেকে গেছিল। বলেছি তো যা দেখা যায়, শোনা যায়, ভাবা যায়, সব মিশে একেকটা মানুষ তৈরি হয়। তবু যুদ্ধটা দূরেই থেকে গেল। দূরেই থেকে গেল, যতদিন না মিস্ লেভেন্স এসে আমাদের সেলাইয়ের ক্লাস নিতে আরম্ভ করলেন। এই মানুষটিকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। বয়স হয়তো বছর কুড়ি, অদ্ভুত ফ্যাকাশে রঙ, ফিকে সোনালী চুল, তাতে এতটুকু জেল্লা নেই, পালকের মতো পাতলা শরীর, চোখ দেখে মনে হত সর্বদা জলে ভরে আছে। ক্লাসের বেকুফ্ মেয়েগুলো বলল, "বেল্‌জিয়াম থেকে এসেছে। জর্মানরা ওর চোখের সামনে ওর বাপ ভাইদের মেরে ফেলেছে, বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিচ্ছু নেই ওর। রেড্ ক্রসের লোকরা ওকে পাঠিয়েছে। ওর কাপড়চোপড়গুলো পর্যন্ত অন্য লোকে দয়া করে কিনে দিয়েছে।"

আমরা শুনে স্তম্ভিত ! ঐ মানুষটিকে মেয়েগুলো এমনি জ্বালাত যে কতবার সে কেঁদে ক্লাস ছেড়ে চলে গেছিল। শেষে একদিন শুনলাম সে চলে গেছে। মেয়েগুলোর কি হাসি ! "টিকতে পারলে তে থাকবে !!" আবার মাদার হায়াসিন্থ

ক্লাস নিতে লাগলেন। এর মধ্যে বুড়ি মাদার জোসেফ্ মারা গেলেন। স্কুল ছুটি হয়ে গেল। আমরা ফুল নিয়ে চ্যাপেলে গিয়ে দেখলাম, চমৎকার একটা কাঠের বাক্সে, সুন্দর বিছানায় মাদার জোসেফ চোখ বুজে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে, পায়ের কাছে, প্রকাণ্ড সব মোমবাতি জ্বলছে। মনে হল মৃত্যু তাহলে এমনি সুন্দর! কিন্তু যুদ্ধে যারা মরে, তাদের কি হয়?

আসলে দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছিলাম। ছোটদের জন্য যত বাংলা বই বেরুত, সব বোধ হয় আমাদের বাড়িতে আসত। যোগীন সরকারের শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী, ছোটজ্যাঠামশায়ের নতুন নতুন অনুবাদের বই। গল্পে ঠাসা হয়ে থাকত জীবনটা। আমাদের খাসিয়া আয়ারা বিকট দুঃখের সব গল্প বলত, তাতে মজার কথা একটাও থাকত না। বেশির ভাগই হিংস্র জন্তু, শত্রু, ভূতপ্রেতের অত্যাচারের গল্প। অসহায় মানুষের ওপর অবুঝ দেবতার প্রকোপ। ভীষণ খারাপ লাগত, কিন্তু খারাপ লাগার চাইতেও সে গল্পের মোহিনী শক্তিটা বেশি ছিল। মাসিমাও জন্তুজানোয়ারের বিষয় বলতেন। আপিস্ ফেরত আমাদের বাড়িতে এক আধ ঘণ্টা বসে পাতানো মামারা, কাকারা নানা রকম গল্প বলে যেতেন। এমনি করে জুল ভার্নের অনেক গল্প শুনেছিলাম। স্কুলের বইগুলিও সংখ্যায় কম হলেও, সুন্দর সুন্দর গল্প কবিতায় ভরা ছিল। শেষটা আর থাকতে না পেরে ছোট্ট একটা খাতা বানিয়ে ইংরিজিতে জন্তুজানোয়ারের গল্প লিখতে শুরু করে দিলাম। আর ভাইবোনদের বানিয়ে বানিয়ে অজস্র গল্প বলতে লাগলাম। দেখলাম গল্পের কি আশ্চর্য ক্ষমতা। আমার শ্রোতারা গল্প শুনবার লোভে আমি যা বলতাম তাই করত। একমাত্র দাদা মাঝেমাঝে খুঁৎ ধরত, বাকিরা আমি যা বলতাম হাঁ করে শুনত। সামালোচনা করার কথা ওদের মনেও হত না। বেপরোয়াভাবে সত্যি, মিথ্যা, খানিকটা শোনা কথা বদলে, একটার পর একটা গল্প বলতাম। বাজে গল্প সব, এখন তার কিছুই ভালো করে মনেও করতে পারি না। তবু এইটুকু জানলাম যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে মানুষকে বশ করা যায়। বাকিরা আমার অন্ধ ভক্ত, শুধু দাদাই মাঝে মাঝে জ্ঞান দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, গল্পের খুঁটি নাড়িয়ে দিত। তাসের বাড়ির মতো গল্প ভেঙে পড়ত। সুখের বিষয় আমার কাঁচা শ্রোতারা সব সময় সেটা টের পেত না।

এর মধ্যে একদিন একটা গোলাপী টেলিগ্রাম এল। মা সেটি হাতে নিয়ে এতক্ষণ পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলেন যে আমরা কেঁদেকেটে একাকার। জ্যাঠামশাই নাকি মারা গেছেন। জ্যাঠামশাই মানে আমার মেজ-জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর। মা বললেন, "আমার মা যখন মারা গেলেন, বাবা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন, তখন আমার তিন বছর বয়স। পাশের বাড়িতে থাকতেন তোদের জ্যাঠামশাই, জ্যেঠিমা আর তাঁদের একটি মেয়ে, সুখলতা। তাঁরা আমাকে নিয়ে

নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছিলেন। দাদাবাবুর মুখে আমি ভালোবাসার কথা ছাড়া কখনো কিছু শুনিনি। পরে নিজের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। তখন আমার বাবাও বেঁচে নেই।"

মার মুখে এইরকম সাংঘাতিক কথা শুনে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেছিল। মা না থাকলেও মানুষ বাঁচে, তা জানতাম না। মা বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই বাঁচে, ভগবান বাঁচান। বাঁচাবার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। তোদের ছোট-মাসিকে শিবনাথ শাস্ত্রী নিয়ে গিয়ে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছিলেন। সে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত জানতও না ওঁরা ওর নিজের মা-বাবা নন্। আমাকে দাদাবাবু নিয়ে গেলেন। খালি তোদের বড়মাসিকে কেউ নিল না। সে সারা জীবন বোর্ডিং-এ মানুষ হল। তার খরচপত্র দিতেন আমার বাবার শিষ্য প্রফুল্ল ঠাকুর। দাদাবাবু আমার বাবার মতো ছিলেন।" কাঁদেননি মা। পাথরের মতো হয়ে গেছিলেন। ভালো করে মনে পড়ে না, তবে আমার ধারণা, সেই সময় বড়মাসি কাছে থাকতে মা মনে জোর পেয়েছিলেন। ছোটবেলায় যখন কাছাকাছি থেকেছি, বড়মাসিকে ঠিক বুঝিনি। কিন্তু যতই আমার বয়স বেড়েছে, ততই তাঁর সঙ্গে সহানুভূতি হয়েছে। সেদিন থেকে দাদামশাই সম্বন্ধে অশেষ কৌতূহল জন্মেছিল। বড়মাসিমা বলেছিলেন, "ছোটবেলায় বাবার ওপর বেজায় রাগ ছিল। ছোট ছোট তিনটি মেয়ের যেই না মা মরে গেল, অমনি তাদের বিলিয়ে দিয়ে দিব্যি ভগবানকে খুঁজতে চলে গেলেন! ভাবতাম এরকম লোকরা ভগবানকে পায় না। কারো কাছে একটু আদর পাইনি সেই পাঁচ বছর বয়স থেকে। শাস্তি পেয়েছি ঢের। বেজায় ঢ্যাঙা হয়ে গেছিলাম শেষ পর্যন্ত। কিছুতেই বেগুন খাব না। অথচ বোর্ডিং-এর নিয়ম সব খেতে হবে। বারবার বললাম, ও আমাকে দিও না, ওর বদলে আমি কিচ্ছু চাই না, শুধু ওটি দিও না!" লাবণ্যদিদি ছিলেন বোর্ডিং-এর কর্ত্রী। ইনি ছিলেন স্যার জগদীশ বসুর বোন। তিনি বললেন,"না, খেতেই হবে, অবাধ্য হলে চলবে না।" দিল আমার পাতে, দেবামাত্র তুলে মাটিতে ফেলে দিলাম। শাস্তি হল সাত দিন নুনভাত। সাতদিন দুবেলা নুনভাত খেলাম। তারপর আবার আমার পাতে বেগুন দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে আবার তুলে মাটিতে ফেলে, লাবণ্যদিদির মুখের দিকে চাইলাম। আশ্চর্য হয়ে একটু চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'থাক, ওকে মাছ দাও।' এমনি লড়াই করে করে বড় হয়েছি বলে কাউকে আদর করতে জানি না।" কথাটা ঠিক নয়। আদর করতে জানতেন বৈ কি, কিন্তু সেটাকে বাইরে দেখাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমরাও ছোটমাসির গলা জড়িয়ে ঝুলতাম, মন্না বলে ডাকতাম, কিন্তু বড়মাসিমাকে কখনো আদর করেছি বলে মনে পড়ে না। এখন বড় খেদ হয়। ১৯৫২ সালে আমার মা মারা যান ৬৭ বছর বয়সে,

বড়মাসিমা গেলেন তার পরের বছর, ৭০ বছর বয়সে। শোকে ক্লিষ্ট, সঙ্গীহীনা। একেকটা মানুষ বোধহয় কষ্ট পেতেই জন্মায়, কিন্তু বড়মাসিমার মুখে কোনো দুর্বলতার চিহ্ন দেখা যেত না। কেমন একটা প্রসন্ন গম্ভীরতা, দেখে লোকের শ্রদ্ধা হত। কখনো কারো নিন্দা করতেন না, গুণগ্রাহী, সত্যিকার ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল। কিন্তু সে দিকটাও প্রকাশ পেত না।

বুড়ো বয়সে আমাকে বলেছিলেন, "একবার বোর্ডিং থেকে বলল, 'তোমার বাবাকে লেখ তোমার জন্য কম্বল পাঠাতে। সব জিনিস কি অন্য লোকে দেবে নাকি? তাতে আমার আঁতে ঘা লেগেছিল, বাবাকে খুব রাগ আর দুঃখ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। বাবা খুব দামী কম্বল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কোনো শিষ্যের উপহার।' সেই শিষ্যই কম্বল দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, 'তোমার চিঠি পেয়ে স্বামীজি কেঁদেছিলেন।' তখন কিছু মনে হয়নি। এখন ভেবে বুক ফেটে যায়। এত বোকা ছিলাম যে এ-ও জানতাম না ডাক এলে আর থাকা যায় না।" সবাই তাঁকে বলত রামানন্দ ভারতী। বিধিমত নিজের শ্রাদ্ধ করে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। নাম ছিল রামকুমার ভট্টাচার্য। পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, বিদ্যারত্নমশাই বলে লোকে জানত। মাইকেলের শেষ বয়সে, চন্দননগরে যে কজন পণ্ডিতকে রেখেছিলেন, দাদামশাই তাঁদের একজন ছিলেন, এ খবর সম্প্রতি আমি শ্রদ্ধেয় শ্রীরাধারমণ মিত্র মশায়ের কাছে শুনেছি। মাইকেলের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছিল, অথচ সুরাপান ছাড়ছিলেন না। বন্ধুবান্ধবরা দাদামশাইকে বলেছিলেন, "ওঁকে বুঝিয়ে বলুন। আপনাকে ভালোবাসেন, হয়তো আপনার কথা শুনবেন।" বলেওছিলেন দাদামশাই। মাইকেল নাকি মুখ গম্ভীর করে বলেছিলেন, "আপনাকে যতই ভালোবাসি না কেন, পণ্ডিতমশাই, ও-কথা বললে আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে।" সকলেই জানেন যে মাইকেল আর সেরে ওঠেননি।

কাশীতে আশ্রম ছিল দাদামশায়ের। কালীভক্ত ছিলেন, তন্ত্রসাধনা করতেন। কোতরঙের অচলানন্দের জামাই, কিন্তু পরে তাঁর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি ছিল না। কারণ দাদামশাই কিছুদিনের জন্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে, প্রচারকার্য করতেন। রাগে দুঃখে অচলানন্দ মেয়েকে আটকে রেখেছিলেন। বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীকে নিয়ে একটা থার্ড ক্লাস্ ঠিকে গাড়ি করে, দাদামশাই স্ত্রীকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। মায়ের কাছে শুনেছি কিছু দূরে ঠিকে গাড়ি ও শিবনাথকে দাঁড় করিয়ে রেখে, দাদামশাই বাড়ির খিড়কি-পুকুরের ধারে গেলেন। দিদিমার সতেরো বছর বয়স, পরমাসুন্দরী। পুকুর ঘাট আলো করে বাসন মাজছিলেন। ওঁদের বাড়িতে রান্না-খাওয়ার জিনিস চাকর-বাকর ছুঁত না। দাদামশাই গিয়ে বললেন, "যাবে আমার সঙ্গে? তোমাকে নিতে এসেছি।" দিদিমা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই এঁটো কাপড়ে যাব?" দাদামশাই বললেন, "আমি ও-সব মানি না।" ব্যস্, আর

ভাবনা কিসের ? দিদিমা হাত ধুয়ে ঠিকা গাড়িতে গিয়ে বসলেন। বাসন পড়ে রইল। আমার মনে হয় শিবনাথকে ওপরে গাড়োয়ানের পাশে বসতে হয়েছিল। গেলেন তো গেলেন দিদিমা, আর কখনো বাপের বাড়ির লোকদের চোখে দেখলেন না। এর নয় বছর পরে ঠোঁটের ওপর ব্রণ বিষিয়ে, তিনটি মেয়ে রেখে, দিদিমা ২৬ বছর বয়সে মারা গেলেন। মায়ের কাছে শুনেছি দাদামশাই কাছে ছিলেন না। মেদিনীপুরে বন্যা হয়েছিল, স্বেচ্ছাসেবীর দল নিয়ে সেখানে গেছিলেন। সেবার দিদিমা কেন জানি আপত্তি করেছিলেন, রাগ করে বলেছিলেন, "যাচ্ছ, যাও। ফিরে এসে আমার মরা মুখ দেখবে।" তাও বোধহয় দেখতে পাননি দাদামশাই। অচলানন্দ তবু মেয়েকে ক্ষমা করেননি। দাদামশাই সন্ন্যাস নিলে, অনাথা মেয়ে তিনটিকে আনবার জন্য দিদিমার মা নাকি কেঁদে আকুল হতেন; তবু তাঁর মন গলেনি। আমরা এসব দুঃখের কাহিনী শুনে রেগে বলতাম, "কেন বল ভগবান দয়ালু। দয়ালু হলে এসব হতে দিতেন না।" মায়ের মনে অপরিসীম ভক্তি। কেবলি বলতেন, "ওরে সব অবলম্বন খসে গেলে তিনি নিজে এসে ভার নেন।"

বড় হয়ে দাদামশাইকে আমার বড় ভালো লাগত ; বড় নিজের, বড় আপনার বলে মনে হত। তাঁর একটা পুরনো ফটো ছিল মায়ের কাছে, ফিকে, বিবর্ণ। সন্ন্যাসীর বেশে পুজোয় বসেছেন। সেটি দেখে আমি ক্রেয়ন দিয়ে বড় করে এঁকে মাকে দিয়েছিলাম। আমার তখন ১৫ বছর বয়স। জানতাম যে আমি জন্মাবার আট বছর আগে পিঠে কারবাঙ্কল্ হয়ে কাশীতে তিনি দেহ রেখেছিলেন। সন্ন্যাসীদের পোড়াবার নিয়ম নেই আমাদের দেশে, তাই তাঁর দেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তখন তাঁর ৬২ বছর বয়স। তবু মনে হত তাঁকে খুব কাছে পাচ্ছি। ঐ রকম সময়ই তাঁর শিষ্যরা তাঁর একখানি জীবনী প্রকাশ করেছিলেন, সেটি পড়ে অনেক ছোটখাটো তথ্য আর তাঁর হিমালয় ভ্রমণের কথা, পায়ে হেঁটে মানসসরোবর যাবার কথা জেনেছিলাম। তবু সবখানি পাইনি। সেকালে বিদ্যাসাগর মশায়ের জামাই সুরেশ সমাজপতি 'সাহিত্য' বলে একটি পত্রিকা সম্পাদন করতেন। তাতে 'হিমারণ্য' নাম দিয়ে দাদামশাই তাঁর মানসসরোবর ভ্রমণের কথা লিখেছিলেন। সে বড় অপূর্ব কাহিনী। দুঃখ এই যে শিষ্যরা কয়েক অধ্যায়মাত্র উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। অনেক পরে কালিদাস নাগ মহাশয় আমাকে বলেছিলেন উনিশ শতকের একেবারে শেষ বছরে, কি তার এক-আধ বছর পরের 'সাহিত্য' পত্রিকার সংখ্যাগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কিম্বা চৈতন্য লাইব্রেরিতে থাকলেও থাকতে পারে। এই আমার একটা আর্যঋণ থেকে গেছে, যার জন্য একটা কিছু করতেই হবে। দাদামশায়ের জীবনীর একটিমাত্র কপি আমার কাছে আছে। সেটিরও সামান্য সংশোধন ও সংযোজন করে পুনঃপ্রকাশ

হওয়া উচিত। আশ্চর্য আধুনিক দাদামশায়ের চিন্তাধারা আর বাচনভঙ্গী। এতকাল আগের রচনা সহজে বিশ্বাস হয় না।

আসতেন মাঝে মাঝে আমার জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে মাকে দেখতে। উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে, সুবিমল, আমার নানকুদার কাছে শুনেছি, এসে তিনি মাটিতে বসতেন আর আমার মা তাঁর পাশে বসে পাখার হাওয়া করতেন আর শাড়ির আঁচল দিয়ে তাঁর গায়ের ঘাম মুছিয়ে দিতেন। নানকুদা মাকে বেজায় ভালোবাসত, মান্তু বলে ডাকত। তার কেবলি ভয় হত বুড়ো যদি মান্তুকে ধরে নিয়ে যায়! মান্তু নিশ্চয়ই চলে যাবে! যাতে যেতে না পারে, তাই নানকুদা তার মান্তুর শাড়ির একটা কোণা আঙুলে জড়িয়ে রাখত।

॥ ৬ ॥

১৯১৫ সালে জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর একটা কারণ শুনেছিলাম যে যুদ্ধের জন্য বিলেত থেকে ওষুধপত্র আসা বন্ধ হয়েছিল। দেশে তখন বিশেষ ওষুধপত্র তৈরি হত না। আর শুধু ওষুধ কেন সাবান, এসেন্স, ক্রীমও খুব কমই তৈরি হত। তাই পিসেমশাই যখন এইচ্ বোস, পারফিউমার বলে প্রসাধনী জিনিস, পানের মশলা ইত্যাদির কারখানা ও দোকান খুলেছিলেন লোকে ধন্য ধন্য করেছিল। মাথার তেল কুন্তলীনের কি সুখ্যাতি। অতকাল আগেও পিসেমশাই বিজ্ঞাপন দেবার গুরুত্ব বুঝতেন। কুন্তলীন পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ছোট গল্পের প্রতিযোগিতা। সব চাইতে ভালো গল্পগুলি খুদে এক বই হয়ে বেরুত। বইয়ের নাম-ও 'কুন্তলীন পুরস্কার'। যতদূর জানি দুটি মাত্র নিয়ম ছিল: গল্প মৌলিক হওয়া চাই আর কোথাও না কোথাও কুন্তলীন বা দেলখোসের উল্লেখ থাকা চাই। আরেকটু বড় হয়েই পড়তে শুরু করেছিলাম বইটাকে। বেজায় ভালো লাগত। কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রসাধনী ব্যবসার সুবিধা হলেও, জ্যাঠামশায়ের অমূল্য জীবন ৫২ বছর বয়সে শেষ হয়ে গেল।

পরে শুনেছিলাম তাঁর মৃত্যু বড় সুন্দর। কোনো ক্ষোভ অভিযোগ ছিল না; শান্ত প্রসন্নভাবে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর লেখা একটি গান আছে... "হাত ধরে তুমি নিয়ে চল, সখা, আমি তো পথ চিনি না...।" তবে আর ভাবনা কিসের? মৃত্যুর দিন ভোরে একটা ছোট্ট পাখি এসে ঘরের জানলায় বসে ডাকছিল। মনে হচ্ছিল বলছে, "পথ পা! পথ পা!" জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমাকে বলেছিলেন, "ঐ শোন, আমার ডাক এসেছে!" তারপর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, সোনার সংসার, কত আশা নিয়ে কত কষ্টে গড়ে তোলা 'ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স', সব ফেলে রেখে দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে স্বর্গে চলে গেলেন। আমার বড়দা, সুকুমারের বয়স তখন ২৮ বছর।

শিলং-এ আমরা ছোটরা এ-সবের কিছুই বুঝতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, ব্যক্তিগতভাবে জ্যাঠামশায়ের অভাব আমাদের স্পর্শ করেনি। আমাদের জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। শুধু মায়ের মুখখানিকে বড়ই ম্লান দেখাত। বোধ হয় কলকাতায় এসে সকলের সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা করত। কিন্তু ছয়টি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে তো চাট্টিখানিক কথা নয়। বলতেন, 'ঐ আমি সত্যিকার বাপকে হারিয়ে ছিলাম। নিজের মা-বাপের কাছ-ছাড়া হলাম যখন তখনো জ্ঞানচক্ষু ফোটেনি।' নিজের মায়ের কথা মার মনে পড়ত না, খালি মনে হত একটা বন্ধ দরজা ওপর থেকে শিকলি তোলা। তার বাইরে মা আর বড়-মাসিমা দাঁড়িয়ে আর বড় মাসিমা মাকে বলছেন, "ঐ ঘরে মা আছে। ওরা আমাদের মার কাছে যেতে দিচ্ছে না!" লাফিয়ে লাফিয়ে কেবলি শিকলি খোলার চেষ্টা করে, কেঁদে মাকে বলছেন, "ওরে তুই কাঁদছিস না কেন? তুই ছোট, তুই কাঁদলে ওরা নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেবে! আমি যে বড় হয়ে গেছি।" বড়-মাসিমার বয়স তখন পাঁচ বছর। এখন ভাবি ঐ মা-মাসির মেয়ে হয়ে সারা জীবন ছোটদের জন্য বই লেখা ছাড়া আমার উপায় কি ছিল?

আমাদের কাছে জ্যাঠামশাই ছিলেন একটা সুন্দর ছবির মতো। এই বই দেখছেন, এই বেহালা বাজাচ্ছেন, এই ঈজেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি আঁকছেন। চমৎকার তেল-রঙের ছবিও আঁকতেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যেরি বেশির ভাগ। আমার কাছে তাঁর আঁকা উশ্রী নদীর ছোট একটি তেল-রঙের ছবি আছে। তার সঙ্গে কত কথা জড়িয়ে আছে। বিয়ে হয়ে মা বাবার সঙ্গে দেরাদুন চলে যাচ্ছেন। জ্যাঠামশাই একাধারে বর-কর্তা, কন্যা-কর্তা। বিদায় দেবার সময় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি দেব তোমায়?" মা বলেছিলেন, "ছোট একখানি ছবি। বড় হলে নিয়ে যেতে অসুবিধা হবে।" এই সেই ছবি।

ছবির মতো হলেও, দিনে দিনে বুঝতে পারি আমার মন তাঁর হাতেই গড়া হয়েছিল। তাঁর পুরনো লেখা পড়তে গিয়ে কত সময় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। দেখেছি যে-ভাষাকে আমি নিতান্ত আমার নিজের মৌলিক ভাষা বলে অনেক দিন ভেবে এসেছি, তাও জ্যাঠামশায়ের দেওয়া। তিনি যাকে ভালো বলেছেন, আমারো তাকে ভালো লাগে। তিনি যাতে মজা পেয়েছেন, আমিও পাই।

এদিকে প্রথম মহাযুদ্ধ তখনো চলেছিল। ১৯১৫ সালের শেষে স্কুলের পুরস্কার বিতরণের দিন আমাদের সকলকে ছবির বই, খেলনা, পুতুল না দিয়ে, বড় বড় কার্ড দেওয়া হল। তাতে ইউরোপের ম্যাপ আঁকা। ম্যাপের মধ্যিখানে ইউনিয়ন জ্যাক্ কাঁধে নিয়ে একজন স্কুলের মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম আমাদের পুরস্কারের টাকা সোল্জারদের সাহায্যে গেছে। বড়রা কেউ কেউ বললেন, "নেটিভ সোল্জারদের সাহায্যে নয়।" নিশ্চয়ই মনের মধ্যে খচ্ করে

লেগেছিল। তাই যদি সত্যি হয়? এর মধ্যে এক সময় বাবা বলে বসলেন, "যুদ্ধে যাব।" আমরা তো রোমাঞ্চিত! আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে বাবার বিপত্তির কথা একবারো মনে হল না, বাবা খাকি পোশাক পরে বন্দুক ঘাড়ে লড়াই করতে যাবেন ভেবেও আমাদের সে কি উত্তেজনা। বন্দুক বাবার একটা ছিলই। বেঘো বনে কাজ করতে হত, বন্দুক ছাড়া চলবে কেন? সেটাকে বাবা মাঝে-মাঝে তেল দিয়ে, ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কারও করতেন। তুলে দেখেছি বেজায় ভারি। এখন বাঘ না মেরে বন্দুক তুলে বাবা গুড়ুম-গুড়ুম করে দুষ্টু জার্মানি মারবেন ভেবেও গা শির-শির করে উঠত। প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বাবা। আপিসের ছোট সায়েবরা দুজন চলেও গেল। তবু বাবাকে নিল না। বাবার রাগ দেখে কে! ঐ সায়েবগুলো কুঁড়ে, মদ খায়, কোনো কাজ জানে না, ওদের নিল আর বাবাকে বাদ দিল। কই দাঁড়াক তো ওরা বাবার পাশে খেলার মাঠে, বন্দুক তাগ্ করুক তো বাবার মতো, দেখা যাক তো কার শরীর বেশি শক্ত।

বলা বাহুল্য হম্বিতম্বি করে কোনো ফল হল না। বড় সায়েব ডেকে বললেন, "আমিও তো যাচ্ছি না। আমাদের হল গিয়ে এসেনশিয়েল সার্ভিস। ম্যাপ তৈরিও যুদ্ধের কাজে লাগে। যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে একদিন এ দিকেও আসবে না, কে বলেছে?" তবু বাবা বাড়িতে গজ গজ্ করতেন। আমরা শুনতাম। কাজে খুব সুনাম ছিল বাবার। আগে রায় সাহেব, পরে রায় বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন। তাই নিযে ভারি লজ্জিত ছিলেন; কেউ খেতাবটা লিখলে বা বললে বেজায় চটে যেতেন। কোনো বড়-সায়েবের বাড়ি যেতেন না, ভেট পাঠাতেন না। স্রেফ ভালো কাজ করে অবসর নেবার কয়েক বছর আগে ইম্‌পিরিয়েল সার্ভিসে উন্নতিলাভ করেছিলেন। খোশামোদ দেখতে পারতেন না, কিন্তু এক দিক দিয়ে ইংরেজদের ভারি ভক্ত ছিলেন। বলতেন, "ওরা পরিশ্রমী, ওরা সময়-নিষ্ঠ, ওরা কথা দিলে কথা রাখে, ওরা আমাদের চাইতে সৎ!" আমার কথাগুলো খুব ভালো না লাগলেও, বুঝতাম ওর মধ্যে অনেকখানি সত্যি আছে। এ-সব অনেক পরের কথা। ১৯১৫ সালে এ-সবের ধার ধারতাম না। ছোটবেলার কথা বলা বড় শক্ত, কারণ তার কতখানি বাস্তব আর কতখানি মন-গড়া, কিম্বা বড়দের মুখে শোনা, তা বলা শক্ত। আমার তো আরো বড় হবার পরের ঘটনা সম্বন্ধেও কিছু অনিশ্চয়তা আছে। যদিও আমার স্মরণ-শক্তি বেশ তীক্ষ্ণ, তবু সাল তারিখ গুলিয়ে যায়, ঘটনার পারম্পর্য ঠিক থাকে না, লোকের নাম ভুলে যাই, উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাই আর সব চাইতে বড় অসুবিধা হল যে যে-কথা আমি শুধু নিজের মনে ভেবেছি, অনেক দিন পরে তাকেই সত্যি বলে মনে হয়। কোনো ডাইরি রাখিনি কখনো, নিজের কল্পনার পায়ে বেড়ি পরাবার কোনো চেষ্টাই করিনি। আমার পাথেয় শুধু আমার স্মৃতিশক্তি আর

আমার সততা। কত ছবি পর্যন্ত এখন দরকারের সময় খুঁজে পাচ্ছি না। তখন অত ছবি তোলার রেওয়াজও ছিল না। ছোট প্রফুল্ল কাকাবাবুর একখানি ছবি থাকলে বেশ হত। নাম ছিল বোধ হয় প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

এঁকে বাবাদের আপিসের বড় প্রফুল্ল কাকাবাবুর সঙ্গে ভুল করলে চলবে না। ইনি বোধ হয় সেক্রেটেরিয়াটে কাজ করতেন, বয়স নিশ্চয় খুব কম ছিল। ছোট-খাটো পাত্‌লা মানুষটি, ধব্‌ধবে ফরসা রঙ। বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে আসতেন মাঝে-মাঝে। আমরা অমনি ছুটে গিয়ে তাঁর কোলে-পিঠে চড়ে, পকেটে হাত পুরে দিয়ে, নানা রকম মজার কথা লেখা পেপার-মিন্ট লজেঞ্চুষ বের করতাম। তাই দেখে বড় মাসিমা শক্‌ড্! আমার সাত বছরের জন্মদিনের আগের দিন এসেছেন, আমিও অভ্যাসমতো ময়লা পায়ে কাকাবাবুর কোলে চড়ে বসে, পকেটে হাত পুরেছি। এই বড় একটা পেপারমিন্ট পেলাম। তাতে লেখা ছিল 'চ্যাটারবক্স্‌'! সকলের কি হাসি! এমন সময় মাসিমা বললেন, "ও কি! ময়লা পায়ে কাকাবাবুর কোলে উঠেছ, দেখ ওঁর কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যাচ্ছে!" তাকিয়ে দেখি, ওমা, সত্যি তো! আমার পায়ের ধুলো ওঁর কালো প্যান্টে লেগে গেছে। ভারি লজ্জা পেলাম। কি করব ভেবে না পেয়ে. দুহাতে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললাম, "কাল আমার জন্মদিন, তুমি বিকেলে নেমন্তন্ন খেতে এসো!"

কাকাবাবু চলে গেলে বড়রা সবাই মিলে আমাকে সে কি বকুনি! "তুমি ভালো করেই জান বড়দের বলা হচ্ছে না, তবু কেন ওঁকে নেমন্তন্ন করলে?" কেন করলাম সেটা কেউ বুঝছে না দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ওঁর গায়ে ধুলো লাগিয়েছি, তবু নেমন্তন্ন করব না? সে আবার কি! যাই হক, প্রফুল্লকাকাবাবু খুশি হয়ে চলে গেলেন। তার পর দিন আপিস থেকে ফেরার পথে নিশ্চয়ই জামাতুল্লার দোকান থেকে আমার জন্য চমৎকার একটা পেয়ালা-পিরিচ কিনে নিয়ে এলেন! এমন সুন্দর জিনিস তার আগে কেউ আমাকে কখনো দেয়নি! চারকোণা মতো আকার, সোনালী পাড় দেওয়া, নীলেতে, গোলাপীতে সোনালীতে ফুলের তোড়া আঁকা। এমন কি ভিতরেও এক গোছা ফুল এমন জায়গায় আঁকা ছিল যে হাতল ধরে চুমুক দিয়ে দুধ খাবার সময়, একটু আড়চোখে চাইলেই আমি ফুলগুলোকে দেখতে পেতাম। মনটা ভরে যেত।

কালামানিকেরো ছবি রাখা উচিত ছিল। কালামানিক বাবার টাট্টুঘোড়া, বাবার সঙ্গে বনে বনে ঘুরত। কুচকুচে কালো রঙ, কপালে একটা সাদা রুহিতনের মতো দাগ। কি যে ভালোবাসতাম ওকে। আমাদের দূর থেকে দেখতে পেলেই নাক দিয়ে ফড়র-ফড়র শব্দ করে ডাকত। দানা দেবার দেরি হলে যে চিঁহি করে

ডাকত, এ ডাক তার থেকে একেবারে আলাদা। বাবা মাঝে মাঝে কুমড়ো-পাতায় করে ওকে করকচ নুন খাওয়াতেন। বলতেন ওটা ওদের দরকার। কুমড়োপাতাটাও ও খেয়ে ফেলত। আমাদের বড্ড ইচ্ছা করত একদিন আমরাও খাওয়াই। হঠাৎ সেই সুযোগ পাওয়া গেল। দৈবাৎ আস্তাবলের দরজা খোলা পেয়ে কল্যাণ এক মুঠো করচক নুন সরাল। তারপর যখন কেউ দেখছে না, ওর হাতের লেখার খাতার পাতায় করে কালামানিককে নুন খাওয়ালাম। কি খুশি সে! কিন্তু নুন খাওয়া হয়ে গেলে পর কিছুতেই কাগজটাকে ছাড়ল না। বড় বড় চারকোণা দাঁত বের করতে লাগল। শেষটা কাগজটাও চিবিয়ে গিলে ফেলল। বুঝলাম কাজটা ভালো হয়নি, তাই কাউকে বলিনি।

সন্ধ্যেবেলায় তেলের বাতির আলোয় আমরা পড়তে বসেছি এমন সময় সইস্ ছুটতে ছুটতে এসে বাবাকে যেন কি বলল। বাবাও ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে রেগে বললেন, "কে কালামানিককে কাগজ খাইয়েছে? এখন কাগজ বেরুচ্ছে!!" আমরা চুপ, একেবারে কাঠ! শেষে বাবা নিজেই বললেন, "বোধ হয় কেউ খাওয়ায়নি। ও নিজেই দুর্বোঘাসের সঙ্গে খেয়ে ফেলেছে। তোমরা যেখানে-সেখানে কাগজ ফেলো না।"

আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতে পাইন মাউন্ট স্কুলের মেমরা থাকত। চমৎকার টেনিস্ কোর্ট ছিল ওদের। বিকেলে টেনিস্ খেলা হত, অনেক সাহেব-মেম আসত। সারি সারি টেবিলে চা কেক্ স্যাণ্ডউইচের ব্যবস্থা হত। আমরা সারি সারি দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম। মা-মাসিমা খুব বিরক্ত হতেন। এর চাইতে শৌখীন জীবন আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না।

শিলং-এ সেকালে বায়োস্কোপ দেখিনি, থিয়েটার তো ব্রাহ্মরা দেখে না বলেই জানতাম, তার অভাব-ও বোধ করতাম না। বছরে একবার ফুলের প্রদর্শনী হত, সে এক এলাহি কাণ্ড। কত রকম বিলিতী ফুল ফুটত ওখানে তার লেখা-জোখা নেই। মায়ের বড় ফুলের শখ ছিল। তাই আমাদের বাড়িতে চমৎকার সুইট-পী হত, ঝাউ-গাছের গোড়া উঁচু করে মাটি ফেলে ভায়োলেট ফুল লাগানো হয়েছিল। এদের যেমন রঙ, তেমনি গন্ধ। এর চাইতে সুন্দর কিছু হতে পারে আমি ভাবতে পারি না। একেকটা গন্ধের সঙ্গে একেকটা জায়গায়, একেকটা মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। সেই মা চলে গেছেন ২৫ বছর হয়ে গেল, কিছুদিন আগে পাটনায় একজনদের পুরনো বাড়ির পুরনো বাগান দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় যেতে গিয়ে হঠাৎ মার কথা, মায়ের ভায়োলেট ফুলের কথা মনে পড়ে গেল। পরদিন ভোরে খুঁজে দেখি, সেখানে অযত্নে আগাছার তলায় রাশি রাশি ভায়োলেট ফুল ফুটে রয়েছে। কে কবে শখ করে লাগিয়েছিল। তাদের মৃদু সুগন্ধে শ্যাওলা ধরা পথটি ভরে আছে।

রূপে রসে দিনগুলো এমনি ভরে থাকত যে বায়োস্কোপ থিয়েটারের অভাব টের পেতাম না। তবে একেবারে যে নাটক হত না, তা-ও নয়। আমাদের স্কুলেই একেকটি বিশেষ ধর্মোৎসবের দিনে সাধু-সন্তদের জীবন নিয়ে নাটক হত। তার কি চমৎকার সাজসজ্জা। মঞ্চ সাজানো হত কি সুন্দর করে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কার্ডবোর্ডের স্ক্রীনে দৃশ্যপট আঁকা হত। শিক্ষিকাদের সঙ্গে মেয়েরা সে-সব আঁকত। এই রকম ব্যবস্থাপনার যে রোমাঞ্চ, তার তুলনা নেই। তারপর চারপাশের গাছপালাগুলোই বা কম কি। আমাদের তিনটি ন্যাসপাতি গাছের কথা অনেকবার বলেছি। শীতের আগে সব পাতা শুকিয়ে পড়ে যেত। ন্যাড়া ডাল আকাশের ওপর উঠে থাকত। ভালো করে দেখলে মনে হত ছোট্ট ছোট্ট কেঠো গুটি ধরে রয়েছে। তবে সে এতই উঁচুতে যে নাগাল পাওয়া যেত না। নীল আকাশের গায়ে ন্যাসপাতির ডালের কঙ্কাল দেখতে ভারি অদ্ভুত লাগত। তারপর যেই না শীত কাটল, মার্চ মাসের হাওয়া বইল, অমনি দেখি রাতারাতি সাদা ফুলে ন্যাসপাতি গাছের ডাল ভরে গেছে, মোমের মতো সুন্দর ফুল, তার মিহি একটু মিষ্টি গন্ধ। দেখে দেখে চোখ ফেরাতে পারতাম না। একটা পীচ্ গাছ ছিল, তার গোলাপী ফুল ; প্লামের সাদা ফুলও সুন্দর ; কিন্তু ন্যাসপাতির ফুলের কাছে কেউ লাগত না। মনে হত গাছ-তলায় কে সাদা সুগন্ধী গাল্‌চে পেতে রেখেছে, রোজ রাশি রাশি পাপড়ি ঝরে পড়ত। শেষটা একদিন সব ফুল ঝরে যেত, গাছের ডালে ছোট্ট ছোট্ট ফলের গুটিগুলো ন্যাড়া হয়ে দেখা দিত। সঙ্গে সঙ্গে সারা শীত ঘুমিয়ে থাকা পাতার কুঁড়িও ফুটে গিয়ে, কচি ফলের মাথায় চাঁদোয়া বানিয়ে তাদের ঠাণ্ডা হাওয়া, হঠাৎ ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করত। ফলগুলো কিন্তু বেজায় শক্ত, কষা, বিশ্রী। গাছে চড়ে কামড়ে খেয়ে দেখেছিলাম। সেই ফল পাকতে ভাদ্র মাস পড়ে যেত। তখন কমলালেবুর চাইতে বড়, নিটোল সোনালী ফলের ভারে ডালগুলি নেমে আসত মাটির কাছাকাছি। আমি, নোটন, সরোজ এরাও পেড়ে খেত। সোনালীর ওপর সাদা সাদা খুদে ফুটকি, রসে ভরপুর, খেতে মধু। একটু ক্যাচ্-ক্যাচ্ করত বটে, কিন্তু নিখুঁত জিনিস পৃথিবীতে কোথায়ই বা আছে ?

বাড়ির চারদিকে ঝোপের বেড়া ছিল, মে-ফ্লাওয়ারের ঝোপ। সে-ও বসন্তকালে ফুটত, সাদা, থোপা-থোপা। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকত ছাড়া ছাড়া গোলাপ-লতার ফুল। একেকটি বোঁটায় সাতটি করে ফুল। এখনো যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। বাড়ির সামনে তিনটি গন্ধরাজ লেবুর গাছ ছিল। তাদের মধ্যি-খানে লালমাথা সবুজ গা বড় বড় মাকড়সারা শক্ত মজবুত জাল বুনে রাখত। তাতে প্রজাপতি পড়ত, ড্রাগন-ফ্লাই পড়ত। সময় মতো দেখতে পেলে, আমরা কাঠি দিয়ে ছাড়িয়ে দিতাম। মনে হত প্রজাপতি ছাড়া পেয়েও উড়তে

কষ্ট হচ্ছে। আশ্চর্য জিনিস ঐ প্রজাপতি, ধরেছি মাঝে মাঝে। দুটি ডানা একসঙ্গে তুলে ফুলের ওপর যখন বসে থাকে, তখন পিছন থেকে চুপি-চুপি এসে ধরা যায়। ধরেই ছেড়ে দিতাম, হাতে ওদের ডানা থেকে রঙীন গুঁড়ো লেগে থাকত। দাদা বলত গুঁড়ো উঠে গেলে ওরা আর উড়তে পারে না। তখন বেজায় কষ্ট হত। একবার ঝাউগাছের মগডালে প্রকাণ্ড ফুটবলের মতো চাক বেঁধেছিল বোলতারা। কাকে কাকে যেন হুলও ফুটিয়েছিল। শেষটা একদিন রাতে সুমপারিং গ্রামের লোকরা এসে, বাঁশের আগায় মশাল জ্বালিয়ে, চাকে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনের গোলার মতো জ্বলতে জ্বলতে মোমে ভরা চাকটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল। আর গ্রামের লোকরা অমনি তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আধ-পোড়া শুক-কীটগুলোকে টপাটপ খেতে লাগল। ইলবন বলল, বড় বোলতাদের ডানা পুড়ে তারা মাটিতে পড়ে মরে গেছে। কয়েকটা অন্ধের মতো উড়ছিল, দাদা বলল, "ওরা রাতে দেখতে পায় না।" মনে আছে এসব দেখে আমার গা-বমি করেছিল। দিদি বোধ হয় কেঁদে নিয়েছিল। কাঁদবার সুযোগ ও কখনো ছাড়ত না।

ছোটবেলায় আনন্দ করবার কিম্বা দুঃখ করবার খুব বেশি উপকরণের দরকার হত না। যখন আমার বছর পাঁচেক বয়স হবে তখন একবার মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্ম-মন্দিরে গিয়ে দেখি একজন লোক হার্মোনিয়ম বাজাচ্ছে, একজন তবলা বাজাচ্ছে আর বাকিরা করতাল বাজিয়ে, গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে গান গাইছে, "প্রেম-সলিলে স্নান করিলে পাপের জ্বালা দূরে যায়।" হঠাৎ কল্যাণ আমাদের দল ছেড়ে গাইয়েদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তারস্বরে গান ধরল, "প্রেম-সলিলে স্নান করিলে পেটের জ্বালা দূরে যায়!" বড়রা ওকে বকবে কি, নিজেরাই হেসে কুটোপাটি। সেই কয়েক মুহূর্তের জন্য মাঘোৎসবের গাম্ভীর্য দূর হয়েছিল, ভগবান বোধ হয় সেটা বেশ উপভোগই করেছিলেন। নইলে পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে এত মজার জিনিস ঠুসে দেবেন কেন?

দুঃখের ব্যাপারও হত। গুরুচরণ নামে একজন দপ্তরি ছিল, সে বোধ হয় ব্রাহ্ম ছিল। ঠিক বলতে পারি না। তার গোবিন্দ বলে একটি ছেলে ছিল। আমার চাইতে কিছু ছোট হবে। গোবিন্দর মা ছিল না। ছিল সৎমা। সৎমার কয়েকটা ছেলেমেয়ে ছিল। গোবিন্দ তাদের কোলে পিঠে নিয়ে বেড়াত। একবার একটাকে ফেলে দিয়েছিল বলে, ওর মা গোবিন্দর গালে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়েছিল। গোবিন্দ গালে পোড়া-ঘা নিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের সাণ্ডে- স্কুলে এসেছিল। তাই দেখে বড়রা ওর বাবাকে ডেকে খুব ধমকে দিয়েছিলেন। গোবিন্দর সেই গাল-পোড়া চোখ ছল-ছল মুখটা আমার এখনো মনে পড়ে।

আশা করি পরে সে সুখী হয়েছিল। পরে যখন বইতে পড়েছি রবীন্দ্রনাথ বলতেন প্রকৃতির বুকের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা মানুষ হক, তখনি আমার মনে হয়েছে আমরা তাই হয়েছিলাম। কৃত্রিম জিনিস খুব কম ছিল আমাদের বাড়িতে, লোক-দেখানি জিনিস একেবারেই না। সাদা-সিধা কাপড়-চোপড় পরতাম, শীতকালে গরম মোজা, উলের সোয়েটার, মোটা মোটা ওভারকোট। বাড়িতে ঠনঠনের চটি পরতাম, একটা লোক বাঁকে করে ঝুলিয়ে বেচতে আসত। সত্যি কথা বলতে কি, আমার চোখে ওগুলোকে বেশ সুন্দর লাগত, বিশেষত নতুন অবস্থায়। কেমন কুচ্‌কুচে চক্‌চকে। দুঃখের বিষয় এক মাসে তাদের চেহারা বদলে যেত। মাকে বড় জোর গরদের শাড়ি পরতে দেখেছি। বাবা আপিসে কোট প্যান্ট পরে, টাই বেঁধে গেলেও, বাড়ি ফিরেই চটি, সাদা পাজামা, গরম জোব্বাপ্যাটার্নের একটা কোট। ভাত খেয়ে উঠে পান খাওয়া চাই—ফ্যাশানেব্‌ল্ হব কি করে ? তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ থাকত না, যদি না কলকাতা থেকে বেড়াতে গিয়ে আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের সাজ-পোশাকের বহর দেখে নাক সিঁটকাত !

আমরা গল্প শুনতে পেলেই খুশি। অতুলভূষণ সরকার বলে একজন ফরসা, টাক-পড়া, দাড়িওয়ালা মানুষ আসতেন। আমরা তাঁকে বড়মামা বলতাম। কেন বলতাম তা জানি না। শুনেছিলাম ওঁর বেশি টাকাকড়ি ছিল না, বুড়ি মা আর রুগ্ন বোন ছিল। বোধ হয় সেক্রেটেরিয়াটেই কাজ করতেন। কিন্তু মানুষটা গল্পের জাহাজ ছিলেন। কত বিখ্যাত ইংরিজি বইয়ের গল্প যে ঐ বয়সে ওঁর কাছে শুনেছিলাম, কাউন্ট-অফ-মন্টেক্রিস্টো, ড্রপ্‌ড্ ফ্‌ম দি ক্লাউড্‌স্, টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ্‌স্ আণ্ডার দি সী, রবিন্‌সন ক্রুসো, ট্রেজার-আইল্যাণ্ড, কিড্‌ন্যাপড্, টেল-অফ-টু সিটিজ, ইত্যাদি অজস্র বই। কি ধৈর্য, কি অপরিসীম স্নেহের সঙ্গে যে তিনি এই কয়েকটা অপোগণ্ড ছেলেমেয়েকে দিনের পর দিন ঘন্টার পর ঘন্টা, গল্প বলে যেতেন, এখন ভেবে অবাক হই। ভাবি মানুষের কাছে ঋণের জালে জড়িয়ে আছি। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। শীতকাল, বড়মামা আমাদের গল্প বলছেন, এমন সময় আমাদের ধোপা সোনেলাল একটা গরম কোট গায়ে দিয়ে জোগান নিয়ে এল। বড় মামাকে সে লক্ষ্য করেনি। মাকে কাপড় গুণে দিচ্ছে, হঠাৎ বড়মামা বললেন, "আরে সোনেলাল, তুমি যে হামারা কোট পিন্‌কে আয়া !" আর বলা কওয়া নেই, দুমদাম করে সোনেলাল ভাগল। পর দিন জোগান নিয়ে যাবার জন্য আবার এসেঅম্লানদবদনেবলল, "না, না, ওটা আমারি কোট, ঠিক ওঁর কোটের মতো দেখতে।" আমরা মোটেই বিশ্বাস করলাম না, বললাম, "তবে পালালে কেন ?" সোনেলাল ফিক্ করে হেসে বলল, "শরম লাগা !" আমাদের ভারি মজার লেগেছিল। বড়মামাও পরে খুব হেসেছিলেন !

॥ ৭ ॥

১৯১৬ সালে কলকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শিলং গেছিলেন। সাল-তারিখের এক-আধ বছর আগে পরেও হতে পারে, মোট কথা বড়মাসিমারা তখনো শিলং-এ ছিলেন। প্রথমে গরমের ছুটিতে নান্‌কুদা, পান্‌কুদা গেছিল। দুজনে দুটি গল্পের ঝুড়ি। তাছাড়া একগাদা বাংলা গল্পের বই নিয়ে গেছিল। তাতে প্রকাশকের নাম দেখেছিলাম, ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স আর সিটি বুক সোসাইটি। এরা দুজন আসাতে মা যে কি খুশি সে আর কি বলব। এক বাড়িতে মানুষ, এরা যত না ভাসুরপো, তার চাইতে ছোট ভাইয়ের মতো। ওরাও মাকে বেজায় ভালোবাসত। মান্তু বলে দুজনেই ডাকত, নান্‌কুদার দেওয়া নাম। নান্‌কুদা হ'ল উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে সুবিমল আর পান্‌কুদা কুলদারঞ্জনের একমাত্র ছেলে, পড়াশুনোয় ভারি ভালো, তার ওপর কায়দাদুরস্ত, ছোটবেলায় মা-মরা, কেমন একটু চাপা স্বভাবের ছিল, বেশি আজে-বাজে বকত না। নান্‌কুদা আর আমরা যেমন বকতাম।

এদের কথা বলবার আগে আমাদের সমবয়সীদের কথাও কিছু বলা দরকার; তারা আমাদের সুখ-দুঃখের গল্প শোনার সঙ্গী হত। নরেস্কে হরিচরণরা থাকত, তার পরের বাড়িতে কাঞ্জিলাল জ্যাঠামশাই থাকতেন। তাঁর দুই নাতি সতু আর দুখু। সতু আমাদের বয়সী, দুখু বছর দুই-তিনের ছোট। ওর বোধ হয় মা ছিল না। বেজায় রোগা। দাদা, কল্যাণ, সতু ওখানকার সরকারি হাইস্কুলে ভরতি হল, কিন্তু দুখুর কথা মনে করতে পারি না। তবে একদিন সে একটা গোটা তামার পয়সা গিলে, খাবি খেতে লাগল, একথা মনে আছে। মুখ লাল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, খালি আঁক্‌ আঁক্‌ করছে আর নাল পড়ছে। সামরা সবাই থ।

এমন সময় বড় প্রফুল্ল-কাকিমা ছুটে এসে দুখুর ঠ্যাং ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে, পশ্চাদ্ভাগে এমনি জোরে এক থাবড়া মারলেন যে তার চোটেই পয়সাটা ঠক্‌ করে মাটিতে পড়ল আর দুখু এতক্ষণ পরে বিকট চেঁচিয়ে উঠল! আমার তো ব্যাপার দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা! জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা বড্ড ভালো ছিলেন। ওঁদের বাড়ির দরজায় বড় বড় পুঁতির মালার পরদা ছিল। এমন আর কখনো দেখিনি, শুধু বইতেই পড়েছি। জ্যাঠামশাই বন-বিভাগে কাজ করতেন। ওঁরা বোধহয় বেশ গোঁড়া ছিলেন। মা একদিন বললেন, "তোরা যে ওঁদের বাড়ির সব ঘরে ছুটোছুটি করিস্, তাই বলে যেন ওঁদের রান্নাঘরে যাস্‌নি।" আমরা বললাম, "কেন?" মা বললেন, "তোমরা গেলে ওঁদের খাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে।" এমনি অবাক হয়েছিলাম যে কি বলব। আমরা গেলে কারো খাওয়া নষ্ট হবে ভেবেও বেজায় কষ্ট হয়েছিল। মা আরো বলেছিলেন, "তোমরা যে ব্রাহ্ম। গোঁড়া হিন্দুরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে খায় না।" কিন্তু পাড়ার বন্ধুরা তো সবাই হিন্দু ছিল, কই ওরা তো

আমাদের সঙ্গে খেত-টেত। সতু দুখুও তো খেত। মনে আছে ভারি গোলমাল লেগেছিল। পরে বহু গোঁড়া হিন্দুদের ভালোবাসায় আমার জীবন কেটেছে।

সেবার হরিচরণরা শীতের সময় কলকাতায় গিয়ে, সে-বছর আর ফিরল না। অমরকাকাবাবুকে হয়তো অন্য কোথাও পাঠানো হয়েছিল। 'নরেস্ক' বাড়ি খালি রইল। তারপর হঠাৎ একদিন সতু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, "নরেস্কে বাংলার বাঘ এসেছে। চল, দেখে আসি।" আর যায় কোথা! আমরা সবে স্কুল থেকে এসে হাতমুখ ধুয়ে ভাত খেতে বসেছি। বড্ড সকালে স্কুল বসত, তাই ডিম রুটি খেয়ে, টিপিন নিয়ে চলে যেতাম, বিকেলে ভাত খেতাম, রাতে কিছু জলখাবার খেতাম। গরম গরম লুচি দিয়ে লাল চিনি দিয়ে কি ছক্কা দিয়ে। সেদিন খাওয়াই হল না, যে যার দুদ্দাড় করে উঠে পড়ে, সতুর সঙ্গে ছুটলাম। বড়মাসিমা রাগ করতে লাগলেন, তা কে কার কথা শোনে!

নরেস্কের গেটের বাইরে থেকে দেখতে পেলাম বারান্দায় একটা জল-চৌকিতে একজন ঝুলো-গোঁফ ভয়ঙ্কর মোটা বুড়ো-মতো মানুষ বসে আছেন, গায়ে একটা গেঞ্জি, সেটার পিঠের দিকটা তুলে একটা লোক দলাই-মলাই করে দিচ্ছে! ঐ নাকি বাংলার বাঘ। আমাদের রাগ দেখে কে! ছোটবেলা থেকে সন্দেশে জীবজন্তুর গল্প পড়েছি আর বাঘ চিনব না! রেগেমেগে সতুর দিকে ফিরতেই, সে আমতা আমতা করে বলল, "তবে যে দাদু বললেন,..."

আমরা সবাই হাঁসের আক্রমণের কথা ভুলে, গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বাড়ি ফিরলাম। শেষের দিকে দৌড়তে হল, কারণ আমরা ভুললেও হাঁসরা ভোলেনি। মা মাসিমাকে সব কথা বলতেই উল্টো ফল হল। "বলিস কি রে? উনি যে দেবতুল্য মানুষ! চল, প্রণাম করে আসি।" আশু মুখুজ্জেকে ঐ একবার কাছে থেকে দেখেছিলাম। অন্য দিন মা আমাদের নানান্‌ ইংরিজি বই থেকে গল্প বলতেন, সতুও বসে শুনত। সেদিন আশু মুখুজ্জের তেজের গল্প বললেন। কেমন রেড রোড বলে কলকাতায় একটা রাস্তা আছে, আগে সেখান দিয়ে কোনো ভারতীয়কে যেতে দিত না। আশু মুখুজ্জে তখন হাইকোর্টের জজ, তিনি নিয়ম অমান্য করে তবু গেলেন। ব্রিটিশ সার্জেন্ট জজ সাহেবকে চিনতে না পেরে, তাঁর নামে মামলা করতে গিয়ে কি হয়রাণ হয়েছিল, সে গল্পও শুনলাম। সেই সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়ের আত্মসম্মান সম্বন্ধে নানা রকম গল্প শুনে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। আমরা যে পরাধীন, এ-কথা এতদিন ঠিক জানতাম না। পরাধীন কথাটার মানেই ভালো বুঝতাম না। এর আগেই দেশের জন্য কতজন প্রাণ দিয়েছিল, দ্বীপান্তরে গিয়েছিল, সব বললেন মা সেদিন। ক্ষুদিরামদের উল্লাসকর দত্তদের বাড়ির সঙ্গে বোধ হয় জ্যাঠামশাইদের যাওয়া-আসা ছিল। মার চোখে জল দেখেছিলাম।

ঐ ঘরে আমাদের আর কুলোচ্ছিল না। ১৯১৬ সালে আমাদের সবার ছোট ভাই যতির জন্ম হয়। জীবনে বড় দুঃখ পেয়ে ৪৯ বছর বয়সে যতির মৃত্যু হয়। দেখতে বড় সুন্দর ছিল। মনে আছে ওকে টেনে নিয়ে বেড়ালে আমার কালো হওয়ার দুঃখ ঘুচে যেত। সে যাই হক, আরেকটি ঘর না হলে চলছিল না।

বাড়ির মালিক চন্দ্রনাথ রায় বললেন, "আপনারা বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। আমি আরেকটা ঘর করে দিচ্ছি।" লম্বা একহারা বাংলোর পশিচম দিকের শোবার ঘরের লাগোয়া আরেকখানি ঘর হল, সামনের বারান্দার জায়গায় একটি খুদে পড়ার ঘর হল, তাতে বই রাখবার তাক হল। পিছনে একটি স্নানের ঘরও হল। আমাদের সে কি উত্তেজনা! বাড়ির ভিৎ খোঁড়া হচ্ছে, এদিকে বড়মামা আপিস ফেরৎ এসে, ট্রেজার আইল্যাণ্ড শেষ করে, গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্ত একটু একটু করে বলে যাচ্ছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এতখানি মাটি খোঁড়া হচ্ছে, নিশ্চয়ই হয় মোহরের কলসিতে ঠুং করে কোদাল লাগবে, নয়তো পিল-পিল করে চার ইঞ্চি লম্বা মানুষেরা বেরিয়ে আসবে।

বেরুল একটা পিঁপড়ের বাসা। সে-ও এক আশ্চর্য জিনিস। বেশ বড় বড় পিঁপড়ে। তাদের বাসার সামনে থেকে এক চাক্‌লা মাটি কেটে নিতেই, ওদের ঘর-গেরস্থালি বেরিয়ে পড়ল। সে কি হৈ-চৈ! ডিম নিয়ে ছুটোছুটি লেগে গেল। পিঁপড়ের বাসার এমন সুন্দর ব্যবস্থা হতে পারে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

নতুন ঘর হল, ঘরে বইয়ের তাক হল। মায়ের বাক্স থেকে অনেকগুলি বই বেরুল, সেগুলি ঐ তাকে সাজিয়ে রাখা হল। তার মধ্যে পাতলা মলাটের একটা সরু বই ছিল, তার নাম 'খেয়া'। শুনলাম রবিবাবুর লেখা বই। তখন সবাই বলত রবিবাবু, কেউ তাঁর কথা বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ বলে উল্লেখ করত না। তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেও, সব বাঙ্গালীর মধ্যে একজন ছিলেন, তাই তাঁকে বলা হত রবিবাবু, যেমন বলা হত বঙ্কিমবাবু, দ্বিজুবাবু। এ-সব ডাকের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গতা ছিল।

যাই হক রবিবাবু বলে কাউকে আমি চিনতাম না। স্কুলে বাঙলা পড়ানো হত না, বাড়িতে বিদ্যাসাগর মশায়ের ১ম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা শেষ করে, আখ্যানমঞ্জরী ধরে যেমন কষ্ট পাচ্ছি, তেমনি আনন্দও পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি রবিবাবুর লেখা কিছু আমি পড়িনি। মা ঐ বইটা আমাকে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার।" পড়বার চেষ্টাও করেছিলাম, একবর্ণ মানে বুঝিনি। বই তাকে তোলা থাকল। পরে আচার রাখবার জন্য পরিষ্কার কাগজের দরকার হলে, ওর একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিলাম। তাই নিয়ে আমাকে যথেষ্ট 'হেনস্থা' হতে হয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। তাও সব পাতাটা নিইনি, খানিকটা ছিঁড়েছিলাম মাত্র।

সেই সময় আমাদের বাড়িতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বলে একজন লম্বা সুন্দর মানুষ এসে কয়েক দিন থেকে গেলেন। মাসিমা তাঁর কাছে ঐ পাতা ছেঁড়ার গল্প করলেন। তিনি আমাকে বললেন, "এখন বুঝতে পারছ না রবীন্দ্রনাথ কত বড় কবি, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে। কেউ তোমাদের ওঁর কবিতা পড়ে শোনায়নি ?" আমরা মাথা নাড়লাম। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি তাঁর স্যুটকেস থেকে দুটি চটি বই বের করে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনালেন। আগে ঘরের বড় তেলের ল্যাম্প নিবিয়ে, চারটে মোমবাতি জ্বাললেন। সেই মোমবাতির আলোয় কবিতা পড়লেন। সত্যি বলব, কিচ্ছু বুঝিনি। তবে আসলে যা বোঝাতে চেয়েছিলেন সে-কথাটি ঠিকই ধরেছিলাম। রবিবাবু আর সব মানুষ থেকে আলাদা। সেই শীতের সন্ধ্যার সেই দৃশ্য এখনো চোখের সামনে ভাসে।

তবে যে কারণে প্রশান্তদাকে আরো বেশি করে মনে পড়ে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো সম্পর্ক ছিল না। উনি বোধ হয় সম্প্রতি কেমব্রিজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছিলেন, তাই সেখানকার নানা রকম মজার গল্প বলে নিজেও ভারি মজা পেতেন। এর পর আরো ৫৫—৫৬ বছর ধরে তাঁকে নানান্ সময় দেখেছিলাম, কিন্তু শিলং-এর সেই আমুদে মানুষটিকে আর খুঁজে পাইনি। তবে তাঁর রবীন্দ্র-ভক্তির যে একটুখানি আভাস দেখেছিলাম, তার পরিপূর্ণ রূপটি অনেকবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল।

সেই কবিতা-গল্পের রবীন্দ্রনাথ শিলং-এ বেড়াতে এলেন। শহরসুদ্ধ সব বাঙালী তাঁকে দেখবার জন্য ভেঙে পড়ল। কেঞ্চেস ট্রেসে আধা বনের পরিবেশ। সেইখানে ব্রুক্‌লাইড বলে এক বাড়িতে এসে অনেকজন উঠলেন। কারা কারা তা বলতে পারব না। ওঁর পত্রাবলী থেকে মনে হয় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীও সঙ্গে ছিলেন। আমার যাঁকে মনে পড়ে তিনি হলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমন মোটা মানুষ আগে কখনো দেখিনি। পরেও দেখেছি বলে মনে হয় না। বড়মাসিমাকে দেখে কি খুশি ! 'সুষমাদি !' বলে ঐ অত বড় শরীর নিয়ে ছুটে এলেন। গান গেয়েছিলেন দিনেন্দ্রনাথ, বাজের মতো গম্‌গম্ করেছিল সুর, গলার মধ্যে। এখন পুরনো রেকর্ডে সেই কণ্ঠ শুনলে কষ্ট হয়, কারণ তার কিছুই ধরা যায়নি। কোথায় সমুদ্রের নিনাদ আর কোথায় টিনের ভেঁপু। রবীন্দ্রনাথ "পুরাতন ভৃত্য" আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। বাঙলা ভাষা যে কি আশ্চর্য জিনিস হঠাৎ বুঝতে পেরেছিলাম। সেদিন থেকে তাঁর ভক্ত চ্যালা হয়ে গেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের সুন্দর চেহারা দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। আমার মনে হয় এমন সুন্দর মানুষ পৃথিবীতে কম জন্মেছে। ঠাকুরবাড়ির লোকেরা নাকি বলত, "আমাদের রবি কালো।" ওঁর মা ছোটবেলায় ছুটির দিনে তাঁর কালো

ছেলেটিকে জলচৌকিতে বসিয়ে গায়ের ময়লা তুলে, 'রূপটান' মাখিয়ে স্নান করাতেন। তার ফলেই অমন উজ্জ্বল মসৃণ গা হয়েছিল কি না কে জানে। 'রূপটান' তৈরি করতে নাকি ৬৪ রকম উপকরণ লাগে এবং গায়ে মেখে স্নান করতে দু ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু ফল ভালোই হয়েছিল বলতে হবে। অবিশ্যি রূপটানের কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। ওপর থেকে কোনো প্রলেপ লাগিয়ে, ভিতর থেকে অমন আলো ফোটানো যায় কখনো ? কি সুন্দর মুখ, কি গলা, কি উদ্ভাসিত দৃষ্টি। এর পর থেকে খুঁজে খুঁজে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। ক্রমে তার রসে মন ডুবে যেতে লাগল। ওদিকে আখ্যানমঞ্জরী ১ম, ২য় ভাগ শেষ করে ৩য় ভাগ ধরেছি। কিন্তু ব্যাকরণ বলে কোনো জিনিসের ধার ধারতাম না। মনে আছে স্কুলে ইংরিজি গ্র্যামার কত সহজে শিখে ফেলেছিলাম। ওরা গ্র্যামারের কোনো আলাদা বই পড়াত না, কিন্তু রোজ ক্লাসে যেটুকু পদ্য কি গদ্য পড়ানো হত, তার মধ্যে দিয়েই যা কিছু শিক্ষণীয় সব শিখিয়ে দিত। আমরা টের-ও পাইনি যে জটিল কিছুতে জড়াচ্ছি।

আর বইগুলিও কি চমৎকার, স্টেপ্স্ টু লিটারেচার, তাতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প স্থান পেয়েছিল। রামায়ণের গল্পও ছিল। তার নাম ছিল, দি স্টরি অফ রামা। 'রামা' শুনে বেজায় হাসি পেয়েছিল। কিন্তু বইটি যে চমৎকার সেটুকু তখনি বুঝেছিলাম। ইতিহাসের বই ছিল, গেটওয়েজ্ টু হিস্টরি। নানান্ ঐতিহাসিক গল্প। ভারতের কথাও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু খুব বেশি থাকলে মনে পড়ত। এইভাবে গল্পের নেশা ক্রমে বেড়েই চলেছিল। জীব-বিদ্যা পড়ানো হত, চার্ট দিয়ে, বোর্ডে রঙীন খড়ি দিয়ে ফুল, বীজের অঙ্কুরিত হওয়া, প্রজাপতি, পোকা-মাকড়ের চমৎকার ছবি এঁকে। বই-টই ছিল না। এভাবে জীব-বিদ্যা শেখার মোহ আজ অবধি আমার মনে লেগে আছে। ভূগোল আর অঙ্ক, এ দুটি খুব ভালো পড়ানো হত না। তবে বাড়িতে বাবার যত্নে ও তাড়নায় অঙ্কে সবাই দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম।

বাবা চমৎকার অঙ্ক শেখাতেন। যখন আরেকটু বড় হলাম, জিওমেট্রি ধরলাম, মনে আছে বাবা আমাদের বিন্দু, রেখা ইত্যাদি বোঝাতে বসলেন। সে এক মনোজ্ঞ ব্যাপার। বাবা বললেন, বিন্দুর একটা অধিষ্ঠান আছে, কিন্তু মাপ নেই। রেখার দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু প্রস্থ নেই। বলা বাহুল্য কথাগুলো ইংরিজিতে বলা হয়েছিল, কারণ ও-সব তখন ইংরিজিতেই হত। বাবা যা বললেন আমরা মেনে নিলাম। দাদা, দিদি, আমি, আবার কল্যাণকেও ডেকে নিলেন। আমাদের বয়স তখন ১১, ১০, ৯ আর ৮। বাবা তবু ছাড়েন না। বললেন, "কই দেখাওতো কিছু যার লম্বাত্ব আছে, কিন্তু চওড়াত্ব নেই।" আমরা বোকা বনে গেলাম। একটা সুতো দেখিয়েছিল দাদা। বাবা বললেন, "ওটা লাল রঙের, ওর

খুব সরু একটু প্রস্থ আছে। খালি চোখে দেখতে পাচ্ছ না, ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস্ দিয়ে দেখতে পাবে।" যন্ত্রপাতি বাক্স থেকে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস্ এনে দেখালেনও।

বাবা শেষ পর্যন্ত নীল ড্রইং-বুকের ওপর লাল অঙ্কের বইটা ফেলে দিয়ে বললেন, "লাইন দেখতে পাচ্ছ?" আমরা দুটোর মাঝখানের লাইনটা দেখালাম। বললেন, "কত লম্বা?" দাদা মেপে বলল, "৭ ইঞ্চি।" বাবা বললেন, "কি রঙের?" আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। লাল কি? না তো, লাল নয়। তবে কি নীল? না, তাও নয়। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। বাবা বললেন, "রঙ থাকলে তো বলবে। ওর চওড়াই নেই তো রঙ লাগবে কিসে?" কিন্তু শিক্ষাটা অতটা নাটুকে ছিল না। যতদূর মনে পড়ছে দুটো মিহি সুতোকে একটার ওপর অন্যটা আড়ভাবে বসিয়ে বললেন, "কোথায় ক্রস্ করেছে?" আমরা দেখালাম ঠিক অবস্থানটি। বললেন, "এবার সুতো দুটো তুলে নিলে, যা থাকবে সেইটেই বিন্দু। অবস্থান আছে মাপ টাপ নেই।" এখন সে রকম প্রত্যয়জনক মনে না হলেও বিন্দুর স্বভাবটি ঠিক বুঝেছিলাম।

এমনি করে ১৯১৬, ১৯১৭ এগিয়ে চলতে লাগল। আবার পুরস্কার বিতরণের সময় ঠিক সেই একই রকম মস্ত কার্ড পেলাম। পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিলাম, সর্বদা প্রথম হতাম। তবে গোড়া থেকেই গুরুজনরা একটা ভুল করেছিলেন। দিদিকে আমাকে এক সঙ্গে অক্ষর পরিচয় করিয়ে দিয়ে, একই ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। দিদিও পড়ায় ভালো ছিল, কিন্তু আমার নিচে হত। কখনো তৃতীয়, কখনো চতুর্থ। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হল যে তাতে আমার এতটুকু অহঙ্কার কিম্বা ওর এতটুকু ক্ষোভ দেখা যেত না।ওর ভাবখানা ছিল তুই বেশি চালাক, তাই তুই তো প্রথম হবি-ই। আর আমি ওকে ছোটবেলা থেকে ধমক-ধামক করতাম, পেটাতাম পর্যন্ত, কিন্তু আর কেউ কিছু বললে রেগে চতুর্ভুজ হয়ে যেতাম। ও যে কত ভালো, সে আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না। হিংসে নেই, অহঙ্কার নেই, লোভ নেই। কিন্তু কোনো উচ্চাশাও কোনো দিন দেখিনি। কর্তব্যপরায়ণ, নির্বিকার। রাগমাগ করত না। আমাকে খুব ক্বচিৎ উল্টে মারত। আর যদি বা আমার ওপর অসন্তুষ্ট হল, গল্প বলে বশ করতাম। স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের বেশির ভাগ লাবানে থাকত, আজীবনের বন্ধু সব, আজ পর্যন্ত তাদের কথা মনে পড়লে মনের মধ্যে একটা কোমল উষ্ম ভাব টের পাই। কত খেলা, কত ঝগড়া, কত চড়িভাতি, কত জন্মদিনের নেমন্তন্ন। সাদাসিদে পোশাক সবার, দু-এক টাকার উপহার আদান-প্রদান। তারি মধ্যে কত স্নেহের স্মৃতি। তবে দুজন আই-সি-এসের মেয়েও পড়ত, তারা সাহেবপাড়ায়, ফ্যাশানেব্‌ল্ বাড়িতে থাকত। কি চমৎকার কাপড়-চোপড় পরে স্কুলে আসত।

একজন একটি জামা পরে এসেছিল একদিন, সাদা রেশমের, তাতে নকল মুক্তোর বোতাম দেওয়া। ঠিক করেছিলাম বড়লোক হয়ে ঐ রকম একটা জামা কিনব। কাউকে কিছু বলিনি। এখনো জামাটার কথা মনে আছে, কিন্তু শখটা কবে চলে গেছে।

একটা বিষয় তখন অত কিছু মনে হত না, এখন ভেবে আশ্চর্য লাগে। আসামের পাহাড়ী শহর, সেখানে বাঙালী বাসিন্দারা সকলেই বহিরাগত, অথচ নিজেদের মধ্যে মিলে মিশে থাকতেন না। অনেক সিলেটী ছিলেন শিলং-এ, সিলেট তো আর খুব দূরে ছিল না। শুনতাম শিলং-পীক থেকে নাকি সিলেটের পাহাড় দেখা যেত। আমাদের লুমপারিং নদীর ওপারে, যেখানে দিদিমারা থাকতেন, সেটাকে সিলেটী-পাড়া বলত। আরো উঁচুতে কলকাতী-পাড়া ছিল। সেখানে দুর্গোপুজো হত, মহিলা-সমিতির মিটিং হত। আর পুলিনবাবু বলে একজন খুব ভালো ডাক্তার ছিলেন, তাঁদের বাড়ির ছেলেরা সাণ্ডে স্কুলে আসত। প্রকাশদা, প্রাণেশদা, প্রফুল্লদা। প্রত্যেক রবিবার সকালে সাণ্ডে স্কুল বসত, নানা রকম গল্প বলা হত, গান হত, কবিতা বলা হত। মাঘোৎসবের সময় বালক-বালিকা সম্মেলন হত, তখন নানান প্রতিযোগিতা হত। আমি একবার ইংরিজি কবিতা বলার জন্য পুরস্কার পেয়ে বেজায় অবাক হয়ে গেছিলাম। কারণ শেষের দিকে আর থাকতে না পেরে ফিক্ করে হেসে ফেলেছিলাম আর সবাই বলেছিল, "ছিঃ, হেসে ফেলে সব মাটি করে ফেললে!" আর দুটি পুরস্কার ছিল সব চাইতে ভালো মেয়ের আর সব চাইতে ভালো ছেলের। আমরা সক্কলে প্রাণেশদাকে ভোট দিতাম। তাকে আমাদের বড্ড ভালো লাগত। শিলং ছেড়ে আসার পর আর তাদের কোনো খবর রাখিনি।

লাবানবাসী আর কটি মানুষের কথা না বললে এ-কাহিনী সম্পূর্ণ হয় না। তাদের দুজনের কথা বলি। তারা বড় ভালো। আমরা তাদের ডাকতাম সুতুদি আর অমলদা। আমার ছোটমেসোমশায়ের প্রথম স্ত্রীর ছেলে-মেয়ে, ছোটবেলা থেকে মা-মরা, জ্যাঠা-জ্যাঠির কাছে মানুষ। এরা দেখতেও যেমন ভালো ছিল, তেমনি স্নেহশীল ব্যবহারও ছিল। বিশেষ করে অমলদা। আমার মনে হয়, সারাজীবনে যত ভালো লোক দেখা যায়, তারা সবাই মনের ওপর একটুখানি ছাপ রেখে যায়, প্রজাপতির ডানা যেমন একটুখানি রঙ রেখে যায়।

সুতুদিদের বাড়ির কাছে থাকতেন বড়দার, অর্থাৎ সুকুমারের, খুড়শ্বশুর কৈলাস-জ্যাঠামশাই, তাঁর নয়-দশটি ছেলে ছিল। আর সবার শেষে দুটি মেয়ে। ওদের বাড়িটা খুসিতে ঠাসা ছিল, যদিও বড়খুকু বলে আমার সমবয়সী ছেলেটা আমাকে মহা জ্বালাত। নিজে বেজায় দুষ্টু, আবার আমাকে দুষ্টু বলত। লাবান পাহাড়ের আরো উঁচুতে থাকত শিউলী-বেলিরা তাদের সঙ্গে আমাদের কুটুম্বিতাও

ছিল, ভালোবাসাও ছিল।

তবে এদের সকলকে ছাপিয়ে যে দুটি মানুষের স্মৃতি আমার মনকে উদ্ভাসিত করে রাখে, তাঁদের নাম ছিল মিঃ স্টিভেন ও মিসেস্ স্টিভেন। মিশনারি সাহেব-মেম, বয়স হয়ে গেছিল, ছেলেমেয়েরা বিলেত থেকে কেবলি চিঠি লিখত, "আর কতদিন থাকবে ? এসো, দেশে আমাদের কাছে ফিরে এসো। শেষ জীবন আমাদের কাছে কাটাও ?" কিন্তু কি করে যান তাঁরা, গরীব মুখ্যু পাহাড়ীদের স্কুল কে চালাবে, ছোট্ট হাসপাতাল কে দেখবে, কে ওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচ্ছন্নতা শেখাবে, খুদে গির্জায় কে ভগবানের নামগান করবে ? আর যাওয়া হয় না।"

শেষটা যখন বুড়ো-বুড়ির শরীর ভাঙল, তারা জোরজার করে তাঁদের ধরে নিয়ে গেল। স্কুলের ভার কয়েকজন পাড়ার লোক নিল ; হাসপাতাল দেখবে বলে কেউ কথা দিল : জিনিসপত্র, ঘরের সামান্য আসবাব সব বিলিয়ে দিয়ে, কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা চলে গেলেন।

এক বছরও গেল না। একদিন হঠাৎ শুনলাম মিঃ আর মিসেস স্টিভেন ফিরে এসেছেন। আহ্লাদে আটখানা হয়ে বন্ধুবান্ধব তাঁদের বাড়ি খুলিয়ে, পুরনো জিনিসপত্রগুলি ফিরিয়ে এনে, যেখানকার যেটা সাজিয়ে দিলেন। মিসেস স্টিভেন অমনি স্কুল নিয়ে মেতে উঠলেন, মিঃ স্টিভেন গির্জা আর হাসপাতাল নিয়ে। বললেন, "কোথায় যাব ? এই আমাদের মনের নিবাস, এ ছেড়ে কি থাকতে পারি ?" জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওঁরা ঐখানে ছিলেন। তাঁদের কথা মনে করে একটা ছোট কালো মেয়ের বুক যে ভরে উঠত, সেকথা তাঁরা ভাবতেও পারেননি।

॥ ৮ ॥

দেখতে দেখতে ১৯১৮ এসে পড়ল। সেবার আমাদের বাড়িতে গরমের সময় চাঁদের হাট বসেছিল। মাসিমা নোটন বোধহয় তার আগেই কলকাতায় ফিরে গেছিলেন। তাঁদের আসাটা স্পষ্ট মনে পড়ে, অথচ ফিরে যাওয়ার কথা মনে নেই। বড় বড় মোটর-বাসে করে কলকাতার দল এসে পৌঁছল। আমরা সকলে মিলে মোটর অপিসে গেলাম, বড়দা, বৌঠান, ছোটজ্যাঠামশায়ের দুই মেয়ে তুতুদি আর বুলুদি। পাঁচ বছর আগে যখন কলকাতায় গেছিলাম ওরা আমাদের ওপর কি দৌরাত্ম্যই না করেছিল। আমাদের চাইতে ৫/৭ বছরের বড় ; ওদের শাসনের চোটে আমরা তটস্থ। কাঁদলে বলত, 'ছিঁচকাদুনির নাকে ঘা !' নালিশ করলে বলত, 'নালিশ্ করলে বালিশ পায় !' দু চক্ষে দেখতে পারতাম না ওদের। এবার কিন্তু যখন নীল, গোলাপী শাড়ি পরে মোটর থেকে নামল, মাথায়

এই বড় বড় খোঁপা বাঁধা, গলায় সোনার মটর-মালা, তাই দেখে দিদি আমি মুগ্ধ। তার ওপর নান্‌কুদা তো ছিলই। তার গল্প আগের চাইতেও ক্ষুরধার হয়ে উঠেছিল। একটিমাত্র নিয়ম হল বড়দের কিছু বলতে পাবে না। অবিশ্যি বড়দের নিয়েই যখন বেশির ভাগ গল্প, এমনিতেও কিছু বলতাম না। আমার মাকে আর ওর নিজের মাকে ছাড়া সকলকে নিয়ে গল্প! আর সে কি গল্প। বড়রা যে এরকম কাণ্ড করতে পারে তা আমরা ভাবতেও পারতাম না। বলা বাহুল্য সব বানানো গল্প এবং সেটা আমরা খুব ভালো করেই জানতাম, তবু বেজায় উপভোগ করতাম। অদ্ভুত এক ভাষা ছিল ওর, 'কিউল' মানে ইয়ং লেডি, 'স্ট্রাক্' মানে তাকে ভালো লাগল, 'হিক্' মানে তার সঙ্গে প্রেমে পড়ল। প্রেমের ব্যাপার আমাদের জানতে বাকি ছিল না। স্কুলের ফিরিঙ্গি সহপাঠিনীরা আমাদের হাতে করে কাছেই সেন্ট এড্‌মণ্ডস্ স্কুলে তাদের বয়ফ্রেণ্ডদের যে প্রেম-পত্র পাঠাত, সে-কথা তারা আমাদের কাছে গর্ব করে বলত। আমরা হাঁ করে শুনতাম। কৌতূহল্ও হত কম নয়। ই কি রে বাবা! এমন তো কখনো দেখিনি! বাড়িতে কিছু বলতাম না। সে যাক্ গে, কোত্থেকে ঐ-সব ভাষা সংগ্রহ করত নান্‌কুদা তা জানি না। মাঝে মাঝে সংস্কৃত ধরনের কথাও বলত, "দীপ্যমান" মানে সুন্দর দেখতে। কিন্তু সুন্দর দৃশ্য বোঝাতে হলে বলতে হবে 'অক্ষট' দৃশ্য! এই খামখেয়ালী ভাব ওর বাড়তে বাড়তে শেষে আশ্চর্য সব খেয়ালরসে ভরপুর গল্প লিখিয়ে ছেড়েছিল। সে-রকম গল্প বাংলায় আর নেই। আমি যেমন গল্প বলে ভাই-বোনদের বশ করতাম, নান্‌কুদাও তেমনি আমাকে সুদ্ধ বশ করেছিল। ও খালি বলত, 'কাউকে বললে আর গল্প বলব না।' কাউকে মানে বড়দের কাউকে। ওর নিজের তখন বছর কুড়ি বয়স হবে, কিন্তু ও নিজেকে বড়দের দল থেকে আলাদা করে রাখত। এটা আগেরবার একদিন বলেছি, "ও পারেতে যেও না ভাই, ফটিং টিঙের ভয়! তিন মিন্‌সের মাথা কাটা পায়ে কথা কয়!"

আমরা বললাম, "জানি, জানি, আমাদের ছড়ার বইতে আছে।" নান্‌কুদা চোখ পাকিয়ে বলেছিল, "তা জানতে পার, কিন্তু আমি নিজের চোখে ও-সব দেখে এসেছি। কলকাতার কাছেই, গঙ্গার ওপারে। স্টীমারে করে যাওয়া যায়!" আমরা বিশ্বাস করব কি না ভেবে পাইনি। এবার অন্য ধরনের গল্প বলত, তার বেশিরভাগই অদ্ভুত মজার।

সবাই মিলে বেশ জমিয়ে তুলেছিল। বড়দা, বৌঠান সব সময় আমাদের বাড়িতে থাকতেন না, ওঁদের আরো আত্মীয়রা এসেছিলেন। বৌঠানের ছোট ভাই টুটুদা যার বাড়িতে যেদিন ভালো মাছ আসত, সেদিনটা তার বাড়িতে কাটাত। আমাদের বাড়িতেও কে জানে কোথা থেকে নোনা ইলিশ আসত, চিংড়ি-মাছ

আসত। সম্ভবতঃ অনেক দাম দিয়ে আনানো হত। বৌঠান যেমন চমৎকার গান গাইতেন, তেমনি রাঁধতেন। ঐ-সব মাছ বৌঠান রেঁধে খাওয়াতেন। এত ভালো হত যে স্কুল থেকে ফিরে একেক দিন দেখতাম আমাদের জন্য একটুও বাকি নেই! ভীষণ রেগে যেতাম।

আর বড়দার কথা, কি করে বলি। ছোটবেলা থেকে মায়ের মুখে বড়দি অর্থাৎ সুখলতাদি আর বড়দার গল্প শুনে এসেছি! দুজনেই বড় ভালো, কিন্তু বড়দি বেজায় ভীতু, আর বড়দা বেজায় মজা করতে ভালোবাসত। বড়দাকে দেখলাম মোটাসোটা, কোঁকড়া-চুল, হাসিখুশি মানুষ। তবে নান্‌কুদার মতো আমাদের নিয়ে জমাতেন না। একটি দিনের অভিজ্ঞতা ভুলবার নয়। বৌঠানের আত্মীয় অবিনাশবাবু মস্ত এক পিক্‌নিক্ দিলেন। শহরের উপকণ্ঠে পল্টনের চাঁদমারি। সেখানে মাঝে-মাঝেই সেপাইরা নিশানা করতে শেখে। সে এক মজার ব্যাপার। দূরে পাহাড়ের গায়ে চাকা দেওয়া দুটি বাক্স রেলের ওপর চলে ফেরে। তাদের গায়ে বড় করে দুটি টারগেট্ আঁকা। গোল গোল দাগ কাটা চাকতি, মধ্যিখানে একটা চোখ। দূর থেকে বন্দুকের নিশানা ঠিক করে ঐ চোখটাকে মারতে হবে। ঠিক জায়গায় লাগলে চাকতিসুদ্ধ গাড়িটা রেলের ওপর গড়িয়ে সরে যেত। আড়াল থেকে বোধহয় টেনে নেওয়া হত। গোল দাগের ওপর লাগারও সঙ্কেত ছিল। আর বাইরে লাগলে গাড়ি নড়ত না। অনেকক্ষণ ধরে এই ব্যাপার দেখতাম আমরা, ভারি আশ্চর্য লাগত।

জায়গাটার নামই হয়ে গেছিল চাঁদমারি। খানিকটা বন, বনের পর খানিকটা ঘাসজমি, তার ওপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে একটা নদী চলে গেছে। কিছু দূরে একটা ঝরণা; ঝরণার নাম পরী-তলা। বড় সুন্দর জায়গা। কিন্তু সেখানে একটা ঘূর্ণি-জল ছিল, মাঝে মাঝে অসাবধান ছেলেরা পরীতলায় স্নান করতে নেমে, ঘূর্ণি-জলে পড়ে আর উঠতে পারত না। পরী-তলার চেহারা মনে করতে পারি না।

ঐ চাঁদমারিতে মাঘোৎসবের সময় ব্রাহ্মরা এবং তাঁদের বহু হিন্দু বন্ধু-বান্ধবরা দল বেঁধে চাঁদা করে চড়ি-ভাতি করতেন। উপাসনা হত, গান হত, গাছতলায় সারি সারি বসে খিচুড়ি, আলুর দম, কপি ভাজা, টোমাটোর চাটনি, দই, বোঁদে খাওয়া হত। ঢালু জমির ওপর পাত পড়ত, দই গড়িয়ে যেত, খিচুড়ি দিয়ে বাঁধ দিতে হত। চাঁদমারি আমাদের চেনা ব্যাপার।

এবার গিয়ে দেখলাম জায়গাটার ভোল বদলে গেছে। সাদা পোশাক পরা বয় বেয়ারারা সবাইকে চা, স্যাণ্ডউইচ্, 'মোরেলো'র দোকানের কেক দিচ্ছে। গাছতলায় মস্ত ফরাস পাতা হয়েছে, তার ওপর গোল হয়ে উৎসুকভাবে সবাই বসে আছেন। এক ধারে বড়দা দাঁড়িয়েছেন, হাতে একটা খাতা, সবার চোখ তাঁর

ওপর। অদূরে মধ্যাহ্ন-ভোজের জন্য পোলাও মাংস রান্না হচ্ছে, তার একটু একটু গন্ধ ভেসে আসছে। মাথার ওপর গাঢ় নীল আকাশ ; পাশ দিয়ে কলকল করে নদী বয়ে যাচ্ছে। বড়দা হাসিমুখে চারদিকে একবার তাকিয়ে একটু গলা খাঁকরে 'ভাবুক-সভা' পড়তে শুরু করলেন।

'ভাবুক-সভা' বড়দার ২০/২১ বছর বয়সে লেখা বোধহয় সন্দেশে বেরিয়ে থাকবে, আমাদের পড়া জিনিস। কিন্তু পড়া যে এমন রঙ্গ-রসে ভরা হতে পারে এ আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। সে কি মুখ-ভঙ্গি, সে কি হাত পা নাড়া, কথার মধ্যিখানে সে কি রস। সাজ নেই, দৃশ্যপট নেই, প্রকৃতির সেই দৃশ্যপটের মধ্যিখানে এ কি রসের ধারা ? কি একটা বাক্যাতীত ভাবে আকণ্ঠ ভরে গেছিল, হাসতে ভুলে গেছিলাম। পড়া শেষ হলে সকলে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে, এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। একটা মানুষের গলার এমন সমারোহ যে হতে পারে কেউ জানত না। সম্বিৎ ফিরে এলে সব খুশিতে ফেটে পড়ল।

তখন কি আর কেউ বড়দাকে ছাড়ে ? 'চলচ্চিত্ত-চঞ্চরি' পড়তে হল। আবার সেই সম্মোহিত ভাব। এখন মনে হয় একটা পর্যায়ে পৌঁছবার পর আর হাসি দিয়ে হর্ষ প্রকাশ করা যায় না। শুধু কথাগুলি নয়, মানুষটাও পড়ার মধ্যে নিজের অন্তরের অনেকখানি দিয়ে দিতেন। এমন আর শুনিনি। কলকাতায় ওঁদের নন্‌সেন্স ক্লাব ছিল, মণ্ডে ক্লাব ছিল, সেখানে রসের কৃষি কাজ হত। তেমনি সব সাকরেদ জুটেছিল বড়দার ; প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। হ্যাঁ, আমাদের মাস্টারমশাই সুনীতিকুমার। তিনি যখন পি-আর-এস্ হলেন, ক্লাবের বন্ধুরা তাঁর ঘাড় ভেঙে ভুরি-ভোজন করেছিলেন। সাড়ে সতেরো টাকা খরচ পড়েছিল, পুরনো খাতায় দেখেছি। এতকাল পরে সেই সুনীতিকুমার-ও রঙ্গ-মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন। বলা বাহুল্য আমরা এ-সমস্ত থেকে বাদ পড়েছিলাম। প্রথম কথা, আমরা অকুস্থলে ছিলাম না। দ্বিতীয় কথা, আমরা থাকলেও নিঃসন্দেহে আমাদের তিনতলায় নান্‌কুদার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। যে-দিনের কথা বললাম, সে-দিন আমি ধারণা করতে পারিনি একটি মানুষের হৃদয় এত রসের উৎস হতে পারে।

এর পর থেকে বড়দার প্রতি আমাদের ভক্তি শতগুণ বেড়ে গেল। সন্দেশে প্রকাশিত বড়দার কবিতাগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আগাগোড়া মুখস্থ হয়ে যেত। নাটকগুলিও তাই। বড়রা অনেক সময় বিরক্ত হতেন। কেউ কেউ বলতেন, "একই কথা রোজ-রোজ একই ভাবে উচ্চারণ করে, তোরা কি এত হাসির খোরাক পাস্ ?" হাসির কারণ বাত্‌লানো যায় কখনো ? যার স্থান মস্তিষ্কে তার কারণ থাকে আর যার স্থান হৃদয়ে তার আবার কি কারণ থাকতে পারে। তবে ইংরিজিতে 'ফানিবোন্' বলে একটা কাল্পনিক হাড্ডির কথা আছে, সেটাই

উপেন্দ্রকিশোর

নন্দলাল বসু

এস· কে· মজুমদার ১৯৩৩

ফ্যামিলি গ্রুপ ১৯৩৮

কার্সিয়ং ১৯৫১

আমি ও জনি কুকুর ১৯৫১

শান্তিনিকেতনের বাড়ি ১৯৫৪

প্যারিসে দিদি ও লতিকা ১৯৫৫

নাকি হাসির কারণ। মোট কথা, বড়দা আমাদের প্রথম ও শেষ হাসির পাঠ দিয়েছিলেন। জ্যাঠামশায়ের লেখায় যথেষ্ট সরসতা ছিল, কিন্তু সে-সব হল প্রাসঙ্গিক হাসি, আর বড়দার বেলায় হাসিটাই ছিল প্রসঙ্গ। সেই হাসি ধরিয়ে দিলেন বড়দা। নিজে যখন চলে গেলেন, তাঁর বয়স ছত্রিশ, আমার বয়স পনেরো, তবু সে রসটুকু আজ পর্যন্ত মনের মধ্যে লেগে রইল। তখন থেকে নাটক লেখার শখ হয়েছিল, কিন্তু সে তো আর চাট্টিখানিক কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের সেই যে কড়া সেজদা, যাঁর জ্বালায় স্কুল থেকে রেহাই পেয়েও তিনি পড়া থেকে রেহাই পাননি, সেই হেমেন্দ্রনাথের মেয়ে মনীষাদেবী তাঁর রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে শিলং-এর কেঞ্চেস্ ট্রেসে থাকতেন। দিদি, আমি তাঁর কাছে গান শিখতে যেতাম। দুঃখের বিষয় গলায় আর সুর নামল না! হেমেন্দ্রনাথ বেশি দিন বাঁচেননি। মনীষাদেবীরা কয় ভাইবোন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হেপাজতে জোড়াসাঁকোতে মানুষ হয়ে, সেখানকার সংস্কৃতির ধারা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। রুগ্ন স্বামীর সেবা তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি। মনীষাদেবীর দিদিরা নাম-করা মেয়ে; লেডি প্রতিভা চৌধুরী, 'আমিষ ও নিরামিষ রন্ধনে'র রচয়িতা প্রজ্ঞাদেবী, অভিজ্ঞাদেবী।

এই সময় তাঁদের বাড়িতে "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" অভিনয় করা হল। সম্ভাব্য সব মেয়েদের সংগ্রহ করা হল। বুলুদি কলকাতায় ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উৎসবে ক্ষীরির পার্ট করে প্রশংসা পেয়ে এসেছিল, তাকেই ক্ষীরি করা হল। তুতুদি হল লক্ষ্মী। আমরা কিনি-বিনির দলে। মনীষাদেবীর বাড়ির হলঘরে কাঠের মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হল। সঙ্গে আরো গানটান হল। তাঁদের বাড়ির সকলে সঙ্গীত-বিলাসী, গাইয়ের অভাব হল না। যে যার বাড়ি থেকে রঙীন শাড়ি, গিল্টি গয়না, পুঁতির মালা এনে দিল।

মনে হচ্ছে এর মধ্যে বড়দা, বৌঠান কলকাতায় ফিরে গেছিলেন, কারণ ঐ উৎসবে তাঁদের উপস্থিতি মনে পড়ছে না। এককথায় অপূর্ব অভিনয় হয়েছিল। সকলে বুলুদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ক্ষীরি নয়তো সত্যিকার ঝি!! সে কি অঙ্গভঙ্গি, মুখ-বিকৃতি! বড়দা নাকি কলকাতায় সব শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকে বড়দার নাটকের শখ। যেখানে যা দেখে আসতেন, বাড়িতে করে দেখাতেন। নিজেও বানিয়ে বানিয়ে লিখতেন, তখন তাঁর বয়স তেরো-চোদ্দর বেশি নয়। একটা খেলাই ছিল কে কত ভালো ভেংচি কাটতে পারে। ভেংচি কাটায় বড়দার মেজবোন পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৮০ বছর বয়সেও কম দক্ষ ছিলেন না। এই একটা আক্ষেপ থেকে গেল। ছোটদের জন্য বাংলায় কেউ তেমন হাসির নাটক লিখল না। নাটক বলতে আমি মঞ্চ-সজ্জা আর আবহ-সঙ্গীত ইত্যাদি বুঝি। নাটকের একমাত্র উপজীব্য হবে তার রস। এমন

রওনা দিলেন। সুখের বিষয়, এত প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও তাঁর বৌমার ছেলে হয়েছিল। আমরা আটকুড়েতে গিয়ে বাঁশের কঞ্চি পিটিয়ে, ভাজাভুজি আর মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম এবং হাঁসরা সে-দিনও আমাদের তাড়া করেছিল।

সেই জ্যাঠাইমারা সত্যি সত্যি যখন জিনিসপত্র বেঁধে, পরদা নামিয়ে, গোরু বেচে, পাড়া অন্ধকার করে চলে গেলেন, কি যে কান্না পেয়েছিল কি বলব।

॥ ৯ ॥

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার দশ বছর পূর্ণ হল। হাইউইণ্ড্স্-এ আমরা এত দিন এত আরামে বাস করেছিলাম যে অন্য কোনোরকম জীবনের কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু কলকাতার কথা মনে করলেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠত। আর ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের ধারে আমাদের দেশের কথা যামিনীদার কাছে কেবলি জিজ্ঞাসা করতাম। যামিনীদার সঙ্গে আমাদের খুব সদ্ভাব ছিল না এ-কথা আগেও বলেছি। রান্নাঘরটি আলাদা একটা বাড়িতে, তার পাশে ছোট্ট জল-গরমের ঘর। সেখানে তিনটি বড় বড় পাথর বসিয়ে উনুন তৈরি করা হয়েছিল। তাতে কাঠের জ্বালে কেরোসিনের টিন বসিয়ে আমাদের সংসারের স্নানের জল গরম করা হত। কাঁচা কাঠ থেকে প্রচুর ধোঁয়া আর মিষ্টি একটা গন্ধ বেরুত। ছুটির দিন দুপুরে ঐখানে আমাদের আড্ডা বসত। রান্নাঘরে ঢুকবার উপায় ছিল না। খাওয়া-দাওয়া হলে, ঘরের শিকল তুলে তালা দিয়ে, যামিনীদা নিজের ঘরে শুতে চলে যেত। সে বেশ খানিকটা দূরে, একেবারে বাড়ির শেষ সীমানার কাছে, নদীর উঁচু পাড়ে। তারি এক ধারে ঘোড়ার আস্তাবল, আস্তাবলের গা ঘেঁষে ঘোড়া-নিমের গাছ, মার্চ এপ্রিল মাসে তার নীল ফুল পড়ে গাছতলাতে গাল্‌চে বানিয়ে রাখত। যামিনীদা ঘোড়া, কিম্বা সইস, কিম্বা নিমগাছ, কোনোটাই পছন্দ করত না। কিন্তু অনেক গল্প জানত।

যাই হোক যামিনীদা ঘরে গেলে আমরা বুনো আপেল পোড়াবার জন্য গরম-জলের ঘরে ঢুকতাম। বুনো-আপেলের গাছটা আবার রান্নাঘরের গা ঘেঁষে হয়েছিল। ফলগুলো মগ্‌ডালের কাছে ঝুলে থাকত। খুঁচিয়ে পাড়ার মতো লম্বা বাঁশ কোথায় পাব ? আমরা ঢিল ছুঁড়ে ফল পাড়তাম। ঢিলগুলো অনেক সময় রান্নাঘরের ছাদে পড়ত। ছাদের তলায় কাঠের উনুনের ঝুল-কালি জমে থাকত ; উনুনে বড় কড়াইতে দুধ বসানো থাকত। ঢিল পড়লেই ঝুল-কালির খানিকটা খসে দুধের ওপর পড়ত। যামিনীদা তাই নিয়ে বেজায় অশান্তি করত। কিন্তু সে তো বিকেলের আগে নয়। দুপুরে আমরা জল-গরমের উনুনের গরম ছাইতে বুনো-আপেল পুড়িয়ে খেতাম। তার মিষ্টি গন্ধ এখনো নাকে লেগে আছে।

সরলগাছের-হাওয়া নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে বেজায় ভালো। এমনিতে আমাদের

স্বাস্থ্য ভালো না হয়ে উপায় ছিল না। সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু জায়গায় পরিষ্কার বাতাস, টাকায় সাত-আট সের দুধ, চার পয়সা ডিম, প্রচুর ফল, তরকারি ; রোজ দু-বেলা দেড় মাইল হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা, সময় মতো খাওয়া-শোয়া। স্বাস্থ্য ভালো হবে না তো কি ? ওখানকার প্রধান শত্রু ছিল শীত। শীতে আমাদের কি করতে পারত ? লম্বা হাতা উঁচু গলা খাঁটি পশমের সোয়েটার পরতাম, লম্বা লম্বা গরম মোজা পরতাম, জুতো ভিজলেই জুতো বদলাতাম। বেশী শীতের সময় রোজ সকালে বড় চিমনিতে আগুন দেওয়া হত। অনেক সময় বিকেলে আরেকবার চিম্‌নি জ্বলত। কাঁচা পাথর কয়লার চাংড়া অনেকক্ষণ ধরে জ্বলত ; তার ভিতর থেকে লাল নীল আলো বেরোত, সামনে বসে কত অগ্নিকাণ্ড, কত যুদ্ধ-ক্ষেত্র কল্পনা করা যেত।

ভালো স্বাস্থ্যের এত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও দাদা আর আমি টন্‌সিল ব্যথায় ভুগতাম। এমনি টন্‌সিল ফুলে যেত যে গিলতে কষ্ট হত। সরকারি হাসপাতালের সুশীল ডাক্তার আমাদের ওষুধপত্র দিতেন। তিনিই আমাদের টন্‌সিল কেটে দিলেন। সে অপারেশনের কথা ভাবতে বেশ মজা লাগে। বাবার সঙ্গে মাইল দুই হেঁটে আমরা মোটর আপিসের কাছে হাসপাতালের আউট ডোরে গেলাম। প্রথমে দাদাকে একটা টুলে বসিয়ে হাঁ করতে বলা হল। দাদা হাঁ করল। একটা তুলিতে কোকেন লাগিয়ে টন্‌সিলে মাখানো হল। দাদা তারপর মুখ বন্ধ করে দু মিনিট বসে রইল। তারপর আবার হাঁ করতে বলা হল। দাদা হাঁ করতেই সুশীলবাবু মজার একটা যন্ত্র গলায় ঢুকিয়ে কুচ্‌-কুচ্‌ করে দুপাশের টন্‌সিল দুটি কেটে, কিড্‌নি বোলে ফেলে, আমাকে বললেন, "এসো, এবার তোমার পালা !"

দেখলাম দাদার চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু টু শব্দ না করে টুল থেকে উঠে বাবার পাশে এসে দাঁড়াল। কিড্‌নি বোলে লাল মাংসের টুকরো দুটো দেখে আমার বমি পাচ্ছিল। কিন্তু বাবাকে কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। টুলে বসে হাঁ করলাম। গলায় কোকেন লাগাবার পরেই মনে হল গলায় মস্ত একটা কি আট্‌কে আছে। হাঁ করেই রইলাম। সুশীলবাবু সেই যন্ত্রটাকে ওষুধ দিয়ে ধুয়ে আমার গলায় ঢুকিয়ে কুচ্‌ কুচ্‌ করে দু-পাশ থেকে দু-চাকলা কেটে কিড্‌নি বোলে ফেলে বললেন, "বড্ড বড় টন্‌সিল সবটা ধরা গেল না। দেখি আরেকবার।" বলে আবার আমাকে হাঁ করিয়ে আরো দু-চাকলা কেটে আনলেন। রক্ত গিলে গিলে আমার অবস্থা কাহিল। ভয়ের চোটে কাঁদতে পারছিলাম না। ডাক্তার যেই বললেন, "আরেকটু আছে।" বাবা হঠাৎ ছুটে এসে, আমাকে জড়িয়ে ধরে কি রকম অন্য রকম গলায় বললেন, "থাক, ঢের হয়েছে। মেরে ফেলবেন নাকি।"

ডাক্তার ভারি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "সত্যি এই যন্ত্রটা দিয়ে ধরতে পারছি না। এক উপায় ক্লরোফর্ম করে তবে কাটা।" শেষ পর্যন্ত তাই করা হল। যেমন ছিলাম, জুতো খুলে একটা খাটে শুলাম। ক্লরোফর্ম করে টন্‌সিল কাটা হল। সুশীলবাবুর টমটম গাড়ি করে বাড়ি ফিরলাম। কয়েক দিনেই সেরে গেলাম, কোনো কু-ফল হল না, কিছু না। খালি এখন পর্যন্ত থেকে থেকে নেই-টন্‌সিলে বেজায় ব্যথা হয়। কারণ তার গোড়াটা থেকে গেছে। সেকালে আজকালকার মতো গোড়াসুদ্ধ উপড়ে আনা হত না। তাই হয়তো পাঁচ ফুটের বেশি মাথায় লম্বা হলাম না। টন্‌সিল কাটলে নাকি সব্বাই সঙ্গে সঙ্গে পা ছেড়ে দেয়।

শিলং-এর একেকটা গন্ধ আজো আমার নাকে লেগে আছে। একটি হল বনের গন্ধ। সে বড় সুগন্ধ। বাবা আমাদের ওখানকার সংরক্ষিত বন দেখতে নিয়ে যেতেন। মধ্যিখান দিয়ে সরু পথ চলে গেছে, দু ধারে বন। মাটির কাছটি অনেকখানি ফাঁকা, উঁচুতে ডালে ডালে জড়িয়ে চাঁদোয়া তৈরি করে রেখেছে, তার ভিতর দিয়ে অতিকষ্টে টুকরো টুকরো রোদ ঢুকে পায়ের নিচে জমে থাকা সরলগাছের শুকনো পাতার ওপর পড়ে। তার ওপর হাঁটা মুশ্‌কিল, বেজায় পিছল। কিন্তু তার ধূপ-ধুনোর মতো গন্ধটি বড় মিষ্টি। বুড়ো গাছের গায়ে কোথাও অর্কিড, আবার কোথাও লাইকেন বলে পরগাছা। তারো কেমন একটা শুকনো পাতার মতো গন্ধ।

হাতে করে তুলে দেখেছি, ফিকে সবুজ রঙ, ধরতে বড় শক্ত। আমরা বলতাম, 'বুড়ির চুল', কিম্বা 'বুড়োর দাড়ি'। এখনো হয়তো হয় ওখানকার গাছে। আঠাশ বছর পরে একবার দেখতে গেছিলাম। সংরক্ষিত বনে যেতে এখন অনুমতি-পত্র লাগে। বাইরে থেকে দেখলাম। এক জায়গায় একটিও সরলগাছ নেই, তার বদলে ত্রিশ ফুট উঁচু ঝাউ-গাছ, সোজা সোজা, সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। সে-বন আপনি হয়েছিল, সরলগাছের গুটি থেকে পাখনাওয়ালা বিচি পড়ে আর এ-গাছ লাগিয়েছে দড়ি দিয়ে মেপে সমান দূরে দূরে, বন বিভাগের কর্মীরা। সেই আমাদের একান্ত আপনার বনটিকে আর খুঁজে পেলাম না।

একটুখানি শীতের ছোঁয়া লাগতেই চির-শ্যামল সরল আর ঝাউ ছাড়া প্রায় সব গাছের রঙ বদলাত, সবুজের বদলে হলুদ, লাল, পাটকিলে, কালচে। তারপর পাতা খসে পড়ে, শীতের বাতাসে উড়ে বেড়াত। মালি তার লম্বা কাঁটা দিয়ে সেগুলিকে এখানে ওখানে জড়ো করত। একেক দিন সন্ধ্যেবেলায় পাতার ঢিপিতে আগুন লাগানো হত। আমরা তার চারদিকে জড়ো হতাম। সামনের দিকটা আগুনে গরম হয়ে যেত, চোখ-মুখ লাল দেখাত, পিঠটি কনকনে ঠাণ্ডা। মাথার চুলে, সারা গায়ে পোড়া পাতার গন্ধ লেগে থাকত। আমার কাছে ঐ-সব

হল শৈশবের গন্ধ ; শুকনো ঘাসের, ঝরা পাতার, পোড়া পাতার, ধূপ-কাঠের গন্ধ।

বছরটা ক্রমে শেষ হয়ে এল। শুনতাম যুদ্ধও নাকি শেষ হয়ে আসছে। সেই প্রথম মহা-যুদ্ধ কোনো দিনই আমাদের খুব কাছে আসতে পারেনি। জিনিসপত্রের দাম কিছু বেড়ে থাকতে পারে, আমরা টের পাইনি। শৌখীন জিনিস আমদানী বন্ধ হয়েছিল বটে তবে তার সঙ্গে আমাদের কি ? একটি জিনিস মাত্র মনে লেগেছিল, সেটি হল বিলেত থেকে ওষুধ আসেনি বলে জ্যাঠামশাই মারা গেলেন আর মা তারপর কত দিন ভালো করে হাসেননি, গল্প করেননি। পরে অবিশ্যি জ্যাঠামশায়ের অপরিসীম স্নেহের কথা অনেক বলেছিলেন। হয়তো একবার যদি এসে তিনি মায়ের কাছে কয়েকদিন থেকে যেতেন, তাহলে মায়ের অত কষ্ট হত না।

আরেকটি মানুষকে ভুলতে পারি না, সে আমাদের আয়া ইল্‌বন। অন্যান্য খাসিয়া মেয়েদের থেকে সে একটু আলাদা রকমের ছিল। তারা 'উদ্‌খারে'র বাড়িতে খেতও না, শুতও না। উদ্‌খার হল খাসিয়া ছাড়া আর সবাই। কিন্তু ইলবন আমাদের বাড়িতে খেত, রাতে আমাদের ঘরে বিছানা করে শুয়ে থাকত। অন্য খাসিয়ারা ডাকুর ভয়ে সূর্য ডোবার পর বাড়ির বার হত না। ইল্‌বন দিব্যি সুন্দর ঘুরে বেড়াত। বলত, "ডাকুরা আমার নিজের লোক।" বিকট সব গল্প বলত আমাদের, কিন্তু কাউকে ভালোবাসার কিম্বা আদর করার ধার দিয়েও যেত না। বলত, "আমার ছেলে হেড্রিক্‌সন তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো।" তবে হেড্রিক্‌সনকে দেখাতে পারত না। কারণ, সে নাকি তার ঠাকুমার কাছে থাকত, তার বাবা ফ্রাং-এ গিয়ে নিখোঁজ। ঠাকুমা ইলবনকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। এখন মনে করলে এর মধ্যে একটা গভীর ট্র্যাজেডির আভাস পাই, তখন কিছু মনে হয়নি। তার প্রধান কারণ ইল্‌বন কখনো কোনো কোমলতা দুর্বলতা প্রকাশ করত না। শেষটা কি একটা সামান্য কারণে খুব মেজাজ দেখিয়ে, গট্‌গট্ করে হেঁটে চলে গেছিল। আর কোনোদিন-ও আমাদের খোঁজ নেয়নি।

১৯১৮ সালে স্কুলে প্রাইজের বদলে সেই মস্ত কার্ড দেওয়া হল, তবে এই ছিল শেষ বার। শীতকালে শহরটা খালি হয়ে যেত। সব স্কুল আড়াই মাসের জন্য বন্ধ হয়ে যেত। বাড়ির সামনের পাইন-মাউণ্ট স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য মস্ত মস্ত মোটর আসত, আসলে আমরা যাকে বাস্ বলি তাই ; তবে বাস্ কথাটির তখনো চল হয়নি। জিনিসপত্র নিয়ে মহা হৈ-চৈ করতে করতে তারা দলে দলে সমতল ভূমিতে নেমে যেত। অত বড় স্কুলবাড়ি যেন ঘুমিয়ে পড়ত। তাই বলে হাঁস পেরুরা কোথাও যেত না এবং আমাদের প্রতি তাদের বিদ্বেষও একটুও কমত না। ওরা যে কি হিংস্র জানোয়ার কম লোকেই জানে। সে বছর

শহরটিকে আরো বেশি ফাঁকা মনে হতে লাগল। শুনলাম কেউ কেউ শীতের পর নাকি ফিরবে না। যতদূর মনে হয় তাদের মধ্যে সুতুদি অমলদা ছিল। ওদের মতো মিষ্টি স্বভাবের স্নেহশীল মানুষ খুব বেশি হয় না। ওরা আমার ছোটমেসোমশায়ের প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়ে, শিলং-এ ওদের জ্যাঠামশায়ের কাছে থেকে পড়ত। মেসোমশাই রাঁচীতে, পাটনাতে নানান্ জায়গায় চাকরি করতেন। যেমন সুন্দর চেহারা মেসোমশায়ের, তেমনি সুতুদি অমলদার। ফর্সা রঙ, কাটা কাটা মুখ চোখ। সুতুদি অমলদা আমাদের চাইতে ভালো দেখতে বলে আমার কোনো আপত্তি ছিল না, ঐ মেসোমশাইকে নিয়েই একদিন গোল বেধেছিল। তখন হয়তো আমার আট বছর বয়স। অমলদা হয়তো দশ, সুতুদি এগারো। অমলদা বলেছিল, "তোমার বাবার চেয়ে আমার বাবা ফর্সা।" এ আমি কি করে সহ্য করি ? আমি বললাম, "না, কক্ষণো না। আমার বাবা তোমার বাবার চেয়ে ঢের বেশি ফর্সা।" এ হেন অযথা কথা অমলদা মানতে চাইল না ; বলল, "আমি তো দেখি আমার বাবাই বেশি ফর্সা।" আমি চটে গেলাম, বেশ চড়া গলায় বললাম, "কক্ষণো না। আমার বাবা শিলং-এ সকলের চেয়ে বেশি ফর্সা।" আমার আত্ম-প্রত্যয় দেখে অমলদা হক-চকিয়ে গিয়ে থাকবে, নরম গলায় বলেছিল, "আমি ভেবেছিলাম আমার বাবাই বুঝি ফর্সা, হতে পারে তা নয়।" এই অবধি শুনে আর সইতে না পেরে, পাশের ঘর থেকে মা বেরিয়ে এসে বললেন, "বাজে বকিস্‌নে। তুই বাবাকে বেশি ভালোবাসতে পারিস্, কিন্তু তোর মেসোমশাই অনেক বেশি ফর্সা।" এখনো মনে আছে তাই শুনে উল্লাস করা দূরে থাকুক, অমলদা আমার দিকে সহানুভূতির সঙ্গে চেয়ে ছিল। বলেছি না, বড় ভালো ছিল ওরা। সারা জীবন ধরে একটুও বদলায়নি।

সত্যি সত্যিই পুরনো দলটাতে চিড় ধরেছিল। শুনলাম সুতুদি এখন বড় হয়েছে, তার পড়াশুনোর সুবিধার জন্য ওরা দুজনে শিলং ছেড়ে চলে যাবে। আরো বন্ধু-বান্ধব ছিল, তাদেরও কেউ কেউ চলে যাবে। সেই যে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে মনীষাদেবী ছিলেন, যাঁর বাড়িতে অত আনন্দ করে লক্ষ্মীর পরীক্ষা অভিনয় হয়েছিল, এর মধ্যে তাঁর রুগ্ন স্বামী মারা গেছিলেন। বাগানের মধ্যিখানে একটা জালের দেয়াল দেওয়া ঘরে তিনি সারাদিন শুয়ে থাকতেন, রাতে হয়তো ঘরে আনা হত, যে-রকম শীতের দেশ। সেই মানুষটি মারা গেলেন, কয়েকদিন পরে গিয়ে দেখলাম জালের ঘর খালি পড়ে রয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বড় মেয়েকে আমরা সরস্বতীদি বলে ডাকতাম, আমরা ওঁদের বাড়ি গেলেই তিনি আমাদের নিজের হাতে তৈরি বিস্কুট খাওয়াতেন। বড় স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। ওঁরা সকলেও নাকি শিলং ছেড়ে চলে যাবেন সরস্বতীদির নাকি বিয়ে হবে। তাঁর ছোট দুই ভাই, দুই বোন। ছোটবোনটির নাম দীপ্তি, সে আমাদের বয়সী। ছোট

ভাইটিকে সবাই 'বাবু' বলে ডাকত, ভারি মিষ্টি গলা ছিল, বয়সে আমার সেজভাই অমিয়র সমান। সরস্বতীদি আর দীপ্তি ছাড়া, এরা সকলেই অকালে চলে গেছে।

শুনলাম শিউলি বেলিরাও নাকি এক বছর পরে চলে যাবে, ওদের বাবা বোধহয় বদলি হয়ে গেলেন, তবে সেটা ঠিক মনে পড়ছে না। ছোটবেলায় যাদের সঙ্গে চিরকাল খেলাধুলো করেছি, সব স্মৃতির সঙ্গে যারা জড়ানো, তাদের সঙ্গে চিরকালের মতো ছাড়াছাড়ির কথা মনে করেও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত। হরিচরণরা, নাড়ু-নীলুরা অবিশ্যি আসত যেত। কাকাবাবুরা বাবার আপিসে কাজ করেন, যাবেনই বা কতটুকু দূরে ওঁরা। তবে মাঝে মাঝে নরেস্ক বাড়িটা খালি পড়ে থাকত। রান্নাঘরের চোঙা থেকে ধোঁয়া উঠছে না দেখে কষ্ট হত। ওদের শ্যাম বলে এক রান্নার লোক ছিল, সে ভারি গপ্পে। আগে নাকি বর্মায় থাকত। তার ওপর পাড়ার লোক খুশি ছিল না, নাকি সে এসে অবধি অন্য লোকের পোষা মুরগি ওদের বাড়িতে একবার ঢুকলে আর বেরুত না। বাঁশ কাটতে গিয়ে শ্যামের আঙুল থেকে বড় এক চাক্‌লা কেটে এল, ব্যথার চোটে সে যায় আর কি! পাড়ার লোকে বলল, "এবার মুরগি চালান বেরুচ্ছে!" হরিচরণরা যখন থাকত না, পাড়াটা কেমন খালি-খালি মনে হত। খুড়িমা যত্ন করে বিলিতী ফুলের গাছ লাগাতেন. ওখানে সব বিলিতী ফুল হত। ওঁরা চলে গেলে ফুলগাছ মরে যেত, আবার হয়তো দেড় বছর পরে ফিরে এসে নতুন করে লাগাতেন। সেবার বেশ কিছুদিন বাড়ি খালি পড়ে থাকার পর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই ছেলে সুধী ঠাকুর আর অরু ঠাকুর কতকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে এলেন। আমাদের একটা যাবার জায়গা হল। সুধী ঠাকুর সৌম্যেন্দ্রনাথের বাবা. ভারি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর কথা ভালো করে মনে পড়ে না। তাঁর ছোট ছেলে নেপু ছিল আমাদের বয়সী, তার সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল। ভারি আদুরে ছিল নেপু, তার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা একটা চাকর ঘুরত। নেপু কিচ্ছু করত না, নিজের পাজামার দড়ি পর্যন্ত বাঁধত না, সব চাকরটা করে দিত। দেখে আমরা অবাক হতাম। কারণ আমাদের বাবার কাছে ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছিলাম, "মিছিমিছি কারো সেবা নেবে না, মাইনে করা চাকরদেরও না। কেন, নিজের জুতোয় নিজেরা রঙ দিতে পার না? একটা গরীব মুখ্যু লোকে যা পারে, তোমরা তা-ও পারবে না?" নিজে সর্বদা নিজের জুতো পালিশ করতেন। পরে যখন কলকাতায় ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল হয়েছিলেন, তখনো। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি দর্পহারী ভগবান বাবার মতো মানুষকেও পেড়ে ফেলেছিলেন। ৭৪ বছর বয়সে দু' পায়ের জোর একেবারে চলে গেছিল, সব কাজের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করতে হত। কথা বলতেও কষ্ট হত, দরকার হলেও কাউকে ডাকতেন না, মাঝেমাঝে চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল জমে থাকত। তাই দেখেই বোঝা যেত আমাদের সেই

প্রচণ্ড রাগী ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ বাবার মনের মধ্যে কি হচ্ছে !

অরু ঠাকুরের নাম অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তিনি ভারি আমুদে লোক ছিলেন। ছোট বড় সবার সঙ্গে মিশতেন। শিলং-এর ব্রাহ্মরা বড্ড গোঁড়া ছিলেন ; তার একটা কারণ হয়তো তাঁদের বেশিরভাগই হিন্দু-সমাজের ছেলে, ব্রাহ্ম হয়েছিলেন বলে অনেক নির্যাতন সইতে হয়েছিল। তাই নিজেদের চারদিকে গোঁড়ামির একটা বর্ম পরে থাকতেন। আমার মাসিমা অনেক বিষয়ে উদার হলেও, সিঁদূর পরতেন না, লোহা পরতেন না, পুজো দেখতে যেতেন না, মদ শব্দ উচ্চারণ করতেন না। কিন্তু মজার কথা হল যে মেসোমশায়ের মৃত্যুর পর থান পরলেন, হাত খালি করলেন, বাকি জীবনটা নিরামিষ খেয়ে কাটালেন। আসলে এ-সব নীতির ব্যাপার ছিল না, একেবারে আবেগের ব্যাপার। মা-মাসিমার তো হিন্দু সমাজের ওপর অভিমান থাকাই স্বাভাবিক। দিদিমা মারা গেলেন, দাদামশাই আবার হিন্দু হয়ে সন্ন্যাস নিলে, কোনো হিন্দু আত্মীয়স্বজন অনাথা মেয়ে তিনটির ভার নিলেন না, যদিও তাঁদের দাদামশাই দিদিমা ঠাকুমা ইত্যাদি অনেকেই বেঁচে ছিলেন। তাঁদের মানুষ করলেন অনাত্মীয় ব্রাহ্মরা। এ দুঃখ খুব সহজে ভুলবার নয়। কাজেই তাঁরা যখন হিন্দুদের গোঁড়ামি সম্বন্ধে কিছু বলতেন, কিন্তু ব্রাহ্মদের গোঁড়ামি সম্বন্ধে কিচ্ছু বলতেন না, আমরা বেজায় তর্ক করতাম, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এ মনোভাবের কারণ বুঝতাম। আমি প্রায়ই বলতাম, "ব্রাহ্মরাও হিন্দু ছাড়া কিছু নয়। উপনিষদের মন্ত্র আওড়ায় !" তাঁরা ব্যথা পেতেন।

সে যাই হোক আমি ব্রাহ্ম সমাজের লোকদের শিলং-এর ব্রাহ্মরা বোধহয় পুরোপুরি ব্রাহ্ম, মনে করতেন না। তার ওপর অরু ঠাকুর নাকি সুরাপান করতেন। কে না জানত ব্রাহ্মরা সুরাপান করে না। আমাদের তাঁকে বেজায় ভালো লাগত ; সুরাপান করতে দেখিওনি কখনো। একদিন অরু ঠাকুর জোব্বা গায়ে দিয়ে, হাত দুটি জোব্বার বুকে গুঁজে, আমাদের বাড়ির কাছেই কো-অপারেটিভ স্টোর্স থেকে বেরুচ্ছেন, এমন সময় একজন লোক বাইরে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু মুচ্‌কি হাসল। তাই দেখে অরু ঠাকুর থমকে দাঁড়ালেন। সবাই জানত ঐ দোকানে জোলাপ থেকে হুইস্কি, এমন কোনো জিনিস ছিল না, যা পাওয়া যেত না। অরু ঠাকুর মাথা নেড়ে এক গাল হেসে, সেই অচেনা লোকটিকে বললেন, "উঁহু ! যা ভেবেছ তা নয়,—বিস্কুট !" বলে বুকের ভিতর থেকে হাণ্টলি পাকারের বিস্কুটের টিন বের করে দেখালেন !

॥ ১০ ॥

১৯১৮ সালটির বিশ্বের ইতিহাসে একটা বিশেষ মূল্য আছে। মনে হয় ঐ সময় থেকেই রাজাদের যুগ ক্রমে শেষ হয়ে, জন-যুগের সূচনা হয়েছিল। তবে

পাহাড়ের ওপরে ঐ সুন্দর জায়গাটির অবস্থান ছিল রাজনীতির বাইরে। ঐ বছর দিদির আমার নিশ্চিন্ত শৈশব হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়ে, দায়িত্বপূর্ণ কৈশোর আরম্ভ হল। বছরের শেষে শুনলাম বিশ্বযুদ্ধও যেমন শেষ হয়েছে, তেমনি আমাদের ডবল প্রমোশন দিয়ে ষষ্ঠ স্ট্যাণ্ডার্ডে তুলে দেওয়া হয়েছে। মা গেছিলেন স্কুলে, মাদার মার্গারিটা তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মায়ের কোনো আপত্তি নেই তো? বছরের শেষে কিন্তু প্রিলিমিনারি কেম্‌ব্রিজ্‌ পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে। বলা বাহুল্য মা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে এলেন। আমরা একটু ঘাবড়ে গেলাম। আমার তখনো এগারো পূর্ণ হয়নি, অনেক বিষয়ে বড্ড ছেলেমানুষ ছিলাম, কিন্তু পড়াশুনোকে ভয় পেতাম না। বেশ তো, তাই দেওয়া যাবে।

যুদ্ধ শেষ হলে সরকারি খরচে আনন্দোৎসব হল। স্কুলের ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো-দাওয়ানো, খেলা-ধুলো, নাচ-গান, জনসাধারণের জন্য মিলিটারি ট্যাটু, ইত্যাদি কত কি হল। ঘরে ঘরে মোমবাতির আর তেলের পিদিমের সারি বসানো হল। আমাদের স্কুল ততদিনে বন্ধ হয়ে গেছিল, কাজেই দলের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ থেকে বাদ পড়ে গেলাম। তবু জনসাধারণের সঙ্গে দাঁড়িয়ে খুব মজা দেখলাম। ডাক্তারবাবু না কে যেন আমাদের দেখতে পেয়ে, ধরে নিয়ে গিয়ে, খাস্তা নিমকি, গজা, মতিচুর খাওয়ালেন। ফলে খুব জলতেষ্টা পেল। তখন আবার লেমোনেড খাওয়ালেন। সেকালের লেমোনেডের বোতলের মুখটা একটা কাঁচের মার্বেল দিয়ে আঁটা থাকত। মার্বেলটাকে একটা ছোট যন্ত্রের চাপ দিয়ে নামিয়ে দিলে, তবে বোতলের মুখ খুলত। দুঃখের বিষয় বোতল না ভেঙে মার্বেল বের করার উপায় ছিল না। কম চেষ্টা করিনি।

ছুটির পর স্কুল খুললে বন্ধুদের কাউকে কাউকে দেখতে পেলাম না। সেলাই, বোনা, হাতের কাজ, ছবি আঁকা ইত্যাদির ক্লাস্‌ কমে গিয়ে, বই পড়ার ক্লাস্‌ অনেক বেড়ে গেল। এখন বুঝতে পারি ওঁদের ইংরিজি শেখাবার নিয়মটি বড় ভালো ছিল। এর আগে পর্যন্ত আলাদা গ্র্যামারের বই পড়িনি। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যামারের যাবতীয় শিক্ষণীয় অংশ সব একেবারে পাখি-পড়া হয়ে গেছিল। গ্র্যামারটাকে কোনো দিনও পাঠ্যাংশ থেকে আলাদা করে দেখিনি। ফলে শুধু আমাদের নয়, আমাদের স্কুলের সকলের ধাপে-ধাপে গ্র্যামার সরগড় হয়ে গেছিল। ঐ ষষ্ঠ স্ট্যাণ্ডার্ডে উঠে যখন আমাদের হাতে নেস্‌ফীল্ড্‌-এর গ্র্যামার দেওয়া হল, খুলে দেখলাম সমস্তই জানা বিষয়, শুধু আরেকটু বিষদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করা। তাই গ্র্যামার কখনো একটা সমস্যা বলেই মনে হয়নি। এখনকার বিদ্যা-দিগ্‌গজরা যদি ঐ নিয়মে নিচের ক্লাস্‌ থেকে ইংরিজি গ্র্যামার আর বাংলা ব্যাকরণের আলাদা বই মুখস্থ না করিয়ে, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে সরগড় করিয়ে দেবার কথা ভাবতেন, তাহলে কি ভালোই না হত।

মোটা মোটা গোটা দুই ফ্রেঞ্চ বই-ও ছিল। মাদার হায়াসিন্থ, যিনি আমাদের নিচের ক্লাসে মুখে মুখে ফ্রেঞ্চ শেখাতেন এবং সেলাইয়ের ক্লাস্‌ও নিতেন, তিনি এবার আমাদের ছেড়ে দিলেন। সেলাই শেখা বন্ধ হল, ফ্রেঞ্চ পড়াতেন মাদার ক্যামিলা। তিনি অনেক পাস্‌টাস্‌ করেছিলেন, বিদ্যে অনেক ছিল, কিন্তু ফ্রেঞ্চ উচ্চারণ করতেন ঠিক ইংরিজির মতো। আমরা ফরাসী নানের কাছে পাঁচ বছর ফ্রেঞ্চ পড়েছি, আমাদের বেজায় হাসি পেত। মাদার ক্যামিলা আমাদের পরীক্ষার জন্য তৈরি করতেন, মাদার হায়াসিন্থ আমাদের মগজের মধ্যে ফ্রেঞ্চ ভাষা একটু একটু করে ঢেলে দিতেন। আজ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ ভুলতে পারিনি।

চমৎকার শেখাতেন মাদার হায়াসিন্থ। খারাপ কাজ করে কখনো পার পাওয়া যেত না। একটা সায়ার সমস্ত তলাটা হয়তো কেউ 'হেম' করেছে, মধ্যিখানে কয়েকটা বাঁকা ফোঁড় দিয়েছে। সেটাকে আর খুলে শুধ্‌রোয়নি। মাদার হায়াসিন্থের ছিল বাজপাখির মতো চোখ, অমনি ভুলটি ধরেছেন। একবার দুষ্কৃতকারীর মুখের দিকে তাকিয়ে, ফুচ্‌ করে কাঁচি দিয়ে অকুস্থলের সুতোটি কেটে সেটা টেনে বের করে আনতেন। অপরাধীকে চার-পাঁচটি ফোঁড় না শুধরিয়ে, ফাঁকি দেবার খেসারত দিতে হত গোটা লাইন আরেকবার সেলাই করে। উল্‌ বোনার বেলাও তাই। ছোট্ট একটা ভুল করে হয়তো পাঁচ-ছয় ইঞ্চি বুনে গেছি, ভাবছি মাদার লক্ষ্য করবেন না। মাদার একবার তাকিয়ে দেখে, বোনার কাঁটাদুটি টেনে বের করে এনে ফড়্‌ফড়্‌ করে উল্‌ টেনে ভুল জায়গা পর্যন্ত সবটা খুলে দিলেন! পরে অবিশ্যি আমাকে হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়েছিলেন ভুল বুনে তারপর অনেকখানি বুনে গেলেও, সেই কটি ঘর কি করে খুলে নামিয়ে আবার বুনে তুলতে হয়। মানুষটা ছিলেন পারফেক্‌শননিস্ট, ভালো গুরু তারাই হয়। খুঁৎ তারা বরদাস্ত করে না।

এসব কথা ভাবতে গেলে মনে হয়, কাজের কত শক্ত গাঁথুনি তৈরি করে দেবার চেষ্টা করতেন তাঁরা, যাতে তার ওপর ভবিষ্যতের প্রাসাদ গড়া যায়। এখন মনে হয় ভিৎ গড়বার সময় না দিয়ে ছেলে-মেয়েগুলোর ওপর বড় বড় বোঝা চাপাবার চেষ্টা হয়।

সে যাই হোক, যুদ্ধ তার কালো ডানা গুটিয়ে নিলে দেখা গেল খুব একটা তফাৎ চোখে পড়ছে না। আমরা পড়াশুনো নিয়ে থাকি। মাঝে মাঝে তখনো গাছেটাছে চড়ি। ছোট বোনটার দেড় বছর বয়স হল। আমার বেজায় ন্যাওটা। স্কুল ছুটি হলেই বড় বড় পা ফেলে বাড়ি চলি, বড় বড় চোখ করে সে আমার পথ চেয়ে থাকে। এমন সময় শোনা গেল বাবা আসছে বছর কলকাতার হেড আপিসে বদলি হয়ে যাবেন। আমাদের শিলং-এর পাট ফুরোল। প্রিলিমিনারি কেম্‌ব্রিজ্‌ পরীক্ষা শেষ হবে ডিসেম্বরে, আমরা শিলং-এর বাড়ি তুলে দিয়ে,

বড়দিনের সময় কলকাতা চলে যাব। সেখানকার স্কুলের নতুন ক্লাস্ শুরু হয় জানুয়ারি থেকে। বাবাকে আরো ছয় মাস শিলং-এ থাকতে হবে।

খবরটা শুনে অবধি পা কাঁপছিল। এতকাল আমরা উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম কবে কলকাতা যাব। এখন কলকাতা যাবার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এ বাড়ি, এ বাগান, এই ফলের গাছ, ফুলের গাছ তরকারির বাগান ছেড়ে যাব কি করে? আর কখনো আসব না? পাশের বাড়ির ফাগু-মালির খোঁড়া ছেলের সঙ্গে আমাদের আজকাল শত্রুতা, তাকে ছেড়ে থাকব কি করে? আলুগাছ আমরা নিজের হাতে করে পুঁতেছি, সে আলু তোলা অবধিও থাকব না?

মন প্রস্তুত করতে অনেকটা সময় পেয়েছিলাম। হঠাৎ প্রিলিমিনারি কেম্‌ব্রিজ্ পরীক্ষা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল। মা বললেন, "কলকাতায় গিয়ে তোদের ডায়োসেসান স্কুলে ভরতি করা হবে। সেখানকার নান্‌দের লেখা হয়েছে। বাঙ্গালীর মেয়ে, তোদের ভালো করে বাংলা শেখা দরকার।"

কেমন যেন সবটা অবাস্তব মনে হতে লাগল। ডায়োসেসানের মেয়েরা কেম্‌ব্রিজ্ পরীক্ষা দিত না, ম্যাট্রিকুলেশন দিত। হঠাৎ ছাড়ার মুহূর্তে ঐ যে স্কুলটাতে ছয় বছর পড়েছি কিন্তু কখনো একান্ত আপনার বলে মনে হয়নি, তার ওপর মায়া পড়ে গেল। মনে হল কই, অনেক দিন তো কেউ আমাদের নেটিভ্ বলে ঘেন্না করেনি। ওপরের ক্লাসের টিচারদের বেশির ভাগই নান্, খাঁটি মেম তাঁরা। তাঁরা কেউ কালো মানুষদের ঘৃণা করতেন না। তাঁদের কাছ থেকে কত যত্ন, কত স্নেহও পেয়েছি। সব কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। তারি মধ্যে ঠেসে পড়াশুনো করি। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ পড়াশুনো আমাদের একটুও কঠিন মনে হত না। কি সুন্দর সব বই। ইতিহাস, ভূগোল, জীব-বিজ্ঞান, সব গল্পের মতো সরস করে লেখা। কত ছবি, কত চার্ট, কত মডেল।

এখনো মনে আছে সৌর-মণ্ডলের মডেল ছিল। মধ্যিখানে সূর্যের জায়গায় একটা মোমবাতি জ্বালতে হত। তলায় একটা হাতল ছিল, সেটি ঘোরালে গ্রহমণ্ডলী নিজ নিজ কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরত। তখনি লক্ষ্য করেছিলাম পৃথিবীটা অক্ষতলে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে নেই, অক্ষদণ্ড একটু বাঁকা। তার ফলে ডিম্বাকারে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে যখন আর নিজেও পাক খেতে থাকে, তখন কখনো দিন কেমন বড় হয়, কখনো ছোট হয়। এসব জিনিস একবার মগজে ঢুকে গেলে আর ভোলা যায় না। পরে বি-এ ক্লাসে যখন অ্যাস্ট্রনমি পড়েছিলাম, ঐ মডেলগুলোর কথা মনে করে অনেক সুবিধা হয়ে গেছিল। কোনো দিশী স্কুলে বা কলেজে সেরকম মডেল আনা হয়েছে বলে তো শুনিনি। যখন ঐ স্কুল ছেড়েছিলাম আমার বারো বছর পূর্ণ হয়নি, কিন্তু মন এতদিন কাদার দলা ছিল, এতকাল ধরে যে ছাপগুলি পড়েছিল, সারাজীবনের ওপর তার চিহ্ন

থেকে গেছে। ডায়োসেসান স্কুলে কলেজে আট বছর পড়েছিলাম, সেরকম কোনো প্রভাব অনুভব করিনি। তখন মনন, মানস, মন, যাই বলা যাক না কেন, সে অনেকখানি তৈরি হয়ে গেছিল।

কন্‌ভেন্টের মেয়েরা আর নিচের ক্লাসের টিচাররা রোমান ক্যাথলিক ছাড়া আর কাউকে বোধ হয় খ্রীশ্চান মনে করতেন না। তাই মুসলমান-হিন্দু-ব্রাহ্ম মেয়েদেরও ওরা বলত প্রটেস্টান্ট। এখন আমরা কলকাতায় গিয়ে প্রটেস্টান্ট স্কুলে পড়ব শুনে, সকলের কি দুঃখ। "তাহলে মরে গেলে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। প্রটেস্টান্টরা তো অনন্তকাল পার্গেটরিতে বাস করে, তবে যদি পাপ কমে, অর্থাৎ যদি রোমান ক্যাথলিক হয়, তবে স্বর্গে যেতে পারে।" এর উত্তরে স্বর্গবাসের ওপর আমাদের সেরকম আগ্রহ নেই শুনে ওরা বেজায় আশ্চর্য হয়ে যেত। ডিসেম্বরের গোড়ারদিকে স্কুল বন্ধ হতেই এইসব মেয়েরা সমতলভূমিতে নেমে গেল। বলে গেল, "তোমরা খুব 'লাকি' যে এই বিশ্রী 'ডাল্' জায়গাতে বছরের পর বছর পড়ে থাকতে হবে না! এখানে আছে কি? না একটা ভালো বায়োস্কোপ; না ভালো দোকান-পাট! দেখবে কলকাতা কত ভালো।"

কথাটা খচ্ করে মনে লেগেছিল। ছিল তো একটা হল, সেখানে মাঝেমাঝে বায়োস্কোপ আসত। আমরা দেখিনি অবিশ্যি। আর কি ভালো দোকান জামাৎ-উল্লার আর গোলাম-হাইদারের! খেলনা, টুপি, জুতো, পোশাক, বাসন-কোসন, কেক-বিস্কুট, কি না পাওয়া যায় সেখানে! কক্ষনো কলকাতার কোনো দোকান এদের চাইতে ভালো হতে পারে না! মনটা ভারি হয়ে গেল। যাবার আগে সব জায়গায় গিয়ে একবার ভালো করে দেখে আসতে হবে। মা বললেন, "সবাই মিলে দেখে আসব। আর হয়তো দেখা হবে না।" মার কথা শুনে আমার কাটা টনসিলে সেকি দারুণ ব্যথা! স্কুল বন্ধ হয়ে যেতেই পরীক্ষার্থিনীরা ছাড়া আর সকলে তো চলে গেল। অমনি স্কুলের আবহাওয়া বদলে গেল। কেমন একটা কোমল অন্তরঙ্গতা আপনা থেকেই গড়ে উঠল। ওখানকার শীতের রোদ বড় মিষ্টি। নানরা আমাদের বাইরে গাছতলায় বসিয়ে পরীক্ষার জন্য তৈরি করতে লাগলেন। বুঝতে পারতাম যে আমাদের দুজনার ওপর তাঁদের অনেক ভরসা, ভালো করে পাস্ করব, স্কুলের সুনাম হবে। আমাদের মন থেকে কিন্তু পরীক্ষার গুরুত্ব লোপ পেয়েছিল, যতটা আগ্রহ থাকা উচিত ছিল, ততটা ছিল না। অনেক মাস পরে কলকাতায় বসে ঐ পরীক্ষার ফল জেনেছিলাম। ভালোই পাস্ করেছিলাম, কিন্তু খুব ভালো কিছু নয়। খবর শুনে নিজেদের মনের নির্লিপ্তভাবে নিজেরাই অবাক হয়ে গেছিলাম।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে আমরা শিলংএ-ই ছিলাম। স্কুলের কাছেই

সেন্ট এড্‌মাণ্ড্‌স্‌ স্কুল, সেখানে গিয়ে পরীক্ষা দিলাম। স্কুল থেকে আমাদের টিফিনের ব্যবস্থা হল, কত যত্ন করে ওঁরা আমাদের খাওয়াতেন। বুঝতে পারলাম ছাড়াছাড়ির সময় মায়া কত গভীর হয়।

স্কুলের একটা জানলা থেকে গৌহাটি যাবার রাস্তাটির একটুখানি দেখা যেত। একদিন সেখান থেকে দেখতে পেলাম বড় বড় দুটো মোটর নামছে। মনটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভয়ঙ্কর একটা উত্তেজনা হল। কত নতুন জায়গা দেখব, নতুন মানুষ দেখব। বড়দাকে দেখব। কলকাতায় থাকব ; ট্রামগাড়ি দেখব, বড় বড় দোকান দেখব, গড়ের মাঠ, যাদুঘর, বায়োস্কোপ, নিউ মার্কেট, যেসব জায়গার শুধু গল্পই শুনে এসেছি এতকাল, এবার সে সমস্তই চোখে দেখব। বিদায় ব্যথার চাইতে নতুনের ডাকটাই মনের মধ্যে সেই মুহূর্তে বেশি করে অনুভব করলাম।

অন্য বছর শীতকালের আগেই বাবা ট্যুরে যেতেন, সে বছর গেলেন না। শুনলাম এখন তিনি বড় অফিসার হয়ে গেছেন আর তাঁকে বনে যেতে হবে না। আশ্চর্যের বিষয় শিলং ছেড়ে এসে অবধি বাবার সেই অনর্গল গল্পের স্রোতও কেমন কমে এল। সন্দেশে বাবার ‘বনের খবর’ বেরুত, বাবার বনে বনে ঘোরার গল্প। এমন চমৎকার সরস গল্প বাংলায় খুব বেশি নেই। কি ঝরঝরে সহজ ভাষা ; বনজঙ্গল জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞতা। অনেক বছর পরে সিগ্‌নেট প্রেস্‌ বাবার ‘বনের খবর’ পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। বাবা তখন ইহলোকে ছিলেন না। আজ পর্যন্ত অমন বই আর চোখে পড়ল না। তবে একটা কথা মনে হত : এ যেন আমাদের ঘরোয়া বাবার চাইতে আরো উজ্জ্বল, আরো রোমাঞ্চময় আরেকটা বাবার গল্প। অথচ একটি কথাও বাড়ানো বা বানানো ছিল না, ছোটবেলায় বাবার কাছে যেমন শুনেছিলাম, হুবহু তাই। শুধু তার গায়ে সাহিত্যের সোনার আলো লেগে গেছে। সাহিত্য যে কি দিয়ে তৈরি তাই বা কে বলতে পারে। বনের খবরের ঘটনাবলী বাবার পুরনো ডাইরি থেকে নেওয়া। বাবা যেমন নোট করে রেখেছিলেন, অবসর নেবার পর সেগুলিকে খাতায় লিখেছিলেন। পরে ‘মুকুলে’ একবার কিছু কিছু বেরিয়েছিল। পুরনো সন্দেশেও সবটা বেরোয়নি। আমি বাবার হাতে লেখা খাতা সিগ্‌নেট প্রেস্‌কে দিয়েছিলাম। ওঁরা তার থেকে নকল করে নিয়ে, খাতা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গায়ের ঘাম আর রক্ত আর প্রাণের ফূর্তি দিয়ে লেখা জিনিসকে কি কখনো ‘ঘরোয়া’ নাম দেওয়া যায় ? নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপারেও যাদু লেগে যায়। এই ‘বনের খবর’ অনেক বছর পুনর্মুদ্রিত হয়নি, আশা করছি হয়তো এবার আবার প্রকাশিত হবে। বই পড়ে নিজের বাবাকে চিনতে হবে এ যেন উল্টো কথার মতো শোনায়। কিন্তু ঐ বইতে বাবার একটা না দেখা দিক বারে বারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যদি পারতাম সেদিনের সেই শিলংটাকে তার সমস্ত আলো হাওয়া মাধুর্যসুদ্ধ ধরে

দিতাম। পরীক্ষার পর সব পুরনো প্রিয় জায়গাগুলোকে আরেকবার দেখলাম। এসব জায়গায় কত চড়িভাতি করেছি, তার কত স্মৃতি মনে জড়িয়ে আছে। এই সেই 'সেভেন্ ফল্‌স্' সাতটি জলের ধারা নেমেছে। কুচি কুচি জলকণায় রোদ পড়ে এখানে রামধনু তৈরি হয়। ঐ পাহাড়ের গায়ে একবার দুটো ছাগলকে খেলা করতে দেখেছিলাম। একজনের শিং-এর ওপর আরেকজন শিং বাগিয়ে লাফিয়ে পড়ছিল, আর খটাং খটাং শব্দের প্রতিধ্বনি উঠছিল।

পৃথিবীর ভালোবাসার জায়গাগুলো অর্ধেক মাটি দিয়ে গড়া আর অর্ধেক মনগড়া। পঁচিশ বছর পরে, সে জায়গায় গিয়েও, তাকে খুঁজে পেলাম না।

মনে আছে পরীক্ষার আগে যেদিন স্কুল বন্ধ হল, সেদিন পুরস্কার বিতরণ হল। সেই ছোটবেলায় প্রথম বছর একটা জন্তুজানোয়ারের বই আর একটা ব্যাট্-বল পেয়েছিলাম, তারপর আর পুরস্কার পাইনি। ইয়োরোপের ছবি দেওয়া কার্ড পেয়েই খুশি ছিলাম। এবার বার্ষিক পরীক্ষাই দিইনি তো আবার পুরস্কার! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হঠাৎ শুনি আমার নাম ডাকছে। একটা খামে আটটি টাকা দিল আমার হাতে! আমি যেমনি অবাক তেমনি খুশি। এর আগে কেউ আমাকে কখনো একসঙ্গে এতগুলো টাকা দেয়নি। তাই দিয়ে কি করেছিলাম মনে নেই।

সব চাইতে বেদনার স্মৃতির কথা বলা হল না। মাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "কলকাতায় গিয়ে কালামানিক কোথায় থাকবে? সেখানে তো বাড়িতে বাগান থাকে না।" মা একটুক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠলাম, "কিছু বলছ না কেন? ওখানে তো গড়ের মাঠে চরতে পারবে।" মা বললেন, "বাবাকে আর জঙ্গলের কাজ করতে হবে না, ঘোড়া রাখার দরকার হবে না। কলকাতায় ঘোড়া পোষার অনেক অসুবিধা।" "তাহলে ওর কি হবে? এইখানে একা ফেলে রেখে যাবে?" মা বললেন, "তোরা কি পাগল হয়েছিস্? তোদের কাঞ্জিলাল জ্যাঠার বদলে যিনি এসেছেন, তিনি ওকে নিচ্ছেন। ওঁরা জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসেন, পন্নুকেও রেখে দিচ্ছেন, কালামানিকের কোনো কষ্ট হবে না।"

আমি বললাম, "ও-ও জানে?" মা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনে হল বুক ফেটে যাচ্ছে, পেট কামড়াতে লাগল, কাটা টন্‌সিলে ব্যথা করতে লাগল। আর কোনো দিন আমরা কেউ কালামানিকের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। ছেলেবেলার দুঃখগুলো যে কি প্রচণ্ড, কি অসহনীয়, যাদের ছোটবেলার কথা মনে আছে তারাই জানে।

মাঝখানে দুটি বাড়ি, তার পরেই কাঞ্জিলাল জ্যাঠার বাড়ি। পাড়ার মধ্যেই থাকবে কালামানিক। যে দিন সে আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেল, আমরা সকলে তখন স্কুলে, ওর যাওয়াটা কাউকে দেখতে হয়নি। ওর আস্তাবলের

দিকেও যাইনি, ওর নাম করিনি কেউ। আমার ঘুম বড় পাতলা। রাতে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যেত, শুনতে পেতাম আস্তাবলের কাঠের মেঝেতে কালামানিক পা ঠুকছে। বেজায় ভালো লাগত। সে রাতটা ছিল নিঃসাড়, নিঃশব্দ, ভয়ঙ্কর। ওকে আর আমরা দেখতেও যাইনি। বাবা বলেছিলেন তাতে ওর কষ্ট হবে।

চলে আসার আগের দিন বিকেলে আর থাকতে না পেরে, আমরা সবাই মিলে কাঞ্জিলাল জ্যাঠার বাড়িতে বেড়ার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কালামানিক যে বেড়ার ওধারেই বাঁধা ছিল বুঝতে পারিনি। হঠাৎ বেড়ার ওপর দিয়ে চোখোচোখি। ওর চোখ দুটো যেন অতল কালো দুটি দীঘি। এক দৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। গলার কাছে একটা শিরা চিড়িক-চিড়িক করতে লাগল। পন্নুও সেখানে ছিল। সে বলল "হ্-হ্-হ্!" বলে কালামানিকের কপালে হাত রাখল। আর কি আমরা সেখানে থাকি! কাঁদতে কাঁদতে দৌড়তে দৌড়তে বাড়ি এসে তবে থামলাম। সেদিন হাঁস পেরু আমাদের ঠুকরে দিয়েছিল কিনা তাও টের পেলাম না।

॥ ১১ ॥

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে, সহ-পাঠিনীরা বলল, "তোমরা চলে যাচ্ছ, আমাদের 'পার্টিং প্রেজেন্ট' দেবে না?" আমি মনে মনে ভাবলাম, "তোমরাও তো চলে যাচ্ছ, তোমরা কিছু দেবে না?" যাইহোক, শেষ পর্যন্ত কেউ কাউকে কিছু দিলাম না। স্কুল থেকে বাড়ি যাবার পথটির প্রত্যেকটি গাছ-পাথর-ঝোপ-ঝাড় আমাদের চেনা ছিল। পাহাড়ের গায়ে কাটা রাস্তা, আরেকটু নিচে পাহাড়ের গা বেয়ে যে জল নামত, সেই জল যাবার সরু খাল। তার পাশে ঘোড়ায় চড়ে যাবার পথ। আরো নিচে খানিকটা সমতল জায়গা, সেখানে ধানক্ষেত ছিল। জায়গাটার নামও ছিল ধানক্ষেতি। এখন সেখানে ঘিঞ্জি বাড়িঘর। ধানক্ষেতির পর আবার পাহাড় উঠেছে। সেই পাহাড়ের তলা দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে, সেই এঁকে বেঁকে আমাদের বাড়ির নিচে দিয়ে গেছে। তারপর কত বাঁক নিয়ে, কত জলপ্রপাত পার হয়ে, কত অন্য নদীর সঙ্গে মিশে, ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে, মোটরের রাস্তার পাশে পাশে সমতলভূমিতে নেমে গেছে। তারি নাম বড়পানি, এখনকার বড়পানির হ্রদ মানুষের তৈরি, সেকালে সে ছিল না।

সব জায়গার সঙ্গে জীবনটা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ঐ ঘোড়ায় চড়া পথ যেখানে শুরু হয়েছিল, সেখানে ফিকে বেগুনী বুনো ভায়োলেট হত। অনেক দিন আগে এখানে দল বেঁধে বেড়াতে গিয়ে মলি মেলোনি বলে একটা সুন্দর দেখতে মেয়ে দিদির আমার সংগ্রহ করা সব ভায়োলেট নিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, "দুঃখ কর না। বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে আমার পার্সেল আসবে, তোমাদের ভাগ

দেব।" বলাবাহুল্য পার্সেল এসেছিল কিনা জানি না, তবে ভাগটাগ দেয়নি। হেসে বলেছিল, "ও মাই! তোমরা ঠাট্টাও বোঝ না!"

ঐখানে বাঁকের কাছে পাথরের দেয়ালের গায়ে আমার নতুন ছাতা ঠেকিয়ে রেখে, সুতুদির ছাতা খুলে দিয়ে, তারপর নিজের ছাতা ফেলে চলে গেছিলাম। তখুনি ফিরে গিয়ে আর পাইনি।

ঐ পাহাড়ের বাঁশঝাড়ের পাশে স্কুলের পিক্‌নিক হয়েছিল, মিস্ মার্টিনের জন্মদিন উপলক্ষে। অন্য খাওয়া-দাওয়ার পর প্লাম কেক খেতে দিয়ে মিস্ মার্টিন বলেছিলেন, "এটা আমার জিনিস। বাকি সব স্কুলের।" দুঃখের বিষয় তখন আর কিছু খাবার আমার ক্ষমতা ছিল না। রুমালে জড়িয়ে বাড়ি না এনে, ঐখানে পেন্‌সিল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে রেখেছিলাম। খুঁড়লে হয়তো তখনো পাওয়া যেত।

ঐ নিচে খুরুত পাগল থাকত। সবাইকে গাল দিত, আমাদের একদিন রাঙাআলু খেতে দিয়েছিল। কি আর বলব, স্কুল থেকে ঐ শেষ বাড়ি ফেরার দিনটিতে, সমস্ত বনভূমি আমাদের হাত-পা ধরে টেনেছিল। বাড়ি এসে দেখলাম তাক থেকে জিনিসপত্র নামানো হচ্ছে, খাটের তলা থেকে বাক্স-প্যাঁটরা টেনে বার করা হচ্ছে। কি তার উত্তেজনা।

মা বললেন, "শুধু সেই সব জিনিস নিয়ে যাওয়া হবে যা আমাদের ওখানে গিয়ে কাজে লাগবে। আর যার যা আদরের জিনিস। বাকি সব গরীবদের দিয়ে দেওয়া হবে।"

বলাবাহুল্য দুটি কাঠের বাক্সের একটিতে বাসনপত্র আর একটিতে বই ভরা হল। কাচের বাসন সব যারা বাড়িতে কাজ করত তাদের দেওয়া হল। বই আর ছবি সব নেওয়া হল। তখন দিদির আমার পুতুল-খেলার শখ চলে গেছিল, তবু এলে-বেলেদের সবাইকে তাদের খুদে খুদে খাটপালঙ্ক, বাসনপত্রসহ পুঁটলি বেঁধে নেওয়া হল। আমরা না খেলি, ছোট বোনটা আরেকটু বড় হলেই খেলতে পারবে তো।

আসবাব-পত্র সব বাড়িওয়ালার। কাপড়-চোপড় আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনের বেশি ছিল না। তবে লেপ, কম্বল, তোষক, বালিশ নিয়ে নেহাৎ কম মালপত্র হল না। বাবার আপিসের লোকের হেপাজতে সেসব মালপত্র ট্রাকে করে গৌহাটি গেল। সেখান থেকে বাবা লগেজ-ভ্যানে তোলাবার ব্যবস্থা করলেন। আমরা সেবিষয় কোনো চিন্তাই করিনি।

বন্ধুরা অনেকেই শীত পড়তেই নেমে গেছিল, কাজেই তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার দরকার হয়নি। দিদিমার দুই মেয়ের কলকাতায় বিয়ে হবে, তাঁরাও চলে গেছিলেন। কলকাতায় আমরা বিয়ে দেখতে যাব ভেবে বেজায় আনন্দ

হয়েছিল। ঐ এগারো বছর বয়স অবধি কারো বিয়ে দেখিনি, মরা দেখিনি। ঠিক যাবার মুহূর্তে মনটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ভোরে উঠে হেঁটে গেলাম মোটর অপিসে। সঙ্গে যে সামান্য জিনিস গেল, কুলি-মেয়েরা সেগুলি পিঠে ঝুলিয়ে নিল। এতদিন যারা আমাদের বাড়িতে কাজ করত, যাদের কাছে আমরা এত গল্প শুনেছি, এত যত্ন পেয়েছি, তারা কেউ কান্নাকাটি করল না। অনেকে বলত এরা বড় নির্বিকার হয়, যতদিন কাজ করল খুব ভালো করেই করল, কিন্তু কারো ওপর বা কিছুর ওপর এতটুকু টান জন্মায় না। জন্মালেও কখনো প্রকাশ করত না। মনে পড়ে ইল্‌বন ছাড়া কেউ আমাদের সঙ্গে খেলা করত না, হাসি-ঠাট্টা করত না, আদর করত না। আমাদেরও ওদের জন্য পরে মন কেমন করত না।

একবার যাত্রা শুরু হলে আর মন খারাপ করার অবকাশই রইল না। গত ছয় বছরের মধ্যে নদীর বাঁকে যেখানে সাঁকোর ওধারে ময়দার কল জলের স্রোতে ঘোরে, তার পরে কি আছে দেখতে যাইনি। তাছাড়াও দেখবার অনেক জায়গা ছিল। শিলং পীক থেকে পরিষ্কার দিনে সিলেটের বাড়ি-ঘর দেখা যেত। আমি অবিশ্যি দেখিনি। তবে আমাদের বাড়ির সামনে একটা বিশেষ জায়গায় দাঁড়ালে হিমালয় দেখা যেত। দিগন্তের কাছে মেঘের পরদা, তার ওপরে নীল আকাশে রূপোলী রঙে আঁকা পাহাড়ের ছবির মতো হিমালয় দেখেছিলাম। পৃথিবীর পাহাড় বলে মনে হত না। ভেবে আশ্চর্য লাগত যে দাদামশাই পায়ে হেঁটে ঐ পাহাড় পার হয়ে তিব্বত গিয়ে মানসসরোবর দেখে এসেছিলেন। দাদামশায়ের মুখে মা যেমন কিছু কিছু শুনেছিলেন, আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন। দুঃখের বিষয় সুরেশ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিমারণ্য' নামে দাদামশায়ের লেখা ভ্রমণকাহিনীর কপি রাখার কথা সে সময়ে কারো মনে হয়নি। আজ পর্যন্ত হিমালয়ের ছবি দেখলে, হিমালয়ের বর্ণনা পড়লে, হিমালয়ের নাম শুনলে পর্যন্ত, আমার না-দেখা দাদামশায়ের কথা মনে পড়ে। ভাবি যদি আর ছটা বছর বাঁচতেন, তার সঙ্গে আমার দেখা হত।

হিমালয়ের প্রতি আমার মনের ভাব যাই হোক, সেদিন মহাখুশি হয়ে আমরা শিলং পাহাড় আর হিমালয়দর্শন ছেড়ে নেমে এসেছিলাম। মন কেমন করার পালা শুরু হয়েছিল কলকাতার নতুনত্ব কেটে যাবার পর। রাতে শিলং-এর বাড়ি-ঘর, পাহাড়, হ্রদ, ঝর্না, ফুলগাছ, ফলগাছ, সরল-বনের স্বপ্ন দেখতাম। কাটা টন্‌সিলে ব্যথা করত।

সেদিন শুধু দুধারের বনভূমির অপূর্ব দৃশ্য দেখে উচ্চকিত, উচ্ছ্বসিত, হয়ে উঠেছিলাম। একেবারে নিরাপদে গৌহাটি পৌঁছয়নি। মাঝপথে নংপো। সেখানে ওপরের গাড়ি, নিচের গাড়ি পার করানো হত। ছোট একটা চা খাবার জায়গা আর বিশ্রাম-ঘর ছিল। ছোটবোনের নাম লতিকা, তার জন্য বাবা দুধ গরম করার

চেষ্টায় গেলেন। সঙ্গে ছিল বাবার ক্যাম্পে ব্যবহারের ছোট্ট স্পিরিট-ল্যাম্প। বাবা নিজে সব করতে ভালোবাসতেন ; তাই চায়ের ঘরে না বলে স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বেলে দুধ গরম করতে গেলেন। স্পিরিট-ল্যাম্প ফেটে গেল, দুধ নষ্ট হল, বাবার ভুরু পুড়ল, মেজাজ খিচড়ে গেল। চায়ের ঘর থেকে দুধ এনে লতিকাকে খাওয়ানো হল। খাবলা খাবলা ভুরু পুড়ে যাওয়াতে বাবাকে বেশ মজার দেখাচ্ছিল। বেজায় হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু হাসবার, কিম্বা অন্যদের দিকে তাকাবার সাহস পাচ্ছিলাম না। দুপুরে নিশ্চয় কিছু খেয়েছি।

বিকেলের আগে পাহাড়তলীতে পৌঁছলাম। দুপাশের নিচু পাহাড়গুলো সরে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে লাল টিনের ছাদ দেওয়া সুন্দর সুন্দর বাংলো-বাড়ি, দূরে দূরে চা-বাগান। তখন পৌষ মাস, এখানেও বেশ শীত আর শরীরের মধ্যে করে শীত বেঁধে নিয়ে এসেছি আমরা, গরম বোধ করার অবকাশও ছিল না।

ক্রমে চ্যাপ্টা পরটার মতো হয়ে গেল জমিটা। মাঝে মাঝে অপূর্ব সুন্দর একটা নদীর আভাসও পাওয়া গেল। তারপর মোটর অপিসে নামলাম। গৌহাটিতে আমরা নিতান্ত নির্বান্ধব ছিলাম না, আমাদের নিতে লোক এসেছিল। রাজুমামা, জিৎ, কিডি। বলাবাহুল্য রাজুমামা কিছু আমাদের নিজেদের মামা ছিলেন না। মা-বাবার বন্ধু এঁরা। রাজুমামা তখন কটন কলেজের প্রফেসর, পরে বোধহয় অধ্যক্ষও হয়েছিলেন। কিডির নাম সুজাতা, অনেক পরে যে সুজাতা চৌধুরী লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা হয়েছিলেন, তিনিই আমাদের আদরের কিডি, একটা পালকের মতো হাল্কা মিষ্টি মেয়ে। শিলং-এ ওরা ছুটি কাটাত, বাড়ি ভাড়া নিয়ে অনেকদিন থাকত, রোজ দেখাশুনো হত। রাজুমামা হলেন কটকের নামকরা ক্ষীরোদ রায়চৌধুরীর বড় ছেলে। সুখে দুঃখে দুই পরিবারের দেখাশুনো। নিজের মামা আবার কাকে বলে।

রাত কাটানো হবে রাজুমামার বাড়িতে, পরদিন সকালে আবার যাত্রা। মনে আছে মামীমা আমাদের জন্য বাড়ির সামনের চওড়া বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। তারপর গরম জল, হাতমুখ ধোয়া, কাপড়ছাড়া, কাপড় ছেড়ে সবাই মিলে বারান্দায় জলযোগ। তারপর একসঙ্গে জ্ঞান বড়ুয়াদের বাড়ি যাওয়া। তাঁরাও আমাদের চেনা বন্ধু। জ্ঞান বড়ুয়ার স্ত্রী ললিতা মালি বোধহয় অরু ঠাকুরের মেয়ে, মায়ের বন্ধু। তাঁদের ছেলেরা মনোভিরাম, নয়নাভিরাম, দেখতে রাজপুত্রের মতো সুন্দর, আমাদের খেলার সাথী। ললিতামাসি নামকরা চিত্রতারকা শর্মিলা ঠাকুরের দিদিমা। তাদের বাড়িতেও কত গল্প, কত হাসি। সাইকেল করে দোকানে গিয়ে জিৎ খুব ভালো ভালো বিস্কুট কিনে আনল। তারপর রাজুমামা উঠে পড়ে বললেন, "আর দেরি নয়, রাতে হাতি শিকারে যাব ভুলে গেলে নাকি। হাতি শিকার শুনে আমার বুকের রক্ত হিম। যেটাকে শিকার

করা হবে সেটা ক্ষ্যাপা হাতি কি না জিজ্ঞাসা করিনি, অতবড় অমন সুন্দর জানোয়ারটাকে কেউ গুলি করে মারবে শুনেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। রাজুমামা সেটা লক্ষ্য করে বললেন, "কি হল ? হাতি শিকারের নাম শুনেই মুখ গম্ভীর ? হাতির পায়ের নরম মাংস কাল যখন রেঁধে তোমাদের সঙ্গে দেওয়া হবে, তখন কিন্তু অন্য রকম মনে হবে। হাতির নখসুদ্ধ পা দিয়ে চমৎকার ছাতা-লাঠি রাখার স্ট্যাণ্ড্ হয়।" মন থেকে সব খুশি দূর হয়ে গেল।

বাড়ি এসে মাংস ভাত খেয়ে তাড়াতাড়ি শোয়া হল। রাজুমামার দল কখন এল, কখন গেলেন টের পেলাম না। শুয়ে শুয়ে কেবলি বলতে লাগলাম, "ভগবান, তুমি হাতিটাকে তাড়িয়ে দিও, ওরা যেন মারতে না পারে। তাড়িয়ে দিও, ভগবান !" কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। ভোরে যখন ঘুম ভাঙল, আমাদের জিনিসপত্র গোছানো হচ্ছে, আর রাজুমামা বেজার মুখ করে বলছেন "নাঃ, সব পণ্ডশ্রম, ব্যাটা কোথায় যে ভাগল বোঝা গেল না।" উঃফ্ ! কি যে খুশি হলাম। মনে মনে বললাম, "ভগবান তুমি বড্ড ভালো। আমি যা চাইলাম তাই দিলে !" ততদিনে উপাসনা-টুপাসনায় আমার মন না থাকলেও, ভগবানের ওপর আমার বেজায় আস্থা। স্কুলে নান্‌দের মুখেও শুনতাম—চাইলেই পাবে, দ্বারে করাঘাত করলেই দ্বার খুলবে ! বড় ভালো লাগত। এখন দেখলাম সত্যিই তাই। পরে অবিশ্যি আনেক সময়ই মনে হয়েছে ভগবানের ওপর ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজে নিশ্চেষ্ট থাকলে কিছুই হয় না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও উঠে-পড়ে লেগে যেতে হবে। বাস্তববাদী বন্ধু ঢের আছে, তাঁরা বলেন ঐটেই আসল কথা, ঐ উঠে-পড়ে লাগাটা। বাকিটা হল মনের দুর্বলতা, মনকে স্তোক দেওয়া। সে যাইহোক, সেদিন যে আমি গিয়ে হাতি তাড়াইনি, সেটা ঠিক।

পিছনের বারান্দায় একটা মরা বন-মোরগ পড়ে ছিল। ছিট-ছিট গা, ল্যাজে ময়ূরের পালকের মতো চোখ, মুরগির মতো বড়। তাড়াতাড়ি চলে এলাম। পাখিটা যদি কদাকার হত তাহলে আমার অত দুঃখ হত না। শুনলাম ওটাকে রোস্ট করে আমাদের সঙ্গে দেওয়া হবে, দুপুরের খাবার জন্য।

গৌহাটিতে ট্রেনে চড়লাম, পাণ্ডুঘাটে নামলাম। সেখানে ব্রহ্মপুত্রের ওপর জাহাজ বাঁধা ছিল। জাহাজ নয় ফ্ল্যাট্। দোতলা চমৎকার একটা জাহাজেরি মতো, কিন্তু তার এঞ্জিন নেই, অন্য জাহাজে টেনে নিয়ে যায়। সে জাহাজটার মাপ এর অর্ধেক। কি সুন্দর নদী ঐ ব্রহ্মপুত্র, ঢেউ তুলে, জল ছিটিয়ে, ছুটে চলেছে। আমরা দোতলার ডেকে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম। মনে হল দূরে নদীর বুকে থেকে এক পাহাড় উঠেছে। একজন বুড়ো ভদ্রলোক ছিলেন, বললেন ঐ উমানন্দ, ওখানে শিব মন্দির আছে। জায়গাটা ভারি বিপজ্জনক, মস্ত ঘূর্ণিজল আছে। পরে দাদামশায়ের লেখা, 'উদাসী সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ'

নামক বইতে ঐসব জায়গার বিষয়ে পড়েছিলাম। সেদিন তার চেয়েও চিত্তাকর্ষক জিনিস দেখে আর চোখ ফেরাতেও পারছিলাম না।

নদীর বুকে শুশুক মাছরা খেলা করছিল। মাছ বললাম বটে, কিন্তু তারা মাছ নয়, জলের জানোয়ার। চোখ দুটি কৌতুকেভরা, এই জলে ডুব দিল, পিঠখানি শুধু ভেসে রইল, মোলায়েম, মেটে, চকচকে। তারপরেই এক লাফে জল থেকে পাঁচ হাত উঠে পড়ল, গা থেকে টপটপ করে জল পড়তে লাগল, রোদ পড়ে মনে হতে লাগল যেন সোনার তৈরি। এমন অপরূপ দৃশ্য আমি কম দেখেছি। মনে আছে জাহাজে আমরা চা আর কেক্ খেয়েছিলাম। দুধ হয়তো পাওয়া যায়নি। শিলং-এ আমাদের $^৩/_৪$ পেয়ালা দুধে $^১/_৪$ পেয়ালা চা দেওয়া হত, আমরা ভাবতাম খুব চা খাচ্ছি। এখানে সত্যিকার চা দিল, খুব একটা ভালো লাগল না।

এপারে আমিনগাঁওতে জাহাজ থেকে নেমে আমরা আবার ট্রেনে চড়েছিলাম। সারা রাত ঐ ট্রেনে কাটল। রাতে একটা দারুন দুর্ঘটনা হতে হতে হল না। সেকালে ওদিককার গাড়ির দরজা বাইরের দিকে খুলত। বাঙ্কে শুয়ে একবার মনে হল কোনো স্টেশনে ট্রেন থেমেছে, একটা লোক দরজা ঠেলে ভিতরে মাথা ঢোকাল, জায়গা নেই দেখে আবার দরজা বন্ধ করে চলে গেল। দরজাটা বোধহয় ভালো করে বন্ধ হয়নি, ভিতর থেকে তো লক্ হয়ইনি।

আমার সব চাইতে ছোট ভাই যতি, বাবাকে ডেকে তুলে একবার বাথরুমে গেল। ওর জায়গা দরজার মুখোমুখি। গাড়িটা একবার জোরে ঝাঁকি দিয়ে থাকবে, ফলে দরজা আবার হাঁ হয়ে খুলে গেল আর যতিও ছিটকে বাইরে পড়ল। ওর তখন তিন বছর বয়স। স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে ওর ভীত 'মা মা' চিৎকার শুনে বাবা চেয়ে দেখেন গাড়িতে যতি নেই। চিৎকারটা বাইরে থেকে আসছে। ব্যস্ আর বলা কওয়া নেই, বাবাও খোলা দরজা দিয়ে লাফ দিলেন। যতি বাঁধের নিচে ধানক্ষেতে পড়ে তখনো চ্যাঁচাচ্ছিল, গাড়ি থেকে আলো পড়ছিল, বাবা ছুটে গিয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। যতি বলছিল, "মাকো পাস্! মাকো পাস্!" মা প্রায়ই বলতেন 'রাখে হরি, মারে কে!' এও দেখলাম ঠিক তাই। আমি প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। দাদা জেগে গিয়ে দেখতে পেয়ে, এমনি হট্টগোল লাগাল যে আমার ভাই সরোজ ছাড়া গাড়িসুদ্ধ সকলে উঠে বসল। চেন টানা হল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেমে গেল। হৈচৈ, হাঁক-ডাক। আমরা স্তম্ভিত। হঠাৎ বাবার গলা শুনলাম, বোধহয় ফিরিঙ্গি গার্ডকে ইংরিজিতে বলছেন, "ঠিক আছে, এই ছেলেটা পড়ে গেছিল।"

তারপরেই বাবা যতিকে কোলে নিয়ে গাড়িতে এসে উঠলেন। মায়ের ফর্সা মুখ বরফের মতো সাদা হয়ে গেছিল। মুখে একটিও কথা বলেননি। সেইখানে মিনিট কুড়ি দেরি হল। তারপর যখন আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ

করল, ভগবানকে বললাম, "তুমি বড় ভালো, ভগবান। কাল হাতি তাড়ালে, আজ আবার যতিকে বাঁচালে!"

যতদূর মনে পড়ে বেলা ১১টা নাগাদ আমরা শিয়ালদা পৌঁছলাম। স্টেশনে চাঁদের হাট। ছোট জ্যাঠামশাই এসেছেন, বড়দা এসেছেন, মণিদা এসেছেন, আরো কারা কারা যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন। কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব হচ্ছিল। গাড়ি থেকে নেমেও মনে হচ্ছিল পায়ের তলার মাটিটা দুলছে, চলছে; কানে তালা লেগে যাচ্ছিল।

তিন-চারটে ঠিকে গাড়ি করে আমরা ১০০ নং গড়পার রোডে গেলাম। প্রায় পঞ্চাশ বছর ঐ বাড়ির কাছে যাইনি, কিন্তু সেদিনের সেই প্রথম দেখার ছবিখানি মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। তার মাত্র পাঁচ-ছয় বছর আগে বাড়ি তৈরি হয়েছিল। আমরা ছোটবেলায় এসে জ্যাঠাইমার সঙ্গে গিয়ে জমি দেখে এসেছিলাম। একপাশে কালা-বোবাদের স্কুল; অন্যপাশে এথিনিয়ম ইন্সটিটিউশন বলে ছেলেদের স্কুল; মধ্যিখানে সাদা ধবধবে বাড়িটি। সামনেটাতে বোধহয় একটু ফিকে গোলাপী ভাব ছিল, তার ওপর সাদা একটা পদ্মফুল আঁকা। আছে হয়তো এখনো। নাকি স্বপ্নে দেখেছিলাম?

বাড়ির সামনের দিকটাতে একতলায়, দোতলায়, ছাপাখানা ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্সের কার্যালয়। আমরা পাশের ছোট দরজা দিয়ে ঢুকে, গলি পার হয়ে, খাবার-ঘরের পাশে, দোতলায় উঠবার সিঁড়ির সামনে পৌঁছলাম। সেই সিঁড়ি তিন-তলা অবধি উঠে গেছিল। ধুপধাপ করে কত উঠেছি, নেমেছি, বকুনি খেয়েছি। সিঁড়ির আকর্ষণ অভ্যাস হতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল।

দোতলায় জ্যাঠাইমা আর বৌঠান ছিলেন, মণিদার স্ত্রী মেজ-বৌদিও নেমে এলেন। জ্যাঠাইমাকে চিনতে পারছিলাম না। থান-পরা, পাকা চুল, দুঃখী-মুখ, ছোট্রখাটো এই মানুষটিই কি আমাদের সেই জ্যেঠিমা, যিনি আমার মাকে মানুষ করেছিলেন? চার বছর হল জ্যাঠামশাই চোখ বুজেছেন, এই সময়টুকুর মধ্যে জ্যাঠাইমা অন্য মানুষ হয়ে গেছিলেন। সংসার থেকে নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিয়েছিলেন। আর তিনি এবাড়ির কর্ত্রী ছিলেন না। সংসারের দায়িত্ব দুই বৌয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। নিজের মধ্যে গুটিয়ে একেবারে এত্তটুকু হয়ে গেছিলেন।

এখন ভাবলে দুঃখ হয় যে জ্যাঠাইমার বয়স তখন বড়জোর বাহান্ন-তিপান্ন বছর। বুড়ো হবার বয়সই নয় সেটা। কিন্তু একটা মানুষের অভাবে তাঁর জীবনের কাজ ফুরিয়ে গেছিল। যদি পুজো-আচ্চা নিয়ে থাকতে পারতেন, যদি শিলং-এর দিদিমার মতো স্কুলের মেয়েদের পড়াতেন, কিম্বা নিজের বিমাতা কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর মতো ডাক্তারি করতেন, কিম্বা স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে

পড়তেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমার জ্যাঠাইমার জীবন এত শীঘ্র এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেত না। যে মানুষটি নিজের এবং পরের এক বাড়ি ছেলে-মেয়ে নিয়ে এত বড় সংসারটা একা হাতে দক্ষভাবে চালাতেন, তাঁর কপালের এই ব্যর্থতার কথা ভাবলেও কষ্ট হয়। কি চমৎকার রাঁধতেন, কত রকম কাজ জানতেন। পরবর্তীকালে আমার মাকে, আমার বড়দি সুখলতাকে, আমার মেজদি পুণ্যলতাকে দেখে বুঝতে পারি কি অসাধারণ কাজের মানুষের কাছে তাঁরা মানুষ হয়েছিলেন।

॥ ১২ ॥

অত বড় বাড়িটা একেবারে গম্‌গম্ করত। একে তো একতলার ছাপাখানার একটানা একটা ঝমঝম শব্দ সারাদিন শোনা যেত, প্রেসের লোকরা সমস্তক্ষণ সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করত, তার ওপর বাইরের বন্ধু-বান্ধব অনবরত আসা-যাওয়া করতেন। আমরা আটটা ভাইবোন আর মা যে তার মধ্যে কেমন অনায়াসে মিলে গেলাম, এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আমাদের আগমনে কারো কারো নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু সুখের বিষয় সেটা টের পাবার বা সন্দেহ করবার বয়স আমাদের হয়নি।

একতলায় সিঁড়ির পাশে খাবার ঘর, তার পেছনে একটা শোবার ঘর, সেখানে ছোট জ্যাঠামশাই শুতেন আর লেখা-পড়া করতেন। মেজ জ্যাঠামশায়ের ছোট ছেলে নান্‌কুদাও ঐ ঘরে বসে মোটা মোটা বই পড়ত। সে ইতিহাসে এম এ দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ফর্সা, বেজায় রোগা মানুষটা, খামখেয়ালে মাথাটি ঠাসা, আমাদের অনেকদিনের বন্ধু। পড়াশুনোর ঘরই ওটা। ছোট জ্যাঠা ছোটদের উপযুক্ত করে ইংরিজি থেকে নামকরা সব বই বাংলায় অনুবাদ করতেন। এত ভালো অনুবাদ খুব বেশি দেখিনি। আর কি সব বই, কোনান ডয়লের শার্লক হোম্‌সের বিচিত্র কীর্তিকাহিনী, বাস্কার ভিলের কুক্কুর; জুল ভের্ণের আশ্চর্য দ্বীপ ইত্যাদি যত সব রোমাঞ্চময় কাহিনী। তাঁর লেখা দেশী-বিদেশী পৌরাণিক গল্পের কথা তো আগেই বলেছি। ঝরঝরে সহজ কিন্তু বিশুদ্ধ বাংলা, মূল গ্রন্থের সমস্ত রসটি রক্ষা করে, নদীর স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। সে বাংলা এখন কেউ লেখে না কেন? তার ওপর সরকারি আর্ট স্কুল থেকে পাস্ করা শিল্পীও ছিলেন। নিজের হাতে প্রায় প্রমাণমাপের ফটো এন্‌লার্জমেন্ট করে, তাতে রঙ দিতেন। অনেক বিখ্যাত মানুষের প্রতিকৃতি করেছিলেন, যতদূর মনে পড়ে তার মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছবিও ছিল। আশুতোষ জ্যাঠামশাইকে খুব স্নেহ করতেন। তেমনি করতেন নাটোরের বুড়ো মহারাজা। জ্যাঠামশাই নাম করা ক্রিকেটার ছিলেন, নাটোরের দলেও খেলতেন।

তবে এসমস্ত সর্বজনস্বীকৃত গুণের জন্য আমরা ছোট জ্যাঠামশাইকে এত ভালোবাসতাম না, তাঁর ওপর এত রাগও করতাম না। আসলে জ্যাঠামশাই তাঁর সব ভাই-বোনদের ছেলেমেয়েদের আপনার বলে জ্ঞান করতেন। কাজেই তাদের গুণ দেখে যেমনি খুশি হয়ে পাঁচ জায়গায় বলে বেড়াতেন, তাদের দোষ দেখলে তেমনি চটে গিয়ে বকেঝকে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। বেজায় মাছ-ধরার শখ ছিল, তাঁর কাছে কত যে গল্প শুনতাম তার ঠিক নেই।

তবে কলকাতায় পৌঁছবার পরদিনই তাঁর স্বভাবের যে-দিকটা প্রকাশ পেয়েছিল, এখন সেটার কথা ভেবে যতটা আশ্চর্য হই, তখন মোটেই হইনি। আমরা এসে পৌঁছেছিলাম বোধহয় বড় দিনের আগের দিন, ১৯১৯ সালের ২৩শে কি ২৪শে ডিসেম্বর। জ্যাঠামশাই বিকেলে জলখাবার খাবার সময় বলে গেলেন, "কাল বেলা তিনটের সময় ঐ ছোটটা বাদে বাকি সবকটাকে নিউ মার্কেট দেখাতে নিয়ে যাব। বড়দিনের নিউ মার্কেট একটা দেখবার জিনিস।"

চোদ্দ থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সের, আরেকজনের সাতটা আনাড়ি ছেলেমেয়ে নিয়ে বড়দিনের ভিড়ে ট্রামে করে নিউ মার্কেট বেড়াতে যাওয়াকে আমি দুঃসাহসিক অভিযান বলি এবং যে করে তাকে আমি বীরপুরুষ বলি। জ্যাঠামশাই বীরপুরুষ ছিলেন, বেঁটেখাটো, তামাটে গায়ের রঙ, গায়ে এক কাঁচ্চাও মেদ ছিল না, ৭৪ বছর বয়স পর্যন্ত রোদে জলে খুরখুর করে সারা শহর চষে বেড়াতেন, সক্কলের খোঁজ নিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষটি, পরিপাটি বেশভূষা, নিজের জুতো নিজে চক্‌চকে করে পালিশ করতেন। বাবার চাইতে তিন-চার বছরের বড় হয়তো, কিন্তু বাবাকে বেজায় ভয় পেতেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে সিগারেট খেতেন! লোকজন ভালোবাসতেন, গান-বাজনা ভালোবাসতেন। কার ছেলের গলা ভালো, তার জন্য গানের মাস্টার রাখা উচিত, কে আঁকে ভালো, তাকে শেখানো দরকার। এইসব নিয়ে ছিল তাঁর ভাবনা। যেমনি ভালোবাসতাম তেমনি রাগে গা জ্বলে যেত। সক্কলের সব খবর রাখতেন এবং কোনোটাই গোপন করতেন না। কারো কিছু ভালো হলে আহ্লাদে আটখানা হতেন, যেন ওঁরই কোনো সৌভাগ্য লাভ হয়েছে এমনি ছিলেন আমার ছোট জ্যাঠামশাই।

পরদিন তিনটের সময় বেরিয়ে সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে হাঁটিয়ে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে ট্রামে চড়ালেন। এসপ্ল্যানেডে নামিয়ে বললেন, "ঐ দ্যাখ্ ঐদিকে হাইকোর্ট!" বলে কেন জানি একটু মুচকি হাসলেন। হাইকোর্ট দেখতে পেলাম না। তবে লাটসাহেবের বাড়ির ফটক, গম্বুজওয়ালা বাড়ি দেখে অবাক হলাম। আরেকটা আশ্চর্য জিনিসও দেখালেন, এস রায় অ্যাণ্ড সন্স সাইনবোর্ড লেখা একটা দোকান। নাকি বড় জ্যাঠামশায়ের দোকান, খেলার সরঞ্জাম বিক্রি হয়। আগেও

শুনেছিলাম এর কথা, এখন চোখে দেখে কৃতার্থ হলাম।

আগেকার ট্রামে যাত্রীদের লম্বা লম্বা বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসতে হত, কন্‌ডাক্টর পাদানিতে ঝুলে ঝুলে চলাফেরা করত। চৌরঙ্গীর ট্রাম অনেকটা আজকালকার ট্রামের মতো। এই পাড়ায় আমার জীবনের বেশির ভাগটাই কাটল, কিন্তু সেই প্রথম দেখাটি এখনো চোখে লেগে আছে। তখন কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথঘাট, পুকুরের ধারে ফুলগাছ, ফুটপাথে কৃষ্ণচুড়োর সারি, ভারি ছিমছাম বড়লোকি ভাব একটা। মোড়েই সেকালের বিখ্যাত হোয়াইট্‌ অ্যাওয়ে লেড্‌ল-র মস্ত দোকান। এখন যার একতলায় ইউ-এস-আই-এস হয়েছে।

ব্রিস্টল হোটেল, গ্র্যাণ্ড হোটেল, কন্টিনেন্টেল হোটেল, ফার্পো রেস্তোঁরা, সাহেবী ব্যাপার সব; দু-একজন বেজায় বড়লোক বিশিষ্ট খোদ্দের ছাড়া দোতলায় উঠতে হলে ডিনার স্যুট পরতে হত। রাজাদের, বড়লোকদের আর সাহেবদের ব্যবস্থা এখানে। আজকাল তার কিছুই নেই। দোকানদাররাই আজকাল রাজা বড়লোক সাহেব। সে যাইহোকগে, সত্যি কথা বলতে কি ওতে আমার কিছু এসে যায় না, কারণ আমি যাদের পছন্দ করি তাদের বেশিরভাগই নাচে গায় নাটক করে ছবি আঁকে আর লেখে। বড়লোক কোথায় পাব!

লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটের মোড়ে গুণে গুণে সাতটাকে তো নামালেন। তারপর রাস্তা পার করিয়ে, হাঁটিয়ে নিয়ে চললেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চললাম। এত ঐশ্বর্য স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। এখনকার তুলনায় যানবাহন খুব কম ছিল, তাই বাঁচোয়া। নিউ মার্কেটে ঢুকে হকচকিয়ে গেলাম। একি পরীদের দেশ? প্রায় বারো বছর বয়স, ইংরিজি সাহিত্যের মেলা বই পড়ে ফেলেছি, কিন্তু কাপড় গয়নার চোখ ফোটেনি! শুধু একটি প্যাসেজ্‌ই মনে পড়ে। তার সঙ্গে স্বর্গের কোনো তফাৎ নেই। নাহুম ইত্যাদির দোকানের সামনে দিয়ে যে পথ গেছে, সেকালে তার দুধারে সারি সারি কেক্‌ প্যাটিসের দোকান ছিল। বাস্তবিক দেখবার জিনিস। বড়দিন উপলক্ষ্যে তারা দোকানের বাইরে নিচু নিচু টেবিলে চিনি আর বাদামের তৈরি সাজ দেওয়া কেক্‌ পেস্ট্রি আর চকোলেট সাজিয়ে রেখেছিল। শিলং-এ মোরেলোর কেকের দোকান ছিল অভিজাত ব্যাপার। খুব ভালো কেক পেস্ট্রি হত। এখনকার ফ্লুরি ট্রিঙ্কার চাইতে ভালো বই মন্দ না। কিন্তু এভাবে ঢালাও সাজানো থাকত না। দেখে মনে কেমন বে-পরোয়া ভাব জাগছিল। এবং শুধু আমাদের নয়, ছোট জ্যাঠামশায়েরও। বললেন "কোনটা চাস্‌, বল্‌।" তারপর সাদা সাদা বাক্সে ভরে আমরা যা চাইতে লাগলাম, তাই কিনে কিনে আমাদের হাতে দিতে লাগলেন। তখন অবিশ্যি নিউ মার্কেটের কেকের দাম ছিল্‌ বারো আনা-এক টাকা পাউণ্ড; আবার তেমনি ছোট

জ্যাঠামশায়ের বেশি টাকা-কড়ির বালাই ছিল না। কিন্তু হৃদয় এবং হাত ছিল উদার।

লজঞ্চুস খেলাম, চকোলেট খেলাম, জীবনে এই প্রথম আইসক্রীম খেলাম। তখনো এবং এখনো ভাবি এমন জিনিস হয় না। তারপর বোধহয় সব নেতিয়ে পড়তে লাগলাম। কারণ যতিকে জ্যাঠামশায় কোলে নিলেন। দাদা সরোজের হাত ধরল, বাকিরা হোঁচট খেতে খেতে চললাম।

বাবা হলে বকাবকি করে ভূত ভাগিয়ে দিতেন, অবিশ্যি এতগুলোকে নিয়ে মার্কেটে বেড়াতে আসতে রাজিই হতেন না তাও সত্যি। জ্যাঠামশাই একবারো বিরক্ত হলেন না। বেরিয়ে এসে একটা ফীটন গাড়ি ডেকে, গাদাগাদি করে আমাদের তুলে, ১০০ নং গড়পারে নিয়ে গেলেন। স্তম্ভিত মুখে চক্‌চকে চোখে সেখানে যখন নামলাম, মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগলাম। তারপর ৫৭ বছর কেটে গেছে, সেই পরীদের নিউ মার্কেটটাকে আর খুঁজে পাইনি। এখন আমরা সেখানে গিয়ে মাছ মাংস ডিম তরকারি আর বাদাম তেল কিনে, রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে ফিরি। বলেছি না কোনো জায়গা, কোনো মানুষ পুরোপুরি মাটি দিয়ে গড়া হয় না, খানিকটা করে মনগড়াও বটে।

গড়পারের বাড়ির খাবার ঘরের ওপরেই বসবার ঘর। সেখানে বড়দার বৌঠানের কাছে কারা আসতেন ভাবতে চেষ্টা করি। কালিদাস নাগ, কালিদাস রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে কেদার চট্টোপাধ্যায়—কি যে সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর, হাঁ করে দেখতাম। আরো আসতেন শিরিকুমার দত্ত, অমল হোম, কত নাম করব। আমাদের সঙ্গে তো আর কারো আলাপ করিয়ে দেওয়া হত না। বরং বড়দের রোমাঞ্চময় কথা শুনবার আশায় যদি বা কাছাকাছি ঘুর ঘুর করে বেড়াতাম, পত্রপাঠ আমাদের তিন তলায় পাঠিয়ে দেওয়া হত।

তিনতলায় তিনটি ঘর, একটা ছোট ছাদ আর একটা মস্ত ছাদ। একটা ঘরে মণিদা অর্থাৎ সুবিনয় আর মেজবৌদি আর তাঁদের সুন্দর ছেলে ধন থাকত। একটা বড় ঘর খালি পড়ে থাকত। খালি পড়ে থাকত বলা ঠিক নয়, সেখানে বড়-বৌঠানের বোন কনক দাশ, অর্থাৎ কনক বিশ্বাস ; মেজবৌদির চারজন সুন্দরী অনূঢ়া বোন, সবার ছোটটি আমাদের বয়সী ছিল, তার নাম ছিল নেলি। ভারি সুন্দর চেহারা তার, পরে তার ভক্তরা বলত সুইট্‌ নেল্‌ অফ্‌ ওল্ড ড্রুরি। তাকে দেখতে আমাদের ভারি ভালো লাগত, একটুও হিংসে হত না, যেমন ছোটবেলায় নোটনকে দেখে হত। কারণ এখন আর কেউ আমাদের কালো বলত না, আর সত্যি কথা বলতে কি সেরকম কালো ছিলামও না। কিন্তু নোটনের পাশে দাঁড়ালে শতকরা নব্বুই জন মেয়েকেই কালোকুচ্ছিৎ দেখাত।

এই সত্যটা মেনে নিয়েছিলাম। চেহারা নিয়ে আর কখনো মনে কষ্ট পাইনি, তবে এখনো মাঝে মাঝে ভাবি মা ফর্সা ছিল, দিদিমা ফর্সা ছিল, ঠাকুরমারও বেশ পরিষ্কার রঙ ছিল, ঠাকুর্দা নাকি ধবধবে ফর্সা ছিলেন—তাহলে দিদিকে আমাকেও ফর্সা করতে ভগবানের কি এমন অসুবিধা হত। এসব কথা বললে মা রেগে যেতেন, বলতেন "তোমাদেরি বা কি এমন অসুবিধাটা হচ্ছে ?" বলতেন বটে, কিন্তু আমাদের জন্য কাপড় কিনতে গেলে গোলাপী, গেরুয়া, ফিকে হলুদ, ঘি-রঙ, ফিকে বেগুনী ছাড়া কিনতেন না। বলতেন "মানাবে না।" তবে আরেকটু বড় হয়েই বাবার সঙ্গে গিয়ে নীল, সবুজ, যা খুশি কিনে আনতাম। আমাদের পিসতুতো দিদি মালতী, যার অপূর্ব গানের গলা এখন পর্যন্ত টস্‌কায়নি এবং যাকে সবাই মালতী ঘোষাল বলে জানে সেও ছিল ওদের সম-বয়সী বন্ধু, সে-ও মাঝে মাঝে এসে ২-১ দিন কাটিয়ে যেত। তখন তিন তলার বড় ঘরে ওদের জন্য মাটিতে মস্ত বিছানা পাতা হত। আমাদের চাইতে সব ৫-৭ বছরের বড়, কলেজে পড়ে, ইয়ং-ম্যানদের গল্প করে। ওরাও আমাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিত না। বলত, "দেখেছ, ভারি জ্যাঠা হচ্ছে !"

অগত্যা তিন তলার বাকি ঘরটায় আশ্রয় নিতাম। সেখানে নান্‌কুদা শুভ আর ছোট জ্যাঠামশাই বড় ঈজেলে ফটো এন্‌লার্জমেণ্টে রঙ দিতেন। দেয়াল আলমারিতে বই ঠাসা ছিল। সে যে কত রকম বই সে আর কি বলব। নান্‌কুদা কিম্বা ছোট জ্যাঠামশাই কখনো আমাদের ভাগিয়ে দিতেন না। বরং মনে হত খুশিই হতেন। কত যে গল্প হত তার ঠিক নেই।

একবার ঝড়ের রাতে একটা প্যাঁচার বাচ্চা ডানা ভেঙে বড় ছাদে পড়ল। কারো অসুখ করলে, ব্যথা লাগলে, নানকুদা অন্য মানুষ হয়ে যেত। অমনি প্যাঁচাটাকে তুলতে গেল। প্যাঁচা বড় বড় চোখ পাকিয়ে, ঠোঁট বাগিয়ে, নখ উঁচিয়ে, ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ শব্দ করতে লাগল। বোঝাই যাচ্ছিল ডানা জখম হয়েছে, উড়তে পারছে না। সাহায্য না পেলে মরেই যাবে।

আমরা সবাই ব্যাকুল হয়ে উঠলাম, তাহলে কি করা যায় ? কাউকে তো কাছে যেতে দিচ্ছে না। নান্‌কুদা সাত-পাঁচ ভেবে, একতলায় নেমে গিয়ে বাগান থেকে লম্বা একটা কাঠি নিয়ে এল। আমরা একটু দূরত্ব রেখে, গোল হয়ে দেখতে লাগলাম। কাঠি দিয়ে নান্‌কুদা প্যাঁচার গলায় সুড়্‌সুড়ি দিতে লাগল। একটু পরে দেখা গেল আরামে প্যাঁচার চোখ বুজে আসছে, গলা পেতে দিচ্ছে, ঠোঁট বন্ধ করেছে, নখ নামিয়েছে।

পরে যখন নান্‌কুদা ওকে কোলে নিয়ে চুন-হলুদ লাগিয়ে ডানা ব্যাণ্ডেজ করে দিল, প্যাঁচা কিচ্ছু বলল না। একটা বড় জুতোর বাক্সে তার বিছানা করা হল। পরদিন আরো খানিকক্ষণ সুড়সুড়ি দিয়ে, ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে দিয়ে, আবার

চুন-হলুদ লাগানো হল। তিন দিন ছিল প্যাঁচাটা, কিন্তু কিচ্ছু খেত না। বোধহয় জ্যান্ত জানোয়ার ছাড়া ওরা খায় না। রাতে খোলা জানলার পাশে রাখা হত। চতুর্থ দিন সকালে দেখা গেল পাখি উড়ে গেছে।

এর অনেক বছর পরে হাজারিবাগে নান্‌কুদার মেজদি পুণ্যলতা চক্রবর্তী, যাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইখানির মতো ভালো বই বাংলায় কম আছে—তাঁর বাড়িতে ছুটি কাটাতে গিয়ে, এই ধরনের আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল। রেলের বাঁধের ওপর বেড়াতে গিয়ে নান্‌কুদা দেখে একজন গরীব লোক লাইনের পাশে বসে কাঁদছে।

কি ব্যাপার ? না, ওর পায়ে কেউটে সাপে কামড়েছে। কখন কামড়েছে ? না, এক্ষুনি। নান্‌কুদার বেড়ানো মাথায় উঠল। তৎক্ষণাৎ রুমাল দিয়ে সাপের কামড়ের দাগের ওপর এঁটে বেঁধে রক্ত চলাচল বন্ধ কবল। তারপর বাঁধের নিচে মেজদির বাড়ি নিয়ে গিয়ে, পেন্‌সিল কাটা ছুরি দিয়ে কামড়ের দাগের ওপর চিরে, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে, টঙায় চাপিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানকার ডাক্তার সব ব্যাপার শুনে বললেন, "সবাই যদি আপনার মতো হত মশাই, আমাদের ব্যবসা উঠে যেত !"

এই রকম মানুষ ছিল নান্‌কুদা, অথচ ওদিকে নিজের শরীর নিয়ে সে কি পুতু-পুতু বাই ! আমরা খুব বকতাম।

ঐ তিনতলার বড় ঘরে যারা শুত, তাদের দেখা পাবার আশায়, বসবার ঘরে কম-বয়সী জনা পাঁচেক অতিথিও ঘুর ঘুর করত। তারা কেউ কেউ বেঁচে আছে বলে আর নাম করলাম না। এটা বুঝতেও আমাদের দেবি লাগল না। কারণ শিলং-এ কন্‌ভেণ্টের ফিরিঙ্গি সহ-পাঠিনীরা এবিষয়ে আমাদের সযত্নে পাঠ দিয়েছিল।

এরা গোড়ায় হয়তো এসেছিল বড়দার টানে, তারপর আবিষ্কার করেছিল যে এ বাড়িতে অন্য আকর্ষণীয় বস্তুও আছে। তবে সেকালের ব্যাপার তো, একটু হাসি, দুটো কথা পর্যন্ত দৌড়, একসঙ্গে বেরুবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। রঙ্গমঞ্চে নামবার অধিকার না পেলেও, উইংস্‌ থেকে আমরা মজা দেখতাম। এরা সবাই নিতান্ত অযোগ্যও ছিল না। পরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ছোট ভাই প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ, আমাদের বড় আদরের বুলাদা, ছোট জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে মাধুরীলতাকে বিয়ে করেছিল। চোদ্দ বছর আগে ৬৩ বছর বয়সে বুলাদার মৃত্যু হলে আমরা একজন প্রকৃত ভালোবাসার মানুষকে হারালাম।

দোতলায় বসবার ঘরের পাশে বড়দার ঘর, তাছাড়া তার সামনে আরো দুটি ঘর। একটিতে জ্যাঠাইমা থাকতেন, আরেকটিকে ড্রেসিং-রুম হিসাবে ব্যবহার

করা হত। এই দুটি ঘরে আমরাও জায়গা পেয়েছিলাম।

তবে খুব বেশিদিন দিদি আর আমি থাকিনি ওখানে। দাদা, কল্যাণ অমনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। সেখানে যে বেজায় ভালো পড়ানো হত সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। ওরা গড়পার থেকে হেঁটে স্কুলে যেত। বাবাকে ততদিনে শিলং-এ ফিরে যেতে হয়েছিল, যামিনীদা প্রথম দিন দুই ওদের পৌঁছে দিয়েছিল, তারপর ওরা কলকাতার ছেলে হয়ে গেল। পড়াশুনোয় দুজনেই খুব ভালো ছিল।

মা-র শরীর ভালো যাচ্ছিল না, কিড্‌নি স্টোন হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন: আমাদের বড় জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। বাস্তবিক একাধারে গণিতে ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি বেশি দেখা যায় না। জ্যাঠামশাই আয়ুর্বেদী ওষুধ দিয়ে মায়ের কিড্‌নি স্টোন গলিয়ে দিয়েছিলেন। আর কখনো মাকে ঐ নিয়ে কষ্ট পেতে হয়নি।

কথা ছিল আমরা ভবানীপুরে বাড়ি ভাড়া করে থাকব। দাদা ওপরের ক্লাসে পড়ে ও হেয়ার স্কুলেই থেকে যাবে। বাকীরা ভবানীপুরের কোনো স্কুলে পড়বে। দিদি আমি তো ডায়োসেসানে ভর্তি হয়েই গেছি। স্কুল খুলবে জানুয়ারির ১০-১২ই।

মায়ের অসুখের জন্য এই ব্যবস্থার কিছু দেরি হল। দিদিকে আমাকে ডায়োসেসানের বোর্ডিং-এ তিন মাস থাকতে হয়েছিল। মনে আছে খুব কষ্ট হয়েছিল। একেবারে নতুন পরিবেশ। কাউকে চিনি না; স্কুলে বাঙ্গালী শিক্ষিকাই বেশি হলেও, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রটেস্টাণ্ট খ্রীশ্চান, তবে মিশনারি স্কুল, পরিচালনা করেন নান্‌রা। তাঁরা রোমান ক্যাথলিকদের ওপর হাড়ে চটা; কনভেন্ট থেকে কেউ এসে ভর্তি হলে কথায় কথায় খোঁটা দিতে ছাড়েন না।

পরে এই স্কুলে কলেজে আমার কৈশোর ও প্রথম যৌবন কত সুখে কেটেছিল সে আর বলতে পারি না। কত বন্ধুবান্ধব, সত্যিকার জ্ঞানী কত শিক্ষিকা। কনভেন্টে দু-তিন জন নান্ ছাড়া সত্যিকার জ্ঞানী কাউকে পাইনি। এখানে কত ভালো অঙ্ক শেখানো হত; তবে বাবার মতো কেউ না।

বোর্ডিং-এ একটা জিনিস একেবারে অন্তর পর্যন্ত পীড়া দিত, সেটি হল সব সময় চারদিকে লোক। নিরিবিলি এক মুহূর্তও পেতাম না। স্নানের ঘরে ছাড়া সব সময় আমাদের ওপর লোকের চোখ। খাওয়া ভালো ছিল না, তাতে কোনোই কষ্ট হত না। শনি-রবি গড়পারে গিয়ে ভালো-মন্দ খেতাম। কিন্তু ঐ সারাক্ষণ অচেনা লোক দিয়ে বেষ্টিত থাকার যে কি জ্বালা, সে আর কি বলব। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, অনেকেরই এতে কোনো অসুবিধা হত না। দিদি অনেকদিন পরে আবার এর পুরনো অভ্যাসের স্মরণ নিল। থেকে থেকেই চোখ

মুছত। অবিশ্যি ফোঁৎ-ফোঁৎ করত না।

আরেকটা অসুবিধাও ছিল। জীবনে এই প্রথম ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করলাম না। ওখানে মাসে মাসে রিপোর্ট দিত। ক্লাসের কাজে রোজ নম্বর দিত, মাঝে মাঝে টেস্ট হত। সব বিষয়ে ভালো ছিলাম, শুধু বাংলায় চল্লিশের ঘরে। আমি যে ছয় বছর বয়স থেকে মনে মনে জানি বাংলায় লেখা ছাড়া আমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না, তাকে কি না পণ্ডিতমশাই বললেন, 'কি, বিলেত থেকে এয়েচ বুঝি ?'

॥ ১৩ ॥

শনিবার রবিবার দুদিন ছুটি থাকত, আমরা ১০০ নং গড়পারে যেতাম, যামিনীদা আমাদের শনিবার বেলা এগারোটায় নিতে আসত। আমরা সেই মুহূর্তটির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। পারলে শুক্রবার বিকেলেই চলে যেতাম। কিন্তু বোর্ডিং-এর নিয়ম ছিল শনিবার সকালে ৯টা থেকে ১০-৩০টার মধ্যে নিজেদের জামা-কাপড় কোথায় কি ছিঁড়েছে, সব মেরামত করতে হবে। তার আগে কাউকে ছাড়া হবে না। তখন রাগ ধরত, এখন বুঝি নিয়মটি বড় ভালো ছিল। একেক দিন যামিনীদা দেরি করে আসত, দিদির চোখ দিয়ে জল পড়ত। আমার নেই – টনসিলে ব্যথা করত। বোর্ডিং-এ কেউ আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত না, তবু ঐ ছাড়া পাবার মুহূর্তটির সে কি আনন্দ !

ল্যান্সডাউন রোড আর এলগিন রোডের মোড়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চার্চ অফ সেন্ট জন্ দি ব্যাপটিস্টের ক্লুয়ার সিস্টারদের মস্ত বড় প্রতিষ্ঠান। এলগিন রোডের ওপর কলেজ, নিচের তলায় ক্লাস, ওপরে কলেজের হস্টেল। মস্ত বাগান ; ফুলগাছ, আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বাতাবিলেবুর গাছ ; দুটি টেনিসকোর্ট ; স্কুলবাড়ি, মিশন স্কুল। ভিতর দিকে আরেকটা হস্টেল, সে এক এলাহি ব্যাপার ছিল। কিন্তু ঐ যে বললাম তার মধ্যে নিজেকে নিয়ে একান্তভাবে বসবাব একটু অবকাশ ছিল না। মস্ত হলে শোয়া, সারি সারি লোহার স্প্রিং-এর খাটে, ছোট মেয়েদের থেকে বড় মেয়েরা সব একঘরে শুত। জনা দুই নিচেব ক্লাসের শিক্ষিকাও শুতেন। পাশের ছোট শোবার ঘরে স্কুল-বিভাগের অধ্যক্ষা সিস্টার জর্জিনা শুতেন। ভারি গুণী, ভারি কড়া, ভারি বুদ্ধিমতী কিন্তু কনভেন্টের নান্‌দের সেই ক্ষমাশীল কোমলতার একটুও ছিল না। তার ওপর রোমান ক্যাথলিকদের কাছে এতকাল লেখাপড়া শিখেছি বলে কেবলি খোঁটা দিতেন। চমৎকার ইংরিজি সাহিত্য পড়াতেন ; চার্লস্ ডিকেন্সের সংক্ষিপ্ত সব উপন্যাস, দি ক্রিকেট অন্ দি হার্থ, খৃস্টমাস স্টরিজ্ ইত্যাদি। কন্‌ভেন্টে কেউ আমাদের এমন করে রস পরিবেশন করেনি। লিখতে-টিখতে দিলে ভালোই লিখতাম, তবু মন

পেতে এক বছর সময় লেগেছিল। তারপর তাঁর কাছেই অজস্র স্নেহ পেয়েছি। ভেবে ভারি মজা লাগত যে ক্যাথলিক নান্‌রা কখনো প্রটেস্টান্টদের নিন্দা করতেন না। অবিশ্যি তার একটা কারণ যে রোমান ক্যাথলিকরা তো আর কাউকে খৃশ্চান বলে মনেই করতেন না। তাদের কাছ থেকে কোনো উৎকৃষ্ট গুণ আশাও করতেন না। কন্‌ভেন্টে নিচের ক্লাসের মেয়েরা হিন্দু ব্রাহ্মদেরও 'প্রটেস্টান্ট' বলত! তাদের কাছে দুই-ই সমান ছিল। বোর্ডিং-এ রোজ সন্ধ্যায় 'স্টাডি আওয়ারে' সবাই এক জায়গায় বসে পড়া তৈরি করতাম। একজন শিক্ষিকা থাকতেন। নিচের ক্লাসের শিক্ষিকা; তাঁদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া দুরাশা! এদিকে বাংলায় কাঁচা; ব্যাকরণ জানি না; কে একটু বুঝিয়ে দেবে? মাস কাবারে প্রথম রিপোর্ট এল ক্লাসে ২০ জন মেয়ের মধ্যে মাঝামাঝি স্থান! মনে মনে স্থির করলাম যা হয়, একটা কিছু করতেই হবে। ইংরিজি গ্র্যামার এত ভালো বুঝি আর বাংলার বেলায় শব্দগুলোরই মানে বুঝি না! বাংলা পড়াতেন দুজন মাস্টারমশাই; দুজনেই পুরুষ; দুজনেই হিন্দু। পণ্ডিতমশায়ের বয়স হয়েছে, প্রাচীনপন্থী, মাথায় টিকি, আমাদের দুজনকে কৃপার চোখে দেখেন। তারপর একদিন ক্লাসে রচনা লিখতে দিলেন: 'আমার পূর্বপুরুষরা'। আমার মন জুড়ে থাকত দাদামশায়ের কাহিনী; আমি ফলাও করে তাঁর কথাই লিখলাম। ব্যস্‌, আর দেখতে হল না। পরদিন খাতা ফিরিয়ে দেবার সময়ে পণ্ডিতমশাই আমাদের ডেস্কের সামনে এসে বললেন, "এতদিন বলনি কেন যে তোমাদের মা অচলানন্দস্বামীর নাত্‌নি? ছিঃ ছিঃ! না জেনে কত অন্যায় করে ফেলেছি। যেখানে অসুবিধা হবে আমার কাছে বুঝিয়ে নিও।" সেদিন থেকে পণ্ডিতমশাইও অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

আর ছিলেন মিঃ কুণ্ডু; তাঁর কাছে আমরা ব্যাকরণ পড়তাম। কিচ্ছু বুঝতে পারব না বলে মনটাকে তৈরি করে রেখেছিলাম। মিঃ কুণ্ডুর বয়স কম, রঙ কুচ্‌কুচে কালো, কেমন একটা আড়ষ্ট ভাব। তিনি ইংরিজিতে বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন। ভাবতেই মজা লাগছিল। কিন্তু তিনি প্রথম দিনই বললেন, "টেক্‌ ডাউন মাই নোট্‌স্‌ অন্‌ দি লাস্ট লেসন্‌:—কারক ইজ্‌ নট্‌ বিভক্তি। ষষ্ঠি ইজ্‌ নট্‌ এ কারক, বিকজ্‌ ইট্‌ হ্যাজ্‌ নো রিলেশন উইথ্‌ এ ক্রিয়া।" সঙ্গে সঙ্গে বলে গেলেন কারক ইজ্‌ কেস্‌, ক্রিয়া ইজ্‌ ভার্ব, ষষ্ঠি ইজ্‌ পসেসিভ!" কথাগুলো স্মৃতির ফলকে গেঁথে গেল। ব্যাকরণের অন্ধকার আকাশে আশার আলো দেখলাম। মনে হল এ তো সব চেনা জিনিস, অন্য নাম নিয়েছে। মনে আছে কেমন একটা আত্ম-প্রত্যয় এল। ভাবলাম গরমের ছুটিতে নিচের ক্লাসের পাঠ্য, চটি একটা ব্যাকরণ বই নিয়ে পড়ে ফেলতে হবে। করেওছিলাম তাই; ঐ আমার ব্যাকরণ অনুশীলনের আরম্ভ ও শেষ। সংস্কৃত পড়িনি; বাংলা ব্যাকরণ

যেখানে যেমন দরকার হয়েছে, অমনি সেটুকু শিখে নিয়েছি। ব্যাকরণে আমি পাণ্ডিত্যলাভ করিনি বটে, তবে যেটুকু জেনেছি তাতেই বুঝেছি সুন্দর স্বয়ং-সম্পূর্ণ জিনিস ঐ বাংলা ব্যাকরণ। এতে সংস্কৃতের মহিমা আছে ; তার সঙ্গে আছে নিজস্ব অপূর্ব এক সহজ গতি। ভালো করে বাংলা পড়লে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শিখবার প্রয়োজন থাকে না। তবে সংস্কৃত পড়িনি বলে সারাজীবন একটা সুগভীর খেদও থেকে গেছে। অমন জিনিসের আসল স্বাদটি পেলাম না। দাদামশাই সংস্কৃতে পণ্ডিত ; বড় জ্যাঠামশাই, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা সবাই সংস্কৃতে পণ্ডিত ! আর আমি কিনা ফ্রেঞ্চ নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করলাম ! তবে ফ্রেঞ্চটিও এত উপভোগ করেছি যে সেটুকু স্বীকার না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে। স্টাডির পর বোর্ডিং-এর সব মেয়েরাই রোজ স্কুলের চ্যাপেলে প্রার্থনায় যোগ দিত। মিনিট পনেরোর ব্যাপার, দুটি গান, একটু পাঠ, একটু প্রার্থনা। তবে পাহাড়ের ওপরকার সেই ছোট চ্যাপেলটির মোহ-মাধুরী এখানে একটুও ছিল না। মূর্তি নেই, ফুল নেই, ধূপধুনো নেই, কপালে কেউ জর্দানের জল দেয় না ; নিতান্ত একাদশী ব্যাপার মনে হত। মেয়েদের মাথা ঢাকা দিয়ে চ্যাপেলে যাবার নিয়ম। শাড়ি পরলে মাথায় কাপড়, ফ্রক পরলে মাথায় ভেল্। সে ভারি বিশ্রী ব্যাপার মনে হত।

চ্যাপেলের পর খাওয়া, খাওয়ার পর শোয়া। পরীক্ষার্থিনীরা আরো কিছুক্ষণ পড়ত। আমরা শুতাম আর সমস্ত অতীত জীবন হুড়মুড় করে এসে আমাদের গ্রাস করত। কিছুতেই ঘুম আসত না। বুধবার রাতে ভুনি খিচুড়ি, বেগুনভাজা আর ডিমের ডালনা দিত। প্রত্যেক বুধবার। ভালোই লাগত। শনিবার দুপুরে বাড়ি গিয়ে বাঁচতাম। মাকে জিজ্ঞাসা করতাম, "আর কত দিন বোর্ডিং-এ থাকব ?" এক শনিবার মা বললেন, "এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ঈস্টারের ছুটি হলেই আমরা চক্রবেড়ে রোডের একটা বাড়িতে দু মাসের জন্য উঠে, অন্য বাড়ি খুঁজে নেব।" চক্রবেড়ের বাড়িতে শিলং-এর এক পুরনো বন্ধু থাকতেন, তাঁরা দু মাসের জন্য দেওঘরে যাচ্ছেন।

আস্তে আস্তে নতুন বন্ধু-বান্ধব হতে লাগল। এরাই আমাদের আপন জন ; কন্‌ভেন্টের সহপাঠিনীরা বিজাতীয় ছিল, তাদের সঙ্গে বেশি অন্তরঙ্গতা সম্ভব ছিল না। এই সময় থেকেই কত আজীবনের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছিল ; এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে। একজন চেনা মেয়েকে দেখে অবাক হলাম। শিলং-এ ডান্‌সাহেব ছিলেন, লোক বড় ভালো। তাঁর স্ত্রী খাসিয়া মেয়ে, তিনিও খুব ভালো। কয়েকটা মেয়ে ছিল। একজন পাইন্ মাউন্ট স্কুলে পড়ত, আমাদের নেটিভ্ বলে টিট্‌কিরি দিত। আমাদের চাইতে বছর পাঁচেকের বড় ছিল মনে হয়। শেষের দিকে শিলং-এ আর তাকে দেখতাম না, বোধ হয় পাস্-টাস্ করে

চলে গেছিল। এখানে এসে দেখি শাড়ি-টাড়ি পরে বাংলা বলছে! আমাদের দেখেও যেন চিনতে পারল না। আমরাও কিছু বললাম না।

রেবা রায় বলে আমাদের প্রায় সমবয়সী একটি মেয়ে বোর্ডিং-এ থাকত। হয়তো বছর দুইয়ের বড় হবে, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই একেবারে মাসি-পিসি বনে গিয়ে আমাদের কিসে একটু আরাম হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখত। রেবা রায় সাধারণ মেয়েদের মতো ছিল না ; নাচ-গানে তার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল। সে সময়ে ভালোঘরের মেয়েরা বল্‌ ডান্স যদি বা করত ; ভারতীয় নাচ ছিল নাচ্‌ওয়ালীদের একচেটিয়া ব্যাপার। এখন যে শান্তিনিকেতনের নাচ বিশ্ববিখ্যাত হয়েছে, তখনো সেসবের উদ্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের আগেকার গীতিনাট্যেও সত্যিকার নাচ ছিল না। ছিল হাত-পা নেড়ে গান, যাকে বলে অ্যাক্‌শন সঙ্‌। রেবা রায় এখনো জীবিত আছে, কিন্তু লোকে তাকে ভুলে গেছে। সে-ই প্রথম সাহস করে প্রকাশ্য মঞ্চে একা নেচেছিল। আমি যে-সময়ের কথা বলছি তখন দেশে স্বাদেশিকতার ঢেউ উঠেছে। জালিয়ানওয়ালা বাগের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে ; স্বদেশী নেতারা ক্রমে সাহস করে এগিয়ে আসছেন। রাজনীতির ক্ষেত্র ছাড়াও এসবের একটা সুফল হচ্ছিল, দেশী সংস্কৃতির ওপর লোকের শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছিল। তার অনেকখানির জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কাছে এদেশ ঋণী। দুটি গানের স্কুল হয়েছিল, প্রতিভাদেবী, সরলাদেবী, ইন্দিরাদেবী প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত সঙ্ঘ আর মিসেস্‌ বি এল চৌধুরীর সঙ্গীত সম্মিলনী। নামটা ঠিক ব্যাকরণ অনুমোদিত নাও হতে পারে। সঙ্গীত সঙ্ঘের একটু আভিজাত্যের গর্ব ছিল, সঙ্গীত সম্মিলনী ছিল সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য। মিসেস বি এল চৌধুরী রেবা রায়ের কে যেন হতেন। দিদি, আমিও সেই বছর সঙ্গীত সম্মিলনীতে ভর্তি হলাম। শিলং-এ একটু একটু বেহালা শিখেছিলাম, বলা বাহুল্য পাশ্চাত্য মতে, এখানে এঞ্জেল্‌ স্মিথ বলে নামকরা বেহালাবাদক পাঠ দিতেন। তাছাড়া বাঙালী মেয়ে বাংলা গান না শিখলে কি করে চলে ? পরে আমরা বেঁকে বসলাম, গান-বাজনা আমাদের আসে না। রেবা রায়ও এখানকার ছাত্রী। সঙ্গীত সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসবে যত দূর মনে হয় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটের হলে, রেবা রায় প্রকাশ্যে নেচেছিলেন। চমৎকার নেচেছিলেন। শুধু আমরা কেন, সকলে বলেছিল চমৎকার নেচেছেন। সাজসজ্জার কথা আর কি বলব ? কণ্ঠার হাড়ের ওপরে, কনুইয়ের নিচে আর পায়ের কব্জির নিচে ছাড়া, শরীরের কোনো জায়গা দেখা যায়নি। তবু ভদ্রলোকের মেয়ে স্টেজে চড়ে নাচল বলে শহরময় ঢি-ঢি পড়ে গেছিল! গত পঞ্চান্ন বছরে আমরা নিঃসন্দেহে পঞ্চান্ন হাজার মানসিক মাইল এগিয়ে এসেছি।

অবিশ্যি তখন এত কথা ভাবিনি, রেবা রায়ের মিষ্টি ব্যবহারের জন্য তাকে

ভালো লেগেছিল। ইতিহাস পড়াতেন চারুলতা দাশ, বাঙালী খৃশ্চান, জাত-শিক্ষক যাকে বলে। পড়াতে পড়াতে ইতিহাসটাকে জ্যান্ত করে ফেলতেন। পরে ইনি অনেক বছর ডায়োসেসান স্কুলের অধ্যক্ষার পদে ছিলেন। সম্প্রতি আশীর ওপরে বয়সে দেহ রেখেছেন। এঁদের অনেকের মধ্যে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না।

শনি-রবি কাটত সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে। সে পরিবেশের রাজা ছিলেন বড়দা। বড়দা ছিলেন অবারিতদ্বার। আমরা যখন খুশি তাঁর ঘরে যেতাম। তবে কাজের মানুষ, বেশি বিরক্ত করবার সাহস হত না। আবোল-তাবোলের কবিতার জন্য ছবি আঁকা দেখতে বেজায় ভালো লাগত। আমি বড়দাকে কখনো রঙ্গীন ছবি আঁকতে দেখিনি। সেসময় সন্দেশের সব ছবিই বোধ হয় উনি আঁকতেন। ভাইবোনদের মধ্যে বড়দিও চমৎকার ছবি আঁকতেন, তার বেশির ভাগই নানান্ দৃশ্যপট, কিম্বা নিজের পরীদের গল্পের ছবি। থাকতেনও না কাছে, ওঁর স্বামী ডাঃ জয়ন্ত রাওয়ের কর্মস্থল ছিল ওড়িষা, জন্মস্থানও বটে। সেখানেই কিম্বা কাছাকাছি কোথাও তাঁদের জীবন কেটেছিল। মারা গেছিলেন অনেক পরে কলকাতায় এসে, বিধবা বড়মেয়ের বাড়িতে।

কাজের মানুষ হলেও বড়দার সরস মধুর ব্যক্তিত্ব বাড়িময় ছড়িয়ে থাকত। এখন বুঝতে পারি সেটা ছিল ওঁদের 'মণ্ডে ক্লাবের' যুগের শেষের দিকটা। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মণ্ডে ক্লাবে যতই নির্মল আনন্দের ব্যবস্থা থাক ওটি ছোটদের জন্যে নয়। বাড়িতে তখন ছোট বলতে জ্যাঠামশায়ের নিতান্ত বালখিল্য দু-তিনজন নাতি-নাত্নি ছাড়া কেউ ছিল না। তাদের মধ্যে একমাত্র সুবিনয়ের ছেলে ধন ঐ বাড়িতে থাকত। পুণ্যলতার দুই মেয়ে ; পরে একজন কল্যাণী কার্লেকর আর একজন নলিনী দাশ নামে সুপরিচিতা, কিন্তু এরা ছোটনাগপুরে বাপের কর্মস্থলে মানুষ হয়েছিল। কলকাতায় আসত যেত। মোট কথা মণ্ডে ক্লাবের ব্যাপার দেখবার আমাদের সুযোগ হয়নি। শুধু একটা রবিবার দোতলার বসবার ঘরের দরজা বন্ধ করে, একটা কিছুর মহড়া চলছিল ; গমকে গমকে হাসি শোনা যাচ্ছিল ; প্লেট প্লেট জলখাবার যাচ্ছিল। বলা বাহুল্য আমাদের সে সময়টা কেটেছিল তিনতলায় নান্কুদার ঘরে। ছোট জ্যাঠামশাই সেখানে ছবি আঁকছিলেন ; নান্কুদা অনুপস্থিত ছিল, বোধ হয় মহড়ায় যোগ দিয়েছিল। কলকাতায় এসেই টের পেয়েছিলাম এগারো বারো বছরের ছেলেমেয়েদের লোকে বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে করে না। যাই হোক, তেতলার স্নানের ঘরে স্নান করে, নান্কুদার ঘরের খালি তক্তাপোষের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, জ্যাঠামশায়ের বইয়ের আলমারিতে পাওয়া "ড্র্যাকুলা" বলে এক অভাবনীয় বই পড়তে আমি ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় আমার ছোটভাই

সাত বছরের সরোজ একটা লোহার হেয়ার-পিন হাতে করে, তক্তাপোষে উঠে, আমার পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে, খুব যত্ন করে হেয়ার-পিনটার দুটো ঠ্যাং একটা খোলা প্লাগ্-পয়েন্টের দুটো গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

আর যাবে কোথায় ! ফ্যাঁ—শ্ করে একটা শব্দ হল ; জোরে একটা ঝিলিক দিল ; সরোজ আমার পিঠের ওপর থেকে ছিটকে পাঁচ হাত দূরে জ্যাঠামশায়ের পায়ের কাছে পড়ল ; ঈজেল হুড়মুড় করে উল্টে গেল আর আমার মনে হল হয় আমার মাথার ভিতরে, নয় আমার হৃৎপিণ্ডে, কিম্বা সম্ভবত দুই জায়গাতেই কেউ গায়ের জোরে একটা অদৃশ্য হাতুড়ি পিটল। আমি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম। দিদিও ঘরে ছিল, দাদাও ছিল, ওদের কাছে পরে শুনেছি যে ছোট জ্যাঠামশাই কয়েক মুহূর্ত তুলি হাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর, যখন দেখলেন সরোজ তখনো শুধু জ্যান্ত নেই, হাতে হেয়ার-পিনটা নিয়েই আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে—আরেকবার চেষ্টা করার জন্য কি না ঠিক জানা যায়নি—তখন তিনি কখনো যা করতেন না, তাই করে বসলেন ; আচ্ছা করে সরোজের কান পেঁচিয়ে দিলেন। তারপর আমার কাছে ছুটে এলেন। ততক্ষণে আমিও উঠে বসেছিলাম। ভাগ্যিস্ সেসময় সব জায়গায় ডি-সি কারেন্ট ছিল।

ব্যাপারটা ওখানেই চুকে গেছিল। কান প্যাঁচাবার পর ছোট জ্যাঠামশাই ঐ নিয়ে আর বাক্যালাপ করেননি। ঈজেল তুলে, বিড় বিড় করে কি যেন বলতে বলতে, আস্তে আস্তে নিচে চলে গেছিলেন। যাবার আগে শুধু নরম গলায় বলেছিলেন, "মরে যাওনি ঐ ঢের।"

বড়দা দিব্যি মোটাসোটা ছিলেন। তাই নিয়ে বৌঠান মাঝে মাঝে রাগমাগ করতেন। "আচ্ছা, খাওয়ার কথা আমি কিছু বলছি না, কিন্তু খেয়েদেয়ে তিনটে পর্যন্ত শুতে পাবে না।" বড়দা দেখলেন এ তো মহা গেরো ! ভয়ঙ্কর ভালো রান্না করতেন বৌঠান। তখন দিন কাল অন্য রকম ছিল। শিক্ষিত বাড়ির মেয়েরাও রান্না করবে, পরিবেশন করে সবাইকে খাওয়াবে, এই রকমই সকলে আশা করত। আমাদের বাড়িতেও ঐ নিয়ম ছিল। আমার পিসিমার বাড়িতে, জ্যাঠামশাইদের বাড়িতে, মাসিমার বাড়িতে, সব জায়গাতেই তাই। হাজার লেখাপড়া শেখা, গাইয়ে-বাজিয়ে মেয়ে হক না কেন, রাঁধবার লোক থাকলেও ভালো রেঁধে বাড়িসুদ্ধ সকলকে পরিবেশন করে খাওয়ানোর মধ্যে ভারি একটা তৃপ্তির ব্যাপার ছিল। তার ওপর বৌঠান ছিলেন অসাধারণ রাঁধিয়ে। বড়দার খাওয়া-দাওয়াটা মন্দ হত না। কিন্তু খেয়েদেয়ে আর শোবার জো রইল না। বৌঠান বাড়িসুদ্ধ সবাইকে ডেকে ঘরে আসর জমানো ধরলেন।

দিন দুই চেয়ারে বসে বই পড়ে, প্রুফ দেখে, কাটাবার পর বড়দা বললেন, "এখানে বড্ড হট্টগোল, যাই আমার অপিস্-ঘরে গিয়ে কাজ করি।" এই বলে

বাড়ির সামনের দিককার নিষিদ্ধ অঞ্চলে চলে গেলেন। তারপর থেকে রোজই খেয়েদেয়ে কাগজপত্র নিয়ে অপিস্-ঘরে চলে যেতেন। আর শোবার কথা মুখেও আনতেন না।

এতে খুশি হওয়া দূরে থাকুক, সন্দিগ্ধ মনে রবিবার দিন যখন অপিস্ বন্ধ থাকত, ঘরে তালা দেওয়া থাকত তখন নিচে থেকে রাম-দহিনকে ডেকে পাঠিয়ে, ঘর খুলিয়ে, বৌঠান দেখলেন অপিস্ ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেমন সর্বদা থাকে আর ঘরের এক পাশের বইয়েব আলমারিটা একটু সরিয়ে, চওড়া একটা কাঠের বেঞ্চির ওপর পুরু-গদী বিছিয়ে চাদর পেতে দিব্যি সুন্দর একটি বিছানা করা! বৌঠান ঘরে ফিরে এসে বললেন, "নাঃ, থাক, কাল থেকে ঘরেই শুইয়ো।"

বড়দা যখন মারা যান, আমার বয়স পনেরো বছর, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর কথা মনে পড়লেই, মনটা ভালো হয়ে যায়। কি উচ্ছল প্রাণশক্তি ছিল মানুষটার; যেখানেই যেতেন সঙ্গে করে একটা আনন্দের ঝড় নিয়ে যেতেন। আমি ভাবতাম এই আশ্চর্য মানুষের স্নেহচ্ছায়ায় আমার লেখিকার জীবন কাটবে; ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে সুন্দর রূপ নিয়ে আমার বই-ও বেরোবে; আমার কি সৌভাগ্য। সে-সব কিছুই হয়নি অবিশ্যি। তবু বড়দা আমার হাতেখড়ি দিয়ে গেছিলেন আর ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স উঠে গেলেও. বহু প্রকাশকের বহু সম্পাদকের আজীবনের প্রীতি আর সহযোগিতা পেয়েছি; সে-ও কিছু কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

কিন্তু 'বড়দা' বললেই তাঁর জীবনের শেষের বেদনাময় দিনগুলোর কথা মনে হয় না; মনে হয় একটা কোঁকড়া চুল, চকচকে চোখ, হাসি-খুশি, মোটা-সোটা মানুষকে, যিনি ছিলেন একদল যুবকের নেতা ও পৃষ্ঠপোষক। নিজে ছত্রিশ বছর বয়সে বিদায় নিয়েও তিনি তাঁদের সারা জীবন প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁদের উত্তরাধিকারীরাই বাংলার রসের ভাণ্ডারটি আজ পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছেন। আমাদের অনেক গেছে, কিন্তু সেটি যায়নি। সেটিকে রসিকতার সঙ্গে ভুল করলে চলবে না; সরসতা অনেক সুগভীর জিনিস, তার মধ্যে একটা গোটা জীবনদর্শন ধরা আছে। রসিকতা কত সময় ছেঁদো কথায় দাঁড়ায়। আমাদের সরসতা আমাদের রক্ষাকবচ।

সে যাই হক, বড়দার বেজায় বন্ধু ছিলেন প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাশের ছেলে প্রেমানন্দ দাশ। তিনি আবার আমাদের শিলং-এর দিদিমার বড় জামাই ছিলেন। তাঁরা আপার সার্কুলার রোডে থাকতেন, সেটা ১০০ নং গড়পার থেকে খুব দূরে ছিল না। একদিন দুপুরে বড়দা গেরুয়া পরে, রুদ্রাক্ষের মালা গলায়, জটা মাথায়—মণ্ডে ক্লাবের কি না ছিল!—পায়ে খড়ম, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে,

সর্বাঙ্গে ছাই মেখে, প্রেমানন্দদের বাড়ির খিড়কি-দোরের কড়া নাড়লেন। পাশেই প্রেমানন্দর ঘর ; বড়দা ভেবেছিলেন রবিবার বেলা তিনটেয় সে নিশ্চয় ঘুমুচ্ছে ; শব্দ শুনে খিড়কি দোর খুলবে ; তারপর বেশ মজা করা যাবে।

ঠিক সেই দিনই খুলবি তো খোল্, প্রেমানন্দের মা রান্নাঘরের রকে পাটিসাপ্টা না কি ভাজছিলেন, তিনি এসে দরজা খুললেন। ঘাবড়ে গিয়ে বড়দা বললেন, "জয় হক, মা !" আর প্রেমানন্দর মা অমনি খিড়কি দোরের সামনেই বড়দাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন ! বড়দা কি আর সেখানে দাঁড়ান ! পিছন ফিরে খড়ম খট্‌খট্ করে, সেই যে দৌড় দিলেন, ১০০ নং গড়পারে না পৌঁছে থামলেন না। আমার মনে হয়, তখন বৌঠান বলেছিলেন, "বেশ হয়েছে ! আমি খুব খুশি হয়েছি !"

॥ ১৪ ॥

বড়দার বিষয়ে গল্প করতে বসলে আর এ কাহিনী কোনোদিনও শেষ হবে না। অল্পবয়স থেকেই নিজেও যে ভয়ঙ্কর গপ্পে আর বেজায় তার্কিক ছিলেন তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। আর শুধু বড়দা কেন, ওঁদের দলটিই ঐ রকম ছিল। সে-দলেব মধ্যে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, কালিদাস রায় প্রমুখও ছিলেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের গা ঘেঁষে একটা সরু গলি আছে। সেই গলিতে সেকালে অনেকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারের বাড়ি ছিল এবং ঐ গলিটি আড্ডা দেবার আদর্শ স্থান ছিল। এক রকম বলতে গেলে ব্রাহ্ম সমাজের হেপাজতেই আড্ডা বসত, যদিও সদস্যারা সকলে ব্রাহ্ম ছিলেন না। গলির প্রথম বাড়ি ছিল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ঠাকুবদাদা গুরুচরণ মহলানবিশের। সকালে, সন্ধ্যায় গান-বাজনা উপসনার শব্দের জন্য সমাজ-পাড়ার সকলে প্রস্তুত থাকত। কিন্তু তার ওপর যখন ছুটির দিনে দুপুরে গলিতে তর্কসভা বসতে আরম্ভ করল, তখন আর তাঁদের ধৈর্য রইল না। বিশেষ করে গুরুচরণ মহলানবিশের বাড়ির সামনের রকটিকে তর্ক-সভার হেডকোয়ার্টার বললেও অত্যুক্তি হত না। শেষটা ছুটির দিনের দিবা-নিদ্রা ভঙ্গে অতিষ্ঠ হয়ে, গুরুচরণের বড় ছেলে সুবোধচন্দ্র একদিন মিস্ত্রি ডাকিয়ে রকটি কাটিয়ে ফেললেন।

আড্ডা অন্যত্র উঠে গেল।

এ-সব অবিশ্যি অনেক দিন আগের কথা, আমি তখন জন্মেছি কি না সন্দেহ। এই তার্কিক বড়দাকে আমি দেখিনি, যদিও ভারতীয় শিল্প নিয়ে ও-সি গাঙ্গুলীর সঙ্গে প্রবাসীতে তাঁর বিখ্যাত বিতর্কের প্রবন্ধগুলি পড়ে বুঝেছিলাম যে ও-সি গাঙ্গুলীর চাইতে বড়দাও কিছু কম যেতেন না। বলা বাহুল্য এ-সব তর্কাতর্কিতে চটাচটি হলেও, ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকত না।

আমি বারে বারে বড়দার চরিত্রের কোমল দিকটা দেখতাম। গড়পারে রোজ সকালে একমুখ দাড়ি নিয়ে, একজন বুড়ো মাস্টারমশাই এসে চা টোস্ট মাখন খেয়ে চলে যেতেন। তাঁর নাম কখনো শুনিনি, সবাই বলত মাস্টারমশাই। বোধ হয় কোনো সময়ে বড়দার শৈশবে উনি বাড়ির মাস্টার ছিলেন। অপরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে, টেবিলের এককোণে বসে তিনি চা খেয়ে চলে যেতেন। কারো সঙ্গে কথা বলতেন না, কোনো উপদ্রব করতেন না। খালি নাক থেকে ময়লা বের করে টেবিলে মাখাতেন। তাতে বাড়ির মহিলারা বেজায় চটে যেতেন। শেষটা একদিন তাঁরা মাস্টারমশাইকে ছোট একটা আলাদা টেবিলে, পরিপাটি করে গুছিয়ে চা খেতে দিলেন। মাস্টারমশাই যথাসময়ে এসে অভ্যস্ত জায়গায় তাঁর চেয়ার না দেখে, একটু বিভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকাতেই, মেয়েরা কেউ তাঁকে তাঁর নতুন জায়গা দেখিয়ে দিলেন। মাস্টারমশাই নিঃশব্দে সেখানে বসে টোস্ট তুলে নিলেন। এমন সময় বড়দা চা খেতে নেমে এলেন।

নতুন ব্যবস্থা দেখে বৌঠানের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "আজ আবার এ ব্যবস্থা কেন ?" সবাই এ-ওর দিকে তাকাল। বৌঠান বললেন, "এতেই তো ওঁর বেশি সুবিধা হবে, এ টেবিলে এত লোক— ।"

বড়দা বললেন, "ও। তাহলে কাল থেকে আমাকেও ঐ ছোট টেবিলে ওঁর সঙ্গে চা দিও।" এই বলে চা না খেয়ে তখুনি ফিরে আবার ওপরে উঠে গেলেন। বলা বাহুল্য ছোট টেবিলও আধ ঘণ্টার মধ্যে অদৃশ্য হল।

বড়দা তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি দিয়ে সকলের চোখ এমনি ধাঁধিয়ে রেখেছিলেন যে তাঁর ছায়ায় ছায়ায় যে আরেকজন অসাধারণ মানুষ সব সময় ঘুরে বেড়াতেন, তাঁর দিকে কারো চোখ পড়ত না। এই মানুষটির নাম সুবিনয় রায়, ডাকনাম মণি, বড়দার মেজভাই, গড়পারের তিনতলায় ইনি মেজবৌদি আর তাঁদের একমাত্র ছেলে ধনকে নিয়ে থাকতেন। ফরসা, লম্বা মানুষটি, গানের শখ, নানা রকম বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করতেন, চমৎকার প্রবন্ধ আর মৌলিক গল্প লিখতেন। খানকতক বই-ও প্রকাশিত হয়েছিল ; গল্পের, প্রবন্ধের, আশ্চর্য সব ধাঁধার বই। অথচ এমন মানুষের ওপর আমাদের দৃষ্টি পড়তে হয়তো আরো দশ বছর সময় লেগেছিল। বড়দার সঙ্গে সঙ্গে ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন ; বড়দার চাইতে হয়তো ৫/৬ বছরের ছোট ছিলেন। দুজনার মাঝে এক বোন ; পুণ্যলতা চক্রবর্তী, যার লেখা 'ছেলেবেলার দিনগুলি'-তে মণিদার বিষয়ে অনেক কথা আছে। ঐ বয়সে মণিদার এত গুণের কথা আমরা জানতেও পারিনি, গুণগুলি সব তখনো ফোটেওনি। এখনো মাঝে মাঝে প্রকাশনী মহলের নানান্ বন্ধুর কাছে শুনি মণিদার কাছে কোনো লেখক বা বিপন্ন প্রকাশক সাহায্য চেয়ে ফিরে আসত না। মণিদাকে এখনকার ছোট

ছেলে-মেয়েরা চেনে না বলে আমার দুঃখ হয়। এমন সরস, উদার, সদা-হাস্যময় মানুষ খুব বেশি দেখি না। ওঁর রচনাগুলি সংগ্রহ করে দুই খণ্ডে প্রকাশ করা যায়। দুঃখের বিষয় কোনো কোনো বইয়ের কপিরাইট মণিদা বিক্রি করে দিয়েছিলেন, তাই মেজবৌদি সাহস পান না। ধন মানসিক রোগে ভোগে। মেজবৌদির এখন আশীর ওপর বয়স। মণিদা ৫২ বছর বয়সে স্বর্গে গেছেন। কার ভাগ্যে কি থাকে কে বলতে পারে। গড়পারের দোতলায় উঠেই ডান হাতে সুন্দর করে সাজানো বসবার ঘর, আর বাঁ দিকে একটা দালান চলে গেছে ; তার ওপারে কার্যালয়ের এলাকা ; আমাদের প্রবেশ নিষেধ। দালানটা বাঁ দিকে একটু এগিয়ে, আবার বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, শোবার ঘর, কলঘর ইত্যাদির দিকে চলে গেছে। ঐ বাঁকটির ওপর একটা বেশ বড় ঘর। সেই ঘরে সতীশমামা বলে একজন অদ্ভুত লোক থাকতেন। তাঁকে ভয় করব, না ভালোবাসব, ঠিক করতে পারতাম না। হাত-পা তাঁর বাঁকা ; কিছুতে ভর না দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না ; একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ ; পরনে পরিষ্কার ধবধবে ফতুয়া আর ধুতি। উস্কো-খুস্কো চুল ; হঠাৎ দেখলে পাগল মনে হত। ছোটরা তাঁকে বেজায় ভয় পেত ; এক দৌড়ে মোড়টুকু পার হত। সতীশমামা ডাকাডাকি করতেন ; গলার স্বরটা বিকৃত, উচ্চারণ অস্পষ্ট ; কি বলছেন সব সময় বোঝা যেত না।

সতীশমামা ছেলেপিলে ভালোবাসতেন। কারো জন্মদিন শুনলে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে সুন্দর ছন্দ-মিল দিয়ে কবিতা লিখে দিতেন ; দুটো করে টাকা হাতে গুঁজে দিতেন ; মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। যার জন্মদিন সে জ্যাঠাইমার কাপড় আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। জ্যাঠাইমা বলতেন, "ভয় কিসের ? ও তোদের সতীশমামা, আমার ছোটভাই।" ছোটভাই মানে দ্বারিক গাঙ্গুলীর প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে, জ্যাঠাইমার সহোদর। শিশুবয়সে কে কোল থেকে ফেলে দিয়েছিল। মাথায় চোট লেগে ঐ রকম হয়ে গেছিলেন। চিরকাল জ্যাঠাইমা মা-মরা বিকলাঙ্গ ছোট ভাইটিকে বুকে করে মানুষ করেছিলেন। বিয়ের পর সঙ্গে করে স্বামীর বাড়িতে এনেছিলেন ; সতীশমামা মারাও গেছিলেন তাঁর কোলের কাছে শুয়ে।

এখনো সতীশমামার গলার স্বর মনে আছে। ভারি রসবোধ ছিল তাঁর। শরীরটাই বিকল হয়েছিল, মাথাটা সাফ ছিল। ছোট জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে তাঁর খুব জমত। একদিন দূর থেকে ছোট জ্যাঠামশাইকে দেখে বলে উঠলেন, "কিছুতেই যে হয় না রাজি !" পাশের ঘরে বসে বড়দা আস্তে আস্তে বললেন, "রাজির সঙ্গে পাজি মেলে।" সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সতীশমামার কবিতার দ্বিতীয় পদ,

"ময়মনসিংহের বাঙ্গাল পাজি !"

জ্যাঠাইমার বাপের বাড়ির আরো অনেকে বেড়াতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় জ্যাঠাইমার বিমাতা কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর। তাঁর জীবনটাই এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তার অনেক আগেই তিনি বিধবা হয়েছিলেন। বয়সে জ্যাঠাইমার চাইতে সমান্য বড় ছিলেন; দেখে মনে হত অনেক ছোট। মস্ত দশাসই চেহারা; ফুট্‌ফুট করত গায়ের রঙ; থান পরে এবং এত বয়সেও রূপ চাপা পড়ত না, তবে কেমন একটু কড়া ধরনের ভাব। আমরা দূর থেকে দেখতাম; তিনিও কাছে ডাকতেন না।

শুনেছিলাম কাদম্বিনী বসু বাল-বিধবা ছিলেন; জ্যাঠাইমার বাবা দ্বারিক গাঙ্গুলীই তাঁর অভিভাবকদের বলে-কয়ে ওঁকে স্কুলে ভরতি করিয়েছিলেন। স্কুল থেকে কলেজে। তারপর একদিন কাদম্বিনী গ্র্যাজুয়েট হলেন। এর মধ্যে কোনো সময়ে দ্বারিক গাঙ্গুলী তাঁকে বিয়ে করে ফেললেন। বিদ্যাসাগর মশাই তাতে নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে করেও কাদম্বিনী রেহাই পেলেন না। স্বামীটি স্ত্রী-শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। দিলেন তাঁকে মেডিকেল কলেজে ভরতি করে। একটার পর একটা ডাক্তারি পরীক্ষা পাস্ করলেন কাদম্বিনী, মড়া কাটলেন, ধাত্রীবিদ্যা শিখলেন, সব করলেন। অন্তিম পরীক্ষাও পাস্ করলেন। কিন্তু স্নাতক বলে স্বীকৃতি পেলেন না। তখন বিলেতেও নাকি কোনো মহিলা ডাক্তারি পাস্ করে এম্-বি হননি। কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রথম পাস্ করা মহিলা চিকিৎসক, যদিও অনেকে তাঁকে সে সম্মান দেন না; যেমন সেকালের বিশ্ববিদ্যালয়ও দেয়নি।

দু তিনটি ছেলে-মেয়ে হবার পর দ্বারিক গাঙ্গুলী স্ত্রীকে বিলেত পাঠালেন ডাক্তারিতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। ছেলে-মেয়েদের ভার নিলেন তাদের দিদিমা। শুনেছি কাদম্বিনী ফিরে এলে, ছোট ছেলে কিছুতেই তাঁর কোলে গেল না। কাদম্বিনী কেঁদেছিলেন। সারা জীবন ডাক্তারি করেছিলেন এই আশ্চর্য মহিলা। অনেক দিন নেপালের রাজ-অন্তঃপুরের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন। সেখান থেকে চলে আসবার সময় তাঁরা তাঁকে দামী দামী সব রেশম-কিংখাবের জিনিস, মণিমুক্তোর গহনা দিয়েছিলেন। আমার মা সে-সব দেখেছিলেন। ১৯২০ সালে আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তিনি অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের চিকিৎসার জন্য কোনো সরকারি সংস্থায় কাজ করছেন। ঘোড়ারগাড়ি করে বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ বেহালা যেতেন। সেকালে বাস ছিল না, ট্রামের লাইনেরও এত বিস্তার হয়নি; ও-সব জায়গাকে বিদেশ মনে হত। ঘোড়ারগাড়ি করে অত দূরে যেতে অনেক সময় লেগে যেত। কাদম্বিনী সে সময়টা নষ্ট না করে, গাড়িতে বসে বসে ক্রুশের কাঁটা দিয়ে অপূর্ব সুন্দর সূক্ষ্ম লেস বুনতেন। তাঁর এই কর্মনিষ্ঠা আর সুন্দর গাম্ভীর্যমণ্ডিত চেহারা দেখে তাঁকে ভারি শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু কাছে যেতে সাহস পেতাম না। মনে আছে তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে মাঝে মাঝে আসতেন। বন্ধুকে

মা-জ্যাঠাইমা নগেনদিদি বলতেন। তাঁকে একদিন গল্প করতে শুনেছিলাম যে, যদিও নেপালে কাদম্বিনী অনেক সম্মান পেয়েছিলেন, রাজবাড়ির মেয়েরা তাঁকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন, নিজের দেশে ফিরে এসে মাঝে মাঝে যে ব্যবহার পেতেন তাকে সম্মান বলা যায় না। একবার কোনো বড়লোকের বাড়িতে কারো প্রথম সন্তান হবার সময় কিছু গোলমাল হয়েছিল, ধাত্রীরা প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাদম্বিনী গিয়ে মা ও ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। নগেনদিদি সেবার সঙ্গে গেছিলেন।

তারপর স্নানটান করে এসে দেখলেন ভিতরবাড়ির উঠোনের পাশের বারান্দায়, যেখানে ঝিরা খেত, সেইখানে তাঁদের জায়গা করা হয়েছে। ঠাকুর পরিবেশন করল, রান্নাবান্নাও খুবই ভালো। কিন্তু খেয়ে ওঠার পর বাড়ির গিন্নি ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালেন দাইরা যেন নিজেদের কলাপাতা তুলে ফেলে দিয়ে, জায়গাটা মুছে দিয়ে যায়। ঝিরা ও-সব নোংরা কাজ করবে না! বলিনি গত সত্তর বছরে আমরা বহু লক্ষ মাইল এগিয়ে এসেছি। আমাদের কোনো উন্নতি হয়নি, একথা ভুল।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে কাউকে কাউকে সকলে চেনে। বড় ছেলের নাম ছিল প্রভাত; তিনি স্বনামধন্য সাংবাদিক ছিলেন। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, এক মুখ বুনো দাড়ি-গোঁফ, তাঁর ডাকনাম ছিল জংলি! অবিশ্যি যখন নামকরণ হয়েছিল, সে নিশ্চয় ঐ নামোপযোগী অন্য গুণও ছিল বলেই হয়েছিল; কারণ তখনো তাঁর দাড়ি-গোঁফ বেরুতে ঢের দেরি ছিল। জংলুমামা বলে আমরা তাঁকে ডাকতাম। মামা হলেও বড়দার বন্ধু জংলুমামা। জংলুমামার এক ছোট ভাই ছিলেন। তাঁকে আর এবার দেখলাম না, অকালে তিনি মারা গেছিলেন, তাঁর নাম ছিল মংলুমামা। মংলুমামাও বড়দাদের বন্ধু ছিলেন, সাহিত্য ভালোবাসতেন। বাবার কাছে তাঁর বিষয়ে একটা মজার গল্প শুনেছিলাম। কোথায় যেন জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে বাবাও ছুটি কাটাতে গেছিলেন, চুনারে কি পচম্বায়, কিম্বা ঐ রকম কোথাও। দুপুরবেলা বাবা রাইডার হ্যাগার্ডের 'কিং সলমন্স মাইন্‌স্' পড়বার চেষ্টা করছেন। এমন সময় হাতে একটা জ্যান্ত খুদে মাছ নিয়ে মংলুমামার প্রবেশ। সে কিছুতেই ছাড়বে না, গল্প বলতেই হবে। বাবা তখন ওকে ভাগাবার উদ্দেশ্যে বললেন, "বলব গল্প, যদি ঐ মাছটাকে জ্যান্ত গিলে খেতে পারিস্!" মুখ থেকে কথাটা বেরুবামাত্র মংলুমামার গলা দিয়ে কিলবিল করতে করতে মাছটা গিয়ে পেটে পৌঁছল। বাবা তো ভয়েই মরেন, শেষটা কি হতে না কি হয়ে যায়। কিন্তু কিচ্ছু হল না। মংলুমামা বহাল তবিয়তে রইলেন। লাভের মধ্যে আগাগোড়া কিং সলমন্স মাইন্‌সের গল্প শুনতে পেলেন!

জংলুমামাদের এক বোনের নাম ছিল জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী। আমরা ডাকতাম

চামি-মাসি। বিয়ে-থা করেননি, নিজের মায়ের মতোই লম্বা দশাসই চেহারা, নিষ্ঠাবতী দেশকর্মী, ইংরেজ সরকারের অত্যাচারে শেষটা প্রাণও দিয়েছিলেন। এঁদের আরো ভাইবোন ছিলেন, তবে তাঁদের কথা খুব ভালো মনে পড়ে না। এক বেলিমাসি ছাড়া। তাঁর নাম ছিল বেলা হালদার, বেতার ইত্যাদিতে কাজ করেছিলেন, ভারি ফ্যাশানেবল্ ছিলেন, কয়েকটি সুন্দর দেখতে ছেলেমেয়েও ছিল। তাঁর সঙ্গে কখনো কথা বলেছি বলে মনে হয় না।

দ্বারিক গাঙ্গুলীকে আমি চোখে দেখিনি। তবে ছোটবেলা থেকে তাঁর সমাজসেবা আর স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহের ও ভয়ঙ্কর তেজের কথা শুনে এসেছিলাম। তার একটা গল্প না বলে পারছি না। আমার মা-রা তখন খুব ছোট। হয়তো ১৮৯০ কি ঐরকম সময় হবে। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বেথুন সাহেব, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি উঠে-পড়ে কাজে লেগেছেন। এমন সময় একটা রক্ষণশীল বাংলা পত্রিকাতে—দুঃখের বিষয় পত্রিকাটার নাম শুনিনি—বিশ্রী ইঙ্গিত করে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দ্বারিক গাঙ্গুলী সেটি কেটে পকেটে ভরে, হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে, সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। চমৎকার বলিষ্ঠ শরীর ছিল দ্বারিক গাঙ্গুলীর। তিনি সম্পাদকীয় লেখাটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি আপনি লিখেছেন ?" সম্পাদক রুখে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, লিখেছি। তাই কি ?"

"তাই এই যে আই হ্যাভ্ কাম্ টু মেক্ ইউ ঈট ইয়োর ওয়ার্ডস ! নিন্, জল দিয়ে গিলে খান।" এই বলে কাটিংটাকে গুলি পাকিয়ে সম্পাদকের হাতে দিয়ে, লাঠি বগলে দাঁড়িয়ে রইলেন। যতক্ষণ না সম্পাদক সত্যি সত্যি গুলিটাকে জল দিয়ে গিলে খেলেন।

তখন দ্বারিক গাঙ্গুলী বললেন, "কালকের কাগজে ঐ মন্তব্য প্রত্যাহার করে যদি সম্পাদকীয় না বেরোয়, তাহলে আমি আবার আসব।"

বলা বাহুল্য মন্তব্য প্রত্যাহার করে পরদিনের সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছিল।

এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে এই দুটি পরিবারের মধ্যে এত মধুর সম্বন্ধ কি করে এতকাল ছিল। কাদম্বিনীর ভাইদের দেখেছি গড়পারে যাওয়া আসা করতে ; বড়দারা তাঁদের মেজদাদামশাই, ছোড়দাদামশাই, বলতেন। সন্দেশে তাঁরা জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড় সম্বন্ধে লিখতেন ; আমাদের বেজায় ভালো লাগত। ছোড়দাদামশায়ের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। মেজদাদামশাইয়ের নামটা ঠিক মনে পড়ছে না, হয়তো যোগেন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা একটা বইয়ের কথাও মনে হচ্ছে। তার নাম বোধ হয় মাছ ব্যাঙ সাপ, কি ঐ রকম কিছু। উনি বোধহয় বিয়ে-থা করেননি। মারাও গেছিলেন বড়দাদাদের কাছে এসে। সেদিন অনেক

রাত অবধি লেখা-পড়া করেছিলেন। তারপর মাঝরাতে ডাক দিলেন, "ওরে তাতা ! তাতারে !" বড়দা এবং বাড়িসুদ্ধ প্রায় সকলে উঠে পড়লেন। বড়দা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে মেজদাদামশাই ? এই যে আমি আসছি।"

মেজদাদামশাই বললেন, "এসে কি করবি রে ? মেজদাদামশাই আর নেই !"

বড়দাদা নিচে এসে দেখেন সত্যি সত্যি প্রাণটা বেরিয়ে গেছে। শুনেছি রক্তচাপ বেশি ছিল, তারি ফলে এমন হয়েছিল। মনে হয় কালকের ঘটনা। সময়ের হিসাব গুলিয়ে যায়।

যাই হোক, মায়ের বিমাতার ভাইদের সঙ্গে এমন স্নেহের সম্বন্ধ সচরাচর দেখা যায় না। এতে নিশ্চয়ই উভয় পক্ষেরই কৃতিত্ব আছে। মনে আছে পরে যখন খেয়াল হল এঁরা আমাদের কেউ নন, ভারি আশ্চর্য লেগেছিল।

এঁদের দেখতে পেতাম শনি-রবিবার যখন বাড়ি আসতাম। সোমবার সকালে বোর্ডিং-এ ফিরে যেতে খুব খারাপ লাগত। এর মধ্যে আমার ১২ বছর পূর্ণ হল। সেদিন সকালে বোর্ডিং-এর লোহার খাটে ঘুম ভাঙতেই শিলং-এ গত বছরের জন্মদিনের কথা মনে পড়ে কান্না পাচ্ছিল। সারা দিন কাটল বছরের অন্য ৩৬৪টা দিনের মতো। জীবনে এই প্রথম এমন হল। শিলং-এ সকাল থেকে মা ভাইবোনরা মজার মজার কথা বলত, ছোট ছোট উপহার দিত, বিকেলে বন্ধুবান্ধবরা আসত, লুচি আলুরদম মাছের চপ, চাটনি, পায়েস খাওয়া হত। সবাই চলে গেলে এত ক্লান্ত হয়ে পড়তাম যে সন্ধ্যে হতেই লেপের তলায় ঢুকে, এই সুন্দর দিনটার কথা ভেবে মনটা খুশিতে ভরে যেত। ভাবতাম সমস্ত বছরের মধ্যে এই দিনটি একান্ত আমার নিজের দিন। আজ পর্যন্ত সেই মধুর চিন্তার খানিকটা আমার মনে লেগে আছে। সেই একটা জন্মদিন ফাঁকা রয়ে গেল।

তবে ফাঁকা শেষ পর্যন্ত থেকে গেল না। শনিবার যেই গড়পাড়ে পৌঁছলাম, আদরে উপহারে অভিভূত হলাম। সামান্য ছোট ছোট জিনিস। একটা নতুন সুতির কাপড়, একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স-ভরা পুঁতি—তাই দিয়ে কত সুন্দর জিনিস যে তৈরি করেছিলাম তার ঠিক নেই—খুদে একটা জাপানী হ্যাণ্ডব্যাগ। বড়দা কত ঠাট্টা-তামাসা করলেন। বিকেলে পায়েস রান্না হল, বড়মাসিমা এসে সুন্দর একটা মিনে-করা বাক্স দিলেন। নোটন আমার গালে চুমো খেল। সব দুঃখ দূর হয়ে গেল।

তার ওপর সন্ধ্যেবেলায় মাসিমাকে মা বললেন, "দিদি, চক্রবেড়ে রোডে তিন মাসের জন্য একটা বাড়ি পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উনি এসে পড়বেন, তখন পাকাপাকি একটা জায়গা ঠিক করা যাবে।" দিদি আমি লাফিয়ে উঠলাম। তাহলে আর কতদিন বোর্ডিং-এ থাকতে হবে ? শুনলাম ঈস্টারের আগে

পর্যন্ত। যেই মনে আশার আলো দেখলাম, অমনি দিনগুলোর যেন পাখা গজাল। বোর্ডিং আর তত খারাপ লাগত না। অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছিল। দেখতে দেখতে ঈস্টার এসে গেল।

ছবির মতো ৫৭ বছর আগেকার চক্রবেড়ে রোড়ের ওপর সেই ছোট্ট বাড়িটার কথা মনে পড়ে। ৪৫ টাকা ভাড়া ছিল। সামনের একটা অংশ, সেখানে যাঁরা থাকতেন তাঁরা আবার ছোট-মেসোমশায়ের আত্মীয়। পিছনের অংশে আমরা উঠলাম। খিড়কি-দোর দিয়ে ঢুকতে হত ; দরজার ওপর গোলাপী ফুলের লতা। ভিতরে পরিপটি করে বাঁধানো ছোট্ট উঠোন। তার ধারে ধারে পেয়ারাগাছ, লেবুগাছ, নারকেলগাছ। তিনতলা বাড়ি। নিচে রান্নাঘর, খাবারঘর, বসবারঘর। দোতলায় একটি ঘরে তালা দেওয়া আর দুটি শোবার ঘর; একটি স্নানের ঘর। তিনতলায় একটি ছোট ঘর, সেটি যামিনীদা দখল করল আর একটি একদিক খোলা ঘর, চমৎকার খেলা-ঘর হয়। কিন্তু সেখানে একটু জোরে কথা বললেও যামিনীদা রেগে যেত। সৌভাগ্যের বিষয় বেশির ভাগ সময় যামিনীদা একতলায় ব্যস্ত থাকত।

আমাদের স্কুলের খুব কাছে ছিল ঐ বাড়ি। আমরা হেঁটে স্কুলে যেতাম। দাদা কল্যাণ হেয়ার স্কুলে আগেই ভরতি হয়েছিল, এবার নয় বছরের অমিকেও ভরতি করা হল। গৃহ-হারা পাখির মতো আমরা আবার নিজেদের বাসা পেলাম। সুখী হতে কতটুকুই বা লাগে ? একটা নিরাপদ ছাদের তলায় কয়েকটা মানুষ, যারা পরস্পরের সঙ্গে স্নেহের সম্পর্কে বাঁধা। আর চারটি খাওয়া-পরার সংস্থান। কোন জায়গা, কেমন বাড়ি, তার বাগান আছে কি না, রাস্তাটা ভালো কি না, এ-সব হল তুচ্ছ কথা। ঐ বাড়িতে আমরা আসল জিনিসগুলি সব পেলাম। বাবাকে ছাড়া। আমাদের রাগী বাবাকে কাছে না পেয়ে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু বাড়িটাকে বেজায় ভালো লাগত। শিলং-এর গন্ধ মাখা বাসনপত্র ; চেনা খেলনা, বই, ছবি, ফুলদানি। বাড়ি আবার কাকে বলে ? আরেকটা মজার জিনিস হল, খেলনাগুলোকে আর ভালো লাগত না। খেলনার বয়স পার হয়ে গেছিলাম।

তবে মাত্র দেড় মাস ছিলাম ওখানে। তারই মধ্যে রসা রোডে একটা ফ্ল্যাটের খবর পেয়ে, মা কার সঙ্গে যেন গিয়ে দেখে পছন্দ করে, একেবারে টাকা জমা দিয়ে এলেন। আমাদের ঘরকুনো মা দরকার হলে সব করতে পারতেন। বাবা এসে আসবাব কিনে বাড়ি সাজিয়েছিলেন। ঐ বাড়িতে আমরা ৬ বছর কাটিয়েছিলাম।

॥ ১৫ ॥

চক্রবেড়ের বাড়িতে থাকতে থাকতে হঠাৎ একজন দূরের মানুষ খুব কাছে এসে পড়লেন। তাঁর নাম ছিল সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, তিনি আমার বড় মেসোমশাই।

বড় মেসোমশাইয়ের কথা আগে বললেও, তাঁকে আগে কখনো ভাল করে দেখিনি, কথাবার্তা তো বলিইনি। এই সময় তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তাঁর অনুশীলনের বিষয় ছিল ফিজিক্স, পদার্থবিদ্যা। সে বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকলেও, এমন সাহিত্যানুরাগী মানুষ আমি কম দেখেছি। তার ওপর অপূর্ব গানের গলা ছিল, সঙ্গীত সাধনাও করেছিলেন। মনে হত ফিজিক্স তাঁর জীবিকা আর শিল্প তাঁর জীবন। এমন গুণগ্রাহী মানুষও খুব বেশি হয় না।

মাথায় খুব লম্বা ছিলেন না, রঙ ছিল শামলা, মাথায় মস্ত টাক, পুরু কাচের চশমা না পরলে ভালো করে দেখতে পেতেন না, অনুভূতি ছিল গভীর, দৃষ্টি ছিল কবির। নিজেকে কখনো লোকের দৃষ্টিগোচর করতে চাইতেন না। প্রবাসী ভারতবর্ষে তাঁর সুন্দর সুন্দর কবিতা বেরোত, রচয়িতার নাম থাকত সুরেশ্বর শর্মা। একবার ঐ রকম একটা কবিতা পড়ে বড্ড ভালো লেগেছিল। রচয়িতা কে তখনো জানি না, কথায় কথায় মেসোমশাইকে কবিতা ভালো লাগার কথা বলেছিলাম। তাঁর চোখ দুটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কি যে খুশি হয়েছিলেন সে আর কি বলব। গভীর সুরে বলেছিলেন, "তাকে চেনো না ! সে যে তোমার মেসোমশাই।" নিজের মেয়ে নোটন ছিল তাঁর অন্তরের ধন, কিন্তু পরের মেয়েকে যতখানি ভালোবাসা যায়, মেসোমশাই আমাকে তার চাইতেও বেশি ভালোবাসতেন। খালি খালি বলতেন, "তুমি যদি আমার মেয়ে হতে আমি যে কত সুখী হতাম।" আমিও মেসোমশাইকে খুবই ভালোবাসতাম, কিন্তু সর্বদা টের পেতাম আমার ঐ রাগী বাবা ছাড়া কেউ আমার বাবা হতে পারত না। আমার শিরার মধ্যে দিয়ে আজ পর্যন্ত আমার বাপের বংশের রক্ত প্রবল বেগে ছোটে। অথচ সারা জীবন তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে কাটিয়েছিলাম।

মেসোমশাইয়ের সেই প্রথম আমাদের বাড়িতে আসার কথা বেশ মনে আছে। একটা শনিবার, বিকেলের দিকে, ঘেমে ঝোল হয়ে মেসোমশাই দু বাক্স পেলিটির কেক নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন। নাকি অনেক খুঁজতে হয়েছিল। পরে বুঝেছিলাম কোনো জিনিস খুঁজতে ওঁর কোনো দিনই আপত্তি ছিল না। পেলে অবিশ্যি অনেক সময় হারিয়ে ফেলতেন। বড় মাসিমা যখন শিলং-এ ছিলেন, মেসোমশাই তখন বিলেতে। যতদূর মনে হয় ১৯১৭ সালে আই-ই-এস হয়ে ফিরে, প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন। মাসিমা তাঁকে আমার ছোটবেলাকার গল্প বলার কথা বলে থাকবেন। মেসোমশাই সেই দিনই আমাকে বলেছিলেন, "তুমি নাকি গল্প বলে সবাইকে বশ কর ? আমাকেও কর না।" কোনো দিনও তাঁকে গল্প বলেছি বলে মনে হয় না, তবে তাঁদের বাড়িতে অনেক ছুটি কাটিয়েছি, ইংরিজি বাংলা বই সম্বন্ধে অনেক গল্প করেছি। চমৎকার অনুবাদ

করতেন, ইংরিজি থেকে বাংলায়। তাঁর 'ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা,' 'জাপানী ঝিনুক' ইত্যাদি গ্রন্থ অতি উঁচুদরের লেখা। যতদূর মনে হয় নিজে খরচ করে ছাপতেন। দুঃখের বিষয় কাব্য রচনায় যতটা দক্ষ ছিলেন, বই বিক্রিতে ততটা ছিলেন না। তাঁদের বাড়িতে মেসোমশায়ের ভাল ভাল বই পড়ে থাকতে দেখেছি। কিন্তু তাঁর ভক্তের অভাব ছিল না, যে কাছে আসত সে-ই তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু হয়ে পড়ত। এঁদের দলটি নেহাৎ হালকা ছিল না ; সে সময়কার বিদ্বৎ-জনদের অনেকেই কোনো না কোনো সময় মেসোমশায়ের বাড়িতে দেখেছি।

তাঁদের মধ্যে অনেক তাঁর অধ্যাপক জীবনের শুরুতে তাঁর ছাত্র ছিলেন, পরে আজীবনের বন্ধু হয়ে গেছিলেন। অনেকেই বিজ্ঞানের সাহিত্যানুরাগী ছাত্র, অনেকে খাঁটি বৈজ্ঞানিক, আবার অনেকে বিজ্ঞানের ধার ধারতেন না, খাঁটি সাহিত্যিক ছিলেন। স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞান ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, কালিদাস নাগ, দিলীপকুমার রায়, হিরণকুমার সান্যাল ইত্যাদি এই দলে ছিলেন। আরো অগুনতি অখ্যাত তরুণ তাঁর কাছে আসত, একটু উৎসাহ, উদ্দীপনার জন্য।

বেশির ভাগ অধ্যাপক প্রগলভ্ হন, মেসোমশাই নিজের মনের মানুষদের মধ্যিখানে ছাড়া বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু সকলের কথা উপভোগ করতেন। চোখদুটি কৌতুকে মিটমিট করত, চাপা ঠোঁটে একটা বঙ্কিম রেখা দেখা যেত। পি-ই-এনের আড্ডায় যেতেন, পরিচয় গোষ্ঠির সঙ্গে মিশতেন। পরে তাঁদেরই কারো কারো স্মৃতিকথা পড়ে বুঝেছি এই সুগভীর কিন্তু চাপা মানুষটিকে হৃদয়ঙ্গম করবার ক্ষমতা তাঁদের অনেকের ছিল না।

দরকার হলে মেসোমশাই ধারালো একটা সোনার ছুরি। একবার মাসিমার সঙ্গে ট্রেনে কোথাও যাবার পরিকল্পনা করতে গিয়ে বললেন, "ঐটুকু খোলা মোটরে গেলেই হবে, চাঁদনি রাত, চমৎকার বনভূমি— ।" আমরা শুনে কিছু বলার সাহস পাইনি হয়তো পরস্পরের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে থাকতে পারি। কিন্তু সেটি মেসোমশায়ের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি অমনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছিলেন,"কি ?' কথাটা শুনে হাসি পেল বুঝি ? মনে হচ্ছে বুঝি আধ বুড়োদের শখ দেখ ! চাঁদের আলো উপভোগ করতে চায় ! ওরে, চাঁদের আলো উপভোগ করতে হলে তার পেছনে আজন্মের অভিজ্ঞতার অনুরণন চাই। তোদের আনন্দ তো বালি-পোরা বেহালার সুরের মতো ঢপ্-ঢপ্ করে। চাঁদের আলো উপভোগ করিস্, নাকি তার আনুষঙ্গিকগুলোকে উপভোগ করিস ?"

তখনি বুঝেছিলাম কথাটা ঠিক ; কিন্তু মেসোমশায়ের মুখে এত কড়া মন্তব্য আশা করিনি। কেউ কোনো উত্তর দিলাম না দেখে, মেসোমশাই একটু আহত হয়ে, অন্য কথা পাড়লেন।

১৯২০-২২ সালে মেসোমশাই শিবপুরে থাকতেন। প্রথমে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ির একতলায়, পরে তার পাশের বড় বাড়িতে। ছোটবাড়ির দোতলায় স্যার কে-জি গুপ্তর ছেলে বীরেন গুপ্ত থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন অ্যামেরিকান ; তাঁদের তিনটি লাবণ্যময়ী মেয়ে ছিল। তারা বাংলা-টাংলা বলত না। কিন্তু ভারি মিশুকে আর ফুর্তিবাজ ছিল। আমাদের সঙ্গেও বেশ ভাব হয়ে গেছিল।

ওদের মা ভারি সুগৃহিণী ছিলেন। আমার মা-মাসিকে মাঝে মাঝে সাংসারিক উপদেশ দিতেন। বয়সে বোধহয় তাঁদের সমান-সমানই ছিলেন। আমার তো জ্যাঠামি করার কুখ্যাতি ছিলই, বড়দের কথা ভারি উপভোগ করতাম। তাছাড়া বারো-তেরো বছরের মেয়েরা না-ছোটো না-বড়ো হয়। তারা অনেক কথাই বুঝতে পারে ! এবং বড়দের কথায় অশেষ আনন্দ পায়। মনে আছে একবার মিসেস্ গুপ্তকে মা-মাসীমাকে বলতে শুনেছিলাম, "সম্পূর্ণ সুখী হতে হলে স্বামীর সঙ্গে কক্ষনো তর্ক কর না। কে না জানে পুরুষরা কিচ্ছু বোঝে না, কেবল বাজে কথা বলে। কখনো তর্ক কর না আর কাজের বেলায় নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতেও ছেড়ো না। ওরা কিছুতেই এসব করে না। তর্ক করতে গেলেই ওদিকে নজর যায়।" এ-যে কি চমৎকার বাস্তব বুদ্ধি, অনেক বছর পরে, আমি সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম। আমার মা অবিশ্যি বাবার সঙ্গে তর্ক করা, কিম্বা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। তাই বলে নিজের মতটাও সহজে বদলাতেন না। কথা না বললেই কি আর মত বদলায় ?

মেসোমশায়ের কাছে আমি উদারতার শিক্ষা পেয়েছিলাম। তাঁর আলমারিতে কত রকম বই ছিল তার ঠিক নেই। তাঁর ভাবখানা ছিল যে সকলের বক্তব্যটা শোনই না, কাজের বেলা নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে কর। আমার মাসিমা অতটা উদার ছিলেন না। মনে আছে দিদির জন্মদিনে আমাদের বুলাদা রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ উপহার দিয়েছিল। মাসিমা এক্কেবারে শক্‌ড্। একজন ইয়ং ম্যান কি বলে অনাত্মীয়া অল্পবয়সী মেয়েদের এ-ধরনের বই দেয় ! কথাটা মাকে না বলেও পারলেন না। মাসিমা মাকে সব কথা বলতেন। মা শুধু তাঁর ছোট বোন ছিলেন না, অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলেন, যাকে সব মনের কথা বলা যায়।

মা পড়ে গেলেন মুশকিলে। আমাদের পরিবারের সবাই জানত বুলাদা অন্য ইয়ং ম্যানদের মতো নয়, ওর সঙ্গে আমাদের আলাদা সম্বন্ধ। এক দিন ও আমাদের ছোট জ্যাঠামশায়ের জামাই হবে। কিন্তু কথাটা তখনো প্রকাশ্য নয়। মাসিমাকে মা কি বলেছিলেন জানি না, তবে মাসিমা ও বিষয়ে আর কিছু বলেন নি। অন্য বিষয়ে আপত্তি তুলেছিলেন। গল্পগুচ্ছের সব গল্প ছোটদের যোগ্য নয়। মা একটু হেসে বললেন, "তেমন ছোট আর কোথায়, তেরো চোদ্দ বয়স

হল। ওরা তো সব পড়ে, শরৎবাবুর বই-ও।" মাসিমা প্রায় মুচ্ছো যান আর কি! শেষটা কিছু না বলে দিদির নতুন বইগুলির গোটা আষ্টেক গল্পের পাশে ছোট ছোট দাগ দিয়ে নোটনকে বললেন, "তুমি এগুলো পড়বে না।" নোটনের বাংলা বই পড়ার কোনো আগ্রহই ছিল না, কিন্তু দিদি আর আমি সেই গল্প-গুলোকে খুঁটিয়ে পড়েও আপত্তিকর কিছু আবিষ্কার করতে পারিনি।

এই প্রসঙ্গে এর প্রায় ত্রিশ বছর পরের একটা ঘটনা না বলে পারছি না। আমার কন্যার তখন এগারো বছর বয়স। একদিন দেখি স্কুলের লাইব্রেরি থেকে একটা রঙচঙে বই নিয়ে এসেছে। আমি দূর থেকে দেখে জিজ্ঞাসা করাতে বলল, "এটার নাম শ্রীকান্ত।" আমি একটু আশ্চর্য হয়ে বললাম, "প্রথম খণ্ড আশা করি?" মেয়ে বলল, "না, না, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড।"

আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না, এমন সময় মেয়ে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই, মা, এতে খারাপ কিছু থাকলেও আমি বুঝতে পারব না, কারণ এটা হিন্দীতে লেখা!" আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। মনে পড়ল মা বলতেন, "সব বই সবাই পড়ুক। নোংরা বই বাড়িতে এনোই না।"

আমাদের দুই পিসির কথাও বলতে হয়। দুজন একেবারে দু রকমের। বড় পিসিমা মোটা বেঁটে, থান পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, চুল ছাঁটা, কড়া গলা, কড়া মেজাজ, লেখা-পড়া বিশেষ জানতেন না, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল আর ভারি স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। তার ওপর গায়ে বেজায় জোর ছিল এবং দরকার মনে করলে ছেলেপুলেদের ওপর সেটা প্রয়োগ করতে একটুও আপত্তি ছিল না। সব্বাই তাঁকে ভয় করত। এক বড় জ্যাঠামশাই ছাড়া। পিঠো-পিঠি দুজন পরস্পরকে বুদ্ধি করে সমীহ করেই চলতেন। ছোটবেলায় বাবাদের ধরে বেজায় পেটাতেন।

ছোটপিসিকে আমরা ডাকতাম সোনা-পিসিমা। সেকালে ময়মনসিংহের ডাকগুলো বড় মিষ্টি ছিল। বাড়ির বড়দা হলেন ঠাকুরদা, মেজদা হলেন ছোট্-ঠাকুরদা, সেজদা হলেন সুন্দরদা, তারপর রাঙ্গাদা, ধনদা, ফুলদা, ইত্যাদি। মিষ্টি মিষ্টি আদরের ডাক। আমাদের সময়ে আমাদের কলকাতাবাসী পরিবারের ডাকগুলোর অনেকটা অদলবদল হয়েছিল। ঠাকুরদা, ছোট-ঠাকুরদা ধোপে টেকেনি; কিন্তু বাকিগুলোর কিছু কিছু টিকে গেছিল। বড় পিসিমার মেয়ে ছিলেন কালো, লম্বা, বেশ ষণ্ডাগোছের আর তাঁকে আমরা বলতাম সুন্দরদি। চেহারা যাই হক, মানুষটি বড় সুন্দর ছিলেন। বড়-পিসিমা, সোনা-পিসিমা, সুন্দরদি—সকলেরি ভারি রসবোধ ছিল। কেউ কোনো জন্মে স্কুলে যাননি। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের মতামত শুনে বারেবারে আশ্চর্য হতাম। শিল্পী হেমেন মজুমদার আমাদের আত্মীয়। ঠাকুমার বোনের নাতিটাতি হবেন। সে-সময় তাঁর ভারি জনপ্রিয়তা; অনেক মাসিকপত্রে তাঁর আঁকা ছবি বেরুত।

খুব ভালো আঁকতেন, কিন্তু অনেক ছবিতেই দেখা যেত সুন্দরীরা হয় পুকুরে নেমেছেন, নয়তো জল থেকে উঠে ঘাটে দাঁড়িয়েছেন, কিম্বা ঐ ধরনের কিছু। বড় পিসিমা কালি কলম দিয়ে সেই মেয়েগুলোকে ব্লাউজ পরাতেন। একবার বড় জ্যাঠাইমশায়ের বাড়িতে কোনো বিয়ে-টিয়ে উপলক্ষ্যে হেমেন মজুমদার এসেছেন। 'বড়-পিসিমাকে দেখেই এক গাল হেসে বললেন, "আপনি নাকি আমার মেয়েদের ব্লাউজ পরান ?"

বড়-পিসিমা তেরিয়া হয়ে বললেন,"ভগবান তোকে এত বড় ক্ষমতা দিছেন তো ওগুলানরে জলে চুবাইয়া খাড়া করস্ ক্যারে ?"

হেমেন মজুমদার একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "আমরা হলাম শিল্পী, লোকের যেমন রুচি—" বড়-পিসিমা তাতে আরো রেগে বললেন,"শিল্পীর কাম লোকের মন্দ রুচি অনুসরণ করণ, নাকি রুচি তৈরি করে দেওন ?" সারা জীবন পূর্ব-বঙ্গের পাড়াগাঁয়ে কেটেছিল, সেরকম লেখাপড়া শেখেননি, বাল-বিধবা, অথচ এই ধরনের একেকটা কথা বলতেন। মাসে মাসে বাবাকে একখানি পোস্ট কার্ড লিখতেন, তার সম্বোধন ছিল 'প্রাণাধিক শম্ভু'। আমরা তাই নিয়ে হাসাহাসি করতাম, কিন্তু এখন মনে পড়ে চিঠিতে কখনো একটি বানান ভুল থাকত না। বই ছাড়া বড়-পিসিমার এক দিনও চলত না, রামায়ণ মহাভারত তো ছিলই, তাছাড়া ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স থেকে প্রকাশিত যাবতীয় বই বোধহয় পড়তেন। একবার তাঁর পড়বার চশমাটি নিখোঁজ হয়ে গেল। বড় পিসিমা পড়লেন মহা মুস্কিলে, বাড়িসুদ্ধ সকলে তটস্থ। পরদিন সকালবেলায় ময়মনসিংহ শহর থেকে বড় স্যাকরা পিসিমার সোনা বাঁধানো চশমাখানি নিয়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বড়খোকা এইটি বন্ধক দিয়ে দশ টাকা নিয়ে কলকাতা গেলেন।" বড়খোকা হল পিসিমার মা-বাপ-মরা বড় নাতি। তার সে দিন মামার বাড়িতে যাবার কথা ছিল। তাই কেউ খোঁজ করেনি। তার উপর রাগ করা পিসিমার পক্ষে ছেলেকে খুঁজে পেতেও বিশেষ অসুবিধে হয়নি। মোল্লার দৌড় তো মসজিদ্ পর্যন্ত। সে-ও শিয়ালদা স্টেশনে নেমে গুটি গুটি রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রীটে আমার সুন্দর জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠেছিল। তাকে চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, নিউ-মার্কেট, বায়োস্কোপ দেখিয়ে দিয়ে কার সঙ্গে যেন আবার দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

দেশ। আমাদের বাড়ির সবাই ময়মনসিংহকেই দেশ বলত। আমরা জন্মেছিলাম কলকাতায়, জীবনে কখনো ময়মনসিংহে যাইনি, তবু দেশ বলতেই আম-কাঁঠালের বনে ঘেরা, বড়-বড় পুকুর-ওয়ালা একটা গ্রামের কথা মনে হত। শেষ পর্যন্ত সেখানে যাওয়া হয়নি। তবে মা-বাবার আর জ্যাঠাদের কাছে আর পরে বড়-পিসিমার আরেক নাতি, অশোকের কাছে এত গল্প শুনেছি যে আজ অবধি বিশ্বাস করা কঠিন যে সেখানে কখনো যাইনি।

বাবারা নিজেদের মধ্যে বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন। বড়-জ্যাঠামশায়ের, সুন্দর জ্যাঠামশায়ের বড়ির ছেলেমেয়েরাও তাই বলত। যে-বাড়ির মায়েরা এ-দিককার মেয়ে তারা বলত না। তবু আমাদের সকলের কথার মধ্যে দুটো-একটা লাগসই বাঙাল শব্দ ঢুকে যেত। যদিও পূর্ব-বঙ্গীয় টান একটুও ছিল না। সুন্দর দেখতে জিনিস হল 'বাঁক্কা,' বোধ হয় বঙ্কিম থেকে। লাগসই হল 'যুইৎ', বোধহয় যুৎ সই থেকে। 'যুইৎ' পাচ্ছি না মানে 'সুবিধে পাচ্ছি না।' 'বেবাক' কথার তো সব জায়গায় চল আছে। অনেক আরবি ফারসি শব্দ পূর্ববঙ্গের ঘরোয়া ভাষায় চলে গেছে। বড় সরস মিষ্টি ময়মনসিঙ্গি কথা।

আমরা চক্রবেড়ে রোডের বাড়িতে থাকতে থাকতে একদিন ছোট জ্যাঠামশাই এসে বললেন, ঠাকুমা এসেছেন, বড়-জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠেছেন, আমাদের দেখতে চেয়েছেন। এর আগে ঠাকুমাকে যদি দেখেও থাকি তো মনে নেই। তবে আমাদের বাড়িতে ঠাকুমার একটা বড় ফটো ছিল, সেটির মধ্যে আমি নিজের সঙ্গে আদল খুঁজে পেতাম। এবার বড় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে ভালো করে দেখলাম। দোতলার চওড়া বারান্দায় একটি মোড়ার ওপর থান পরে, পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে বসে ছিলেন। সামনে আরেকটা মোড়ায়, লম্বা হাতা আদ্দির জামা আর তসরের থান পরে সোনা-পিসিমা বসে ছিলেন। ঠাকুমা থেকে থেকে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল আর কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। সোনা-পিসিমার বয়স তখন বছর চল্লিশ হবে, সদ্য বিধবা হয়েছেন। ঠাকুমা হয়তো মেয়েকে থান-পরা অবস্থায় দেখেননি। এই মেয়ের যখন বছর দেড়েক বয়স, ঠাকুমাও বিধবা হয়েছিলেন। বড় জ্যাঠামশায়ের হয়তো বছর বাইশ বয়স ছিল, বিয়ে হয়েছিল, গণিতে ও সংস্কৃতে ডবল এম্-এ, অধ্যাপনা করেন। তিনিই তখন বাড়ির কর্তা। বাবা আর সোনা-পিসিমা বাপকে মনে করতে পারতেন না। স্নেহে এবং কড়া শাসনে বড় জ্যাঠামশাই একাই একশো ছিলেন। তবে তাঁকে কর্মস্থলে থাকতে হত। দেশের বাড়িতে বাবার আর সোনা-পিসিমার শৈশব কেটেছিল, পরস্পরের সঙ্গে মারামারি করে। বাবা দেখতে মোটা-সোটা ছিলেন বলে, তাঁকে দাদা বলে না ডেকে, সোনা-পিসিমা বলতেন 'লাউয়া' আর পেট্‌নাই খেতেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল বিখ্যাত 'কুন্তলীন' প্রস্তুতকারক হেমেন্দ্রমোহন বসুর সঙ্গে। তাঁর ছেলে নীতিন বসু, মুকুল বসু, সিনেমা জগতে স্বনামধন্য। গণেশ বোস্, কার্তিক বোস, ক্রিকেটের মাঠের রত্ন। তাঁর মেয়ে মালতী ঘোষাল আর ললিতা দাস সুগায়িকা।

কিন্তু সেদিন বিকেলে দেখলাম ছোট মেয়েটি হয়ে মায়ের হাঁটুর কাছে বসে আছেন। পাৎলা ছিপছিপে চেহারা, নিটোল গড়ন, এক মাথা ঘন কালো চুল।

কে বলবে চোদ্দটি সন্তানের জননী। চমৎকার ছবি আঁকার হাত ছিল সোনা-পিসিমার। পরে অনেক আদর পেয়েছি তাঁর কছে। তবু সেদিন মনে হয়েছিল আমরা কেউ কিছু না। ঠাকুমাকে পিসিমাকে প্রণাম করা হল, মাদুর পাতা ছিল, তাতে বসা হল। ঠাকুমা দেশ থেকে ক্ষীরের নাড়ু, নারকেলের ইচা-মুড়া ইত্যাদি এনেছিলেন। সে-সব খাওয়া হল, পুঁটলি বেঁধে নেওয়া হল। আমসি নেওয়া হল। কিন্তু ঠাকুমা কোনো দিন আমাদের গায়ে হাত দিয়ে আদর করেছেন বলে মনে পড়ে না। কখনো আলাদা করে আমাদের সঙ্গে বোধ হয় কথাও বলেননি। পরের বছর ৮০ বছর বয়সে মারা গেছিলেন। জ্যাঠামশায়ের ঐ বাড়িতে এসে। অনেক দিন থেকে পেটের ক্যান্সারে ভুগছিলেন। মায়ের কাছে শুনেছি বড় জ্যাঠাইমা আর সুন্দর জ্যাঠাইমা ছাড়া, বাকি তিন বৌকে নিয়ে ঠাকুমা ভারি বিব্রত হয়ে পড়তেন। তিনজনেই বামুনের মেয়ে। তাদের প্রণাম নিলে যদি পাপ হয়। তবে তিনজনের মধ্যে মায়ের স্থান একটু আলাদা ছিল। মায়ের মা মারা গেলে, বাপ সন্ন্যাসী হলেন। উপেন্দ্রকিশোর তাঁর বন্ধু ছিলেন, পাশের ঘরে থাকতেন। তিনিই মাকে মানুষ করার ভার নিলেন। অন্য দুই বোন দুই জায়গায় গেল। ছোটবেলায় কোনো সময় চুল কামানো হয়েছিল বলে মায়ের ডাকনাম ছিল ন্যাড়া। সুন্দর জ্যাঠামশাই, ছোট জ্যাঠামশাই চিরকাল তাঁকে ঐ নামে ডেকে গেছেন। তুই ছাড়া তুমি বলেননি। ভাসুর হয়েও না। ঠাকুমাও মায়ের প্রণাম নিতেন।

বড় জ্যাঠামশায়ের আমহার্স্ট রো-র ঐ চক মেলানো পুরনো ভাড়া বাড়িটাতে যে ভূতের উপদ্রব ছিল, সে কথা আমাদের সমবয়সী দিদিরা, ভাইপোরা প্রায়ই বলত। তবে তাতে বোধ হয় জ্যাঠামশায়ের কিছু এসে যেত না। অন্য কারো কিছু ক্ষতি হয়েছিল বলে শুনিনি। মাঝখান থেকে আমরা যথেষ্ট রোমাঞ্চ উপভোগ করেছি।

বড় জ্যাঠামশায়ের চার ছেলে ছিলেন, মনোরঞ্জন, রোহিণীরঞ্জন, সুধীরঞ্জন, কুমুদরঞ্জন। এঁদের মধ্যে একমাত্র কুমুদরঞ্জন তাঁর সংস্কৃত বিদ্যা, বিশেষ করে তাঁর আর্য়ুবেদ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। এঁরা কেউ নেই, তবে এঁদের ছেলেমেয়েরা আছে। বড় জ্যাঠামশায়ের চার কন্যাও ছিলেন। তিনজন এখনো আছেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি, তখন বড় জ্যাঠামশায়ের বাড়ি, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি, আত্মীয়-অনাত্মীয়, আহুত-অনাহুতে গমাগম করত। পিঁড়ি পেতে খাওয়া হত, মাদুরের ওপর বিছানা পেতে অনেকে শুত। সকলের এক ব্যবস্থা ছিল, ব্যবহারের তারতম্য ছিল না। জ্যাঠাইমাও অসাধারণ মেয়ে ছিলেন।

॥ ১৬ ॥

ঐ যেমন বললাম, দুই পিসিমা, গিরিবালা আর মৃণালিনী, দুজনার চেহারায় ও স্বভাবে কোনো মিল ছিল না। কিন্তু সাদৃশ্যও যথেষ্ট ছিল। দুজনের সমান রন্ধন-পটুত্ব, সমান মেজাজ, সমান রসবোধ। সোনা-পিসীমা নিজে নিজে ইংরিজি শিখেছিলেন। কলকাতায় তাঁর জীবন কেটেছিল। বয়সে ছিলেন বড়-পিসিমার একমাত্র মেয়ে বিদ্যুল্লতার সমান। বিদ্যুল্লতাই আমাদের সুন্দরদি। তফাৎ আরো ছিল। বড় জ্যাঠামশাই আর বড় পিসিমা গোঁড়া হিন্দু। সোনা-পিসিমার হিন্দুমতে বিয়ে হলেও, পিসেমশাই হলেন আনন্দমোহন বসুর ভাইপো এবং নিজেও ব্রাহ্ম-ঘেঁষা। পরে এঁদের ছেলেমেয়েদেরো ব্রাহ্মমতে বিয়ে হয়েছিল। একবার বড়-পিসিমারা যখন দল বেঁধে পুরী-ভুবনেশ্বরে তীর্থ করতে গেলেন সোনা-পিসিমাও ওঁদের সঙ্গে ঝুলে পড়লেন। তবে সেটা জগন্নাথ দর্শনের আকর্ষণে, নাকি সমুদ্র দেখার আকর্ষণে, সেটা বলতে পারলাম না। সমুদ্র-স্নানে সোনাপিসি যে খুব আগ্রহী ছিলেন, তা মনে হত না। কারণ একটা ঘটি নিয়ে সমুদ্র-স্নানে যেতেন। এবং যেখানে বালির ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ে, তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে বসে পড়তেন। থেকে থেকে ঢেউয়ের স্রোত এসে তাঁকে ঘুরিয়ে, সারা গায়ে বালি মাখিয়ে দিত। পিসিমা অমনি দু ঘটি বালি সুদ্ধ জল মাথায় ঢেলে উঠে পড়তেন। তারপর বাড়ি ফিরে অনেকক্ষণ ধরে তোলা জলে স্নান করতেন। কিন্তু হাজার হক শিল্পী মন ছিল, সাগর দেখেই সুখ।

ঐখানেই হাঙ্গামার শেষ নয়। বড়-পিসিমা অনেক টাকা খরচ করে পুজো দিয়ে মহাপ্রসাদ নিয়ে এলেন। এই মহাপ্রসাদ কালীভক্তদের মহাপ্রসাদ নয়। এ প্রসাদে একশো রকম মিষ্টি থাকে শুনেছি। সোনা-পিসিমা তাই দেখে মহা খুশি হলেন। রাতে দু-হাত পেতে একটি মাত্র মিষ্টি নিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন। তারপর ভোর থেকে মহা বিপদ। দৌড়োদৌড়ি। নাড়ি ছেড়ে যায় আর কি। ডাক্তাররে! ওষুধরে! সন্ধ্যেবেলায় সোনা পিসিমা একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসলে পর, বড় পিসিমা ফোঁস্ করে নাক দিয়ে ছোট একটা নিশ্বাস ছেড়ে কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আমি আগেই জানি, ভগবানের প্রসাদ ব্রাইহ্মের প্যাটে সইব না।'

বড় পিসিমা গোঁড়া হিন্দু হলেও, আমাদের বাড়িতে এসে মাঝে মাঝেই থেকে যেতেন। গোড়ায় নিজে রেঁধে খেতেন। পরে আমার মায়ের হাতেও খেতে আপত্তি করতেন না। বলতেন, 'বামুনের মেয়ের হাতে খাব না তো কার হাতে খাব।' অবিশ্যি ঠাকুমা কিম্বা দেশের অন্য আত্মীয়রা কলকাতায় এলে, বড় জ্যাঠামশায়ের বাড়িতেই সাধারণত উঠতেন।

তখন মনে হত বড় জ্যাঠামশাই বেজায় বুড়ো। এখন বুঝি সে রকম কিছুই

বয়স হয়নি। বড় জোর ৬৩ মতো হবেন। কিন্তু এমনি গম্ভীর প্রকৃতির আর কড়া মেজাজের মানুষ যে বয়সের তফাৎটাকে অলঙ্ঘ্যেয় বলে মনে হত। মাথায় বাবার চাইতে খানিকটা বেঁটে, এক মুখ সাদা দাড়ি-গোঁফ। বলিষ্ঠ শরীর, পেশীগুলো লোহার মতো শক্ত। প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে, আমহার্স্ট রো থেকে হেঁটে গঙ্গার ওপর জগন্নাথ ঘাটে গিয়ে স্নান করে আসতেন। আমরা গড়পারে থাকতে একটা সোমবার, ছোট জ্যাঠামশাই আমাকে সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে ট্রাম ধরা হবে। দিদির জ্বর, আমি একাই বোর্ডিং-এ ফিরছি। মাঝপথে ফতুয়া গায়ে, হাতে ছোট্ট একটা পেতলের কমণ্ডলু ধরা, এক বুড়োর সঙ্গে দেখা।

বুড়ো বললেন, 'কার পুঁড়ি ?' ছোট জ্যাঠা বললেন, 'শম্ভুয়ার।' তারপর আমাকে বললেন 'প্রণাম কর। উনি বড় জ্যাঠামশাই।' বড় জ্যাঠামশাই বললেন, 'থাক, থাক, গঙ্গাস্নান করে এসেছি। এর চেয়ে ওঁর আরো কাছে যাবার সাহস পাইনি। কিন্তু মনে মনে ওঁর নানা-গুণ নিয়ে ভারি গর্ব ছিল। যত না তাঁর জ্ঞানবিদ্যের খেলাধূলার ব্যুৎপত্তির জন্য, তার চাইতেও তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার জন্যে।

'অলৌকিক ক্ষমতা' কথাটা শুনলে তিনি হয়তো অবাক হয়ে যেতেন, আমরা কিন্তু ওঁর ছেলেমেয়েদের কাছে আশ্চর্য সব গল্প শুনতাম। জ্যাঠামশাই যখন গণিতে এম্-এ পরীক্ষা দেবেন, প্রথম দিনের আগে হল বেজায় জ্বর। কদিনের মধ্যে একবারো বইখাতা ছুঁতে পারলেন না। ঠিক আগের দিন রাতে তাই মন খারাপ করে শুতে গেছেন। রাতে স্বপ্নে দেখলেন যেন সেকালের সেনেট হাউসের একটা বড় থামের পাশে একটা থান ইঁট পড়ে আছে। তারি পাশে ওঁর সীট। উনি যেন সীটে বসে ভাবছেন, "শরীর দুর্বল, ক দিন বই ছুঁইনি, কেমন লিখব কে জানে !" এমন সময় একজন ঝোলা-গোঁফ লোক এসে প্রশ্ন-পত্র বিলি করল। উনি সেটি খুলে প্রশ্নগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল।

কিন্তু এমনি প্রখর ছিল তাঁর স্মৃতি-শক্তি যে ঘুম ভেঙেও প্রশ্নগুলি তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল। জ্যাঠামশাই আর ঘুমোলেন না ; তখনি উঠে পড়ে প্রশ্নের উত্তরগুলি ভালো করে ঝালিয়ে নিলেন। পর দিন সেনেট হাউসে ঢুকেই, দেখতে পেলেন থামের পাশে ইঁট, ইঁটের পাশে তাঁর সীট। একটু পরেই সেই ঝোলা-গোঁফ লোকটি এসে প্রশ্নপত্র বিলি করে গেল। বলা-বাহুল্য তাতে স্বপ্নে-দেখা সেই প্রশ্নগুলি। জ্যাঠামশাই অনায়াসে সবগুলোর সুষ্ঠু উত্তর দিলেন। অবিশ্যি অন্য দিনের অন্য পরীক্ষগুলোরও সমান ভালোই উত্তর দিয়েছিলেন। ঐ স্বপ্নের ব্যাপারটার কোনো বস্তব ব্যাখ্যানা দেবার চেষ্টা করব না। এই রকম একটি

অতি-প্রাকৃত ক্ষমতা আমাদের বংশের কারো কারো মধ্যে দেখা গিয়েছে। বাবা জ্যাঠামশাইদের ঠাকুরদাদা লোকনাথ রায়ের ৩৩ বছর বয়সে ইচ্ছা-মৃত্যু হয়েছিল। আমি এসব কাহিনী যাঁদের কাছে শুনেছি তাঁদের অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বড় জ্যাঠামশায়ের নানান্ গুণের মধ্যে সঙ্গীত-প্রীতি ছিল না। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের কারো কারো গানের শখ ছিল, কিন্তু তাঁর সামনে গাইবার সাহস ছিল না। শুনেছি একবার দেশ থেকে বাবাদের এক ভাগ্নে এসে, গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। ঠিক সেই সময় জ্যাঠামশাইও কলেজ থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। তাঁকে দেখেই ছোকরার গান বন্ধ হয়ে গেল, সে পাশ কাটিয়ে নেমে গিয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় দিল।

জ্যাঠামশাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ওপরে উঠে, জ্যাঠাইমাকে বললেন, "বীরুটার বোধ হয় দারুণ পেট ব্যথা। গোঙাতে গোঙাতে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল ; আমাকে দেখে, বোধ হয় ওষুধের ভয়ে পালাল। তুমি বার্লির ব্যবস্থা কর।"

বড় জ্যাঠামশায়ের প্রকৃত চেহারা দেখতে হলে খেলার মাঠে যেতে হত। এত কড়া মানুষ যে খেলাধুলোয় এত উৎসাহী হতে পারে, এ-কথা তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস হত না। তিনি বাস্তবিকই বিশ্বাস করতেন ক্লাস-রুমে সব মানুষটা তৈরি হয় না ; অর্ধেকটা হয় খেলার মাঠে। আমাদের গোটা পরিবারকে তিনি কি গভীরভাবে এ বিষয়ে প্রভাবিত করেছিলেন, সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তাঁর হাতে তৈরি দুটি মানুষের কথা বলেছি, ছোট জ্যাঠামশাই আর বাবা। আরেকজন ছিলেন আমার সুন্দর জ্যাঠামশাই, মুক্তিদারঞ্জন। ইনি এক আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগর কলেজের গণিতের অধ্যাপক। এটুকু বললে কিছুই বলা হল না। গণিত ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। আমরা যেমন অবসর বিনোদনের জন্য গল্প কবিতা পড়ি, আমার সুন্দর জ্যাঠামশাই তেমনি শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে মন ভালো করতেন। নতুন নতুন নিয়ম উদ্ভাবন করতেন। একবার সেই রকম কিছু উৎকৃষ্ট নিয়ম বিলেতের কোনো বিখ্যাত গণিত-বিশারদকে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি চিঠির একটা মামুলি উত্তর দিয়ে, নিজের বইয়ের নতুন সংস্করণে সুন্দর জ্যাঠামশায়ের নাম উল্লেখ না করেই, নিয়মগুলি ছেপে দিয়েছিলেন। যেন তাঁর উদ্ভাবন। দয়া করে জ্যাঠমশাইকে বইয়ের একটা কপি পাঠিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাই কোনো উচ্চবাচ্য করেননি।

অসম্ভব গয়ের জোর ছিল সুন্দর জ্যাঠার। বাবার কাছে শুনেছি, কোনো জিম্‌নেসিয়ামে বাবাকে আর ছোট জ্যাঠাকে নিয়ে সুন্দর জ্যাঠামশাই অভ্যাস করতে যেতেন। তাঁর প্যারালাল বারের খেলা দেখে বাবারা স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। রিং ধরে ঝুলে শরীরটাকে হাতের দৈর্ঘের ওপর তুলে ফেলতেন।

তারপর মাঝে মাঝে বাবাদের ডেকে বলতেন, "কুইল্যা, শম্ভুয়া, ঝুইল্যা পড় ।" অমনি বাবা আর ছোট জ্যাঠামশাই তাঁর দুই ঠ্যাং ধরে শূন্যে ঝুলে পড়তেন । কিন্তু কিছুতেই তাঁকে টেনে এক ইঞ্চিও নামাতে পারতেন না ।

এই মানুষটিকে আরো কাছে পেয়েছিলাম, যখন আমরা মাস দুই পরে চক্রবেড়ে রোডের বাড়ি ছেড়ে রসা রোড আর জাস্টিস চন্দ্র মাধব রোডের মোড়ের একটা বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে এলাম । ব্যড়িতে এক টুকরোও আসবাব ছিল না । আমরা মাদুরে বিছানা পেতে শুতাম ; আসনে বসে খেতাম ; হেঁটে স্কুলে যেতাম । দাদা রোজ হেয়ার স্কুলে যেত ; বাকিরা বাড়ির কাছেই এল্-এম্-এস্ স্কুলে ভরতি হল । অনেকে বলত ওটা নাকি দুষ্টু ছেলেদের স্কুল । কিন্তু আমার সে-রকম ধারণা হয়নি । দুষ্টু ছেলে কোথায় নেই ? তেমনি আবার ঐ স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন সেকালের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়, বিদগ্ধ সুধীর চ্যাটার্জি । ওখানে খেলাধুলা, ব্যায়াম, বয়-স্কাউট শিক্ষায়, ছবি আঁকায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত । এগুলি আমার মনকে আকৃষ্ট করত ।

গরমের ছুটিতে বাবা কলকাতায় বদলি হয়ে এলেন । এসেই ছাদে পাখা ঝোলালেন ; টেবিল চেয়ার খাট আলমারি কিনে ফেললেন । ফাঁকা বাড়িটা ভরপুর হয়ে উঠল । কথায় কথায় বকা-বকি সত্ত্বেও, বাবা এসে পৌঁছলে মনে হল এবার আমাদের বাড়ির ফাঁকগুলি ভরে গেল । জীবনের দুঃখ ব্যর্থতা সব মেনে নিয়েও বুঝতে পারি এমন পরিপূর্ণ শৈশব লাভ করা কত বড় সৌভাগ্য । সব সময় মনে হয়েছে আমাদের পায়ের নিচে শক্ত মাটি, মাথার ওপর সস্নেহ প্রহরা, আমরা বড় নিরাপদ । একে একে যখন ছোটবেলাকার অবলম্বনগুলো কালের নিয়মে বিলীন হল, তখনো মনে হয়েছে পায়ের নিচে মাটি থেকে জোর পাচ্ছি ।

আমাদের চক্রবেড়ের বাড়িতে আবার সকলে নিজেদের একটা ছাদের তলায় মিলিত হয়ে, আমাদের ছোটবেলার যামিনীদার হাতের রান্না খেয়ে, চেনা বাসন-পত্র দেখেই আমরা খুশি ছিলাম । এবার বাবা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের আসা-যাওয়া অনেকখানি বেড়ে গেল । এমন কি একটা ছুটির দিনে স্বয়ং বড় জ্যাঠামশাই আমদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন । বাবার ফূর্তি দেখে কে ! তাঁর এই বড়-দাদাটি ছিলেন বাপের মতো । বয়সে হয়তো ১৭-১৮ বছরের বড়, ঠাকুরদা মারা যাবার সময় বাবার বয়স বছর পাঁচেক । সারা জীবন এই দাদার স্নেহে ও কড়া শাসনে বাবা মানুষ হয়েছিলেন । আমার গোঁড়া হিন্দু বড় জ্যাঠামশাই ব্রাহ্মদের ওপর খুব প্রসন্ন না থাকলেও, কড়া নিয়মে গোঁড়া ব্রাহ্মদের চাইতে কম যেতেন না । হুঁকো কলকে চলতে পারে, পান চলতে পারে । কিন্তু সিগারেট কখনো না । থিয়েটার কখনো না, বাই নাচ, গানের আসর চিন্তার বাইরে, পরে বায়োস্কোপকে পর্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতেন ।

যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খাবে, **পরিষ্কার** পরিচ্ছন্ন থাকবে, পড়াশুনো করবে, প্রার্থীকে সর্বদা সাহায্য করবে, খেলাধূলা করবে, হাঁটবে, সাঁতার কাটবে, সম্ভব হলে গাছে ও ঘোড়ায়—চড়বে। আবার কি চাই ? এ দিক থেকে বাবাকে নিয়ে বোধ হয় তিনি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। ঐ রকম জবরদস্ত ডানপিটে ছেলে কম দেখা যেত, উপরন্তু পড়াশুনোতেও বেশ ভালোই ছিলেন। অঙ্কে বেজায় ভালো। ছবি আঁকতেন চমৎকার। জ্যাঠামশাই আনন্দের সঙ্গে বাবাকে শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পাঠিয়েছিলেন।

সেকালে সেটি ছিল ডানপিটেদের আড্ডা। বাবার কথায় মনে হত তাদের সঙ্গে তিনি স্বাভাবিক ভাবে মিশে গেছিলেন। বট্যানিকেল গার্ডেনে একবার বাইরের লোক এসে লিচু চুরি করল। সেখানকার কর্তা এক লালমুখো সাহেব এসে কলেজের অধ্যক্ষ আরেক লালমুখো সাহেবকে যা-নয় তাই বলে গেলেন। অধ্যক্ষ ছেলেদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা লিচু খেয়েছ ?"

তারা অস্বীকার করাতে বাগানের কর্তাকে বলেছিলেন, "থানায় বল, তারা চোর ধরুক।" কর্তা তবু রাগারাগি করে চলে গেলেন, ভাবখানা যে তুমি সুদ্ধ চোরের সহায় হলে কি করা যায় !

ব্যাপার দেখে ছেলেরা গেল চটে। তাদের জনপ্রিয় অধ্যক্ষের অপমানের উপযুক্ত শোধ নিতে হবে। বাছাই করা কয়েকজন ডানপিটে ছেলেকে নেওয়া হল। যারা গাছেটাছে চড়তে পারে, চালাক-চতুর, বিপদ হলে বিভ্রান্ত হয় না। মন্দ দৃষ্টান্ত দেবার ভয়ে বাবা সে-কথা স্বীকার না করলেও আমরা সর্বদা সন্দেহ করতাম যে বাবাও ঐ দলে ছিলেন। এমন যোগ্য স্বেচ্ছাসেবক কোথায় পাওয়া যাবে ? সে যাই হক, মাঝরাতের পরে যখন ঘুম সব চাইতে গাঢ় হয়, সেই সময় গেঞ্জি গায়ে, মাল-কোঁচা দিয়ে ধুতি পরে, খালি পায়ে, কোমরে একটা করে গামছা বেঁধে একদল বে-পরোয়া ছেলে বাগানের উঁচু পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকে, নিঃশব্দে, তারার আলোয়, সব লিচু গাছের সব লিচু পেড়ে, গামছায় বেঁধে নেমে এল। গাছে একটিও ফল রইল না। তারপর নিঃশব্দে গঙ্গার তীর ধরে এক মাইল দূরে গিয়ে লিচু-গুলোকে সাবাড় করে, কোথাও একটি আঁটি বা এক কুচি খোসা না ফেলে, সেগুলোকে গঙ্গার জলে ফেলে দিল। ভাঁটার স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ভেসে কোথায় চলে গেল। তারপর প্রসন্ন চিত্তে হস্টেলে ফিরে, হাত-পা থেকে কাদার শেষ চিহ্ন মুছে, গামছা কেচে অন্য ছেলেদের গামছার সঙ্গে মেলে দিয়ে, যে-যার শুতে গেল।

পরদিন সকাল না হতেই মহা সোরগোল। বাগানের সায়েব এসে চ্যাঁচামেচি করতে লাগলেন, "এবার আর কোনো সন্দেহ নেই। এ তোমার ছেলেদের কাজ। ওদের জেলে দেওয়া উচিত।"

কলেজের অধ্যক্ষও কম যান না। তিনি বললেন, "আমার কলেজ তল্লাশী করতে পার, ছেলেদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পার। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও যে পঁচিশ ত্রিশটা লিচু-গাছের সব লিচু আমার ছেলেরা তো খেয়ে ফেলেইছে, উপরন্তু অতগুলো খোসা বিচিও চিবিয়ে খেয়েছে ?" শেষ পর্যন্ত সাহেবকে চলে যেতে হল। অধ্যক্ষ সমবেত ছাত্রদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, "ক্লাসে যাও।" এ গল্প নিশ্চয়ই বড় জ্যাঠামশায়ের কানেও গেছিল, তিনিও নিশ্চয় আর কিছু বলেননি।

আরেকবার বাবা শনিবার বিকেলে হস্টেল থেকে বাড়ি এসে দেখলেন শিব-নারায়ণ দাস লেনে বড় জ্যাঠামশাই যে নতুন বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন, সেটি বেশ ভালো। বড় জ্যাঠাইমা অবিশ্যি বললেন, "সব ভালো, খালি ঐ ভূতের উপদ্রব ছাড়া।" "ভূতের উপদ্রব, আবার কি ?" "সন্ধ্যায় আমি একা থাকি, তখন ভূতে থান-ইঁট ছোঁড়ে।" বড় জ্যাঠাইমা বাবাদের ছোট বেলাকার খেলার সাথী। বেশ কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল ; ঠাকুমা ছিলেন ভারি উদার ও স্নেহশীলা। ফলে বৌটি দেওরদের সঙ্গে বাতাবি-লেবু চুরি করে খেত। সে সময় লোকের বিশ্বাস ছিল কামরাঙা কিম্বা বাতাবি খেলে জ্বর হয়। বাতাবিকে আমাদের দেশে বলত 'জাম্‌বুরা'। এদিকে গাছ ভরা রস-টুসটুসে বাতাবি। দেওররা পাড়ত, বৌঠান নূন লঙ্কা মেখে নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে কলা-পাতায় করে লুকিয়ে রাখত। সুবিধে বুঝে নিজে এবং দেওররা গিয়ে খেত। মোড়ের মাথায় একটা নতুন বাড়ি হচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলায় বাবাকে ছোকরা চাকরটার সঙ্গে এক গাদা থান ইঁট নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠতে দেখে, বড় জ্যাঠাইমা বললেন, "কি করস্, শম্ভুয়া ?"

বাবা বললেন, "ভূতের সমাদর।"

আরেকটু রাত হলে রোজ যে দিক থেকে থান ইঁট আসত, সেই দিকে বাবা এগারোটা থান ইঁট ছুঁড়লেন। তার আওয়াজে কানে তালা লাগে। কিন্তু সেই এগারোটা ইঁটেই ভূত পালাল। আর কখনো কোনো উৎপাত করেনি। এ-কথাটাও জ্যাঠামশায়ের কানে গেলে, তিনি শুধু বললেন, "ভূত ভেগেছে সত্যি, কিন্তু যদি নির্দোষ লোকের মাথায় পড়ত ?" বাবা মুচকি হাসলেন। নির্দোষ লোক কোথায় ? ওদিকে একটা বদমায়েসদের আড্ডা ছিল ; বাবার লক্ষ্য অব্যর্থ।

আসলে ডানপিটেমিকে ওঁরা বড় অপরাধ মনে করতেন না। অবাধ্যতা, বেয়াদবি, অসততা, দুর্নীতি সইতে পারতেন না। বাবা যখন জাত ভেঙে, ব্রাহ্ম মতে, আমার মাকে বিয়ে করেছিলেন, ঠাকুমা আর বড় জ্যাঠামশাই মত দিয়েছিলেন, কিন্তু নিশ্চয় খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। তবে বাবার সুখটাই তাঁদের কাছে বড় ছিল। কিন্তু এ-সব ঘটনার প্রায় ত্রিশ বছর পরে আমি যখন আমার

হিন্দু স্বামীকে গৌর অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিলাম, বাবার সম্মতি বা আশীর্বাদ, বা ক্ষমা পাইনি।

সে-সব পুরনো ব্যথার কথা তার পরবর্তী ৪৪ বছরের সুগভীর পরিপূর্ণতায় মুছে গেছে। এখন আর মনে এতটুকু তিক্ততা বাকি নেই। কিন্তু বাবা সেদিনের পর থেকে আর আমার সঙ্গে কথা বলেননি ; দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ঐ তাঁর বিশাল হৃদয়ের একটিমাত্র খুঁৎ ছিল ; অপরের মনের কথা তিনি কল্পনাও করতে পারতেন না। তাই বলে আমার জীবনের প্রথম চব্বিশটা বছর তো আর কেড়ে নিতে পারেননি। পায়ের তলায় মাটি নিজের হাতে শক্ত করে গেঁথে দিয়েছিলেন, সেটা তো আর নিয়ে নেননি।

ঐ যা বলছিলাম, বড় জ্যাঠামশাইতো এসে উপস্থিত হলেন। সব ঘর দেখলেন ; কিচ্ছু খেলেন না, বাইরে তিনি খেতেন না। মা প্রণাম করলেন ; তিনি আশীর্বাদ করলেন ; কিন্তু ভাদ্দরবৌদের মুখ তিনি সেকালের নিয়ম অনুসারে, কখনো দেখতেন না। আমার জানার মধ্যে মায়ের বিয়ের পর একবারই তিনি মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করেছিলেন। আমরা সকলে আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। মার নিউমোনিয়া হয়েছিল ; রোগটা তখন সবে ভালোর দিকে মোড় নিয়েছে। বড় জ্যাঠাইমার খবর নিতে এলেন। বাবা বাড়ি ছিলেন না। আমাদের কাছে খবর নিয়ে বললেন, "যাই, দেখেই আসি।" এই বলে মায়ের খাটের পাশে চেয়ারে বসে ভারি প্রসন্ন ভাবে অনেক গল্প করে গেলেন, যেন নিজের মেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে মায়ের চাইতে হয়তো সামান্য বড়ই হবেন। এর পরেই জ্যাঠামশাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে অসুখ সারেনি। তবে এসব হল আরো তিন-চার বছর পরের কথা।

ক্রিকেটের সময় রবিবার রবিবার তিন ভাই এক সঙ্গে খেলা দেখতে যেতেন। প্রথমে আসতেন ছোট জ্যাঠা, "কই রে শম্ভুয়া, স্নান হল ?" বাবাও স্নান করে তৈরি। দুজনে পাশাপাশি ভাত খেতে বসতেন। দুরকম ভাত। আমরা চিরকাল আতপ চাল খাই। ছোট জ্যাঠা সেদ্ধ চালের শক্ত ভাত খেতেন। বলতেন, "দ্যাখ্ ন্যাড়া, ওপর থেকে ভাত ফেলবি, পাতে পড়ে ঠুং করবে, তবে বুঝবে ভালো হয়েছে !" বলেছি তো ন্যাড়া মানে আমার মা। তারপর সুন্দর জ্যাঠাও আসতেন, তিনিও মাকে ন্যাড়া এবং তুই বলতেন। তবে লোকের সামনে নয়। চোখের সামনে মানুষ হতে দেখেছিলেন যে। কি আর বলব। সে সময়কার কথা বলতে গেলে আমি পঞ্চমুখ হয়ে পড়ি। পৃথিবীতে যত রকম ভালোবাসা আছে, তার মধ্যে পারিবারিক ভালোবাসা সব চাইতে মধুর।

॥ ১৭ ॥

সকালে খবরের কাগজ খুলে মন খারাপ হয়ে গেল। বাপি বোস পরলোকে গেছে। সমস্ত কৈশোরটা ঝন্‌ঝন্ করে আমার মাথার ওপর ভেঙে পড়ল। বাপি আমার সোনাপিসিমার অষ্টম ছেলে, আমার চাইতে সাত মাসের ছোট, আমার বন্ধু, আমার ভাই। পঞ্চাশ বছর আগে কেউ যদি বলত বাপি মরে যাবে আর আমি টের পাব না, পরদিন কাগজে দেখব, তাহলে আমার হাসি পেত। এমনি করে গত বছর গণেশদাও চলে গেছিল। আমি জানতে পারিনি, দেখতে পাইনি। তার আগে অনেক দিন দেখা হয়নি, চিঠিপত্র লেখার অভ্যাস না ছিল বাপির, না ছিল গণেশদার। আমার ঠাস বুনটের কৈশোর, তার মধ্যে কি ফাঁকা দেখা দেওয়া সম্ভব ? পরের ঘাটতির জন্য কি আগের ঘনিষ্ঠতা মিথ্যা হয়ে যায় ?

কত বছর ধরে আমহার্স্ট স্ট্রীটের আমার পিসিমার বাড়ি ছিল আমাদের আনন্দ-নিকেতন। আমরা সবাই জানতাম বাবা থেকে আমার ছোট বোন লতিকা পর্যন্ত যে-কেউ যে-দিন যে-সময়ই ওদের বাড়িতে যাই না কেন, ওদের বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষ হাসতে হাসতে ছুটে আসবে। পৃথিবীতে এমন একটা জায়গা খুঁজে পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্য এখন বুঝতে পারি। তখন নিত্য-নৈমিত্তিকের মধ্যে ধরে নিয়েছিলাম।

ওদের বাড়িটা ছিল পৃথিবীর আর সব বাড়ি থেকে আলাদা। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মর্টন ইনস্টিটিউটের পাশে, অনেকখানি জমিওয়ালা মস্ত লাল দোতলা বাড়ি। জমির চারদিকে গাছপালা থাকলেও মধ্যিখানটা ফাঁকা। সেখানে বোধ হয় বারো-মাস ক্রিকেট পেটা হত। এক বৃষ্টি পড়লে বন্ধ থাকত। নিজেরা তো খেলতই, আত্মীয়-স্বজনদের ছেলেরাও খেলত, বন্ধুবান্ধব কত যে আসত, তার ঠিক নেই। ওখানে পঙ্কজ গুপ্ত, বেরি সর্বাধিকারী, বেচু দত্ত রায় ইত্যাদির যখন তরুণ বয়স, তাদের দেখেছি। বেচুদার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ওর মা আমার বাবার কিঞ্চিৎ দূর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন। ঘনিষ্ঠতাটা পারিবারিক কারণে যত না, বন্ধুত্বের কারণে তার চাইতে বেশি। বেচুদার কথা পরে আরো বলা হবে।

পিসিমার বড় ছেলে জিতেন্দ্রনাথ আরবি-ফারসি পড়তেন। মৌলবী রেখে ওমর-খৈয়মের একটা বাংলা অনুবাদ করেছিলেন, সেটি অন্য সব অনুবাদের চাইতে আলাদা, কারণ মূল গ্রন্থ থেকে করা। তার কথা অনেকেই জানে না। জিতেনদার চমৎকার গ্রন্থ সংগ্রহ ছিল। তার মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য কন্টিনেন্টাল বইও ছিল। দুঃখের বিষয়, জিতেনদাকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো যেত না যে ও নিজে ছাড়া আর কারো ওসব বই পড়া উচিত। তবে বইগুলো খাবার ঘরের পাশে একতলার একটা বড় ঘরে বন্ধ থাকত। সে ঘরের দরজায় বড় তালা ঝুলত, কিন্তু

গোটা স্যাতেক বড় বড় জানলায় শিক দেওয়া ছিল না। বাপি আর গণেশদা অতি সহজে জানলার একটা কাচ ভেঙে, হাত গলিয়ে জানলা খুলে, ভিতরে ঢুকে বই বের করে আনত। এই ভাবে আমার কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

জিতেনদার ছোট আসানদা। সে একা এইচ্ বোস অ্যাণ্ড সন্সের সুগন্ধী দ্রব্যের ব্যবসা দেখত। অন্য ভাইদের একজনেরো এদিকে আকর্ষণ ছিল না। কোম্পানি উঠে যাবার এও একটা কারণ ছিল। আসানদা আমাদের চাইতে ১২-১৩ বছরের বড় ছিল, ওদের বাড়িতে গেলে দেখা পাওয়া যেত না। কিন্তু থেকে-থেকেই আমাদের বাড়িতে এসে রাশি রাশি তেল, সাবান, সেন্ট, সরবৎ, পানের মশলা দিয়ে যেত। পুরনো একটা মটর ছিল, সেটাকে নিজেই মিস্ত্রি লাগিয়ে সারিয়ে-টারিয়ে আমাদের বেড়াতে নিয়ে যেত। পরে সেজ-ভাই নীতিন আর পঞ্চম ভাই মুকুলদা চলচ্চিত্রে কিছু সাফল্য করলে ভালো ভালো মটর কিনেছিল। ততদিনে আমরা কৈশোর পার হয়ে গেছি। মধ্যিখানে চতুর্থ ভাই কুঁকুদাও আমাদের বন্ধু মানুষ, শিলং-এও গেছিল সে।

মুকুলদার পর গণেশদা, কার্তিকদা, বাপি আর সবার ছোট বাবুলাল। সে আমার চাইতে পাঁচ বছরের ছোট। চার মেয়ের মধ্যে মালতীদি সবার বড়, নামকরা গাইয়ে মালতী ঘোষালকে সবাই চেনে। সে আমার চাইতে বছর পাঁচেকের বড় হবে। ছোট তিন বোন—ময়না, সোনা, দানু, যেন তিনটি সোনার পুতুল। সাজেনা-গোজেনা, চুল আঁচড়ায় না, তবু রূপ ফেটে পড়ে, মুখে সদাই হাসি আর রোগা রোগা হাত দিয়ে আমাদের জড়িয়ে জড়িয়ে ধরত। ময়না, সোনাও চমৎকার গাইত।

এত হাসি, এত গল্প, এত খেলা, এত স্নেহ আমার সোনা-পিসিমার বাড়িতে জমা হয়ে থাকত। লোকে বলত মেয়েরা ভালো ; কিন্তু বাড়িতে কোনো বাইরের লোক গেলে, ছেলেরা সব একেবারে 'নেই' হয়ে যায়! বাইরের লোকে যাই দেখুক, আমরা দেখতাম এক বাড়ি ছেলেমেয়ের যার যা আছে, অমনি সব খুলে বাড়িয়ে ধরত। বাড়িতে যে আসত, চেনা বা অচেনা, সকলে খাবার শোবার ভাগ পাবে, এটা ছিল জানা কথা।

আমরা শুনেছিলাম আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ওদের অবস্থাই সব চাইতে ভালো। মলতীদির একটা ব্রুচ্ ছিল, তাতে একটা মস্ত মুক্তোর ভিতরে আলো জ্বলত। ব্রুচের তলায় ছোট্ট ব্যাটারি, ব্রুচ লাগালেই আলো জ্বলত। এর চাইতে বড়মানুষি আমরা ভাবতে পারতাম না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ওদের বাড়িতে কোনো দিনও কোনো লোক-দেখানি বড় মানুষি দেখিনি। আমার পিসিমার বাড়িটি আমার মনের মধ্যে নরম, গরম ছোট্ট একটি স্নেহের নীড়ের

মতো হয়ে আছে, আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো আঘাত পেলে সেইখানে মুখ গুঁজে রাখা যায়। যদিও পিসিমা, জিতেনদা, আসানদা, কুঁকুদা, গণেশদা আর এখন আমার আদরের বাপিও স্বর্গে গেছে। বাড়িটা খালি খাঁ খাঁ করছে। মেয়েদের কোনকালে বিয়ে হয়ে গেছে, কুঁকুদার স্ত্রী, বাবুলালের স্ত্রী কেউ বেশি দিন বাঁচেনি। একমাত্র জিতেনদার স্ত্রী, আমার লীলা-বৌদি শূন্য পুরী আগলাচ্ছেন।

পিসিমার বাড়িতে সুন্দর জ্যাঠামশায়ের ছেলেদের কেউ কেউ এসে ক্রিকেট খেলত। তাদের মধ্যে হৈমজারঞ্জন, নীরজারঞ্জন ইন্দুজারঞ্জনকে সবাই চিনত। ক্রিকেট, হকিতে এরা নাম করেছিল। সুন্দর জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে শৈলজারঞ্জন বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা করতেন। খেলাধুলোয় এঁরও খুব খ্যাতি ছিল। মোটর দুর্ঘটনায় শৈলজার একটা পা চিরকালের মতো জখম হলেও, খেলা ছাড়েননি। হৈমদা, নীরজাদা আর নেই, কিন্তু শৈলদা এখনো চলে-ফিরে বেড়ান ; মুখে বেশি কথা বলেন না ; কি ভাবেন কে জানে। সুন্দর জ্যাঠামশায়ের বাড়ির সকলেরও আলাদা আলাদা ঘর-সংসার। তার ছয় ছেলের চারজন, চার মেয়ের তিনজন আছে। পরিবারে কারো বিয়ে-থা হলে দেখা হয় ; আর মাঝে-মধ্যে হয়তো দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল, তখন সকলের সে কি আনন্দ। হৈমদার স্ত্রীর, নীরজাদার স্ত্রীর আমার কাছাকাছি বয়স, তারা আমার নিকট বন্ধুর মতো। বড় স্নেহশীল আমাদের পরিবার। কি বৌরা, কি জামাইরা।

১৯২১-২২ সালে কলকাতা শহরে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকি, কিন্তু সবার খবর সবাই পাই। বাবাদের ক ভাইবোনের সপ্তাহে একবার দেখা হওয়া চাইই। এইভাবে সবার সংবাদ সবাই পেত। আমাদের ছোটদের মধ্যেও খবর চালা-চালি হত। কিছু দিন পরে বুঝতে পারলাম যে একই খবর দু রকম হয় ; বড়রা ওপর থেকে দেখেন, ছোটরা তলা থেকে দেখে। নান্‌কুদা আমাদের চাইতে ১০-১১ বছরের বড় হলেও, নিখুঁৎভাবে খবর সরবরাহের কাজ করত। তবে মুশ্‌কিল ছিল যে সবার খবর সবাইকে বলে দিত। কোনো গোপন কথা বলবার আগে ওকে দিয়ে বলিয়ে নিতে হত যে বড়দের বলবে না।

এর মধ্যে আমাদের স্কুলে ভালো করেই মন বসে গেছিল। কলকাতার স্কুল-জীবন আমরা বড়ই উপভোগ করেছি। পড়াশুনো ছাড়াও মাঝে মাঝে ছোটখাটো উপলক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত নাটিকা প্রহসন ইত্যাদি করা হত, ইংরিজিতে বা বাংলাতে। আমি এই সুযোগে হাসির নাটিকা লিখে একটু খ্যাতিও করে ফেললাম। নিজেরাই লিখতাম, নিজেরাই অভিনয় করতাম।

'প্রসূন' বলে আমাদের ক্লাসের মেয়েরা একটা হাতেলেখা মাসিক-পত্র বের করতে লাগল। সকলের কি উৎসাহ ! একটি মাত্র কপি বেরোত ; চমৎকার করে

ছবি-টবি আঁকা হত। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী সব থাকত। বলা বাহুল্য আমি তার সম্পাদিকা ছিলাম না। আমার সে যোগ্যতা ছিল না, যদিও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যথেষ্ট ছিল। কারণ তখনো আমি 'বাংলায় কাঁচা'। সকলে তাই বলত। বলত আমার গল্প নিঃসন্দেহে সব চাইতে সরস, আমার প্রবন্ধও খুব ভালো, কবিতা লিখতাম না। কিন্তু আমি বাংলা জানি না। এ নিন্দা আমি মেনে নিয়েছিলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করে বানানটা অনেকখানি সরগড় করেছি। কিছু কিছু বানানের নিয়মও শিখেছি। এক সারি অভিধানের স্মরণ নিয়েছি। তবু যে অর্থে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বাংলা জানতেন, আমি এখনো জানি না। বাংলা জানি না, কিন্তু ইংরিজি জানি। তাতে আমার অনেক সাহায্য হয়। অদ্ভুত শোনালেও, কথাটা সত্যি।

ততদিনে ১৯২১ সাল শেষ হয়ে এসেছিল। সারা বছরের ক্লাসের কাজে নম্বর দেওয়ার নিয়ম ছিল। বছর শেষে সেগুলি জুড়ে, যারা যে-বিষয়ে ৭৫% নম্বর পেত, তাকেই একটি ভালো বই পুরস্কার দেওয়া হত। আলাদা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানের পুরস্কার দেবার নিয়ম ছিল না। এর একটা সুফল হল যে যে-মেয়ে কোনো একটি বিষয়ে ভালো, অন্য বিষয়ে ততটা নয়, সেও একটি পুরস্কার পেত। একেবারেই কোনো পুরস্কার পেল না, এমন ছাত্রী কম ছিল। আর কিছু না হক গান, সেলাই, ছবি-আঁকা, ড্রিল ইত্যাদিতেও আলাদা প্রাইজ্ ছিল। ভালো ব্যবহারের জন্য নাম লেখা রুপোর পিন্ দেওয়া হত। এখন মনে পড়ছে এই পুরস্কার আমি কোনো দিন পাইনি। তবে সেকালে 'ভালো ব্যবহার' বলতে বোঝাত ক্লাসে চুপ করে থাকা, শিক্ষিকা কিম্বা সহপাঠিনীদের সঙ্গে কোনো তর্কাতর্কি করে না। এমন পুরস্কার আমি পাই কি করে?

বাংলার পুরস্কারও পেতাম না। সেজন্য মনে মনে ভারি দুঃখও ছিল। তবে অন্যরা আমার চাইতে বেশি ব্যাকরণ জানত এও সত্যি কথা। বাড়ি এসে এসব দুঃখ চলে যেত। ছোট বোনটার তিন বছর বয়স, তার বড় ভাইটার পাঁচ। গল্প শোনবার জন্য আজকাল এরা দুজনও মুখিয়ে থাকে। এদের আবার শুধু মুখে গল্প বললে চলত না, ছবি এঁকে বলতে হত। একটা স্লেট আর একটা পেন্‌সিল আমার সহায় ছিল। গল্প বলি আর মজার মজার ছবি আঁকি। শেষটা এমন হল যে যোগীন সরকার সম্পাদিত, সিটি-বুক-সোসাইটি থেকে প্রকাশিত চমৎকার সচিত্র খুকুমণির ছড়ারো আরেক সেট্ ছবি আঁকতে হত। সুখের বিষয়, এরা ছবি সম্বন্ধে ততটা তীব্র সমালোচক ছিল না। তবে ছবিগুলোতে প্রাণ থাকা দরকার ছিল, এই লাফাচ্ছে, এই গড়াচ্ছে, এই দৌড়চ্ছে! তাই আঁকতাম আমি। ওরা ভাবত এমন চিত্রকর হয় না। সেই সময় থেকেই নিজের অগোচরে অজ্ঞাতে ছোটদের বই সম্পাদনার পাঠ নিচ্ছিলাম। ঐ রকম ছবি এঁকে এঁকে ওদের আমি

সেই ১৩-১৪ বছর বয়সেই পদ্মী-পিসির বর্মী বাক্সের গল্প আগা-গোড়া বলেছিলাম। লিখেছিলাম হয়তো তার ২৫ বছর পরে। ছোট জ্যাঠামশাই ঐ-সব আঁচড়-কাটা ছবি দেখে আমার জন্য পরেশ গুপ্ত বলে একজন প্রবীণ এবং দক্ষ শিল্পী ঠিক করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে বছর চারেক চার্কোল ড্রইং, তেল রঙ ইত্যাদি শিখেছিলাম। একবার কংগ্রেস অধিবেশনের মেলায় মহিলাদের বিভাগে দেখানো একটা ছবির জন্য রূপোর পদক পেয়েছিলাম। সন্দেশে সেকালে আমার নিজের গল্পের জন্য কালি দিয়ে, জল-রঙ দিয়ে ছবিও আঁকতাম। তার নমুনা পর্যন্ত নিখোঁজ হয়ে গেছে। পরে লেখাতেই মন দিলাম, ছবি আঁকা ছেড়ে দিলাম। আমার আত্মীয়-স্বজনরা অনেকেই ভালো ছবি আঁকত। হিতেনদা, হিতেনদার ছোটবোন দানু, আমার নিজের ভাইবোনদের কেউ কেউ, ভালোই আঁকত। পত্রিকার ছবি, বইয়ের মলাট এঁকে আমার ভাই অমি কিছু রোজগার পাতিও করেছিল। নিয়ম ছিল ভাই-বোনদের রোজগার করা, বা প্রাইজ-পাওয়া টাকা দিয়ে সবাইকে খাওয়ানো হবে। ভাবি ছোটবেলাটাকে সত্যিই আকণ্ঠ উপভোগ করেছি।

এই সময় বড়দাকে রোগে ধরল। জমিদারী ব্যাপারে বড়দা ময়মনসিংহ গেছিলেন, ফিরে এলেন জ্বর নিয়ে। জ্বর মানে কালাজ্বর। তখনো কালাজ্বরের কোনো ভালো ওষুধ বেরোয়নি। লোকে বলত কোনো রকমে যদি কালাজ্বরের রুগী একটা বছর বেঁচে যায়, তবে আর ও রোগ তার কিছু করতে পারে না। প্রথমটা কেউ সেরকম ভয় পাইনি। বড়দা আমাদের ঘরের আলো ছিলেন। তিনি চলে যাবার পরে ৫৪ বছর কেটে গেছে, তবু তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়াতে পারে এমন আর একটিও মানুষ দেখলাম না। আমি ভাবতাম আমি বড়দার ছায়ায় ছায়ায় মানুষ হব। আমার দাদা হলেও, মায়ের থেকে মাত্র ২$^{১}/_{২}$ বছরের ছোট, আজন্মের খেলার সাথী। বড়দার অসুখে দেখতাম মায়ের বড় ভাবনা। প্রথম প্রথম বড়দা ওষুধ-পত্র খেতেন, পথ্যি করতেন বটে, কিন্তু ঘরে একখানি গদী-আঁটা আরাম-কেদারায় বসে নিজের কাজ-কর্মও আগের মতোই করে যেতেন। আমরা তাই দেখে আশ্বস্ত হয়ে নিজের নিজের কাজে মেতে থাকতাম। তখনো ভাবতাম, "আমি জানি আমাকে দিয়ে কিছু লেখাপড়া ছাড়া আর কোনো কাজ হবে না ; বড়দা আছেন আমার আবার ভাবনা কিসের।"

বড়দা অসুখে পড়বার ঠিক আগেই সত্যজিৎ জন্মেছিল। মাঝে-মাঝেই গড়পারের বাড়িতে গিয়ে ওকে আমরা দেখে আসতাম। ভারি মজা লাগত। মনে হয় শরীরটা বড়সড় কিন্তু সরু ছিল, নাকটা বড় আর পাখির ছানার মতো সারাক্ষণ এত বড় হাঁ করে থাকত। এই সময় বড়দা হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন, "সন্দেশের জন্য একটা ছোট গল্প লিখে দে।" আমি আকাশ থেকে

পড়লাম। এমন সৌভাগ্যের কথা আমি ভাবতে পারিনি। কিন্তু পারব তো? বড়দা বললেন, "পারবিনে কেন? ভাই-বোনদের তো ঝুড়ি-ঝুড়ি গল্প বলিস্। সেই রকম একটা দে।"

আমি চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরে এলাম। আমাদের বাড়ির একটা মজা ছিল যে একলা হওয়া অসম্ভব ছিল। এটা সেই বোর্ডিংএর একলা-না-থাকার থেকে আলাদা জিনিস। কারণ এটা স্নেহ দিয়ে মোড়া ছিল। হয়তো নিরিবিলি একটু ভাববার জন্য তিনতলার মস্ত ছাদে গেলাম। তা ছাড়া আর নিরিবিলি কোথায় পাব? পাঁচ মিনিট না যেতে অমনি খোঁজ পড়বেই। ঐ দেখ, নিশ্চয় কারো ওপর রেগেছে; নয় তো ওকে কেউ কিছু বলেছে; কিম্বা কোনো মুশ্‌কিলে পড়েছে; অতএব চল্ গিয়ে দেখা যাক। আমাদের বাড়িতে কারো প্রাণ ভরে মন খারাপ করবার, কিম্বা নির্জনে চিন্তা করবার জো ছিল না। কাজেই আমার কোনো গল্পই নির্জন-চিন্তা-প্রসূত নয়। মনের মধ্যে আঁকুপাঁকু করতে থাকে, খোঁচা দিলেই ঝরে পড়ে। মাঝে মাঝে আবার পড়েও না। মন তখন বন্ধ্যা মরুভূমি। একটি গল্পও দানা বাঁধে না। আজ পর্যন্ত এমন হয়। একেক বছর পুজোর সময়ও একটিও ভালো গল্প উত্‌রোয় না। জোর করে গল্প লেখা কখনো ভালো হয় না। আপনি ফুলের মতো ফুটল তো ফুটল, নইলে রইল অমনি বন্ধ হয়ে, সময় হলে নিজেই ফুটবে। তখন হয়তো সাত দিনে সাতটি গল্প তৈরি হবে। তবে আমার ঐ প্রথম গল্পটির কুঁড়ি আগে থাকতেই ধরেছিল কি না মনে নেই। এইটুকু মনে আছে, বাড়ি এসে, কাকেও কিছু না বলে খস্-খস্ করে লিখে ফেলেছিলাম। মা এত তাড়াহুড়ো দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলেননি। কোনো দিনই মুখে কিছু বলেননি, তবে লেখা যদি ভালো হত, তবে ভারি খুশি হতেন।

সেই গল্প কাউকে পড়াইনি। এখন ভেবে আশ্চর্য লাগে বড়দা কত ক্ষমাশীল ছিলেন। আমি হলে ও গল্প পুনর্লিখনের জন্য ফিরিয়ে দিতাম। রস যথেষ্ট ছিল, বরং এতটা বেশি মাত্রায় ছিল যে বড়দা বুদ্ধি করে খানিকটা ছেঁটে দিয়েছিলেন। ভাষাও একটা চোদ্দ বছরের বাংলায় কাঁচা মেয়ের পক্ষে মন্দ হয়নি। আমার আপত্তি অন্য দিক দিয়ে। ঐ গল্পে একটা মা-বাপ-মরা ছেলে চালাকি করে তার ভালোমানুষ মামাকে ভোগা দিয়ে, তাঁদের বাড়িতে নিজের আদর বাড়িয়ে নিয়েছিল। কেউ ফাঁকি দিয়ে নিজের সুবিধে করে নিচ্ছে, এমন গল্প আমি সন্দেশের সম্পাদনা করতে গিয়ে, কোনোমতেই বরদাস্ত করি না। গল্প যদি ভালো হয় তো পত্রপাঠ পুনর্লিখনের জন্য ফেরত দিই। গল্পের নাম দিয়েছিলাম 'লক্ষ্মীছাড়া'। ছেলেটার লক্ষ্মীছাড়ামিতে আপত্তি না জানালেও, বড়দা নামটা বদলে 'লক্ষ্মী ছেলে' করে দিয়েছিলেন। তার মানে যে লক্ষ্মী ছেলের উল্টোটি,

সে-কথা আর বলে দিতে হবে না।

এ-বিষয় আরেকটু বলতে হয়। দুষ্টু ছেলে-মেয়েতে আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি নিজেও যথেষ্ট দুষ্টু ছিলাম এবং অনেক দুষ্টু ছেলেমেয়ের গল্প লিখি এবং ছাপাই। আমার আপত্তি হল দুষ্টুমি করে কেউ নিজের সুবিধে করতে পাবে না। যদি মজা করতে পারে, তবে ঐ মজাটাই যথেষ্ট। সবচাইতে আশ্চর্য কথা, এই দিক দিয়ে কেউ গল্পের খুঁৎ ধরেনি। বরং অনেকে ভালো বলেছিল। কিন্তু আমি নিজে খুশি হতে পারিনি। এর পরের ৭ বছরে, অনেক গল্প লিখেছিলাম, আমাদের 'প্রসূনে' তার ২-৩ টি বেরিয়েছিল, তার বেশি নয়। সন্দেশে বা অন্য কাগজে যাবার চেষ্টা করিনি। কেবলি বই পড়তাম, লিখতাম আর নিজেকে তৈরি করবার চেষ্টা করতাম। এদিকে বড়দা ক্রমেই আরো রোগা, আরো দুর্বল হয়ে যেতে লাগলেন। তবু বসে বসে হাসি-মুখে কাজ করে যেতেন।

বলেছি তো আমরা পরম নিশ্চিন্তে নিজেদের কাজকর্ম করে যেতাম। সোনা-পিসিমার বাড়ির একতলায় একটা ঘেরা উঠোনে, সুন্দর একটা ১২ কোণা লাল চৌবাচ্চা ছিল। তাতে লাল, সোনালী মাছ রাখার কথা। বলা বাহুল্য পিসিমার ছেলেরা তাতে লাল মাছ রাখেনি। তার বদলে রেখেছিল একটা বেজায় বদ্‌মেজাজী কুমীর-ছানা। কে যে সেটাকে কোত্থেকে এনেছিল, তা মনে নেই। সেটা আবার দিনে দিনে শশীকলার মতো বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমরা ভয়ে মরি কবে না বেরিয়ে এসে, কাকে কামড়ায়। এমনিতেই তো বেশি ঝুঁকে দেখতে গেলে ফ্যাঁশ্‌-ফ্যাঁশ শব্দ আর দাঁত কট-কট করত। ছোট ছোট লাফ দিত। বেরিয়ে গেলও একদিন। বেজায় বৃষ্টির ফলে চারদিক জলে ভেসে গেল, উঠোনে জল দাঁড়াল, লাল চৌবাচ্চা উপচে পড়ল। সকালে দেখা গেল কুমীর নেই!

সকলের চক্ষুস্থির! পিসিমার সে কি রাগ! কুমীর-পোষা তিনি আদৌ সমর্থন করতেন না। কিন্তু ব্যাটা গেল কোথায়? তিন চার দিন পরে মর্টন ইন্সটিটিউশনের বড় দরোয়ান এসে বলল, "খোকাবাবুরা! ওদিকে কাঠ-গুদোমে কেউ ঢুকতে পারছে না, কি যেন ফোঁশ-ফ্যাঁশ কট্‌-কট্‌ করে তেড়ে আসছে!" সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অমনি 'বলা! বলা!' করে ডাক ছাড়া হল। সুন্দর জ্যাঠামশায়ের চতুর্থ ছেলে বলরাম দড়ির ফাঁস বানিয়ে নিয়ে গিয়ে কুমীর ধরে নিয়ে এল। এবাড়ির সকলে অম্লানবদনে স্বীকার করল যে ও কুমীর ধরা তাদের কর্ম নয়। এর পর আরেকটু বড় হলে কুমীরটা নিজেই খচমচ করে চৌবাচ্চা থেকে বেরিয়ে এসে, এখানে-ওখানে ওঁৎ পেতে বসে থাকত। ওর ভয়ে একতলার স্নানের ঘরে যেতে সবাই ভয় পেত ; তার পাশেই সেই উঠোন, আর কুমীর অনায়াসে জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে বসে থাকত। তার ওপর বলরাম যখন

ধর্মঘট করল যে সে আর কুমীর ধরতে পারবে না, তখন ওটাকে চিড়িয়াখানায় উপহার দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

॥ ১৮ ॥

এই দুই বছরে আমরা পাকা কলকাতাইয়া হয়ে গেছিলাম। শিলং-এর সেই গাছ থেকে পেড়ে ন্যাসপাতি, খোবানি, প্লাম, পীচ, ব্ল্যাক্‌বেরি, রাস্প্‌বেরি খাওয়া মনের পিছনে সরে গেছিল। ভাবতাম কলকাতার খাবারের মতো আছে কি! আম, জাম, কাঁঠাল, আতা। তাল-শাঁস খাইনি এর আগে, ডাবের জল খাইনি। একটা ফেরিওয়ালা সাড়ে বত্রিশ ভাজা বিক্রি করতে আসত। বত্রিশ রকম চাল-কড়াই আর $\frac{1}{2}$ খানা শুকনো লঙ্কা। আরেকটা লোক কুচি কুচি কাগজে মুড়ে চিনি দিয়ে তৈরি ১২ রকম খুদে খুদে নকল ফল আনত, প্রত্যেকটিতে আসল ফলের রঙ আর গন্ধ। এখন ভাবি গন্ধটি কি সত্যি ছিল, নাকি আমাদের উৎসুক নাকের চাঁদা? একজন প্যাটিওয়ালা বেজায় ভালো চিকেন-প্যাটি আর চিজ্‌-কেক বেচে যেত। একেকটার দাম বড়জোর দু আনা। কুল্‌পী-বরফওয়ালা সন্ধ্যাবেলায় চটে মোড়া মাটির হাঁড়িতে করে কুল্‌পী আনত। মনে হত স্বর্গে নিশ্চয় এই সব খায়। সাধারণ কুল্‌পী এক আনা, মালাই কুলপী দু আনা, ডবল মালাই তিন আনা। কালিকা হোটেল থেকে মাঝে মাঝে রসুনের গন্ধলাগা চপ-কাটলেট্‌ আসত। ইন্দুভূষণের দই, গিরীশ ময়রার সন্দেশ, দ্বারিক ঘোষের মিষ্টান্ন।

এ-সবের মধ্যে পড়ে শিলং-এর সেই তাজা ফলের স্বাদ, সেই ঘরে করা জ্যাম-জেলি, মাল্‌পোয়া, সিঙাড়া, পাঁড়েজির সেই ক্ষীরের বরফি প্যাঁড়ার কথা একেবারে ভুলে গেলাম। আশ্চর্য যে পাহাড়-নদী-বনের মধ্যে জীবনের প্রথম ১১ বছরের বেশি কাটালাম সারাদিনের মধ্যে তার জন্যে এতটুকু মন কেমন করত না। সেই পাহাড়ের চুড়োর প্রথম স্কুল, সেই ধূপ-ধুনোর গন্ধেভরা মা-মেরির মূর্তি দিয়ে সাজানো সুন্দর চ্যাপেল—সব ভুলে গেলাম। খালি অনেক সময় গভীর রাতে বাড়ির সামনেকার ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার অনেক পরে, যেদিন ঘুম ভেঙে যেত আর চারদিকের বিকট নৈঃশব্দ্য বোঝার মতো বুকে চেপে বসত, তখন সরল গাছের সেই একটানা মর্মরের জন্য হৃদয়টা আমার হুহু করে উঠত। কিছুতেই আর ঘুমোতে পারতাম না। তখন থেকেই আমার পাতলা ঘুম, অনিদ্রার জ্বালা আজও গেল না।

আরো বদলেছিলাম। শিলং-এ সাজ-পোশাক সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিলাম। কলকাতায় এসে নতুন বন্ধু-বান্ধবের মতো কাপড়-জামা পরতে ইচ্ছে করত। আমরা হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা করতাম, হাত-গলা খালি থাকত।

বন্ধুদের হাতে দেখতাম সোনার চুড়ি, গলায় সরু সোনার চেন্ লকেট। আমাদেরও শখ হত ; তবে এতটা বেশি নয় যে কাঁচের চুড়ি পরে সন্তুষ্ট না হওয়া যায়। ঐ চুড়িওয়ালার হাঁক শুনে নিঃশব্দ দুপুরে গায়ে রোমাঞ্চ লাগত।

প্রথম বছরটা কাপড়-জামার শখ মেটাবার কোনো সুযোগ পাইনি। কারণ আমরা বোর্ডিং-এ ভরতি হবার সময়, ছোট জ্যাঠামশাই দিদিকে আমাকে নিউ মার্কেটের রুলম্যানের দোকানে নিয়ে গিয়ে ৬টা-৬টা করে সাদা লং-ক্লথের লম্বা হাতা ফ্রক, পিনাফোর, বডি-পেটিকোট আর ইজের কিনে দিলেন। তার কোথাও এতটুকু ফুল-তোলা কি কুঁচি কি রঙীন বোতাম ছিল না, শুধু পিনাফোরের গলার কাছে খানিকটা সাদা লেস্ লাগানো ছিল। দিনের পর দিন আমরা তাই পরে স্কুলে যেতাম। বন্ধুরা হাসাহাসি করত। আজকাল হলে আর কেউ কিছু বলত না, কারণ সবাই রোজ এক রঙের, এক প্যাটার্নের উর্দি পরে ইস্কুল করে।

পরের বছর দুজনে শাড়ি ধরলাম, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা শখ মেটাবার সুযোগ পাওয়া গেল। বাবা সঙ্গে করে নিউ মার্কেটে নিয়ে গিয়ে জামা করবার জন্য ভয়েল, লন ইত্যাদি কিনে দিতেন। এক গজের দাম ছিল আট আনা থেকে চোদ্দ আনার মধ্যে। এক বুড়ো দর্জিকে এক টাকা দিলে সুন্দর ব্লাউজ তৈরি করে দিত। মা তাকে ধরে আমাদের জামা তৈরি শেখাবার বন্দোবস্ত করলেন। দর্জি কাগজে একটা করে ব্লাউজ কেটে দিল। আমরা সেটি ফেলে জামা কাটা মক্স করলাম। ক্রমে সাহস বাড়লে অন্য প্যাটার্নের জামাও তৈরি করতে পারতাম। মাঝে মাঝেই পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে হল্ অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসনের মস্ত দোকানের রেডিমেড্ জামার বিভাগে 'সেল' হত। সব জামা জলের দরে বিক্রি হত। চমৎকার কারিকুরি করা সব বিলিতী ভয়েলের জামা। তার একেকটার ভিতর দিদি আমি একসঙ্গে ঢুকে যাই। তারি মধ্যে সব চাইতে ছোট দু-একটি কিনে, সেলাই খুলে, ছোট করে কেটে, আবার সেলাই দেওয়া অভ্যাস করা হল। দুজনে ওস্তাদ দরজি হয়ে উঠেছিলাম। শিলং-এর কনভেণ্টে ফ্রেঞ্চ নান্‌দের কাছে শেখা এম্‌ব্রয়ডারি এতদিনে কাজে লাগল। আজ পর্যন্ত আমি কখনো কেনা জামা, কিম্বা দর্জির করা জামা পরি না।—যাক্‌গে এসব মেয়েলী কথা কেই বা শুনতে চায়। এও আমাদের কলকাতাবাসী হওয়ার একটা পর্যায়।

তাই বলে বারো মাস তো আর একটানা কলকাতায় থাকা হত না। মাঝে মাঝে অল্প দিনের জন্য ছাড়া পাওয়া যেত। মনে আছে ফিরে এসে কলকাতাটাকে যেন আরো ভালো লাগত, আরো সুন্দর মনে হত। সুন্দর আরো সত্যিই ছিল। আরো পরিষ্কার ছিল। দুবেলা রাস্তায় ঝাঁট পড়ত, হোস্-পাইপে করে জল দেওয়া হত। হপ্তায় হপ্তায় রাস্তার মধ্যিখানের বড় নর্দমার ঢাকনি খুলে, কোমরে দড়ি-বেঁধে একটা ছোট ছেলেকে নামিয়ে দেওয়া হত। সে বাল্‌তি করে

ভিতরকার ময়লা আর কাদা তুলে ঢাকনির পাশে জমা করে রাখত। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘোড়ায় টানা ট্যাঙ্কের মতো গাড়ি এসে সব কাদা তুলে নিয়ে যেত। ভোরে সব ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যেত। ঐ ছেলেটার বিষয় আমি গল্প লিখেছি।

আজকাল শুনি নালায় কাদা জমে পাথর হয়ে আছে, জল যাবার জায়গা নেই, তাই কুড়ি মিনিট বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়ায়। আগে নাকি জল দাঁড়াত না। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। তখন তো নালা পরিষ্কাব করা হত, তবু আধঘণ্টার মধ্যে ভবানীপুরে হাঁটুজল হত। ট্রাম বন্ধ হত, বাস ছিল না, লোকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গুটিয়ে, যে যার কাজকর্ম করত। পরদিন উত্তর কলকাতার খবর পেতাম। গণেশদারা বুক ফুলিয়ে বলত, "আমাদের মেছুয়া বাজারে গামলা চড়ে লোকে যাতায়াত করেছে। কালীতলায় গলা-জল"—এইসব। এ আমি নিজের চোখে দেখিনি। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও দেখেছি, পার্ক স্ট্রীটের মোড়ের কাছেই চৌরঙ্গীতে যে বড় পুকুর ছিল, এখন যেখানে প্যাতাল রেলের কাজ হচ্ছে, সে পুকুরের জল উপচে পড়ে গড়ের মাঠের জমা-জলের আর চৌরঙ্গীর জমা-জলের সঙ্গে মিলেমিশে ছোটখাটো একটি মহাসাগর তৈরি হয়ে যেত। তাতে বড় বড় মাছ সাঁতরে বেড়াত। তাদের আদি বাস ঐ বড় পুকুরটি।

এই কলকাতাকে আমাদের নিজেদের শহর মনে হত। এখানে আমার মা জন্মেছিলেন, আমার দাদা, দিদি, আমি এবং ছোট ভাইদের কেউ কেউ জন্মেছি। এইটাই আমাদের বাড়ি। আর সেই টিনের চালের লম্বা সাদা, অর্কিড ঝোলানো বাড়িটার স্থান তবে কোথায়? তাকে জোর করে মনের পিছনে ঠেলে রাখতাম, পাছে রাতের ঘুম নষ্ট করে। আরেকটা জায়গাও ছিল আমাদের। সে জায়গা কখনো চোখে দেখিনি। ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে, মসূয়া বলে একটা গ্রাম। সেখানে আমাদের ঠাকুমা থাকতেন, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের বাড়িতে। ঐ ময়মনসিংহেই নেত্রকোণা বলে এক জায়গায় আমার সেই বড় পিসিমা থাকতেন। তার পুত্র-ভাগ্য ভালো ছিল না। বড় দুটি গিয়ে, একটিতে দাঁড়িয়েছিল। মেজ ছেলের এক ছেলে। আমার চাইতে দু বছরের ছোট। তার জ্যাঠার ছেলেরা মানুষ হল না দেখে, বড় পিসিমা আর তাঁর বিধবা পুত্রবধূ তার একমাত্র ছেলেকে আমার বাবার কাছে মানুষ হবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেই ছেলে দেখতে দেখতে আমাদের আরেকটা ভাইয়ের মতো হয়ে গেল। তার নাম অশোক। এমন রসিক আর কর্মক্ষম মানুষ আমি কম দেখেছি। ঐ ৯-১০ বছরের ছোট ছেলেটা যখন অদেখা অচেনা আমাদের কাছে এসেছিল, তখন তার মনের মধ্যে কেমন হয়েছিল তাই ভাবি। দুদিনে সে আমাদের একজন হয়ে গেল। মা-হারা, বাপ-হারা, গৃহ-হারা মানুষদের আমার বাপ-মা-হারা গৃহ-হারা মা অমনি বুকে জড়িয়ে নিতেন। অশোক আমাদের দেশের কত যে মজার মজার

গল্প বলত, তার ঠিক নেই। দেশটা হঠাৎ আমাদের যেন বড় কাছে এনে ফেলত। গোড়ায় গোড়ায় ময়মনসিংহি কথা বলত, কলকাতার ভাষা শিখতে ওর এক মাস লেগেছিল। ও-ও কল্যাণ অমির সঙ্গে এল্-এম্-এস্ স্কুলে ভর্তি হল। বুঝবার জো ছিল না ও আমাদের ভাই নয়। শুধু একটা বিষয়ে তফাৎ ছিল। বাবা আমাদের যেমন ধমকাতেন, চড়টা-চাপড়টা চালাতেন, কিন্তু অশোকের বেলা সাতখুন মাপ। কখনো ওকে বকেছেন বলেও মনে পড়ে না। ও-ও অমনি বাবার মাথায় চড়ে বসল, সমানে সমানে ঠাট্টা তামাসা করতে লাগল। দেখে আমরা হাঁ। শুধু ছুটি-ছাটায় অশোক দেশে তার মা-ঠাকুমার কাছে যেত, আমরা কলকাতায় থাকতাম। প্রথমদিকে দেশে যাবার জন্য ও উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। পরে আগ্রহটা কমে গেল। গরমের ছুটিতে দেশে গেলেও, পুজোর সময় হয়তো আমরা কাছাকাছি কোথাও গেলাম, তখন ও-ও আমাদের সঙ্গে যেত। কত যে আনন্দের স্মৃতি মনে জমা হয়ে রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে সেসব জায়গার শিলং-এর সঙ্গে তুলনা হয় না, কিন্তু আনন্দের দিক থেকে একটুও কম যায় না।

প্রথম ঈস্টারের ছুটিতে আমরা কৃষ্ণনগরের কাছে মহেশগঞ্জের বাবুদের পৈতৃক বাড়িতে তিনদিন কাটিয়ে এসেছিলাম। বাবুরা অন্য জায়গা থাকতেন ; তাঁদের বোন আমার মায়ের কলেজের বন্ধু, তাঁর নিমন্ত্রণেই আমাদের যাওয়া। বাংলার ছোট শহরের ঐ আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। বাড়ির পাশে একটা নদী। বেশ চওড়া, কিন্তু এক হাঁটুর বেশি জল ছিল না। কয়েকটা ফুটো নৌকো বালির ওপর রাখা ছিল। ঐ নদীতে মোষরা স্নান করত, আমরাও করতাম, তাই আমাদের গায়ে ফুটকি-ফুটকি বেরিয়েছিল। নদীর ধারে দুটি আলাদা বাড়ি। একটি বন্ধ, রহস্যময়। অন্যটিতে আমাদের সেই মাসিমারা থাকতেন। এক সময় তাঁরা খুব ধনী ছিলেন, তখন অবস্থা পড়ে গেছিল। বাড়ি ভরা দামী দামী পালিশ-জ্বলা মেহগনির আসবাব। কারিকুরি করা উঁচু উঁচু খাট, মস্ত মস্ত আয়না, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেরাজ, দেয়ালে সোনালী ফ্রেমে তেল-রঙে আঁকা হাঁড়িমুখ লোকদের ছবি। বেজায় পুরনো বুড়ো বুড়ো চাকরবাকর। সমস্ত বাড়িটার কেমন একটা সেকালের আবহাওয়া। নক্সা করা টানা-পাখা, মস্ত মস্ত দেয়ালগিরি, ঝোলানো বাতি। দেখেশুনে আমি রোমাঞ্চিত। পরে আমার অনেক গল্পে, আপনা থেকেই ঐ রকম একেকটা বাড়ি দেখা দিয়েছে।

আমাদের শোবার ঘরে প্রকাণ্ড ডিম্বাকৃতি আয়না লাগানো ড্রেসিং-টেব্‌ল্। আয়নাটা কেবল মুখ থুবড়ে পড়তে চায়। দেরাজগুলোর চমৎকার পেতলের হাতল। কিন্তু টেনে খোলা দায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল একবার ওগুলো খুলতে পারলে, ভিতর থেকে নিশ্চিত রোমাঞ্চকর সব জিনিস বেরুবে। ওপরের একটা

ছোট দেরাজ অনেক কষ্টে টেনে খুলে, ভিতরে দেখি একটা হলদে হয়ে-যাওয়া মলাট-ছেঁড়া ইংরিজি বই। সেটিকে বের করে দেখি, তার নাম 'কাউন্ট ড্র্যাকুলা'। অমনি পড়তে বসে গেলাম। কি আর বলব, বইটাকে আর নামাতে পারি না! খাওয়া-শোয়া মাথায় উঠল। বীভৎস-রস যে কি বেজায় আকর্ষণীয়, ঐ আমার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। আমার চোখ কপালে উঠে গেল, গায়ের রক্ত হিম হল, চুল খাড়া হয়ে উঠল, তবু বই ছাড়তে পারি না। এখন পর্যন্ত সে শিহরণের কথা ভুলিনি। এর অনেক বছর পরে আমি যখন এম্-এ পাস্ করে রবীন্দ্রনাথের ডাকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতে এলাম, তখন একদিন দেখি একটা ১৩-১৪ বছরের ছেলে ক্লাসের মধ্যে কি একটা বই পড়ছে, কিচ্ছু শুনছে না। পড়তে পড়তে ছেলেটার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, চুল খাড়া হয়ে উঠছে, মুখ হাঁ হয়ে যাচ্ছে। লক্ষণগুলো আমার বিলক্ষণ চেনা। ছেলেটাকে বললাম, "নিয়ে আয়, দেখব।" সে কাঁচুমাচু মুখ করে বইটা এনে দিল। দেখলাম মলাটে একটা কালো গুহা থেকে একটা বিকট জানোয়ার মুখ বের করে রেখেছে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বইয়ের নাম 'তিব্বতী গুহার ভয়ঙ্কর', রোমাঞ্চ সিরিজ, ২২ নং! এই ধরনের বইয়ের ভয়ঙ্কর আকর্ষণ। আমি নিজে কখনো লিখি না, কিন্তু আকর্ষণটা অস্বীকার করা যায় না। রাতে অবিশ্যি ওঠবার সময় সেদিন দিদিকে ডেকেছিলাম। তাতে আর কি এমন ক্ষতি হয়েছিল? আমার বড়দা ছোটবেলায় ভাইবোনদের এমনি সব ভয়ের গল্প বলতেন যে রাতে কেউ উঠতে চাইত না। ঐ মহশগঞ্জের ছুটিটি তাই আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে রয়েছে।

এর পরের বছর আমরা মিহিজাম গেছিলাম। সেখানে বড় জ্যাঠামশায়ের একটা বাংলো-বাড়ি ছিল। কোনো সাহেবের শখের বাড়ি, সে বিলেত যাবার সময় ওটি সস্তায় বেচে গেছিল।·বড় জ্যাঠামশায়ের ছেলেমেয়েরা সেখানে বড় একটা যেত-টেত না। বাড়ি বন্ধই থাকত। একজন সাঁওতাল মালি দেখাশুনো করত। বাড়ির নাম "রোজি নুক্", সামনে অযত্নে বাড়া সারি সারি নানান্ রকম গোলাপগাছ। পেছনে পাঁচিলঘেরা তরকারির বাগান। কত রকম তরকারি গাছের জঙ্গল হয়ে আছে। দেখে কষ্ট হল। সাপের আড্ডা। কয়েকটা ঝিঙে, কাঁচালঙ্কা, কাগজি লেবু পেড়ে পালিয়ে এলাম।

ভারি সরল গ্রামবাসীরা। বাবা মুরগির ডিমের খোঁজ করতেই, যে যার ঘরের মুরগি ঠেলে সরিয়ে, তলা দেখে দু-চার দিন তা দেওয়া ডিম এনে দিয়েছিল। পয়সা পয়সা করে। কিন্তু সেদ্ধ করে ভেঙে দেখা গেল, প্রত্যেকটাতেই নানা পর্যায়ে মুরগি-ছানা তৈরি হচ্ছে।

এ বাড়িটারও কেমন একটা সেকেলে আবহাওয়া। পুরনো সাহেবী আসবাব।

এখানেও একটা ঐ রকম ডিমের আকারের আয়না দেওয়া ড্রেসিং টেবিল। সে আয়নাটাও কেবলি সামনে ঝুঁকে পড়ছিল। তার দেরাজও অনেক কষ্টে খুলতে হল। তার ভিতরেও হলদে হয়ে যাওয়া এক রাশি কাগজ। খবরের কাগজের কাটিং, একসঙ্গে আল্‌পিন দিয়ে আঁটা। খুলে দেখি বোয়ার যুদ্ধের ধারাবাহিক বিবরণী। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেই ধারাবিবরণী পড়েছিলাম। তার আশ্চর্য রোমাঞ্চ। এখন মনে হয় রস-রোমাঞ্চ উপভোগ করতে হলে, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকলে চলবে না। কাজেই আমাদের জীবনকালের যুদ্ধগুলোর বর্ণনা পড়ে যে উত্তেজনা হয়, সেটার একটা ব্যক্তিগত দিক থাকাতে, পরীদের গল্পের মতো উপভোগ্য হয় না। একমাত্র দুঃখ হল ঐ কাটিংগুলো কেন হস্তগত করিনি।

আরেকটা জায়গায় প্রায়ই যাওয়া হত। শিবপুরের বোটানিকেল গার্ডেন্স-এর ধারে মেসোমশায়ের বাড়িতে। সেখানকার আবহাওয়া অন্য রকম। সেকালের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। যেন মস্ত একটা পার্কের ভেতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্টেল-বাড়ি, কলেজ-হল, ছোট বড় সুন্দর দেখতে বাংলো, তাতে অধ্যাপকরা থাকেন। মেসোমশাই ফিজিক্সের অধ্যাপক। তাঁর একতলা বাংলোতে ঢুকলেই মনে হত অন্য কোথাও এলাম। চারদিকে রাশি রাশি বই, আলমারিতে, টেবিলে, চেয়ারে, মেঝেতে। কেমন একটা বই-বই গন্ধ। বড় ভালো গন্ধ সে। আমি অনেক সময় নতুন বইতে নাক গুঁজে বসে থাকি। বইয়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকত বর্মা চুরুটের গন্ধ, অম্বুরী তামাকের গন্ধ। সে এক অপূর্ব ব্যাপার। যারা চুরুট তামাক খায়, তারা ভোগাসক্তি নিয়ে তার গন্ধ উপভোগ করে। সত্যি করে ঐ গন্ধটি উপভোগ করে তারা, যারা তামাক ছোঁয় না। যেমন আমি। আমাদের বাড়ির চাকররা পর্যন্ত হয় ছাদে গিয়ে, নয় বাড়ির বাইরে গিয়ে বিড়ি খেত। বাবা পান ভালোবাসতেন, কিন্তু চুরুট সিগারেটে একটা টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে চরিত্র স্খলন হয়, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবে মেসোমশাইকে বেজায় ভালোবাসতেন। তিনি আমাদের বাড়িতে এসে চুরুট খেলে বাবার এতটুকু আপত্তি হত না। কিন্তু ছোট জ্যাঠামশাই যে আজীবন বাবাকে লুকিয়ে সিগারেট খেতেন, এ তাঁর নিজের মুখে শোনা।

নিটোল সুন্দর পরিবারটি ছিল আমাদের। আগে বড় জ্যাঠামশাই আর সুন্দর জ্যাঠামশাই এক বাড়িতে থাকতেন। পরে বড় জ্যাঠামশাই সেজ ভাইকে ডেকে বলেছিলেন, "এই স্নেহের সম্পর্ক চিরস্থায়ী করবার একমাত্র উপায় হল আলাদা বাড়িতে থাকা।" ভাবি কি আশ্চর্য বুদ্ধি ছিল বড় জ্যাঠার। সত্যিই শেষ পর্যন্ত ভাইবোনদের ভালোবাসা অটুট ছিল। মাথার ওপর ছিলেন ঠাকুমা। তিনি মসূয়া গ্রামের বাড়িতে লোকজন নিয়ে একা থাকতেন। চমৎকার সব ফলের গাছ ছিল

শুনেছি। দুধ খুব সস্তা ছিল। কেউ এলেই ঠাকুমা, বড়-পিসিমা আমাদের জন্য ক্ষীরের নাড়ু, নারকেল ছাঁচ, ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীর-নারকেলের 'ইচা-মুড়া', দেখতে ঠিক যেন চিংড়ি মাছের মুড়ো, আনারস ইত্যাদি পাঠাতেন। বলেছিই তো দেশের জন্য মনের মধ্যে একটা বড় কোমল স্থান ছিল। যাইনি কখনো। কেন যাইনি ঠিক জানি না। হয়তো বাবা জাত ভেঙে বামুনের মেয়ে বিয়ে করেছেন বলে পাছে কোনো অপ্রিয় কথা ওঠে। ওদিকে কিন্তু দেশের আত্মীয়রা এসে আমাদের বাড়িতে খেতেন। বড়-পিসিমা, অশোকের মা আমার বৌদি, এঁরা আমাদের বাড়িতে এসে থাকতেন। নিজেরা রাঁধাবাড়া করতেন। আমাদের বাড়িতে সম্পূর্ণ এক প্রস্থ রান্নার ও খাবার বাসন তোলা থাকত। খাবার সময় পিসিমাদের না ছুঁলেই হল। এতদিনে সেই পুরনো দুঃখটা আমার দূর হয়ে গেল। বলেছি তো আমরা দেখলে কারো খাওয়া নষ্ট হয় ভাবলেও আমার বড় কষ্ট হত। অনেক পরে আমার গোঁড়া হিন্দু বামুনের বিধবা ননদ বলতেন, আমি সামনে না বসলে, তাঁর খাওয়া হয় না। কোথাও কোনো খেদের অবকাশ রাখেননি ভগবান।

সেবার ঠাকুমার আশী বছর বয়স হল। তাঁর যে পেটে ক্যান্সার ছিল একথা কেউ আমাদের বলেনি। একদিন খুব অসুস্থ হয়ে ঠাকুমা দেশ থেকে.এসে বড় জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠলেন। দেখতে দেখতে তাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল। চারদিকে ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি ঘিরে রইল, মাঝখান থেকে ঠাকুমা স্বর্গে গেলেন। গল্প শুনেছিলাম ৩৩ বছর বয়সে ঠাকুমার শ্বশুরের ইচ্ছা-মৃত্যু হয়েছিল। বুড়ো মা-বাবা ছেলেমানুষ স্ত্রী আর ছোট্ট এক ছেলে রেখে মারা যাবার সময়, তিনি স্ত্রীকে বলেছিলেন "দুঃখ কর না ; তোমার ঐ এক ছেলে থেকে একশো হবে।" সেই ছেলে আমার ঠাকুরদা। ঠাকুমার আট ছেলে মেয়ে ও ৫৪টি নাতি-নাতনি হয়েছিল। তাদের ছেলেমেয়েদের ধরলে ১০০ না হলেও, কাছাকাছি হবে। মুশ্‌কিল হল ঠাকুমার নাতি-নাতনিদের কারো একটি, কারো দুটি সন্তান ; কারো কেউ নেই, আবার কেউ কেউ বিয়েই করেনি।

॥ ১৯ ॥

অনেকে জানতে চায় পাকদণ্ডী নাম কেন। পাকদণ্ডী হল তো পাহাড়ের খাড়াই ওঠার জন্য সাপের মতো আঁকা-বাঁকা পথ। সেই পথ-ই। ছোটবেলায় দেখতাম মধ্যিখানে আমাদের শহরখানি, তার প্রায় চারদিক ঘিরে পাহাড়। কাছের পাহাড়ের দিকে চেয়ে দেখতাম, একেবারে তলা থেকে চুড়ো অবধি পথ চলে গেছে। সে পথ সোজা নয়। সোজা পথ-ও একটা থাকত ; পাকদণ্ডীর বাঁক থেকে বাঁকে সে পথ খাড়া উঠে যেত। ভারি কষ্টকর, হাঁপ-ধরা পথ সেটা ; পাকদণ্ডীর সিকি ভাগ লম্বা ; কাজের মানুষদের পথ। খাসিয়া মেয়েরা পিঠে

বোঝা নিয়ে সেই পথ দিয়েই উঠত। আরাম করা কাকে বলে তারা জানত না।

কিন্তু পাকদণ্ডী আস্তে আস্তে, ঘুরে ঘুরে, ছায়ায় ছায়ায় উঠত। মাঝে মাঝে মনে হত বুঝি বনের মধ্যে ঢুকল। দুদিকের গাছ ঝুঁকে পড়ে পথটাকে কোলে নিত। একদিকে তার পাহাড়ের গা, একদিকে ঢাল নেমে গেছে। পাহাড়ের গায়ে, পাথরের খাঁজে খাঁজে সিল্‌ভার-ফার্ন, মেডেন-হেয়ার ফার্ন ; তাদের কি বাহার। সিল্‌ভার-ফার্নের তলায় কে যেন খড়ি মাখিয়েছে ; হাতে চেপে ধরলে, ফার্নের ছাপ হাতে উঠে আসে। আর ফুলের কথা কত বলব। বুনো ভায়োলেট, বুনো স্ট্রবেরি, পাতার সঙ্গে মিশিয়ে থাকা লজ্জাশীলা হানি-সাক্‌ল্‌, তার মধু-গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। দেখতে দেখতে, ফুল-পাতা তুলতে তুলতে, পাহাড় চড়া। সে পাহাড় চড়াতে কোনো কষ্ট থাকে না। একমাত্র মুশ্‌কিল হল গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে কারণ কখন সূর্য ডোবে কে জানে। গন্তব্যস্থানের কথা ভুলে যাওয়াও বিচিত্র নয়।

এইজন্য পাকদণ্ডী নাম। এর বেশি কি বলব ? ভালো জিনিস দেখে দেখে চলা, মন বোঝাই করে সুন্দর জিনিস জমা করা।

এদিকে ১৯২২ শেষ হল,১৯২৩ শুরু হল। আমার পনেরো বছর বয়স হল। নাবালকত্বর আর কিছু বাকি রইল না। এর আগেই মা দিদিকে আমাকে ডেকে নিয়ে একদিন অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের ছেলেমেয়ে কেন হয় জানিস ?" আমরা তো অবাক। আমতা আমতা করে বললাম, "ভগবান দেন।" মা সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হাতে করে কিছু দেন না, মানুষরা নিজেরা পাকায়।" এই বলে সোজা বাংলায় আমাদের মুখের দিকে চেয়ে মানুষের জন্মরহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিলেন। আমি তখন হয়তো ১৩ পূর্ণ হয়ে ১৪য় পড়েছি। আমাদের ভিক্টোরীয় মায়ের মুখে এমন অকথ্য সংবাদ শুনে বলা বাহুল্য আমরা শক্‌ড্। একেবারে 'শকু'। জাপানী ভাষায় উপযুক্ত শব্দ না থাকায়, ওরা শক্‌ড্‌কে বলে 'শকু' !

'শকু' হলেও একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়নি। অনেকগুলো জিজ্ঞাস্য বিষয়ে সেই সুযোগে জেনে নিলাম। ছেলেপুলে হওয়ার যখন এমন সহজ উপায় আছে, তখন রাজারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করত কেন ? মা তারো সহজ উত্তর দিলেন। অতিরিক্ত বিলাসী আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটানোর ফলে ছেলে হত না। ওষুধ-পত্র, তাবিজ, শেকড়, কিছুতেই কিছু হত না। "তাহলে তো বিয়ে না হলেও ছেলে হতে পারে।" মা বললেন, "পারেই তো।" তার অসুবিধাগুলোও বুঝিয়ে দিলেন। মা সেই এক দিনেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমাদের একটা চলন-সই যৌনবিজ্ঞানের পাঠ দিলেন। আর কোনো দিনও বিষয়টা উত্থাপন করেননি। তবে কতকগুলো ভালো ইংরিজি বই কিনে দিয়েছিলেন। আমার ভিক্টোরীয়

আদর্শে মানুষ মায়ের পক্ষে এই পাঠ দেওয়া যে কত শক্ত কাজ ছিল এবং তিনি যে কি স্পষ্ট ও নির্মলভাবে সে পাঠ দিয়েছিলেন ভেবে আশ্চর্য হই।

ব্যস্, আর কি চাই ? আমাদের বড় হওয়ার আর কি বাকি রইল ? তবু ছিল বাকি। সেই বছর দুটি ভালোবাসার মানুষকে হারালাম। দুটি কেন, বলতে হয় তিনটি। একজন হলেন আমাদের বড় জ্যাঠামশাই। আরেকজনের মৃত্যুর কথা ভাবলে আজ পর্যন্ত মনটা হু-হু করে। তিনি আমাদের বড়দাদা।

মনে হত বড় জ্যাঠা খুব বুড়ো। সাদা দাড়ি, গম্ভীর ভাব। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্তও রোজ আমহার্স্ট রো থেকে হেঁটে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্নান করে আসতেন। তাঁকে ধরল জ্বরে। সে জ্বরের কারণ ছিল বুকের দোষ। দেখতে দেখতে তাঁর ঐ বলিষ্ঠ শরীর ভেঙে পড়ল। জ্যাঠামশাই দেওঘর গেলেন হাওয়া বদল করতে। আর ফিরলেন না। তখন তাঁর হয়তো ৬৮-৬৯ বছর বয়স। মনে আছে এত দূরে দূরে থাকতেন যে ব্যক্তিগত অভাব বিশেষ কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু বাবার বড় কষ্ট হয়েছিল। কতদিন বাবার মুখ দেখলে আমাদের কষ্ট হত। তাছাড়া ঠাকুমা নেই, বড় জ্যাঠাও গেলেন, কেমন একলা লাগত।

কাজে ভরা ছিল জ্যাঠামশায়ের জীবনটা। যৌবনে বাপকে হারিয়ে, তাঁর সব দায়িত্ব নিজে বহন করেছিলেন। ছোট বোনের বিয়ে দেওয়া, ছোট ভাইদের মানুষ করা, সবই তাঁর দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ গম্ভীর চেহারার পিছনে আশ্চর্য উদার প্রাণরসে ভরপুর একটা চিত্ত ছিল। বাংলার যুবকদের জীবনযাত্রার মোড় তিনি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এ রাজ্যের তরুণরা একটা বলিষ্ঠ ক্রীড়ানুরাগী আদর্শ উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছিল। একদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ, দুরূহ গণিতশাস্ত্রের বই রচনা করেছেন ; অন্যদিকে ঘরকুনো বাঙালী ছেলেদের খেলার মাঠে তিনিই প্রথম ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আগে পর্যন্ত এ-দেশের শিক্ষাবিদ্‌দের একটা অলিখিত ধারণা ছিল যে গড়ের মাঠে গিয়ে সবার সামনে বল্ পেটালে সে ছেলে মানুষ হয় না। এই বজ্রগম্ভীর মানুষটির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চিরকালের মতো বাঙালী ছেলেরা বেঁচে গেছে।

প্রথম উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট খেলার দেশী ক্লাব হল টাউন ক্লাব। ১৯০০ সালেরও আগে, বিশেষ করে বড় জ্যাঠামশায়ের আগ্রহে ও অপরিসীম চেষ্টায় কয়েকজন দূরদর্শী ও চিন্তাশীল বাঙালী মিলে এই ক্লাবের পত্তন করেছিলেন।

চাট্টিখানিক কাজ নয় একটা গোটা জাতিকে বোঝানো মাঠে গিয়ে ছোট ছেলের মতো একটা কাঠের চ্যাপ্টা ডাণ্ডা দিয়ে শক্ত একটা গোলাকে পেটা-পিটি করলে কিভাবে কলেজের ছেলেদের উপকার হতে পারে। পৃষ্ঠপোষক অবিশ্যি আরো ছিলেন : নাটোরের মহারাজা, ভূ-কৈলাসের রাজা, মালখানগরের বসু পরিবারের কয়েকজন মাতব্বর আর অনেকগুলো আগ্রহে অধীর যুবক। এই

উৎসাহী যুবকদের দলে আমার বাবা প্রমদারঞ্জন, আর দুই জ্যাঠা মুক্তিদা আর কুলদাও ছিলেন। পরে মুক্তিদারঞ্জনের ছেলেরা; সোনা পিসিমার ছেলেরা, আমার অতুল পিসেমশায়ের ছেলেরা, বেচু দত্তরায়, প্রেমা দত্তরায় এবং আরো অনেকে বড় জ্যাঠামশায়ের দেখানো পথ ধরেছিল।

টাউন ক্লাব হল। এখন যেটাকে সকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ বলে সকলে জানে, গোড়ায় সেটাই ছিল টাউনক্লাবের মাঠ। পরে কোনো কারণে ক্লাবটি উঠে পাশের মাঠে চলে যায় এবং এখনো সেখানে আছে। বলা যেতে পারে বাঙালী ক্রিকেট ক্লাব বলতে, টাউন ক্লাবই প্রথম। পরে অবশ্য খ্যাতিতে ঔজ্জ্বল্যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু টাউন ক্লাবই বাঙালী ক্রিকেট ক্লাবের পিতামহ।

ক্লাব তৈরি হয়েছিল, ভালো ভালো খেলোয়াড় তৈরি হয়েছিল, আমাদের গোটা পরিবারের ক্রিকেটের ওপর একটা জন্মগত আত্মীয়তাও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জনসাধারণকে ক্রিকেটমুখী করতে আরো প্রায় ৫৫ বছর লেগেছিল। ক্রিকেটের মাঠে মেয়ে দর্শক কেউ ভাবতেও পারত না। টিকিট গ্যালারি, একে ওকে ধরাধরির কথা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারত না।

ছোট জ্যাঠামশাই বোধ হয় সবটাতে বাড়াবাড়ি করতেন। একদিন ১৯২২ সালে, ভাগ্নী ভাইঝিদের একটা দল নিয়ে ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হলেন। ক্যালকাটা ক্লাবের সায়েবদের সঙ্গে টাউন ক্লাবের খেলা। বড় জ্যাঠামশাই উপস্থিত থাকবেন। বলাবাহুল্য এই পরিকল্পনার কথা তাঁকে আদৌ বলা হয়নি। ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে যতই উদার হন, নিজের মেয়েদের বাড়িতে পড়াশুনোর ব্যবস্থা করেছিলেন, স্কুলে দেননি। ১৫-১৬ বছরের মধ্যে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমাদের খেলার মাঠে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর সমর্থন থাকা অসম্ভব। না জানানোই ভালো।

এখানে বাবার মনোভাব অবধানযোগ্য। কথাটা পাড়তেই তিনি ছোটজ্যাঠামশাইকে বললেন, "দেখ ছোড়দা, তুমি যা খুশি করতে পার, খালি আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। একপাল মেয়ে নিয়ে তুমি মাঠে যেও। আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমি আলাদা যাব।"

তাই করা হল। ছোটজ্যাঠাকে গড়পার থেকে নিজের দুই মেয়ে, আমহার্স্ট স্ট্রীট থেকে পিসিমার দুই মেয়ে আর রসা রোড থেকে আমাদের দুই বোনকে নিজস্ব গাড়ির অভাবে সংগ্রহ করতে কতখানি বেগ পেতে হয়েছিল সহজেই কল্পনা করা যায়। ভুলে গেছি, তবে মনে হয় উত্তর কলকাতার চার মেয়েকে সম্ভবত সুন্দর জ্যাঠার ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। আবছা মনে পড়ছে তাঁদের বাড়িরও গোটা

দুই বোন গেছিল। আমাদের দুই বোনকে ছোট জ্যাঠামশাই ট্যাক্সি করে ইডেন গার্ডেনে নামালেন।

সে ইডেন গার্ডেনের কথা আজকালকার লোকে ভাবতেই পারে না। মধ্যিখানে খেলা হত, তার চারদিক ঘিরে স্রেফ নন্দন-কানন ছড়িয়ে থাকত। যত্ন করে ছাঁটা ঘাসজমি, তার মাঝখানে নিখুঁৎ পিচ্, দেখেও চোখ জুড়োত। কেমন একটা অন্য জগৎ। হৈ-হল্লা নেই, ঠেলা-ঠেলি, গালা-গালি নেই। মাথার ওপর নীল আকাশ, গায়ে লাগে গঙ্গার বাতাস, চারধারে ফুলের বাহার, সবুজ মাঠে সাদা পোশাকপরা বাইশটা খেলোয়াড় আর তাদের সাহায্যকারীরা। মাঠে খেলা হচ্ছে, চারধারে মুষ্টিমেয় ক্রিকেটপাগল রোদে পা ছড়িয়ে ঘাসে বসে খেলা দেখছে। সুন্দর ছোট প্যাভিলিয়ন, তার কাছে এক সারি বেতের চেয়ার পাতা ছিল। ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের কর্তৃপক্ষকে হয়তো বলা ছিল। বার্কমায়ার সাহেব মোটা শরীর নিয়ে হাসি-মুখে আমাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। তাঁর সঙ্গে ক্রিকেটিং ক্যাপ পরা সাদা পোশাকপরা, সায়েব-সায়েব্ চেহারার যে দাড়িমুখ মানুষটি ছিলেন, তিনিই যে আমাদের বড় জ্যাঠামশাই সেটা বুঝতে সময় লাগল।

বার্কমায়ারের সঙ্গে দেখলাম তাঁর খুব ভাব। বড় জ্যাঠাকে এমন চমৎকার ইংরিজি বলতে শুনে আমরা থ'। বার্কমায়ার বললেন, "কি পানীয় দেব লেডিজ্‌দের ?" কেউ কিছু বলবার আগে বড় জ্যাঠা বললেন, "নাথিং স্ট্রং !" বলে মুচকি হাসতে হাসতে চলে গেলেন আর সেমুখো হলেন না। ঐ বড়জ্যাঠাকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে লর্ডস্-এ ব্যাট্ হাতে দাঁড় করিয়ে দিলেও নিশ্চয় ঘাবড়াতেন না, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমরা আইস্‌ক্রীম সোডা খেলাম।

ছোট জ্যাঠামশাই আমাদের মাঝখানে বসে ক্রিকেট খেলার নিয়ম-কানুন বলে দিতে লাগলেন। মাঠের কোন জায়গাটা লং ফীল্ড, কোথায় কভার পয়েন্ট, কাকে স্লিপ বলে, গুগলি কি, পায়ের বদলে হাত থাকলেও লেগ-বিফোর-উইকেট্ হয়, এ-সব আমাদের তাঁর কাছে শেখা। দুঃখের কথা আর কি বলব, এখন সব নাম পাল্টেছে ! কিন্তু আমরা ৮-৯টি বোন-ই যে প্রথম বাঙালী মেয়ে ক্রিকেট ফ্যান এবং প্রথম দর্শক, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সেদিনের স্মৃতিটি আমার মনের পটে সোনার জলে লেখা হয়ে রইল। আজ পর্যন্ত তার মাধুর্য এতটুকু টশ্‌কায়নি। লাঞ্চের সময় আমাদের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হল।

যতদূর মনে পড়ে এটা হল ১৯২২ সালের কথা। এক বছর আগেও হতে পারে, সময় গুলিয়ে যায়। বলেছি তো ১৯২৩ সালটি ভালো যায়নি। বছরের গোড়ায় যামিনীদা দেশে গিয়ে আর ফেরার নাম করে না। দু বছর আগে তার স্ত্রী মারা যায়। যামিনীদা ব্যস্ত হয়ে দেশে গিয়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে, তারপর আরেকটা বিয়ে করে ফিরে এসেছিল। বাবা চটে কাঁই। বললেন, "বাল-বিধবাদের আবার

বিয়ে হক ; কিন্তু তা তো দেবে না। বুড়ো হাবড়া নিজে আর একটা বিয়ে করে এল !"

বাল-বিধবার কথা কি করে উঠল ভেবে পেলাম না। কারণ যামিনীদার তো মেয়েই ছিল না, ছেলেরও বিয়ে হয়নি যে মরে গিয়ে বাল-বিধবা বানাবে ! সে যাই হক, যামিনীদা সে বছর আবার দেশে গেল। ছয় মাস আট মাস কেটে গেল, আর ফেরে না। সকলে বিরক্ত। এমন সময় হঠাৎ ন্যাড়া মাথায় যামিনীদার ছেলে তারিণী এসে বলল, "বাবা জ্বর হয়ে মারা গেছে ; তার কি টাকা-কড়ি পাওনা আছে নিতে এসেছি।"

দারুণ আঘাত লেগেছিল। যামিনীদা আমাদের রান্না করে খাওয়ায় না, এমন কোনো সময়ের কথা মনে পড়ে না। হয়তো আমার ২ বছর বয়স থেকেই ছিল। ধমক-ধামক, ঠেলে রান্নাঘর থেকে বের করে দেওয়া, চ্যালা-কাঠ নিয়ে তেড়ে আসা, সব কথা মা-বাবার কাছে গিয়ে লাগানো ইত্যাদি কারণে,যদিও তার সঙ্গে আমাদের গেরিলা যুদ্ধ থামত না, এখন ছবির অন্য দিকটাই কেবলি মনে পড়তে লাগল।

আমরা যে যা খেতে ভালোবাসতাম, তাকে ঠিক সেইটি দিতে যামিনীদার ভুল হত না। সর জমিয়ে বাড়িতে গাওয়া ঘি করত, তার চাঁচির ওপর গুঁড়ো চিনি ছড়িয়ে ডাক দিত, "কোথায় গেলে, চাঁচি খাবা না ?" অমনি আমরা আমাদের সেই মস্ত বাগানের যে যেখানে থাকতাম, সেখান থেকে ছুটে এসে ময়লা হাত পাততাম। যামিনীদা ন্যাশপাতি গাছের নিচে জলের কল দেখিয়ে দিত, "যাও, হাত ধুইয়া আস্।"

মাকে যামিনীদা দেবতার মতো ভক্তি করত। মার কখনো অসুখ-বিসুখ হলে, বাবা যদি ট্যুরে থাকতেন, যামিনীদাই একাধারে আমাদের মা-বাবা হয়ে যেত। রোগা টিং-টিঙে শরীর, খোঁচা-গোঁফ, খিটখিটে যামিনীদার জন্য আজ পর্যন্ত আমার মন কেমন করে। টাকা পনেরো মাইনে পেত, কাপড়-চোপড় বিছানাপত্র পেত, মাঝে মাঝে ধার-ধোর করত। ওর মৃত্যুর খবর যখন এল, তখন অন্য লোকে আমাদের রান্না করত। তার নাম ছিল বৈষম। পুরীর কাছে বাড়ি। আমরা ডাকতাম বিষ্ণু বলে। সে কিচ্ছু রান্না জানত না। গরম তেলে মাছ ছাড়তে হলে, 'মা' বলে এক ডাক দিয়ে, পাঁচ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াত। মা তাকে হাতে ধরে সব শিখিয়েছিলেন। পরে তেলের স্টোভের ওপর তন্দুর বসিয়ে সাহেববাড়ির মতো কেক্ বানাত। প্রথমে আমার মায়ের সংসারে, তার পর বোনদের সংসারে, সব নিয়ে ৫০ বছর আমাদের বাড়িতে কাজ করেছিল। শেষে দেখতে পায় না, পা কাঁপে, তবু কাজ ছাড়বে না। ওর ছেলে ভালো কাজ করত, সে নিয়ে যেতে চাইত। কিছুতেই যাবে না ! দিদিকে বলত "তুমি বেঁচে থাকতে,

আমি ছেলের ভাত খাব ?" দিদি তাকে পেন্‌শন দিত, বলত, "নিজের ভাতই খাও।" অবসর নিয়ে বেশিদিন সে বাঁচেনি।

এসব লোক আজকাল হয় না। যখন এসেছিল, আমার ছোটবোনের বয়স ছিল তিন। যামিনীদা রান্না করত, বিষ্ণু কাপড় কাচত, বিছানা তুলত, ফাই-ফর্মায়েস খাটত। লতিকাকে ডাকত 'খুকী', কারণ মা ডাকতেন 'খুকী' আর বিষ্ণুর সব কিছু মায়ের মতো করা চাই। লতিকার বয়স যখন ত্রিশ, কার্শিয়ং-এর 'ডাও-হিল্' স্কুলের অধ্যক্ষা, বিষ্ণু, তখনো তাকে ডাকে 'খুকী।' একবার বাংলার রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রী গেছেন স্কুল দেখতে। পরিদর্শনের কাজ হয়ে গেলে, লতিকার বাংলোর বসবার ঘরে বসে গরম কফি, ঘরে করা কেক্ বিস্কুট খাওয়া হচ্ছে। আমি তখন ওখানে ছিলাম ; দু-একবার চোখে পড়ল, গলা-বন্ধ সোয়েটার পরে ভারি অপ্রসন্ন মুখে বিষ্ণু বসবার ঘরের দরজার কাছে ঘোরাঘুরি করছে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই, আমি ভুরু কোঁচকালাম, বিষ্ণু সরে গেল।

আবার দেখি পাশের দরজা দিয়ে উঁকি মারছে আর বিড় বিড় করছে। অবশেষে বিশিষ্ট অতিথিরা উঠলেন ; আমরা গাড়ি-বারান্দা অবধি গিয়ে তাঁদের গাড়িতে তুলে দিলাম। রাজ্যপালের স্ত্রী মায়ের কলেজের বন্ধু, তাঁর সঙ্গে শেষ কটা কথা বলে নিচ্ছেন, এমন সময় স্পষ্ট শুনলাম বিষ্ণু আর ধৈর্য রাখতে না পেরে, লতিকার কাছে গিয়ে বলল, "এই খুকী ! এ-সব কি হচ্ছে, দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে না ?" ওকে বকতে গিয়ে লতিকা হেসে ফেলল আর যারা শুনতে পেল তারা সবাই হেসে ফেলল। এতক্ষণ পর লজ্জা পেয়ে বিষ্ণু পিছটান দিল। এ ঘটনা হল ১৯৫২ সালের ব্যাপার। আমার ছোটবেলা সম্বন্ধে যে বই লিখেছিলাম তার নাম দিয়েছিলাম, "আর কোনোখানে।" এ-ও সেই আর কোনোখানের কথা, এ জগতে এমন হয় না।

১৯২৩ সালের সব চাইতে বড় আঘাত বড়দার মৃত্যু। বছরটা শুরুই হয়েছিল হতাশার মধ্যে দিয়ে। দিদির আমার অক্ষর-চেনা এক সঙ্গে ; সেই ইস্তক এক সঙ্গে পড়াশুনো, খেলাধুলো ; একরকম কাপড়-চোপড় ; ওর চাইতে পড়ায় আমি একটু ভালো, তবে ও-ও ক্লাসের খুব ভালোদের একজন ছিল—কিন্তু ও বেজায় লক্ষ্মীমন্ত ; আমি দুরন্ত, মুখফোঁড়, অসহিষ্ণু। স্কুলে দুজনায় ছাড়াছাড়ি হবে কখনো ভাবিনি। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর অবধি ভাবছি কয়েক মাস পরেই দুজনে একসঙ্গে ম্যাট্রিক দেব। তখন ১৬ পূর্ণ হলে ম্যাট্রিক দেবার কথা। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ বললেন, "মেয়েদের বেলা অত নিয়ম কেউ মানে না। তোমার ফেব্রুয়ারিতে ১৫ পুরবে, তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে।" দুঃখের বিষয় সে অনুমতি পাওয়া গেল না। দিদি এবং পুরনো বন্ধুর দল পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে লাগল,

আমি নিচের ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে বসলাম। আমার বিশেষ বন্ধু মীরা দত্তগুপ্তাও পরীক্ষা দিল, তার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হল।

তবে নতুন সহপাঠিনীরাও মন্দ ছিল না। অল্প দিনে তাদের সঙ্গেও ভাব হয়ে গেল। কথাটা একবার মেনে নেবার পর আর তত কষ্ট হত না। মজা হচ্ছে, তার পরের বছর থেকে পরীক্ষার বয়স ১৬ থেকে কমিয়ে ১৫ করে দেওয়া হল। মাঝখান থেকে আমার একটা বছর নষ্ট হল। তবে নষ্ট বোধহয় হয়নি, অজস্র ইংরিজি বাংলা বই পড়েছিলাম। ছবি আঁকা শিখেছিলাম। বিশেষ সেলাই ক্লাসে যোগ দিয়ে নানা রকম এমব্রয়ডারির কাজ শিখেছিলাম। দিদিরা পাস করে কলেজে ভর্তি হল। আমি স্কুলেই রইলাম।

এর মধ্যে একদিন সকালের দিকে একজন শিক্ষিকা এসে আমাকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে গেলেন। নাকি মা আমাদের নিতে এসেছিলেন। নিচে নেমে মায়ের মুখ দেখে বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। দেখলাম মার হাতটাও থরথর করে কাঁপছে।

॥ ২০ ॥

ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখলাম এ গড়পার সে গড়পার নয়। এখানে হাসি নেই, কথা নেই, কাজ নেই, আনন্দ নেই। প্রেস্ বন্ধ ; প্রেসের ঝম্ ঝম্ শব্দ বন্ধ। কে যেন মনের কানে বলে দিল এখানে আর কোনো দিন ওসব হবে না। সব নাটক, সব গান, সব হাসি-ঠাট্টা চিরকালের মতো থেমে গেছে। কেউ কোনো কথা বলল না। একতলায় কোনো মানুষ আছে মনে হল না। সিঁড়ির ধাপে ধাপে লোক দাঁড়িয়ে ছিল। চেনা লোক প্রায় সবাই, কিন্তু সকলকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। বসবার ঘরের শ্বেত পাথরের মেঝের ওপর আমার ঠাকুমার ছেলে-মেয়ে-বৌ নাতি নাতনি নাত-বৌ নাত-জামাইরা কাঠ হয়ে বসেছিল।

বসবার ঘরের পাশ দিয়ে বড়দার ঘরে গেলাম। বড়দা চোখ বুজে বুকের ওপর হাত দুখানি জড়ো করে, একটা নিচু খাটের ওপর শুয়ে ছিলেন। সাদা কাপড়, সাদা চাদর, সাদা ফুল। বড়দার পায়ের ওপর মুখ থুবড়ে আমার হতভাগিনী জ্যাঠাইমা পড়ে ছিলেন। বড়দার পাশে একটা মোড়ার ওপর আমার অনন্যসাধারণ বৌঠান, চোখ বুজে, দুহাত যোড় করে বসে ছিলেন আর তাঁর দু গাল বেয়ে স্রোতের মতো জল পড়ছিল। মানিককে কোথাও দেখিনি ; হয়তো তাকে কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছিল। মানিকের তখন দু বছর বয়স, তার মায়ের ২৯ বছর, তার বাবার ৩৬ বছর।

দেখে দেখে দেখে দেখে চিরকালের মতো সে দৃশ্য আমার মনের ওপর আঁকা হয়ে গেল। বড়দার কোঁকড়া চুল, শীর্ণ গাল, তার ওপর কোথায় একটা বড়

ছেলে রঞ্জন, মেয়ে কমলা ১৯৫৬

পিসিমা, সোনা,বাপি

কমলা ১৯৫৮

এস· কে· মজুমদার ১৯৬০

ফ্যামিলি গ্রুপ ১৯৫২

বেতারের দল : সরোজ-নলিনীতে ১৯৫৯

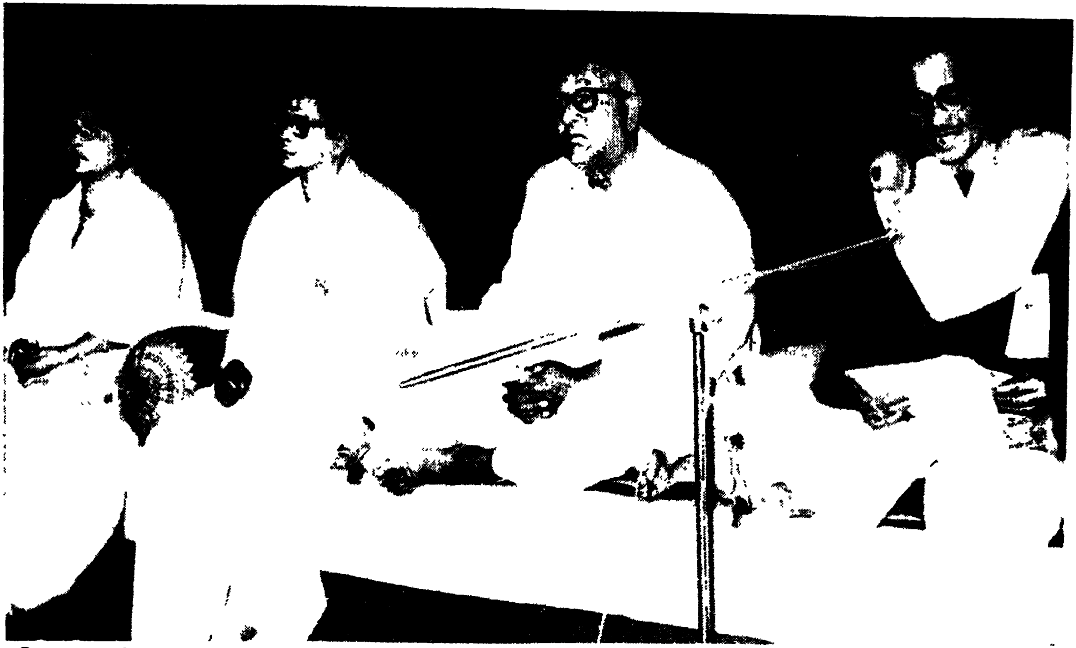

রবীন্দ্রমেলা, শান্তিনিকেতন ১৯৫৯

প্রথত নাতনি ১৯৫৯

আঁচিল। হৃদয়ের মধ্যে কাউকে যদি গুরুর আসন দিয়ে থাকি, এই সেই মানুষ। মনে আছে কেউ চেঁচিয়ে কান্নাকাটি করেনি। জ্যাঠাইমা-ও না। ব্রাহ্মবাড়ির এই একটি দিককে আমি বড় শ্রদ্ধা করি। শোকের সময় কখনো কাউকে সংযম হারাতে দেখিনি। মনে আছে কে যেন গান গেয়েছিল। বৌঠানের আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই বড় ভালো গাইয়ে। কণক দাশ, রেণুকাদেবী, সাহানা দেবী, আরো অনেকে। তবে সেদিন কারা গান করেছিলেন মনে নেই। বড়দার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্তটিও মনে করতে পারি না। শুধু এটুকু মনে আছে খালি-খালি মনে হচ্ছিল সব হারিয়ে ফেললাম, কিছু বাকি রইল না।

একদিন বালিশে ঠেস্ দিয়ে বসে, 'আবোলতাবোলে'র একটা ছবিতে তুলি লাগাতে লাগাতে বড়দা বলেছিলেন, "তুই-ও এসব করবি, কেমন ?" আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে শুধু মাথা দুলিয়েছিলাম। আসলে পারিনি বিশেষ কিছু করতে। ছবি সামান্যই এঁকেছি। ওঁদের মতো জোরালো হাত কই ? কবিতা আমার আসে না। গল্প লিখেছি অজস্র। বড়দার গল্পের মধ্যে এক ধরনের সততা আছে, যার সামনে যা কিছু মেকি, নকল, ভণ্ডামী, সব মাথা হেঁট করে। আমার সাধ্যমতো সেই সততাটুকুকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছি। সেই সততার তলায় তলায় সরসতার স্রোত বইয়ে দিতেন বড়দা। কোথাও এতটুকু তিক্ততা, কিম্বা গ্লানি থাকতে দিতেন না। আমিও সারা জীবন সেই চেষ্টাই করেছি। মেকি জিনিস পরিহার করতে চেয়েছি। মনের মধ্যে গল্পগুলি যেমন ফুটেছে, তেমনি সাজিয়ে দিয়েছি। নকল কিছুর জায়গা রাখিনি ; মাস্টারি করার চেষ্টা করিনি।

এসব হল পরের কথা। সেদিন আমার পনেরো বছর বয়স, তখনো স্কুলে পড়ি। শুধু এটুকু বুঝতে পারছিলাম বড়দা যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সেই আমার পথ। আমাকে দিয়ে অন্য কোনো কাজ হবে না। পণ্ডিতিয়ানা তো নয়ই। বড়দার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারের জীবনধারায় অন্যরকম সুর বাজতে আরম্ভ করল। যেন আত্মপ্রত্যয় কমে গেল। এখানে বড়দার বইয়ের বিষয়ও কিছু বলতে হয়। সব চাইতে আশ্চর্য কথা হল যে বড়দা একটা ছাপাখানার মালিক, একটা নাম-করা প্রকাশনালয়ের মাথা, অথচ ৩৬ বছর বয়স পর্যন্ত নিজের একখানিও বই ছেপে বের করেননি। ঐযে আবোল-তাবোল,—যার কবিতার মতো কবিতা রবীন্দ্রনাথও লেখেননি, যার ছবির মতো ছবি অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল চিন্তাও করেননি, যার মলাটের পরিকল্পনা দুনিয়াতে কেউ আজ অবধি করেনি—ঐ একখানি বইয়েরও পরিপূর্ণ রূপটি বড়দা দেখে যাননি। শুধুমাত্র তাঁর জীবনের শেষ সময়ে, বইয়ের ডামি কপিটি একবার হাতে নিয়েছিলেন। ৩৬ বছর বয়সে কি কারো মরা উচিত ? তারি মধ্যে এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিল তাঁর কত রচনা, কত ছবি। আমার ৩৬ বছর বয়সে

আমি তাঁর সিকির সিকি কাজও করে উঠিনি। বড়দার সব বই বহুকাল পরে মানিকের আর সিগনেট প্রেসের যুগ্ম চেষ্টায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই তিনটি মানুষ ; প্রথমে উপেন্দ্রকিশোর, তারপর সুকুমার, তারপর সত্যজিৎ, বাংলার শিশু-সাহিত্যের সাবালক-প্রাপ্তির জন্য যা করেছেন, সেটা অবধানযোগ্য। ছোটদের জন্য বই লিখলেই শিশুসাহিত্যিক হওয়া যায় না। শুধু তথ্যমূলক পাঠ্যপুস্তক লিখে গেলে তো নয়ই। ছোটদের বিষয়ে গল্প লিখলেও সব সময় শিশু-সাহিত্যিক হওয়া যায় না। ব্যাপারটা আরো গভীরে নামে। এখানে রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হয়। তিনি জ্যাঠামশায়ের ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, দুজনার একই ধরনের আদর্শ ছিল। বড়দাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মনে আছে বড়দার শেষ অসুখের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। বলেছিলেন, "তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?" বড়দা গান শুনতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আমি সেখানে ছিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য যা কিছু লিখেছেন, চমৎকার হলেও, আমি তার মধ্যে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা দেখতে পাই। যেখানে বড়দের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হচ্ছে, সেখানেও বিদ্রোহটা মায়ের কাছে প্রকাশ করা, কাজেই তার বেপরোয়া ভাবটা নিছক ছেলেমানুষীতে দাঁড়ায়। অথচ রবীন্দ্রনাথ খোকামি সইতে পারতেন না। ছোটদের জন্য তাঁর সব লেখাতেই দুটি জিনিস লক্ষ্যও করি। তিনি চাইতেন ছোটরা বিশ্ব-প্রকৃতির সব রস উপভোগ করুক এবং বলিষ্ঠভাবে বড় হতে শিখুক। এর মধ্যেই গুরুগিরির হাওয়া আছে। শিশু-সাহিত্যে গুরুগিরির স্থান নেই, এমনকি গুরুরও স্থান নেই। অথচ বিশ্বপ্রকৃতির সব রস উপভোগ করে বড় হতে পারার কথা আছে। যেমন করে সকলের আগোচরে ছোট ছেলের শরীরটিও বাড়ে।

উপেন্দ্রকিশোরের লেখার মধ্যে এই সহজ কথাটা বারে বারে প্রকাশ পাচ্ছে। এমন যে চমৎকার সৃষ্টি, একে ছোটদের সামনে তুলে ধরতে হবে। এমন যে উপভোগ্য জীবন, এর মজা বুঝতে পারলে আপনা থেকেই একে শ্রদ্ধা করা যাবে। উপেন্দ্রকিশোরের আগে পর্যন্ত বাংলায় সামান্য যে শিশু-সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে শিক্ষা দেবার দিকটাতেই গুরুত্ব দেওয়া হত। আর তার প্রায় সবই ইংরিজি বই থেকে নেওয়া হত। তাও অনেক সময় নাম-ধাম বদলে, মূল বইটার রস সব নষ্ট করে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর রসকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতেন। কিন্তু তাঁর লেখা গল্পগুলির মধ্যে খুব অল্পই মৌলিক গল্প। সন্দেশে প্রকাশিত তাঁর গল্প-সল্প ছাড়া। সেগুলি একেবারে মৌলিক এবং প্রাণরসে ভরপুর। ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতি-কথা, তথ্যমূলক রচনা সবই নিজে তৈরি করে লিখতেন।

গল্পের বেলা কেন লিখতেন না জানি না। যে কোনো দেশের বলিষ্ঠ সাহিত্য মৌলিক হয় ; ছোটদের জন্য রচনাও।

সেই মৌলিকত্ব সুকুমারের মধ্যে অপূর্ব খেয়াল-রসে ভরতি হয়ে উপ্‌চে পড়ত। বড়দা প্রায় সব গল্প নিজে বানিয়ে লিখতেন। ক্বচিৎ দু-তিনটি প্রচলিত রসের গল্প লিখেছেন। ঐ সরসতা আর স্বকীয়তা দিয়ে বড়দা তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনেই বাংলার শিশু-সাহিত্যকে সাবালকত্ব দিয়ে গেছেন। যতদিন লেখকরা অন্যদের বই থেকে ভুরি-ভুরি সামগ্রী ধার করে আনতে থাকেন, ততদিন বুঝতে হবে তাঁদের নিজেদের দেবার মতো কিছু নেই। অর্থাৎ তাঁদের দেশের সাহিত্য তখনো দানা বাঁধেনি। দানা না বাঁধা মানেই রস তখনো কাঁচা, পাতলা পান্‌সে। সুকুমার সেই পাতলা রসে দানা বাঁধিয়ে দিলেন।

তখন আমার পনেরো বছর বয়স। হাজার উচ্চাশা থাকলেও, ক্ষমতা ছিল কাঁচা। তবে এটুকু বুঝতাম বাংলা শিশু-সাহিত্যের জন্য কিছু করতে হলে, শুধু পুরনো রচনার নির্ঘণ্ট দিলে হবে না, কিছু সৃষ্টির কাজ করতে হবে। তার পর ৫৪ বছর কেটে গেছে, আমাদেরও সন্ধ্যা নেমেছে, তবু দেখছি সৃষ্টির কাজের শেষ নেই। কে একজন চিন্তাশীল মনীষী বলেছিলেন, 'দুনিয়াতে নতুন চিন্তা বলে কিছু নেই। সব কথাই কোনো না কোনো সময়ে, কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ, একবার না একবার বলে গেছেন।' সেইগুলিই হয়তো আমাদের মূলধন। কিছু অনুবাদ করেছি, কিছু জীবন-কথা ভ্রমণ-কথা সংক্ষেপে ছোটদের জন্য লিখে দিয়েছি। তার কিছুই আমার নিজের বলে প্রকাশ করিনি। মূল্যবান জিনিস যদি পাঠকদের চোখ এড়িয়ে যায়, তাই তুলে ধরেছি। বড়দের বই যে অনুবাদ করেছি, সেও ঐ একই কারণে ; নয়তো নিছক বাস্তব উদ্দেশ্যে। তাও বই পছন্দ না হলে নয়।

সত্যজিৎ আমার চাইতে তেরো বছরের ছোট। কর্মবহুল জীবনের মধ্যেও বাগ্‌দেবীর তাড়ায় না লিখে পারে না। সব মৌলিক, অভিনব, চমক্‌ময়। অতিশয় উত্তেজনাময় কাহিনীর তলায় তলায় সরসতার নদী বয়ে যায়। এমন গল্প এর আগে বাংলায় লেখা হয়নি, যদিও দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প ভালো ভালো আছে। এ-সব হল দুঃসাহসিক চিন্তার গল্প। এসব গল্পের বৈশিষ্ট্য হল যে পাঠকবর্গের যে একটা বৃহৎ অংশের যোগ্য বই বাংলায় বিশেষ লেখা হয় না—অর্থাৎ মোটামুটি ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়স্কদের কথা বলা হচ্ছে—মানিক তাদের অভাব ঘুচিয়ে দিচ্ছে। এবং যোগ্যভাবেই দিচ্ছে। যেমনি গল্পের রোমাঞ্চ, তেমনি ভাব, তেমনি ভাষা, রুচিও কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় না। গুরুজনদের আপত্তিরও কোনো অবকাশ থাকে না। যে দেশেরই সাহিত্য পরিণতি লাভ করেছে, সেখানেই এই ধরনের বই দেখা দিয়েছে। গত কয় বছরের মধ্যে বাংলায়

বেশ কটি তথ্যমূলক কিম্বা একেবারে কাল্পনিক দুঃসাহসিক অভিযান ও অভিজ্ঞতার বই প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি হল ছোটদের সাহিত্যের শেষ অধ্যায়। সুখের বিষয় মানিকের ভক্ত লেখকদের একটা বড় দল ক্রমে তৈরি হয়ে উঠছে। তারা যদি সত্যজিতের গল্পের উচ্চমান রক্ষা করতে পারে, বাংলা কিশোর-সাহিত্যের সুদিন তাহলে এসে গেল।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য হল এইটুকু প্রকাশ করা যে বড়দা উত্তরাধিকার স্বরূপ বাপের কাছ থেকে যে প্রতিভা লাভ করেছিলেন, ৩৬ বছরের জীবনে তাতে এমনি প্রাণশক্তির প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন যে আজ পর্যন্ত তার কাজ অদম্য গতিতে চলেছে। এ বিষয়ে সত্যজিতের অবদান নেহাৎ কম নয়।

তবে মাঝখানে মস্ত একটা মরুভূমি। তখন সেটা তত লক্ষ্য করিনি। নিজে সাবালিকা হবার কাজে বড় বেশি ব্যস্ত ছিলাম। ১৯২৩-২৪ সালের কথা ভাবতে চেষ্টা করি। দেশে তখন স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রমে বল পাচ্ছিল। তার মানে নয় শুধু বোমা বারুদ বিস্ফোরণ পিকেটিং ও কারাবরণ। সেসব তো ছিলই। তাছাড়াও ভিতরে ভিতরে দেশটাকে যে একটা বড় কিছুর জন্য তৈরি হতে হবে এবং হচ্ছেও, এ কথা আমি বিশ্বাস করতাম।

কতকগুলো মুশ্‌কিলও ছিল। বাবা সরকারি চাকরে। পরীক্ষা দিয়ে নিজ গুণে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে ঢুকে, ক্রমে ক্রমে প্রভিন্‌সিয়াল সার্ভিস থেকে ইম্‌পিরিয়েল সার্ভিসে উন্নত হয়েছিলেন। সেটা তত লজ্জার বিষয় ছিল না—অক্ষমতাতে বাহাদুরি কোথায়?—যতটা ছিল বাবার প্রথমে রায়-সাহেব, পরে রায়-বাহাদুর উপাধি লাভে। আমরা সবাই জানতাম বাবা কোনো দিন কারো খোশামুদি করেননি, কারো বাড়ি গিয়ে বসে থাকেননি; বরং কখনো যদি বাধ্য হয়ে কোনো সভা বা পার্টিতে যেতে হয়েছে বেজায় বিরক্ত হয়ে, হাঁড়িমুখ করে গেছেন। উপাধি পেয়েছেন স্রেফ্ ভালো কাজ করার জন্য। অবিশ্বাসীরা যাই বলুক, তখনো মাঝে মাঝে যোগ্য ব্যক্তিরা শিরোপা পেত। এখনো পায়। তবে সবাই পায় না। এবং তখনো যেমন, এখনো তেমন অযোগ্যরাও অনেকে পায়। কোনটা যে বেশি খারাপ তা জানি না।

যাইহোক উপাধিগুলোর ওপর বাবা হাড়ে চটা ছিলেন। নিজে কখনো ব্যবহার করতেন না, আর কেউ করলে বিরক্ত হতেন। আসলে আমাদের দেশভক্ত বন্ধু-বান্ধবরা ঐ উপাধির কথা জানতে পারেনি। তাইতে আমরা বেঁচে গেছিলাম। কিন্তু বাবা কেন সরকারি চাকরি ছাড়ছেন না, তাই নিয়ে গঞ্জনা দিতে ছাড়ত না। মার কাছে একবার কথাটা পাড়লে, মা সোজাসুজি বললেন, "এতো কোনো বিশ্বাসঘাতকতার কাজ নয়। তাছাড়া বাবা কাজ ছাড়লে কি তোরা আর তোদের দেশপ্রেমিক বন্ধুরা আমাদের সংসার চালাবি?" এমন অকাট্য যুক্তির

কোনো উত্তর হয় না বলে রণেভঙ্গ দিতে হল।

তখন কেউ বিদেশী কাপড় পরত না। শহরের নানা জায়গায় যে যার দামী দামী বিদেশী কাপড়-চোপড় এনে স্তূপাকার করে রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। মা একবার বলেছিলেন, "শীতে কাঁপছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গরীব মানুষ। পুড়িয়ে না ফেলে ঐ গরম জামাগুলো ওদের দিয়ে দিলে হত না ?" আমরা তখন জোর গলায় বলেছিলাম, "না, মা, হত না। দেশ-প্রেমের জন্য সব্বাইকে কষ্ট করতে হবে।" এখন ভাবি মা মন্দ কথা বলেননি। এদিকে বাবা নিউ মার্কেট থেকে আমাদের জন্য চমৎকার সব ভয়লের কাপড় কিনে আনতেন। নিজেরা জামা করতাম। তখন খুব ভালো দিশী সূতির কাপড় পাওয়া যেত না, যদিও গরম কাপড় আর রেশমী কাপড় তৈরি হত। আমরা বঙ্গলক্ষ্মীর মোটা মোটা শাড়ি পরে স্কুলে যেতাম। ৪৬ ইঞ্চি বহর, ১০ হাত। আমার খুব আরাম হত ; কিন্তু দিদি আর মা আমার চাইতে ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ওদের খাটো হত। সুখের বিষয় টাকা পাঁচেক দিয়ে চমৎকার ৪৮ ইঞ্চি বহরের ১১ হাত তাঁতের কাপড় পাওয়া যেত। সত্যি কথা বলতে কি শাড়ি নিয়ে কোনো কষ্ট ছিল না। কিন্তু দিশী মিল্‌ সবে চালু হয়েছে ; জামার কাপড় বানায় খড়খড়ে, মোটা। আমরা খদ্দরের জামা পরা ধরলাম। খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে কিনে আনতাম। আর কখনো বিলিতী কাপড়-জামা পরিনি। পরে সুন্দর ভয়ল্‌ও এদেশে তৈরি হত। এখনো "ফরেন" কাপড় গায়ে তুলতে পারি না।

আমার বন্ধু মীরা দত্তগুপ্তা আমাকে একটা তক্‌লি আর এক পুঁটলি তৈরি-করা তুলো দিয়ে বলল, "গান্ধীজি বলেছেন এই দিয়ে সুতো কেটে, ঘরে ঘরে তাঁতে বুনে নিলে, দেশে কারো কাপড়ের কষ্ট থাকবে না।" কতকটা মীরার অকাট্য যুক্তি শুনে আর কতকটা ওকে বেজায় ভালোবাসতাম বলে, তক্‌লিটা নিয়ে সুতো কাটা অভ্যাস করতে লাগলাম। অবশ্য বাবাকে লুকিয়ে। এবিষয়ে তাঁর খুব সহানুভূতি ছিল না। বলতেন, "শখের কথা আলাদা। কিন্তু মিল্‌ না চললে দেশের আর্থিক উন্নতি হবে না।" সে যাইহোক, বেশ সুন্দর দেখতে হত আমার সুতোগুলো। শেষটা অনেক সুতো জমে গেল।

তখন মীরাকে বললাম, "এখন কি করা হবে ? তাঁত বসাবার জায়গা আমাদের বাড়িতে নেই। তাঁত কিনবার টাকাও নেই আমার। তাঁত চালাতে জানিও না।" মীরা বলল, "ওসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।" নাকি খাদি প্রতিষ্ঠান না কোথায় ওঁরা কাপড় বুনে দিতেন। ওকে সুতোগুলো দিয়ে আশায় আশায় রইলাম। কবে আমার নিজের হাতে কাটা সূতির জামা গায়ে দেব। এমন সময় একদিন হাঁড়িমুখ করে মীরা এসে বলল, "এই নে তোর সুতো। আমাদের কারো সুতো ওঁরা নিলেন না। নাকি যথেষ্ট পাক দিই না ;

তাঁতে চড়ালেই ছিঁড়ে যাবে।" শুনে আমি অবাক হলাম। ওর বেশি পাক দেব কি! আর পাক দিলে যে সবটাই গুটলি পাকিয়ে যায়! রইল আমার তক্‌লি কাটা! ঐ তক্‌লিটা বছর পাঁচেক আগেও আমার কাছে যত্ন করে রাখা ছিল। তারপর যে কোথায় গেল বলতে পারছি না।

মীরা আমাকে স্বাধীনতা-সংগ্রামী করে তোলার জন্য কম চেষ্টা করেনি। কবে ঠিক মনে নেই, হয় ঐ সময়, নয় ২-১ বছর পরেও হতে পারে, ভবানীপুরে ওদের কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে মহিলাদের লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। কাঠি-ফড়িং-এর মতো চেহারা ছিল দুজনার। যেমনি বেঁটে, তেমনি রোগা। ও আমার চেয়েও বেশি। তাতে কি হয়েছে? আমরা আরো উৎসাহী সদস্যা জুটিয়ে মহা আগ্রহের সঙ্গে বিকেলে গিয়ে 'শির-মুড়া, দাড়ি-মুড়া' ইত্যাদি করতাম। ভারি ভদ্র ও আদর্শবাদী মাস্টারও জোগাড় করেছিল মীরা। বলা বাহুল্য এ-সবের জন্য কেউ একটা পয়সা নিত না। গরীব হলেও না। আদর্শবাদের যুগ সেটা। দুষ্টুলোক ছিল নিশ্চয়, কিন্তু বাবা আমাদের এমনি কড়া পাহারায় রাখতেন যে তাদের অস্তিত্ব তেমন টের পেতাম না। খালি আমাদের কলেজ বিভাগের একজন মেয়ের দাদা সাইকেল করে রোজ দিদির আর আমার পেছন পেছন স্কুল থেকে বাড়ি অবধি আসত। কিচ্ছু বলত-টলত না। ওর মা-বোনরা আমাদের চেনা ছিলেন। আমরা ভাবতাম ঐরকম পাজির পা-ঝাড়া কেউ নেই। একবার ভালো করে শিরমুড়া দাড়িমুড়াটা রপ্ত হলেই একদিন দেখে নেব! সে সুযোগ আর আসেনি। লাঠি লাগানোর মধ্যে ভালোমানুষ মাস্টারটির ঠ্যাঙে একদিন এমনি বাড়ি মেরে দিলাম যে দুদিন ধরে বেচারি খোঁড়াল। তবে এখনো মনে হয় ঠ্যাংটা তার সময়মতো সরিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, নইলে ও আবার কেমনধারা মাস্টার!

॥ ২১ ॥

ঐ বছর পুজোর সময় আমরা দেওঘরে গেছিলাম। মায়ের শরীর খুব ভালো যাচ্ছিল না। প্রফুল্লকাকাবাবুর কোনো আত্মীয়ের বাড়ি, রেলের গুমটির ওপরেই। সারা বছর খালি পড়ে থাকত। একটা দেখাশোনা করার লোকও ছিল না। পাশের বাড়ির পুলিস অফিসারের কাছে চাবি থাকত। বড় ভালো লোক। আমাদের খুব দেখাশুনো করতেন আর থেকে থেকেই জিজ্ঞাসা করতেন রাতে কেউ জ্বালাতন করেছে কি না। বৈদ্যনাথের এক পাণ্ডাও আমাদের তার পাখনার তলায় নিয়ে নিল। তার পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা মন্দির তপোবন ইত্যাদি নানা দ্রষ্টব্য স্থান দেখলাম। তাছাড়া বৈদ্যনাথের শ্রেষ্ঠ প্যাড়ার দোকান সেই আমাদের চিনিয়ে দিল। ফরসা শুঁটকো মিচকে চেহারা। কিন্তু উপকার করত সন্দেহ নেই।

দলটি আমাদের খুব ছোট ছিল না। জসিডি অবধি একটা গোটা থার্ড ক্লাস্ হাফ-কামরা রিজার্ভ করে গেছিলাম। তাতেও কিছু সীট বাকি থাকছে শুনে আত্মীয়স্বজনরা কেউ কেউ ঝুলে পড়ল। সুন্দর জ্যাঠার বড় মেয়ে প্রীতিলতা। আমাদের খুতিদি। তার বেশ লিখবার হাত ছিল। অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে সিলেটে চলে যাওয়াতে, সে-প্রতিভা ফুটবার সুযোগ পায়নি। খুতিদির দুই ভাই, হৈমদা আর নীরজাদা। এরা খেলার মাঠে বিখ্যাত ছিল। দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত। একজন শিবপুরে, একজন বেনারসে। বড়জ্যাঠার বড়ছেলের বড়ছেলে নরেশ। আমার চাইতে বছর তিন-চারের ছোট। ভারি মিষ্টি স্বভাব এবং তার চেয়েও মিষ্টি গানের গলা। তবে পরে শুনেছিলাম কোনো মেয়ে গাইছে মনে করে নাকি স্থানীয় যুবকদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ছোট জ্যাঠার দুই মেয়ে তুতুদি, বুলুদিও ছিল। নরেশ ছাড়া এরা সকলেই আমাদের চেয়ে ৫-৭-১০ বছরের বড়। তবু খুব জমত। আরো কয়েক বছর আগে এই নীরজাদাই আমাদের কাছে অম্লানবদনে রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূতের ও রোমাঞ্চের গল্প নিজের অভিজ্ঞতা বলে চালাত। এবার অবিশ্যি সে সম্ভাবনা ছিল না। আমরা বড় বেশি চালাক হয়ে গেছিলাম।

বাড়িতে এত লোক যে প্রায় সব ঘরেই শোবার ব্যবস্থা করতে হত। বাড়ির সব চাইতে ভালো ঘরটির তিন দিক খোলা, হু-হু করে হাওয়া দিত। কোনো ঘরেই বড় বড় তক্তাপোষ ছাড়া কোনো আসবাব ছিল না। আর ছিল প্রচুর দেয়াল আলমারি। এই ঘরটিতে মেয়েদের শুতে দেওয়া হয়েছিল। তার মানে তুতুদি, বুলুদি, দিদি, আমি। সারা রাত আর ঘুমুতে পারি না। কেমন একটা অস্বস্তি। থেকে থেকেই ঘুম ভেঙে যায়। চারজনেরি। দু-রাত এ-রকম হবার পর মা বললেন, "থাক গে, ওটাকে খাবার ঘর করে, এদিকের ছোট ঘরে তোরা শো।" তাই করা হল। উত্তরের ঘর, অনেক ছোট, তবু সারা দিন খোলা বাতাসে দূরে দূরে বেড়িয়ে, খুব ঘুমোতাম।

এই সময় হৈমদা, নীরজাদা এসে পড়াতে আবার জায়গার অভাব ঘটল। ওরা বলল, "আমরা ঐ খাবার ঘরটাতেই শোব। বারে বারে ঘুম ভেঙে যায় আবার কি? আমাদের ভাঙবে না। এই বলে ওরা ঐ ঘরে শুল। বলা বাহুল্য সারা রাত দু চোখের পাতা এক করতে পারল না। দু দিন চেষ্টার পর, ভিতরের বন্ধ দালানে ছেলেদের জন্য ঢালা বিছানা পাতা হত। সবাই আরামে ঘুমোত।

এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী কলকাতার বিখ্যাত হার্ট স্পেশ্যালিস্ট ডাঃ এস এন রায়ের স্ত্রী একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, তোমরা কি ঐ বাড়িতে খুব শান্তিতে আছ?" মা বললেন, "কেন বলতো?" "ও-বাড়িতে তো কেউ থাকতে পারে না। ওটা নাকি ভূতের বাড়ি। পূব-দক্ষিণের বড় ঘরে একজন দুঃখিনী মেয়ে আত্মহত্যা করেছিল।" আমরা বললাম, "ও-ঘরে কেউ শোয় না।

আমরা তো বেশ ভালোই আছি।" এটাই আমার জীবনের একমাত্র প্রত্যক্ষ ভূতের কাহিনী। তবে ঐ সময় থেকেই ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার মনটা কেমন স্পর্শকাতর হয়ে আছে। কত যে ভূতের গল্প লিখেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু দেখিনি কিছু, ভয়ও পাইনি কেউ।

১৯২৩ সালে দিদি ম্যাট্রিক পাস করে ডায়োসেসান কলেজেই পড়ছিল। খুব ভালো কলেজ ছিল, চমৎকার একটা লাইব্রেরি ছিল। সে যাই হক, কলেজের নিয়ম ছিল সবাইকে খোঁপা বেঁধে যেতে হবে। দিদির চক্ষু স্থির। খোঁপা বাঁধতে কে শেখাবে ? মা মাসি তো চুল টেনে বেণী বেঁধে, বেণী পাকিয়ে খুদে এক খোঁপা তৈরি করেই সন্তুষ্ট থাকতেন। সে-সবের চল উঠে গেছিল। কাজেই তুতুদি বুলুদির স্মরণ নিতে হল। ওরা এবং ওদের সব বন্ধুরা প্রায় মাথার সমান বড় বড় খোঁপা বাঁধত। খোঁপাগুলো ফোঁপরা হত, কারণ অনেকেরি মাথায় খুব বেশি চুল ছিল না। কিন্তু তাতেই নাকি ভালো খোঁপা বাঁধার সুবিধা। আমরা তো ওদের কাছে খোঁপা বাঁধা শিখতে বসলাম। সে কথাই বলি।

প্রথমে সব চুলগুলো আঁচড়ে পেছনে নিয়ে, একটা কালো ফিতে দিয়ে শক্ত করে গোড়া বাঁধা হত। তারপর সামনেটা চিরুণী দিয়ে ঠিক করা হত। এ কাজটি ভালো করে করতে হত ; পরে চিরুণী লাগাতে গেলে সবসুদ্ধ ধ্বসে পড়বার ভয় ছিল। পেছনের চুল এবার তিন ভাগ করে, মধ্যের ভাগটাকে জড়িয়ে তুলে বেশ কয়েকটা কালো লোহার কাঁটা দিয়ে শক্ত করে আটকাতে হত। তারপর তার চারদিকে দু দিকের দুটি ভাগকে জড়িয়ে হেয়ার পিন দিয়ে যথাস্থানে এঁটে দিতে হত। বুলুদির নাকি ২১-২২ টার কম কাঁটাতে চলত না। কিন্তু দেখতে হত চমৎকার। আমরাও খুব চেষ্টা করতাম। কাজটা খুব সহজ ছিল না। অনেক সময় সব করে-টরে, সেজেগুজে কোথায় বেরুব, ঠিক সেই মুহূর্তে নাকের ডগায় একটা মাছি বসল। সেটাকে তাড়াবার জন্য যেই না একটু মুণ্ডু নেড়েছি, ব্যস সবসুদ্ধ ধ্বসে গেল! চারদিকে হেয়ার-পিনের বৃষ্টি! কোনো ভালো জিনিস কি আর সহজে হয়। আমি ৬ বছর ঐ রকম খোঁপা বাঁধার পর, শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখলাম আমার স্কুলের বন্ধু অণুকণা দিব্যি সুন্দর গোড়া না বেঁধে, হাতে জড়িয়ে খোঁপা করে, তার মধ্যিখানের ফাঁশটি টেনে বের করে আনে। অমনি দেড় মিনিটে চমৎকার এক অজন্তা প্যাটার্নের খোঁপা হয়ে যায়। তাতে দুটি বড় সেলুলয়েডের কিম্বা একটি রূপোর বড় কাঁটা গুঁজে রাখলে সারা দিনে আর খুলে পড়ে না। এই খোঁপাই আমি আজ পর্যন্ত বাঁধি। কেউ শিখতে চাইলে শিখিয়েও দিতে পারি। কাঁটা না দিলেও চলে।

পুজোর শেষে ফিরে এলাম কলকাতায়। কোথাও যেতে যেমনি ভালো লাগত, ফিরে আসতেও তার সমান ভালো লাগত। গড়পারের বাড়ির আবহাওয়া

চোখের সামনে বদলে যেতে লাগল। নতুন বাড়ি, যে-বাড়িতে কেউ বাস করেনি, শূন্য হলেও একেবারেই ফাঁকা হয় না, কারণ সে-বাড়ি হয় সম্ভাবনায় ভরা। কিন্তু যে-বাড়ি থেকে সব চাইতে প্রিয় মানুষটি চলে গেছে, সেই বাড়ি হয় ফাঁকা। তার প্রাণ চলে যায়। যদি না আর কেউ প্রাণ দিতে পারে। গড়পারের বাড়ি তৈরি হবার পর মাত্র আট-নয় বছর কেটেছিল। এরি মধ্যে ঘরে ঘরে 'ছাড়ি-ছাড়ি' হাওয়া।

ও-বাড়ি ছাড়তেই হল। ব্যবসা রাখা গেল না। কত আশা করে বিলেত থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে জ্যাঠামশাই ছাপাখানা করেছিলেন। তার কি সুনাম। সারা ভারত থেকে ইউ রায় এণ্ড সন্সে হাফ-টোন ব্লকে ছবি ছেপে দেবার ফরমায়েস আসত। আর কি সব ছবি। তার ফেলে দেওয়া রঙীন প্রুফ আমরা তুলে এনে যত্ন করে রাখতাম। কিন্তু ব্যবসা পোক্ত হবার সময় রইল না। জ্যাঠামশাই ৫২ বছরে, বড়দা ৩৬ বছরে চলে গেলেন। মণিদার ঘাড়ে সব পড়ল। তার বয়স হয়তো ৩২। ছোট ভাই সুবিমল এ-সব কাজের দিকও কখনো মাড়ায়নি। কি করে যে কি হয়ে গেল এখনো বুঝতে পারি না। শুনেছি ধার ছিল মাত্র ১$^{১}/_{২}$ লাখ আর নানা জায়গা থেকে পাওনা ছিল ২ লাখ। তবু কেন ব্যবসা উঠে গেল ভেবে পাই না। কোনো একটা ব্যাঙ্ক কি অন্য প্রতিষ্ঠান কি সর্বনাশ ঠেকাতে পারত না। মোট কথা পাওনাদাররা ছিল পেশাদার মহাজন, তারা একজোট হয়ে নালিশ করেছিল। ব্যবসা, গুড-উইল, বাড়ি ঘর সব নিলাম হয়ে গেছিল। কপর্দকশূন্য অবস্থায়, আমার দেবতুল্য জ্যাঠামশাইয়ের, যাঁর বাড়িতে কত অনাথ অভাজন আশ্রয় পেয়েছিল, সেই জ্যাঠামশায়ের দুঃখিনী বিধবা আর দিক্‌-ভ্রান্ত সন্তানরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল। তবে এ সব ঘটতে সময় লেগেছিল দুই বছরের বেশি।

তার মধ্যে স্নেহের নীড় ভেঙে ফেলার বিষম ক্লেশ। কোর্ট থেকে বলেছিল বৌদের স্ত্রীধন ছাড়া আর সব জিনিসের নির্ভুল তালিকা তৈরি করে কোর্টের হাতে তুলে দিয়ে যেতে হবে। সে এক বেদনাময় অধ্যায়। তার হাল্‌কা দিকটাও ছিল। যারা চিরকাল রস বিলিয়ে এসেছে, তারা তালিকা করতেও রস পরিবেশন না করে পারেনি। মজার মজার বর্ণনা ছিল ঐ তালিকায়। কেউ পড়েছিল কি না জানি না। নিলেমে বাড়ি কিনেছিল পাশের বাড়ির ছেলেদের স্কুল। ব্যবসা কিনেছিলেন একদা ইউ রায় এণ্ড সন্সের সঙ্গে সংযুক্ত দুই ভাই, শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস ও শ্রীসুধাবিন্দু বিশ্বাস। আরো খোদ্দের থাকতে পারে, আমি সবিশেষ জানি না।

আমার ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন তাঁর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে ঐ বাড়িতেই বাস করেছিলেন। তাঁর নিজস্ব আসবাবপত্রে নাম লেখা ছিল না বা

অধিকার প্রমাণ করা কোনো দলিল ছিল না বলে, সেগুলিও তালিকাভুক্ত হয়ে নিলেম হয়ে গেছিল। উপেন্দ্রকিশোরের পাণ্ডুলিপি, 'সন্দেশ' পত্রিকার স্বত্বাধিকার, প্রেস, প্রকাশনী, সব গেছিল। কেবল সুকুমারের উত্তরাধিকারী, সত্যজিতের তখন দু বছর বয়স ছিল বলে, নাবালকের সম্পত্তি বলে তাঁর কাগজপত্রে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।

সব কথা মনে করতে পারি না। ঐ দুটি দুঃখময় বছরের কথা সব জানিও না। তবে পুরনো চাকররা এ বাড়িতে কাজ করে করে বুড়ো হয়ে গেছিল, তারা কেউ যেতে চাইছিল না মনে আছে। বলছিল কোথায় যাবে আজীবনের আশ্রয় ছেড়ে।

বড়দার মৃত্যু আর বাড়ি নিলেম হবার মাঝখানে ছিল ১৯২৪ সাল। তখনো সকলে গড়পারেই ছিল। শেষ একটি আনন্দোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ বাড়িতে। হয়তো খুব আনন্দের ব্যাপার হয়নি, কিন্তু বিয়ে বাড়ির নিজস্ব এক রকম মহিমা আছে, তাকে অস্বীকার করা যায় না। যতদূর মনে হচ্ছে বৈশাখ মাসে ছোট জ্যাঠামশায়ের ছোট মেয়ের আগে বিয়ে হল।

আমি সেবার ম্যাট্রিকুলেশন দিলাম। ডায়োসেসান স্কুলেই সীট পড়ত আমাদের। তখন পরীক্ষার হলে টোকাটুকির কথা শোনাই যেত না। এক-আধজন বে-পরোয়া অপরাধী দেখা গেলে, তাকে তখুনি ঘর থেকে বের করে দেওয়া হত। পরীক্ষার আগের তিন মাস পরীক্ষার্থিনীদের সে যে কি যত্নে তৈরি করা হত, এখনো মনে করে চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। সে অন্য রকম তৈরি করা। এখন দেখি ভালো ছাত্ররা যাতে বিদ্যালয়ের খ্যাতি বাড়ায়, তাই তাদের বেশি করে যত্ন নেওয়া হয় আর দুর্বল ছাত্রদের এক বছর আগে থেকে ট্র্যান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। আমাদের সময় এর ঠিক উল্টোটি হত। ভালোদের সাহায্য করতে শিক্ষিকারা তো সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন, কিন্তু শেষের ঐ তিনটি মাস ধরে যে ছাত্রী যে বিষয়ে কিঞ্চিৎ দুর্বল, তাকে সেই বিষয়ে তাঁরা আপ্রাণ তালিম দিয়ে যেতেন। শুধু যারা তিনটে চারটে বিষয়ে এত কাঁচা যে পাস করবার কোনো সম্ভাবনাই থাকত না, তাদের সে বছর পাঠানো হত না। কাজেই সকলেই ঐ তিনটি মাস খুব খাটত।

আমি নিজে আগের মতো বাংলায় কাঁচা না থাকলেও, ঐখানেই আমার সব চাইতে দুর্বলতা। সুখের বিষয় খাঁটি ব্যাকরণের প্রশ্নে খুব কম নম্বর থাকত। বাক্য রচনা, ভ্রম-সংশোধন, ব্যাখ্যা করা, ইত্যাদি বুদ্ধি করে চালিয়ে দিতে পারতাম। অনুবাদ আর রচনায় আমাকে পায় কে! কিন্তু যতই নিজেকে প্রবোধ দিই না কেন, বাংলায় আমি একটু কাঁচাই ছিলাম। যেখানে যত বাংলা বই পেতাম, সব পড়তাম। কি ভালো ভালো মাসিক পত্রিকা বেরুত : প্রবাসী,

ভারতবর্ষ, বসুমতী ইত্যাদি। সব পড়তাম। রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু লেখা ধারাবাহিকভাবে বেরুত। 'শেষের কবিতা' বোধ হচ্ছে 'বিচিত্রা'য় বেরিয়েছিল ; কোন সালে ঠিক মনে নেই। প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত ছিলাম। তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে বিচার-বুদ্ধি লোপ পেত।

কিন্তু ঐ স্কুলের শেষ বছরটাতে মনটা কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করত। মনে হত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে কি একটা যেন বাদ পড়ে যায়। তখন তারাশঙ্করের নাম কেউ শোনেনি, কিন্তু শরৎবাবুর অনেক ভক্ত। আমাদের বাড়িতে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে বড়রা খুব উৎসাহী না হলেও, তাঁর সব উপন্যাস আমাদের কিনে দেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার মা-বাবা ভারি উদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো নাম করা সাহিত্যিককে তখনো চোখে দেখেছি বলে মনে হয় না। এখনো ভাবি চোখে দেখার কি খুব গুরুত্ব আছে ? দুচার দিন মিশবার সুযোগ পেলে হয়তো ব্যক্তিগত তথ্য কিছু জানা যেতে পারে। কিন্তু তারই বা কতখানি মূল্য ? কত সময় যার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, তাকে কাছে থেকে দেখে হতাশ হয়েছি। ঐ যে কথাটা বারে বারে বলি, বারে বারে তার সমর্থন পেয়েছি। সৃজনের কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের সৃষ্টিকর্মের দিক আর ব্যক্তিগত জীবনের দিক একেবারে আলাদা। কোথা থেকে, হৃদয়ের গভীরের কোন নিভৃত গোপন স্বর্গ থেকে সৃষ্টির মন্ত্রটি পান তাঁরা, তার সঙ্গে মলিন জগতের কোনো সম্পর্ক নেই, যতই ব্যথা, যতই প্রেম থাক না কেন। বড়দার মৃত্যুর পর সন্দেশ আর বেশি দিন চলেনি। সন্দেশ বন্ধ হয়ে গেলে, আর কোথাও লিখবার কথা মনেও স্থান দিইনি। তাছাড়া আরেকটা কথাও ছিল। ১৯২২ সালে ঐ একটি গল্প প্রকাশিত হবার সময়ই বুঝেছিলাম আমাকে আরো প্রস্তুত হতে হবে। খাতায়, কাগজের কুচিতে অজস্র লিখতাম। ছোট ভাইবোনকে ছবি এঁকে এঁকে রাশি রাশি গল্প বলতাম। কিন্তু কোথাও ছেপে বেরোক, এ ইচ্ছাও কখনো হত না। এক আমাদের স্কুলের হাতে-লেখা পত্রিকা 'প্রসূন'-এ ছাড়া। তা সেই দলটি আমার এক বছর আগেই স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে গেছিল ; পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেছিল। ডায়োসেসান কলেজের নিজস্ব একটা ত্রৈমাসিক বেরুত, পরে তাতে লিখতাম। জানতাম যে না লিখে আমার উপায় নেই। কিন্তু হৃদয়ের দরজা জানলাগুলো তখনো খোলেনি।

গল্প লেখা আমাদের পরিবারের অনেকেরি অভ্যাস ছিল। এখনো মাঝে মাঝে পুরনো সন্দেশের পাতায় কারো কারো লেখা দেখে আশ্চর্য হই। যেমন ছোট জ্যাঠার ছোট মেয়ে তুতুদি যার ১৯২৪ সালে বিয়ে হল। সে সত্যি ভালো গল্প লিখত। কেন যে আর লেখেনি ভেবে পাইনে।

তুতুদির বিয়ে হবে গড়পারে, তার আগেই আমার পরীক্ষাও শেষ হয়ে যাবে।

খুশি না হয়ে পারলাম না। ছিলাম গিয়ে কয়েকদিন গড়পারে। ফাঁকা ফাঁকা ঘরগুলো কয়েক দিনের জন্য ভরাট হয়ে ছিল। তুতুদির মা যখন মারা যান, তুতুদির বয়স হয়তো দু তিন মাস। মেজ জ্যাঠাইমার কোলেই সে মানুষ হয়েছিল। সে যে ওঁর নিজের মেয়ে নয় বোঝাই যেত না। এই ক'দিন জ্যাঠাইমাও যেন নিজের দুঃখের বোঝাটা নামিয়ে রাখলেন। মফঃস্বল থেকে মেয়েদের নিয়ে মেজদি এলেন ; মেজদি মানে উপেন্দ্রকিশোরের মেজ মেয়ে পুণ্যলতা। বড়দিও এলেন, তাঁর নাম সুখলতা। আরো কেউ কেউ এলেন। বাড়ি গম্‌-গম্‌ করতে লাগল। সবাই জানত এ বাড়ির এই শেষ কাজ। কেউ মুখে সেকথা আনত না।

মেজদির দুই মেয়ে কল্যাণী আর নলিনী দেখতে কিছু রূপসী নয়, কিন্তু হীরের মতো ঝিকমিক করে। নলিনীর হল জ্বর। ৭-৮ বছরের জ্বরো মেয়েকে বিছানায় শুইয়ে রাখা এক ব্যাপার। বাড়িসুদ্ধ সবাই ব্যস্ত। মেজদির বড় ভয় ঐ মেয়ে না উঠে গিয়ে কোথায় কি খেয়ে বসে। আমিই একমাত্র বেকার। কাজেই ওকে আগলাবার ভার আমার ওপরেই পড়ল। বয়সের তফাৎটা আরেকটু বেশি কি আরেকটু কম হলে হয়তো আগেই ওর ওপর নজর পড়ত। কিন্তু ঐ বয়সে ৭-৮ বছরের ব্যবধান প্রায় অলক্ষ্য। মেয়ে ১০৩° জ্বর নিয়ে এই শোয় তো এই লাফিয়ে ওঠে। শেষটা বললাম, "শোও। তাহলে গল্প বলব।"

"কটা বলবে ?"

"অনেক।"

"যতক্ষণ শুয়ে থাকব ?"

"হ্যাঁ।"

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে নিনি বলল, "আচ্ছা বল।"

বলে বলে হয়রাণ হয়ে গেলাম। একটার শেষ কথা বলতে না বলতে, বলে, "আরেকটা।" যখন প্রায় জিব বেরিয়ে পড়েছে, তখন বললাম, "আমি হাঁপিয়ে গেছি। এবার তুমি একটা বল।" বলবার সঙ্গে সঙ্গে নিনি আলি-ভুলির গল্প শুরু করল। মনে হয় নাম দুটি সুখলতাদি কিম্বা আর কারো লেখা থেকে নিয়েছিল। কিন্তু গল্পটি একেবারে আন্‌কোরা নতুন। গল্পের প্লটের যে খুব চাঞ্চল্যকর গুণ ছিল, তাও বলছি না। কিন্তু গল্পের সমস্ত সংলাপ ছিল নিখুঁৎ ছন্দের ছড়ায়। আগে থাকতে তৈরি করা জিনিস নয়, সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে বানিয়ে করে দিচ্ছিল। আমি একেবারে হাঁ করে শুনছিলাম। ভাবছিলাম এ মেয়ে রক্তে করে কি জিনিস নিয়ে এসেছে কোথা থেকে কে জানে। মাঝে অনেক বছর উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে ঈশাণ স্কলার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বড় বড় কলেজের অধ্যক্ষার পদ ভূষিত করেও, তিনি তার রক্তের দাবিকে অস্বীকার করতে না পেরে, এখন

সন্দেশে ছোট মেয়েদের গোয়েন্দা-গল্প লেখে ! কিন্তু সেই আলি-ভুলি ছিল অন্য জগতের জিনিস। সে কোথায় গেল ?

॥ ২২ ॥

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দুটি মানুষের কাছে আমরা এই সময় অনেকখানি আনন্দের জন্য ঋণী ছিলাম। তাঁরা হলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই মেয়ে সীতা দেবী আর শান্তা দেবী। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে রস-রোমাঞ্চ খোঁজাই স্বাভাবিক। অজস্র ইংরিজি বই পড়েছিলাম। স্কুলের লাইব্রেরি থেকে দু বোন দুটি বই আনতাম। পাড়ায় দুজন মেয়ে থাকত, আমাদের চাইতে হয়তো ৩-৪ বছরের বড়। তারা ডায়োসেসান কলেজে পড়ত। যতদূর মনে হচ্ছে নাম ছিল রেণুকা আর কণিকা। তারাও কলেজ লাইব্রেরি থেকে দুটি বই আনত। প্রত্যেক সপ্তাহে দিদি আর আমি এই চারটি বই শেষ করতাম। এইভাবে স্কট, ডিকেন্স, হস্‌কেন, রাইডার হ্যাগার্ড, মারি করেলি, টলস্টয়, ডস্টোএভ্‌স্কি, ভিক্টর হিউগো থেকে আরম্ভ করে যত নাম করা লেখকের বই এবং অগুন্তি অখ্যাত লেখকের বই পড়েছিলাম। কবিতার বই নিয়ে ডুবে থাকতাম। ব্রাউনিং আর টেনিসন ছিলেন আমার প্রিয় কবি। অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কারো তুলনা ছিল না। বলেছি না তাঁর প্রচণ্ড প্রতিভা আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

ততদিনে বাংলা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে শিখেছি। বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র ছাড়াও তাঁদের চাইতে অনেক ছোট অনেক লেখকের সঙ্গে মনে মনে যে-রকম অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, সে-রকম অন্তরঙ্গতা বঙ্কিম শরৎচন্দ্র, কিম্বা মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্ভব ছিল না। তার কারণ ছোটরা ছিলেন অনেক কাছাকাছির মানুষ। নিজেকে এঁদের গল্পের নায়িকা ভাবা অনেক সহজ ছিল। এঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় সীতা দেবীর আর শান্তা দেবীর আর সংযুক্তা দেবী বলে একজন অজানা লেখিকার। পরে জেনেছিলাম সীতা দেবী শান্তাদেবী দুজনে মিলে একেকটা বই লিখতেন, আর লেখিকার নাম দিতেন সংযুক্তা দেবী। ভারি উপভোগ করেছিলাম বুদ্ধিটাকে। আমার মাসিমা কিন্তু বলতেন, "ও-সব দ্বিতীয় শ্রেণীর বই নিয়ে সময় নষ্ট করিস্ কেন ?" যাদের বই রোম্যান্স দিয়ে ঠাসা, তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর বলতে আমরা রাজি ছিলাম না। এই হল সাহিত্য বিচারের মজা। ব্যক্তিগত রুচির এক্ষেত্রে এত বেশি প্রাধান্য যে কে সত্যি ভালো আর কে মন্দ তাই বুঝে ওঠা দায়। তাছাড়া রসের জগতে ভালো-মন্দ নেই। কাকে ভালো লেখা বলা হবে, মাস্টারমশাইরা, সমালোচকরা, সাহিত্যবিদ্‌রা যার প্রশংসা করেন, নাকি পাঠকরা যার মধ্যে কিছু রস, আনন্দ, সান্ত্বনা, জীবনের মানে খুঁজে পায়, তাকে ? সত্যি কথা বলতে কি সমালোচকরা

অনেক নীরস দুর্বোধ বইয়ের প্রশংসা করেন ; সাধারণ লোকে যার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝে না, সেইসব জিনিস-ই তাঁদের বেশি পছন্দ। কারণ তাঁরা মস্তিষ্ক দিয়ে বই পড়েন। আর আধা-মুখ্যু জনসাধারণের মস্তিষ্ক বলে যা আছে, তার কথা বেশি কিছু না বলাই ভালো। কিন্তু তাদের বেদনা আছে, দুঃখ আছে, হতাশা আছে, সুখও আছে। তারা হৃদয় দিয়ে বইয়ের মানে করে। মুশকিল হল তাদের এক ঘেয়ে জীবনে রোমাঞ্চের বড় অভাব, তাই তারা উত্তেজনা খোঁজে। ভালো বইতে সেটি না পেলে, বাজে বই থেকেই নিশ্বাস বন্ধ করে ও-জিনিস আহরণ করে। বলেছিই তো সৃষ্টি-কর্মের ভালো-মন্দ বুঝে ওঠা দায়। আর তাই যদি বলা যায়, ভগবানের কেরামতিই কি সবসময় বোঝা যায় ? শিলং-এ সরলগাছে একরকম বিকট শুঁয়োপোকা দেখতাম। ৬ ইঞ্চি লম্বা, বুড়ো-আঙুলটার মতো মোটা, নোংরা ছাই রঙের গা, পিঠের ওপর দু-সারি ছোট্ট ছোট্ট ঢিব্‌লি মতো। একটা কাঠি গায়ে লাগালেই ফ্যাঁশ করে শব্দ হত আর ঢিবলিগুলোর ঢাকনি খুলে গিয়ে, ভেতর থেকে তিনটি করে মোটা লোম বেরুত, প্রত্যেকটির আগায় আঠার মতো কি একটা লাগানো। আমাদের খাসিয়া ধাইমারা বলত ও-জিনিস হাতে লাগলে জীবনে কখনো ঘা শুকোবে না, খেয়ে খেয়ে হাড় অবধি গিয়ে পৌঁছবে। ভাবতাম, এত যাঁর ক্ষমতা, তিনি ঐ জানোয়ার তৈরি করলেন কেন ? লেখকরা কোন ছার।

ছোটদের জন্যেও সেকালের সন্দেশে সীতাদেবী শান্তাদেবীর লেখা বেরুত, নিরেট গুরুর কাহিনী আর বিদেশী মজার গল্পের অনুবাদ। হিন্দুস্থানী উপকথা তো খুবই প্রশংসনীয়। তবে এ-সব গল্প মৌলিক ছিল না। আমি মৌলিক রচনার বেশি প্রশংসা করি। সীতাদেবী শান্তাদেবীর উপন্যাসগুলি ছিল একেবারে মৌলিক, অর্থাৎ একটা বিশেষ সমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রার গল্পকে যদি মৌলিক বলা যায়। কিন্তু ঘটনাগুলি তাঁদের কল্পনা-প্রসূত। সে সময়কার অনেক নামকরা কাহিনীর বিষয়ে এ-কথা বলা যায় না। এমন কি 'মন্ত্রশক্তি'র মতো একটি সার্থক রচনার অর্ধেকটির সঙ্গে ফ্লরেন্স বারক্লের 'দি ফলোইং অফ এ স্টার'-এর অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। অবিশ্যি দুই দেশের দুজন গুণী নারীর পক্ষে একই কাহিনী কল্পনা করাও অসম্ভব নয়। মোট কথা সীতাদেবী শান্তাদেবী গল্পের সঙ্গে আমাদের জীবনের বেজায় সাদৃশ্য ছিল। বলাবাহুল্য ঐ সব মনোহর রোমাঞ্চের অবকাশ বাবা একেবারেই রাখতেন না। ঘরোয়া জিনিস রূপদর্শীর চোখ দিয়ে দেখাটাও খুব সহজ গুণ নয়। পরে অবিশ্যি অন্য এবং আরো জোরালো লেখকরা এই দুই বোনকে নৃশংসভাবে আমাদের চিত্ত থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এবং তাঁদের মধ্যে কেউই নারী ছিলেন না। কয়েক বছর আগে কলকাতার এক দল অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মেয়েদের চেষ্টায় রবীন্দ্র সদনে

যে ছয়জন সত্তরোত্তর লেখিকাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছিল, সুখের বিষয় তাঁদের মধ্যে এই দুটি বোনও ছিলেন। এঁদের চাইতেও প্রবল প্রতিভাসম্পন্না লেখিকাও ছিলেন, যেমন শৈলবালা ঘোষজায়া, গিরিবালা দেবী। কিন্তু আমাদের ঐ ১৩, ১৪, ১৫ বছর বয়সে সীতাদেবী শান্তাদেবীকেই বেশি অন্তরঙ্গ বলে মনে হত। শৈলবালা যে সমাজের কথা লিখেছেন, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। আরেকটু দূরে দেখবার মতো জ্ঞানবুদ্ধিও ছিল না। এর পরেই শরৎচন্দ্রকে পেলাম। সীতাদেবী শান্তাদেবীর সঙ্গে অন্য লেখিকারা বিদায় নিলেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাংলা বইয়ের পাহাড় জমালাম। বুঝতে পারতাম শুধু ইংরিজি বিদ্যা দিয়ে হবে না ; যদি কিছু লিখতে হয় বাংলাতেই লিখতে হবে। যে-সব ভারতীয়রা মাতৃভাষা ছেড়ে ইংরিজিতে সাহিত্য-সাধনা করতেন, তাঁদের সঙ্গে আমার মনের মিল ছিল না। পরে কিছু ইংরিজি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, ভালোই লিখেছিলাম, কিন্তু ও-পথে আমার পা রাখার মাটি খুঁজে পাইনি। ইংরিজি বিদেশী ভাষা। এতাবৎ শুধু নিজেদের পরিবারের কথাই বলে এসেছি। তার একটা কারণ অনাত্মীয় সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া কাউকে দেখিনি। তাঁকেও দেখেছি বললে ঠিক বলা হবে না, বরং দর্শন করেছি। অর্থাৎ বাইরে থেকে দেখেছি। কলকাতায় সেই সময় আরেকটা বাড়িও ছিল, যাদের সঙ্গে আমাদের কোনো রক্ত-সম্পর্ক না থাকলেও এত বেশি ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা ছিল যে অনেকে ভাবত ওঁরা আমাদের নিকট আত্মীয়। তাঁরাও ময়মনসিংহ থেকে এসেছিলেন। মেজজ্যাঠামশায়ের বন্ধু গগনচন্দ্র হোম। এঁর বড় ছেলে অমল হোম সামাজিক কাজে,রবীন্দ্রসাহিত্য ব্যাখ্যানায় আর মৌলিক সমালোচনায় এক সময় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আমার প্রিয় বন্ধু ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় গগনচন্দ্রের ভাইপো।

গল্প শুনেছি এই গগনচন্দ্রের ব্রাহ্ম সমাজের গন্ধ-লাগা বিষময় প্রভাব থেকে তাঁর আদরের পোষ্যপুত্র উপেন্দ্রকিশোরকে রক্ষা করবার জন্য আমার বাপ-জ্যাঠাদের দূর সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন এবং বলাবাহুল্য একেবারে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ময়মনসিংহ থেকে উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে এন্ট্রান্স পাস্ করে উপেন্দ্রকিশোর কলকাতায় পৌঁছে একেবারে গগনচন্দ্রের মুঠোর মধ্যে এসে পড়লেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের সঙ্গে পরিচয় হল। ফলে যা হবার তাই হল। উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্ম হলেন। সেই ইস্তক গগনচন্দ্রের বাড়ির সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের আত্মীয়তা। উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে আত্মীয়তা মানে তাঁর ভাইদের সঙ্গেও আত্মীয়তা। উপেন্দ্রকিশোর যখন দ্বারিক গাঙ্গুলীর মেয়ে বিয়ে করলেন, সারদারঞ্জন প্রমাদ গণলেন। অমনি উপেন্দ্রকিশোরের পরের ভাই মুক্তিদারঞ্জনের বিয়ে দিয়ে দিলেন। আসলে মুক্তিদার তখনো বিয়ের

বয়স হয়নি। হয়তো সবে উনিশ পুরে কুড়িতে পড়েছিলেন। নাকি কিঞ্চিৎ অনিচ্ছুক ছিলেন ; এত শীগগির বিয়ে কিসের। তবে বিদ্রোহ করবার সাহস পাননি। আমি নিজের চোখে দেখেছি ঐ বিয়ে কত সুখের ছিল। তাছাড়া সারদারঞ্জনের আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন এসব ব্যাপারের অনেক বছর পরে কুলদারঞ্জন এবং আমার বাবা দুজনেই ব্রাহ্ম মতে বিয়ে করলেন। তবে উপেন্দ্রকিশোর ছাড়া কেউ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নেননি। দীক্ষা না নেওয়াতে বাবার কোনো অসুবিধাও হয়নি, তিনি দস্তুরমতো গোঁড়া ব্রাহ্ম ছিলেন। যিনি এই সর্বনাশের মূল, সেই গগনচন্দ্র হয়তো উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন না, তবু বাবারা সবাই তাঁকে গগনমামা বলতেন। আমরা বলতাম গগনদাদামশাই। এমন আমুদে স্নেহশীল মানুষ খুব বেশি দেখিনি। অবারিতদ্বার। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে অচেনা লোকেও খেয়েদেয়ে এলে তাঁরা কৃতার্থ হতেন। শুধু গগনদাদামশাই নয়, তাঁর স্ত্রী-ও। তাঁকে আমরা ডাকতাম গগন-বৌদি। তাঁর হাসিখুশি শামলা মুখখানি চোখের সামনে ভাসে। এঁদের বড় ছেলে অমল হোমকে আমরা বলতাম ননীকাকা। ননীকাকার বিয়ের সময় বাবার সঙ্গে গগনদাদামশায়ের মনোমালিন্য হল। সে আরো কয়েক বছর পরের কথা। তবে গগনদাদামশায়ের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা যে কত ঘনিষ্ঠ ছিল তাতেই বোঝা যায়।

সে সময় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম যুবকদের মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা গেছিল। প্রশান্তচন্দ্র বললেন, হিন্দু বিয়ে যখন রেজিস্টার করতে হয় না, আদি ব্রাহ্ম সমাজে বিয়েও যখন রেজিস্টার করতে হয় না, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে বিয়েই বা রেজিস্টার করা হবে কেন ? এই নিয়ে মহা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এদিকে বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মেয়ের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের বিয়ের সব ঠিক। হেরম্বচন্দ্র ভয়ানক রেগে গেলেন। রেজিস্ট্রি না করলে ব্রাহ্ম বিয়ে বে-আইনী। তাঁর মেয়েকে তিনি এভাবে বিয়ে দিতে পারেন না। কেউ নিজের মত ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত বাপের অমতেই মেয়ের বিয়ে হল। পরে বাপ তাঁদের ক্ষমাও করলেন। এর বছর দুই-তিন পরে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র তাঁর কনিষ্ঠা বোনের বিয়ে দিলেন। সে বিয়েও রেজিস্ট্রি হল না। আরো পরে স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়ে হেমলতা সরকারের মেয়ের সঙ্গে অমল হোমের বিয়ে হল। কে আমাদের বাড়িতে খবর দিল এ বিয়েও রেজিস্ট্রি হবে না। শুনেই বাবা মহা চটে গেলেন। “তাহলে আমি বিয়েতে যাব না।”

বাবা বিয়েতে যাবেন না মানে আমরাও যাব না। আমাদের দুঃখ দেখে কে ! বলাবাহুল্য বাবার কথা শুনে গগনদাদামশায় যেমনি অবাক, তেমনি ক্রুদ্ধ ! “তবে

প্রশান্তর বিয়েতে আর তার বোনের বিয়েতে কেন গেছিল ?" বাবা বলতে চাইছিলেন যে তারা নিছক পর, তারা কি করে না করে তাতে আমি কি বলব। কিন্তু গগনমামার ছেলের কথা আলাদা! এসব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে কারো সহানুভূতি থাকা সম্ভব নয়। বাবার সঙ্গে গগনদাদামশায়ের মুখ দেখাদেখি রইল না। রবিবার রবিবার মামার কাছে যাওয়া বাবা বন্ধ করলেন। তারপর অবিশ্যি মিটমাট হয়ে গেল। মৃত্যুকালে গগনদাদামশাই এর শোধ তুললেন। বলে বসলেন "কুলদা আর প্রমদা আমার জন্য যেন হবিষ্যি করে।" বলাবাহুল্য বাবা জ্যাঠামশাই তাই করেছিলেন। ভাবি আত্মীয়স্বজন আর কাদের বলে ?

অমল হোমের বিয়ের অনেক আগেই তার একমাত্র বোন, আমাদের বীণাপিসির বিয়ে হল। এঁর স্বামী শ্রীসুকুমার বসুই কয়েক বছর আগে তাঁর ভূতত্ত্বের বইয়ের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। গগনবৌদি এসে আমাদের দুই বোনকে আর দাদাকে বিয়েবাড়িতে নিয়ে গেলেন। এই প্রথম মায়ের তত্ত্বাবধানের বাইরে অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে থাকলাম। সেখানে দেখলাম বীণাপিসি 'দোলন-চাঁপা' বলে একটা কবিতার বই উপহার পেয়েছে। কে যেন কবিতাগুলো পড়ে শোনাচ্ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পরে বাড়ি এসে ঐ বইখানার সঙ্গে নজরুলের আরো গোটা দুই বই কিনে ফেললাম। কোনো মুসলমান কবির মুখে এমন কাব্য শুনব আশা করিনি। কাজি নজরুল নাকি তখন জেলে ছিলেন। বইতে কামানের পাশে দাঁড়ানো তাঁর এক বেপরোয়া ছবিও দেখলাম। মনের গোড়ায় নাড়া লেগেছিল। আশ্চর্যের বিষয় সেই প্রথম মোহের এতটুকু আর বাকি নেই। অপূর্ব ভাষা, অপূর্ব ছন্দ, কিন্তু ভাবের দিকে কোথায় যেন অনেকখানি অতৃপ্তি থেকে যায়। এ হল নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত কথা। সর্বজনস্বীকৃত মহান্ কবিকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সত্যি কথা বলতে কি শেলীর কবিতাকে আমার কেমন একটু পৌরুষের অভাব মনে হয়। সে-ও ব্যক্তিগত কথা। এই বইতে আমার প্রকৃত আর আন্তরিক মতামত ছাড়া একটি কথাও লিখব না। মোট কথা সে সময় কাজি নজরুলের কাব্যসুধার আস্বাদ পাওয়ার জন্য বীণাপিসির বিয়ের কথা এত বেশি করে মনে পড়ে।

আরেকজন মানুষকেও আবিষ্কার করলাম। আমি একা নয় ; বাংলার পাঠকরা সবাই করল। তাঁর নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর বয়স তখন কুড়ির নিচেই হবে যদ্দূর মনে হয়। আমাদের বাড়িতে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, তিনটি পত্রিকাই আসত। সেকালের প্রবাসীর তুলনা খুঁজে পাই না। সব তরুণ লেখকদের নিদ্রার ও জাগরণের স্বপ্ন, প্রবাসীতে লেখা বেরুবে। টাকার জন্য নয়। প্রবাসী বা অন্য কোনো কাগজ লেখকদের তখন খুব বেশি টাকা দিত বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রবাসীর লেখক হবার সম্মান অনেকখানি। আমরা পত্রিকাগুলোর সামনের মলাট

থেকে পেছনের মলাট পর্যন্ত সব কিছু পড়তাম ; চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন, সবকিছু। প্রবাসীতে মাঝে মাঝে পুস্তক-সালোচনায় দেখতাম বইয়ের ও লেখকের নাম, পৃষ্ঠা সংখ্যা আর দামের পরে শুধু লেখা, 'ছাপাই ও বাঁধাই ভালো।' ব্যস্ আর কিছু না।

সেই প্রবাসীতে এক গরীব কেরাণী ও তার মুমূর্ষু স্ত্রীর গল্প পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম এর আগে কেউ শোনেনি। আমিও শুনিনি। সে এমন গল্প যে চিরকালের মতো মনে ছাপ দিয়ে গেল। ভাষার জন্য নয়, অন্য কোনো চমৎকারিতার জন্য নয়, স্রেফ্ মানবিকতার গুণে। তখন অবিশ্যি অত বুঝতে পারিনি। শুধু মনে হয়েছিল এমন গল্প কম পড়েছি।

কোনো বই পড়ে লেখকের সঙ্গে আলাপ করার জন্য কখনো আগ্রহে অধীর হইনি। ভবিষ্যতে কিসে আমার নিজের লেখার সুবিধে হতে পারে কখনো ভাবিনি। বড়দের জন্য লেখার কথা নিজের থেকে মনেও আসেনি। খালি ভেবেছি ছোটদের জন্য ভালো বই লিখতে শিখতে হবে। তার তখনো ঢের দেরি। সেকালে মার্চ মাসের গোড়ায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা হত, ফল বেরোত মে মাসের শেষে। কলেজের ক্লাস শুরু হত ১লা জুলাই নাগাদ। কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে কোনো সমস্যাই ছিল না। যে কোনো কলেজে যে কোনো সময়ে মেয়েরা ভর্তি হতে পারত। খুব একটা ভাবনাচিন্তা ছিল না। প্রথম বিভাগে পাস করত অর্ধেকের বেশি। মোট ৭৫% নম্বর পেলে নামের পাশে একটা তারা দেওয়া থাকত। কোনো বিষয়ে ৮০% পেলে, সেই বিষয়ের নামের আদ্যক্ষর থাকত। তাকে বলা হত 'লেটার পাওয়া'। গোটা দুই লেটার পাব ভেবেছিলাম। নিজের ক্ষমতার দৌড় জানতাম না। তবে নিচের ক্লাস্ থেকে সর্বদা প্রথম হয়ে এসেছিলাম ; ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো ফল না হলে, আত্মীয়স্বজনরা ক্ষুণ্ণ হবেন। ছোট জ্যাঠামশায়ের আগ্রহ সবচাইতে বেশি ছিল। এই যা ভাবনা।

পরীক্ষা দিয়ে যখন বাড়ি অসতাম মা বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না। আমার মা আসলে ভারি বুদ্ধিমতী ছিলেন। আমি নিজে খুব খুশি হতে পারতাম না। খালি মনে হত ওরি মধ্যে আরো ভালো করে লেখা যেত। মন খুঁতখুঁত করত। ছোটজ্যাঠামশাই বাংলার পরীক্ষকদের একজন ছিলেন। অবিশ্যি আমাদের কাগজ তাঁর কাছে পড়েনি। একদিন হঠাৎ বললেন, "বাংলা পেপারে 'জ্যাপান ইজ্ দি চিলড্রেন্স প্যারাডাইস'-এর কি বাংলা করেছিস্ ?" আমি থতমত খেয়ে বললাম, "আমি লিখেছি জাপান শিশুদের স্বর্গ-স্বরূপ। ভুল হল নাকি ?" জ্যাঠামশাই বললেন, "তা জানি না। তবে একজন লিখেছে—'জাপান শিশুদিগের সরবৎ'—তাই ভাবলাম তুই কি লিখেছিস্।" ছেলেটা বোধহয় প্যারাডাইস্ ক্যাবিনের বিখ্যাত সরবতের কথা ভাবছিল।

একদিন মেসোমশাই এসে শিবপুরে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এখন বড় হয়েছ, আমার বইগুলো সব পড়ে দেখ।" দেয়াল-আলমারিতে বই, বুক শেল্‌ফে বই, ঘরের মধ্যিখানটা জুড়ে একটা প্রাক্তন বিলিয়ার্ড টেবিল ; তার ওপরকার বইয়ের স্তূপ দেখতে হয়। চেয়ারে বই। মেঝের ওপর বই। বইয়ের একরকম মিষ্টি গন্ধ হয়। তার সঙ্গে আমার মেসোমশায়ের চুরুটের গন্ধ মিশে এক বিশেষ ধরনের সুখ-স্বর্গ তৈরি করে রাখত। আমি তাতে ডুবে থাকতাম। স্বর্গে কি ডুবে থাকা যায় ? সাহিত্য বিষয়ে আমার মতামত জানতে চাইতেন মেসোমশাই। 'সুরেশ্বর শর্মা' বেনামায় প্রবাসীতে তাঁর কবিতা বেরুত। আমাকে পড়তে দিয়ে, মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। যেন আমার মতামতের কত দাম ! সত্যি বলছি মেসোমশায়ের আগ্রহ দেখে আমার মতামতগুলো গভীরতা লাভ করত। মেসোমশাই চাইতেন আমি কাব্যরসে ডুবে যাই। কিন্তু বিচারবুদ্ধি না হারাই। তাই যেতাম। ইংরিজি কবিতার বাংলা অনুবাদ করতেন। পরে তাঁর ব্রাউনিং-এর অনুবাদ, শেলীর অনুবাদ ইত্যাদি বই হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, "এই ক'টা লাইনের বাংলা করে দাও তো দেখি।" আমি বড় যত্ন করে, নিজের ভাষার দুর্বলতা সম্বন্ধে বড় সচেতন হয়ে, বাংলা করতাম। মাঝে মাঝে আনন্দে উদ্বেল হয়ে বলতেন, "বাঃ, বাঃ, আমিও যে প্রায় ঐরকমই একটা খসড়া করেছি।" এমনি করে আমার মেসোমশাই আমার মনে বল দিতেন।

একটা মহামূল্য রত্ন মেসোমশাই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তার নাম আত্ম-প্রত্যয়। তাঁর কাছে বসে মনে হত চেষ্টা করলে আমিও হয়তো কিছু কিছু লিখতে পারব। তখন কি আর জানি যে এসব জিনিস চেষ্টা করে হবার নয়। ভিতরে থাকল তো হল আর না থাকল তো হাজার চেষ্টা করলেও হবে না।

॥ ২৩ ॥

আমার বড়জ্যাঠামশাই সারদারঞ্জনের কথা যথেষ্ট বলিনি। তাঁর সঙ্গে কখনো গল্প করিনি। কখনো কাছে ডেকে কিছু বলেছেন বলে মনে পড়ে না। এর আগে তাঁর মৃত্যুর কথা বলতে, তারিখ সম্বন্ধে কিছু ভুল করেছি। তাঁর ছোট ছেলে, সংস্কৃতে পণ্ডিত, ডঃ কুমুদরঞ্জন রায়ের লেখা জ্যাঠামশায়ের খুদে জীবনীতে দেখছি তাঁর জন্ম তারিখ দেওয়া আছে ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৫, অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসের শেষের দিকে, হয়তো ২৬শে কিম্বা ২৭শে। তাঁর মৃত্যুকাল ১লা নভেম্বর ১৯২৫। আমাদের মনে হত বেজায় বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু হিসাব করে দেখেছি মাত্র ৬৭ বছর পূর্ণ হয়েছিল। অনেকদিন কাশি আর জ্বরে ভুগে, হাওয়াবদলের জন্য বৈদ্যনাথ গিয়েছিলেন। আর্য্যুবেদ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও, নিজের রোগের গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। যাবার সময় মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে

গেছিলেন আর সেখানে পৌঁছেই একটা ভালো পুকুরের সন্ধান নিয়ে রেখেছিলেন। জ্বরটাকে কোনোমতে ঝেড়ে ফেলেই ছিপ নিয়ে বসবেন। কিন্তু সে জ্বর ছাড়বার নয়। জ্যাঠামশায়ের ক্ষয়-রোগ হয়েছিল এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। এইবারে আমার বাবা সত্যিকার পিতৃহীন হয়েছিলেন। নিজের বাবা মারা যাবার সময় বাবার বয়স পাঁচ, সঙ্গে সঙ্গে বড়দাদা তাঁর স্নেহের ছত্রখানি মাথার ওপর তুলে ধরেছিলেন। বাবাকে কখনো ঠাকুরদাদার কথা বলতে শুনিনি। ছোট জ্যাঠামশাই বলতেন নাকি লম্বা চওড়া ধপধপে ফরসা মানুষ ছিলেন। পরম পণ্ডিত, সে তো আগেই বলেছি।

বড় জ্যাঠার রঙ কালো না হলেও একেবারেই ফরসা ছিল না, মাথায়-ও খুব বেশি লম্বা ছিলেন না। তবে বেঁটেও না। ভারি বলিষ্ঠ জোরালো শরীর ছিল। ৬৫ বছর বয়সেও গড়ের মাঠে তাঁকে দৌড়তে দেখে সায়েব খেলোয়াড়রা হাঁ! কথা বলতে সাহস পেতেন না, তবু মনে হত পৌরুষের প্রতিমূর্তি। কুমুদরঞ্জন তাঁর পুস্তিকাটিতে লিখেছে সারদারঞ্জন জীবনে একটিমাত্র মানুষকে ভয় করতেন, তিনি হলেন ওঁর বাবা শ্যামসুন্দর। সারদারঞ্জনের একমাত্র রিপু ছিল ক্রোধ। একমাত্র ব্যসন ছিল মাছ-ধরা। ক্রিকেট-খেলাটা তিনি এত বেশি গুরুত্ব দিতেন যে তাকে ব্যসন বলা চলে না।

এইরকম মানুষের হাতে আমার বাবা মানুষ। বড়দাদাকে যেমন ভয় করতেন, তেমনি শ্রদ্ধা করতেন। শুনেছি দেশে ঠাকুমার কাছে বাবার আর ছোটজ্যাঠামশাইয়ের শৈশব কেটেছিল। বড় জ্যাঠা, মেজজ্যাঠা, সুন্দর জ্যাঠা কলকাতায় বা কর্মস্থলে থাকতেন। পুজোর ছুটিতে ভাইদের জন্য, মা-বোনের আর ছেলেমানুষ স্ত্রীর জন্য, নানারকম কাপড়চোপড় ফল মিষ্টি কিনে নিয়ে যেতেন। যে কদিন থাকতেন খেলা-ধুলো আমোদ-আহ্লাদ করে কাটাতেন। তবে তার মধ্যে দরকার হলে শাসন-টাসনও করতেন। খেলাধুলোর মধ্যে ছিল শিকার, মাছ-ধরা আর ফাঁদ পেতে শেয়াল ধরা। একদিন সকালে ছোট ছোট ভাইদের নিয়ে ফাঁদ দেখতে গিয়ে দেখেন ফাঁদের মধ্যে শেয়ালের বদলে বাঘ-মশাই বসে আছেন। তারপর থেকে ফাঁদ পাতা বন্ধ হয়েছিল। শেয়ালগুলো তরমুজের ক্ষেত নষ্ট করত।

আশ্চর্য মানুষ ছিলেন, কঠোরে কোমলে মেশানো। ছোটভাইরা জানতেন বড়দাদা কাছে থাকলে আর কোনো ভয় নেই। তেমনি আবার পান থেকে চুন খসলেই কড়া শাসন। তাঁর সামনে থেকে ভাইরা পালাতে পারলেই বাঁচতেন। বাবার সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য ছিল। চেহারায় নয়, স্বভাবে। তবে বড়জ্যাঠামশায়ের মতো বাবা অত বেশি পড়াশুনো করতেন না। তেমনি বড় জ্যাঠারও বাবার মতো ছবি আঁকার হাত ছিল না। বাবারও একমাত্র রিপু ছিল অন্ধ রাগ। ব্যসন

যে কি ছিল ভেবে পাই না। গুণ তো যথেষ্ট ছিল। কোনো একটাকে আঁকড়ে ধরে, যাকে বলে, 'হবি' বানালে হয়তো রাগটা কমে যেত। হয়তো অতিরিক্ত প্রাণশক্তি রাগ হয়ে ফেটে পড়ত। জ্যাঠামশায়ের মতোই বাবাও কখনো কোনো প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিতেন না। কত লোক আমাদের বাড়িতে এসে থেকেছে, খেয়েছে, বাবার খরচে চিকিৎসা করিয়েছে। মনে হত তাদের জন্য কিছু করতে পেরে, বাবা কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছেন। শরীর সারাতে চেঞ্জে গেলেও, বাড়তি কয়েকজনকে জুটিয়ে নেবার চেষ্টা করতেন; টাকাকড়িতে বাবার লোভ ছিল না। বাড়ির কর্তার খাওয়ার জন্য কেউ কোনো আলাদা ব্যবস্থা করলে বিরক্ত হতেন। সবকিছু সমান ভাগ হবে। মাঝে মাঝে বেশ মজা হত। আমরা ছিলাম আট ভাইবোন, তাছাড়া বড়পিসিমার নাতি অশোক আর পরে ইউ রায় এণ্ড সন্স উঠে গেলে, মেজজ্যাঠামশায়ের ছোট ছেলে সুবিমল, আমাদের নান্‌কুদা। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি থেকে নোন্‌তা খাবার, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি আসত। বলাবাহুল্য গোটাদশেক মানুষের তাতে কুলোত না। কাজেই নিয়ম হয়ে গেল যে নোনতা খাবার এলে বড়রা খাবে, আর ফল মিষ্টি ছোটরা খাবে। মা কিম্বা বাবাকে এ-সব বাড়তি লাভের জিনিস মুখেও দিতে দেখিনি। মা সন্ন্যাসীর মেয়ে, লোভ কাকে বলে জানতেন না। বাবার এই নির্লোভ দিকটা নিশ্চয় বড়জ্যাঠামশায়ের কৃত কর্ম। তবে মতামত সম্বন্ধেও বাবা যদি একদা উদার হতেন, তাহলে আমার অনেক সুবিধা হত।

সে যাক গে, বড়জ্যাঠামশায়ের কথা হচ্ছিল। এর আগেও বোধহয় বলেছি তিনি খানিকটা 'সাইকিক' ছিলেন। অলৌকিক কথাটা আমার পছন্দ নয়, মনে হয় এ-সমস্ত ক্ষমতাই অসাধারণ হলেও স্বাভাবিক। তবে হয়তো কিছুটা অতীন্দ্রিয়। সাধারণ মানুষের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের যতখানি গোচর হয়, তার চেয়ে খানিকটা বেশি কিছু। পরীক্ষার আগের রাতে স্বপ্নে প্রশ্নপত্র দেখার কথা বলেছি। আরো অনেকবার নাকি স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, বাস্তবে তাই ঘটেছিল। তিনি নিজেই বলতেন, "জান তো আমার স্বপ্ন কখনো মিথ্যা হয় না।"

শেষ অসুখের সময় অনেকের মনে আশা হয়েছিল হয়তো এবার সেরে উঠবেন। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়ির সকলের ধারণা ছিল চেঞ্জে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বড়জ্যাঠামশাই ভালো হয়ে যাবেন। কিন্তু মারা যাবার সাত দিন আগে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যেন একটা মন্দিরের সামনে পৌঁছেছেন। বড় ছেলে মনোরঞ্জন তাঁকে মন্দিরের দরজাটি দেখিয়ে দিতেই, ভিতর থেকে একজন ভক্ত এসে তাঁকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। সেখানে সাদা সরস্বতীর মূর্তি ছিল। ভক্ত যেন জ্যাঠামশাইকে মূর্তির সামনে বসালেন।

ঠিক সেই সময় ঘুম ভেঙে যেতেই, ছোট ছেলে কুমুদরঞ্জনকে বললেন, 'মনে

হয় আমার যাবার সময় হয়েছে।' সেই মুহূর্ত থেকে প্রফুল্লচিত্তে তিনি মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেছিলেন আর যাকে বলে সজ্ঞানে স্বর্গে যাওয়া, শেষ পর্যন্ত তাই করেছিলেন।

এ-সমস্ত ঘটেছিল ১৯২৫ সালে। আমি তখন কলেজের ছাত্রী। হয়তো বৈদ্যনাথে মারা গেছিলেন বলে বড় জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর কথা আমি ভালো করে মনে করতে পারছি না। এটুকু মনে আছে যে তারপর বছরখানেক বাবার মুখে হাসি দেখিনি। তখন ১০০ নং গড়পার রোডের পাট-ও শেষ হয়ে আসছিল, সেই সময় বড়জ্যাঠামশাইকে স্মরণ করে একদিন সেখানে ব্রহ্মোপাসনা হল। মেজজ্যাঠামশাই ব্রাহ্ম হলে পর বড়জ্যাঠামশায়ের মনে যে তিক্ততা জমেছিল, সে তিক্ততা কবে কেটে গেছিল। তবে ব্রাহ্ম ভাইদের বাড়িতে বড়জ্যাঠামশাই খুব কম যেতেন। গেলেও জল-স্পর্শ করতেন না। ভাইরা তাঁকে এত ভালোবাসতেন আর ভক্তি করতেন যে ক্রমাগত আমহার্স্ট রোতে তাঁর বাড়িতে যেতেন, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন। বলাবাহুল্য বড়জ্যাঠার ছেলেমেয়েদের মনে কোনো ভেদজ্ঞান ছিল না।

আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুল বোধহয় মে মাসে। এতটা ভালো হবে আশা করিনি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ১২তম কিম্বা ১৩তম স্থান নিয়েছিলাম। শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ বোধহয় সপ্তম স্থান নিয়েছিল। এতটা আশা না করলেও, এই মনে করে বেজায় দুঃখ হয়েছিল যে আরেকটু চেষ্টা করলই প্রথম দশজনের মধ্যে হতে পারতাম। এখানে বলি যে আমার মনে হয় পরীক্ষার ফলের তালিকায় প্রথম ২০-২৫ জনের মধ্যে কৃতিত্বের বিশেষ তফাৎ থাকে না। এক নম্বর, আধ নম্বর কম-বেশির জন্য কেউ ওপরে কেউ নিচে হয়। অন্য সব বিষয়ে ৮০-র বেশি পেয়েছিলাম, অঙ্কে ৯৯ আর এ্যাডিশনেল অঙ্কে ৯৮। কিন্তু বাংলায় ৭৮ আর ফ্রেঞ্চে ৭৫। এখন কি হয় জানি না, সেকালে কোনো একটা বিষয়েও ৮০-র কম পেলে প্রথম দশজনের মধ্যে হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল।

স্কুলের দিদিমণিরা খুব খুশি। স্কুলের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলাম বলে প্রাক্তন ছাত্রীদের দেওয়া সোনার মেডেল পেলাম। এক ভরি সোনার তৈরি, সুন্দর গড়ন। তখন নাকি পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ পড়েছিল! এখনো আছে আমার কাছে। ইংরিজির জন্য মিসেস্ ইংলিস্ প্রাইজ পেয়েছিলাম। পছন্দমতো গোটা দশেক চমৎকার বই কিনেছিলাম, বাবার সঙ্গে গিয়ে, কলেজ স্কোয়ারের বুক কোম্পানি থেকে। শেলী, কীট্‌স্, ব্রাউনিং ইত্যাদির কবিতার বই। বাবা মুখে একবারো বলেননি যে খুশি হয়েছেন, কিন্তু আমাকে সুন্দর একটা ওয়াটারম্যানের, কলম আর সোনা বাঁধানো প্রপেলিং পেন্সিল দিয়েছিলেন। একদিন ব্রিজ্ খেলার বন্ধুদের ডেকে খুব খাইয়েও ছিলেন। উপলক্ষটা আমাদের বলা হয়নি, পাছে

অহংকার হয়। আর ছোটজ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে দুই চ্যাঙারি ভর্তি আমার পেয়ারের ছানার মুড়কি আর ছানার গজা নিয়ে এসে, আমাকে দেখেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলেন ; চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। এখনো ভাবি মানুষ কেন মানুষকে ভালোবাসে ? আমি তো ছোটজ্যাঠাকে কক্ষনো কিছু দিইনি। অনেক তর্ক করেছি। বাবাকে যেসব কথা বলবার সাহস হত না, ছোটজ্যাঠাকে অম্লানবদনে বলেছি। কিন্তু মনে মনে খুব ভালোবাসতাম। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ভালবাসার মানুষদের কেন আমরা বলি না, 'তোমাকে আমি ভালোবাসি', কিম্বা 'তুমি ভালো', কিম্বা 'তুমি সুন্দর', কিম্বা 'তোমার কোনো গুণ দেখতে পাই না, তবু ভালোবাসি।' দেখতে দেখতে সুযোগ চলে যায়, সময় চলে যায়, ভালোবাসার মানুষগুলোও সব একে একে চলে যায়। তখন বুক-ভরা ভালোবাসা নিয়ে একা বসে থাকতে হয়।

সেকালে প্রথম দশজন ২৫ টাকার মাসিক বৃত্তি পেত। মেয়েদের মধ্যে যে প্রথম হত, সে-ও একটা ২৫ টাকার বৃত্তি পেত। শান্তিসুধা প্রথম দশজনের একজন হয়ে ঐ বৃত্তি পেল আর আমি মেয়েদের মধ্যে প্রথম হওয়ার বৃত্তিটি পেলাম, যদিও আমার আসলে দ্বিতীয় স্থান।

একটা শনিবার সকালে আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশাই ছোট্ট এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে দেখা করতে এলেন। ভারি লজ্জা পেলাম। এই পণ্ডিতমশাই-ই ১৯২০ সালে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বিলেত থেকে এয়েচ ?" বললাম, "আপনি মিষ্টি নিয়ে আমাদের বাড়িতে এলেন, কিন্তু আমি তো খুব ভালো নম্বর পাইনি।"

পণ্ডিতমশাই আমাদের ক্লাসে উত্তর-রাম-চরিত পড়াতে পড়াতে কাঁদতেন বলে আমরা হাসাহাসি করতাম। আজ দেখলাম আবার তাঁর কান্না পেয়েছে। বললেন, "সিস্টার ডরথি ফ্রান্সিস্ আমাকে বলেছেন আমি যদি আরেকটু যত্ন নিতাম, তাহলে তুমি বাংলাতেও ৮০-র ওপরে পেতে। কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ ভারি সুন্দর হবে।"

আমারো টন্‌সিলে ব্যথা করেছিল। বলেছিলাম, "কক্ষনো না। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হতে পারে, কিন্তু কক্ষনো পক্ষিরাজ হয় না।" পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করেছিলাম। মা তাঁকে এক থালা সন্দেশ এনে দিয়ে বলেছিলেন, "আমরা ব্রাহ্ম। আপনি কি আমাদের বাড়িতে খাবেন ?" পণ্ডিতমশাই দু' হাত পেতে মিষ্টির থালা নিয়ে বলেছিলেন, "আপনি রামানন্দ ভারতীর কন্যা, আপনার হাতে না খেলেই আমার পাপ হবে।"

সেই দিনটি, সেই সময়টি, পণ্ডিতমশায়ের সেই মুখখানি, মায়ের মুখ, সব আমার মনে খোদাই করা হয়ে আছে। সেই মুহূর্তে মনে মনে পুরনো সঙ্কল্পটি আবার উচ্চারণ করে নিয়েছিলাম, যেমন করে পারি, যতদিন বাঁচি, বাংলা ভাষার

সেবা করব। পরে মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধব, পাঠক কেউ কেউ নাকি বলেছে, "তোমার বাংলার চাইতে ইংরিজি লেখা বেশি ভালো। এত কম ইংরিজি লেখ কেন ?" যারা এমন প্রশ্ন করতে পারে তাদের আমার বলার কিছু নেই ! আমি ভাবতে পারি না বাংলা ছাড়া আমি আবার কোন ভাষা লিখব। যদি লিখি, তাহলে বাংলা বইয়ের ইংরিজি অনুবাদ কিম্বা শ্রেষ্ঠ ইংরিজি বইয়ের, বিশেষতঃ ছোটদের বইয়ের বাংলা করে, বাংলার-ই কাজ করব। ইংরিজি অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছি, ইংরিজিতে এম্-এ পাস করেছি—সেইজন্যেই আমাকে ইংরিজিতেই লিখতে হবে এ কি কোনো কাজের কথা হল ? আমি মনে করি ইংরিজিতে এত লেখা-পড়া করেছি বলেই আমি বাংলা লেখার জোর পেয়েছি। আমার চোখ খুলেছে, মন খুলেছে। এতটা খুলেছে যে ধাঁর করা ভাবের ধার করা ভাষার বিষয়ে আমার কোনো মোহ নেই। যতদিন বাঁচি বাংলাতেই লিখব।

তবে এত কথা ভাববার তখন আমার বুদ্ধি বা বিদ্যেও ছিল না। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মানুষ যেমন বাড়ে, তার চিন্তাও তেমনি পুষ্টি পায়। মোট কথা, পরীক্ষার ফল বেরুলেই কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে এলাম। ইংরিজি, বাংলা তো নিতেই হবে, তাছাড়া নিলাম লজিক, বটানি, অঙ্ক। বলাবাহুল্য ঐ আবশ্যিক বিষয় দুটিই আমার আসল উদ্দেশ্য, বাকি তিনটি শুধু নম্বর তুলবার ফিকির। এতদিনে নিজের ক্ষমতার একটা মাপ পেয়েছিলাম। ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় ১২তম কিম্বা ১৩তম হব না, সে বিষয়ে মন ঠিক করে ফেলেছিলাম।

ভর্তি তো হলাম, কিন্তু এখন থেকে যে খোঁপা বেঁধে কলেজে যেতে হবে, তার কি ? সেই যে বলেছিলাম, ২০টা হেয়ার-পিন দিয়ে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এলো-খোঁপা বাঁধা, রোজ রোজ তার পাট চলতে লাগল। খোঁপার মধ্যে কিছু পুরে, খোঁপাটাকে আরেকটু পুরুষ্টু করার কথা মনেও আসত না। ছোটবেলা থেকে মায়ের কাছে একবার শুনেছি যে নকল জিনিস ভারি মন্দ যে নিজেদের অজান্তেই মনে প্রাণে নকল জিনিস ঘেন্না করে এসেছি। হালে, হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবনতি হবার দরুণ, কিম্বা এতকাল পরে বুদ্ধি খোলাতে, টের পাচ্ছি নকল জিনিসই বা মন্দ কি। নিউ মার্কেটে তৈরি করা নকল খোঁপা কিনতে পাওয়া যায়। চুলটুল না থাকলেও কোনো উপায়ে—সে উপায়টা এখনো রপ্ত করতে পারিনি—ঐ নকল খোঁপাটি মাথায় এঁটে কেশবতী কন্যা হওয়া যায়। নকল দাঁতে কখনো ব্যথা করে না, নড়ে না, পড়ে না। যদি না হাত থেকে ফেলে দেওয়া যায়। সে তো পড়ে গেলে ঠ্যাং-ও ভাঙে। নকল পশমের মোজা পোকায় কাটে না, আসল পশম খেয়ে-দেয়ে নাশ করে। আর কত বলব ?

ষোল বছর বয়সে আমরা জানতাম নকল চুল ভারি খারাপ। ছিলও মাথায় এক ঢাল চুল, এলো খোঁপা করাতে বাধা ছিল না। ঠোঁটে রঙ, ভুরুতে রং,

চোখের পাতিতে রং, নখে রং—এসব অন্য জগতের ব্যাপার। তবে নাক-মুখ চকচক করলে বিশ্রী দেখায়, তাই একটু পাউডার মাখা চলত। তাও মুখে মাখার জন্য আলাদা রকম পাউডার কিনতে হয়, সেটা শিখতে সময় লেগেছিল।

প্রসাধনের কথা বাদ দিয়েও অন্য সমস্যা ছিল। সারা দিন এক গাদা কাপড়-চোপড় টেনে বেড়াতে হত। সে পোশাকের ডিজাইন হয়েছিল মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন প্রথম সিংহাসনে চড়েন নির্ঘাৎ সেই সময়ে। ১৯২৪ সালে আমরা তখনো তাঁর সময়কার ভেতরের কাপড়-চোপড় পরতাম। 'অন্তর্বাস' কথাটার তখনো চল হয়নি ; শুনলে নিশ্চয় একটু অসভ্য-অসভ্য মনে হত। আমরা কি পরে কলেজে যেতাম তাই বলি। প্রথমে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা ইজের। তার ওপর গলায় কণ্ঠা থেকে পায়ের কব্জি অবধি লম্বা একটা সাদা লংক্লথের সেমিজ। তার ওপর কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি লম্বা লংক্লথের সায়া। ওপর দিকে সেমিজের ওপর, ছোট হাতাওয়ালা আঁটো একটা বডির ওপর, কনুই-হাতা, কণ্ঠা অবধি উঁচু একটা ব্লাউজ আর সবার ওপরে ডান কাঁধে পিন দিয়ে আঁটা ব্রাহ্ম-ফ্যাশানে পরা শাড়ি। তখন থেকেই সামনে কুঁচি দিয়ে মাদ্রাজি ফ্যাশানে কাপড় পরার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ও ফ্যাশানটা ভারি অসভ্য, কাজেই দিদি আর আমি এম্-এ পাস করে স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত ব্রাহ্ম-ফ্যাশানে শাড়ি পরেছি পায়ে ছোট গোড়ালি পর্যন্ত। বাড়িতে বাঙালী ধরনের কাপড় আর পায়ে চটি, কিম্বা খালি পা। সে যাই হোক, আমি হলপ্ করে বলতে পারি আমরা ঐসব পরে যখন অরক্ষিতভাবে ট্রামে চড়ে এম্-এ পড়তে যেতাম আর ছেলেদের সঙ্গে ক্লাস্ করতাম, তখন আমাদের শরীরের কোনো জায়গায় এতটুকু উঁচু-নিচু টক্কর আছে বলে মালুম দিত না। তবে স্বাভাবিক ওজনের চাইতে নিশ্চয় আমরা সের দুই ভারি হয়ে যেতাম। তাছাড়া আরেকটা অসুবিধা ছিল যা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো টের পাওয়া অসম্ভব ছিল। সেটি হল যে ঐ তলাকার সেমিজটা তার ওপরকার পেটিকোটটা আর সবার ওপরকার শাড়িটার আড়াই প্যাঁচ পরস্পরের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমনি জড়িয়ে যেত যে হাঁটাই দায় হয়ে উঠত। আর গরু তাড়া করলে যে কি হত সে ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

॥ ২৪ ॥

কলেজে পড়তে বেজায় ভালো লাগত। সে সময় ডায়োসেসান কলেজে ইংরিজি, ইকনমিক্স, ইতিহাস ইত্যাদি পড়াবার জন্য বিলেত থেকে ভালো ভালো খাঁটি মেম আনা হত। আর সিস্টার ডরথি ফ্রান্সিস তো ছিলেনই। মনে হয় খুব ভালো পড়ানো হত। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন চারুলতা দাশ।

এঁর কাছে আমরা স্কুলের ওপরের ক্লাসেও ইতিহাস পড়েছিলাম। পাতলা ছিপছিপে, অতি পরিপাটি করে কাপড়-চোপড় পরা, এক অভিজাত খ্রীশ্চান পরিবারের মেয়ে। ভারি কড়া, কিন্তু চোখ দেখে সন্দেহ হত সেইসঙ্গে বেজায় রসবোধও ছিল। পরে যখন নিয়ম হয়ে গেল যে এম্-এ পাস না করলে কেউ কলেজে পড়াতে পারবে না, তখন আধ-বুড়ো চারুদি কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। সমানে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজে পড়ে তৈরি হয়ে, ১৯৩০ সালে আমি যেবার এম-এ দিলাম, সেবার উনিও ইতিহাসে এম্-এ দিয়ে, পাস করে, পুরনো চাকরিতে ফিরে গেলেন। আরো আট-দশ বছর পরে উনি ডায়োসেসান স্কুলের অধ্যক্ষা হয়ে অনেকদিন অতি দক্ষভাবে বিদ্যালয় চালিয়ে ছিলেন।

পরে শুনতাম ওঁর নাকি বেজায় কড়া মেজাজ। শুধু ছাত্রীদের নয়, তাদের মা-বাবাদেরও নাকি বকে ভূত ভাগিয়ে দিতেন। আমি কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আগাগোড়া অত্যন্ত স্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েছি। এক সময় আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন। মনে আছে তখন আমার বাংলা শেখার চেষ্টা দেখে ভারি উৎসাহ দিতেন। মাস্টারনী জিনিসটি নিয়ে লোকে হাসাহাসি করে। যেন ভারি কৌতুককর কিছু। মা-বাবারা কত সময়ে—বিশেষ করে বাবারা—মেয়েদের কাছে তাদের দিদিমণিদের নীরস চেহারা আর কড়া মেজাজ নিয়ে তামাসা করেন। এ একটা মজার ব্যাপার। পুরুষ অধ্যাপকরা স্বাভাবিক জীবন কাটান, তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার থাকে। হয়তো মাঝে মাঝে মনে হয় না থাকলেই ছিল ভালো—তবু তাঁদের জীবন থেকে সব রস শুকিয়ে যায় না। তাছাড়া তাঁদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাইরের একটা সরস জীবনও থাকে। মেয়েদের কিছুই থাকে না। আমাদের দেশে সব মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার কথা, তা সে সুখেরই হক কি দুঃখেরই হক। তবু বিধবারা আছে আর যে-কোনো কারণেই হক বিয়ে হল না এমন অনেক মেয়ে আছে। তাদের মা-বাবা যতদিন বেঁচে থাকেন, তারা একটা বাড়ির আদর যত্ন পায়। তাঁরা গেলে, প্রায়ই দেখা যায় বোর্ডিং-এ, হস্টেলে, কিম্বা কোথাও একখানা ঘর নিয়ে, তাদের জীবন কাটে। সে ঘরটি একটা নিরাপদ আশ্রয় হলেও, নিজের বাড়ি নয়। মনের কোমল বৃত্তিগুলো শুকিয়ে গেলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ-সব মেয়েরা পরের ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখলে হয় গলে কাদা হয়ে যায়, নয় নির্মম উগ্র মূর্তি ধারণ করে। উভয় ক্ষেত্রেই ছেলে-মেয়ে পড়াবার যোগ্যতা হারায়। আরেক রকম আছে, তাদের অবস্থা ভালো, নিজেদেরও গুণ আছে, হয়তো বিদেশ ঘুরে এসে ভালো চাকরি করে, কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন। কথায় কথায় তারা পারিবারিক জীবনের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। কিশোর মন নিয়ে তারা করবেটা কি? যতই 'উইমেন্স লিব্' সম্বন্ধে লম্বা চওড়া কথা শুনি, ততই আমার সেই সব বঞ্চিতা নিঃসঙ্গ দিদিমণিদের কথা

মনে পড়ে। তাঁদের একজনকেও আমার সুখী বলে মনে হত না। শুধু বিদ্যা দিয়ে জীবন ভরে রাখতে পারে লাখে একজন। আর পারে যাদের অসাধারণ প্রতিভা থাকে। নইলে পারিবারিক জীবনের মতো আছে কি ? এত তেতো, কিন্তু এত মধুর। চার দিক দিয়ে এমনভাবে হাত-পা বেঁধে রেখে দেয়—একবার একা গিয়ে জ্বালামুখী দেখে আসার এত সখ সত্ত্বেও, সারা জীবনে হয়ে ওঠে না! পৃথিবীতে দর্শনীয় এত জায়গা ছেড়ে চারটি ঘরের মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসা! আমাদের একটা মস্ত কাকাতুয়া ছিল, পায়ে শেকল পরে সে দাঁড়ে বসে থাকত। রোজ সন্ধ্যায় একবার সে একটানা পাঁচ মিনিট ধরে বিকট চ্যাঁচাত আর ডানা ঝাপটাত। মেয়ে-মানুষের জীবনেও তাই হয় ; দিনান্তে একবার ডানা মেলে, যে জায়গা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সেইখানে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে। আবার ঐ চারখানি ঘরের মধ্যেও যে এতখানি ধরে কে জানত ! আমি বাড়ি না থাকলে কারো অসুবিধা হয়, আমি এলে কেউ খুশি হয়, এমন সব মানুষ আছে আমার, যাদের জন্য সারাদিন কাজ করেও, আমার কাজের শেষ থাকে না। ফেলে দেবার মতো পাঁচ মিনিটও সময় আমার নেই। এই দুঃখ যে না পেল, সে কতটুকু সুখ পেল ? তাই জীবনের প্রদোষে, আমার সেই সব দিদিমণিদের—যাঁদের এককালে জ্বালিয়েওছি কম নয়—তাঁদের কাছে আমার হৃদয়ের ভালোবাসা জানাই।

সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, যত পারি লেখা-পড়া করব, কিন্তু অধ্যাপনা করে কখনো আমি জীবন কাটাব না। ভাবতাম একটা বড় লাইব্রেরিতে দিন কাটাতে কেমন লাগবে ? নয়তো একটা ছাপা-খানায় বা প্রকাশনালয়ে ? নিদেন একটা বইয়ের দোকানে ! যেখানে সারাদিন নতুন বইয়ের গন্ধ পাব ; যে-বইতে কেউ হাত দেয়নি, সে বই প্রথম খুলব। কিন্তু সর্বদা তার পেছনে থাকবে একটা ছোট বাড়ি, একটা মানুষ আর দুটো একটা ছেলে-মেয়ে। আমার ঘর, আমার মানুষ। সেই ষোল বছর বয়সেই জানতাম এদের না পেলে আমার সুখ কোথায় ? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়াসের উদ্দেশ্যই হল একটি ছাদের তলায়, কটি মানুষ। তা না পেলে ছোটদের জন্য গল্প লিখব কি করে ? জীবনের আধখানা ফাঁকা থাকলে তাকে ভরব কি দিয়ে ? নকল জিনিসে তো কাজ হবে না।

বলা বাহুল্য এত গুছিয়ে কথাগুলো ভাবিনি, কিন্তু একবারও ইচ্ছা করেনি নিজেকে বেজায় রকম ভালো করে তৈরি করে, মস্ত একটা চাকরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিই। সে ইচ্ছে না হলেও, স্বাধীন হবার প্রবল বাসনা ছিল। এই বইতে আমি শুধু আমার প্রকৃত মনের কথা লিখব। সেই কৈশোর থেকে কারো কোনো কর্তৃত্ব আমি ভালো মনে মেনে নিতে পারিনি। না শিক্ষকদের, না বাবার, না মা-র। নিজের অক্ষমতা, মূর্খতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলাম বলে সেই অবাধ্যতা কখনো কাজে প্রকাশ করিনি। তবে তর্ক করে যতই গুরুজনদের

অপ্রীতিভাজন হয়েছি, ততই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি আমার এই ভালোবাসার মানুষগুলোর কাছেও আমার নিজেকে সমর্পণ করব না। তবে এও ভাবতাম যে ভালোবাসার মানুষগুলো সুখী না হলে, আমিও যখন সুখী হতে পারি না, তবে আবার স্বাধীন হব কি করে? অনেক পরে, অনেক সুখ অনেক দুঃখ পেরিয়ে বুঝেছিলাম স্বাধীনতাও বাইরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, তার নিবাস আমারি মনের মাঝে। এত কথা বলার মানে হল আমি ভারি অবাধ্য মেয়ে। অন্য লোকের কথামত চলা আমার পক্ষে বড্ড কঠিন।

বাবা আমাদের মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে হকি ফুটবল খেলা দেখতে নিয়ে যেতে চাইতেন। কিন্তু যখন শেক্সপীয়র রেপার্টরি থিয়েটার এসে প্র্যাট্ স্কুলে অভিনয় দেখাল, কলেজ থেকে মেম দলবল নিয়ে টিকিট কেটে দেখতে গেলেন। বাবা আমাদের যেতে দিলেন না। মনে মনে বেজায় রাগ হয়েছিল। মার কাছে গিয়ে খুব খানিকটা গজ্ গজ্ করেছিলাম। মাকে কখনো বাবার বিচারের বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে শুনিনি। কিন্তু চোখে বেদনা দেখেছি। এতগুলো ছেলেমেয়ের কারো গায়ে কখনো হাত তোলেননি, খালি আমার আর একটা দুরন্ত ভাইয়ের গালে এক-আধবার চড় কসিয়েছেন। মনে হয় ভগবান থাকলেও সে অবস্থায় চড় দিতেন। ভাগ্যিস্ তিনি নিরাকার, তাই বড় বাঁচা বেঁচেছি। বলেছি তো যাকে লক্ষ্মী মেয়ে বলে, আমি তা ছিলাম না। তবু কেন আমার মাসি, মেসো, পিসি, জ্যাঠা, জ্যেঠি, দাদা-দিদি আর এন্তার বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে এত স্নেহ পেয়েছিলাম জানি না। আশা করি তাঁদের মনে আমার অবাধ্য স্বভাব শুধ্রোবার উচ্চাশা ছিল না।

জ্যাঠতুতো পিসতুতো ভাই-বোনগুলোও ততদিনে অনেক বড় হয়ে গেছিল। সমবয়সীদের সঙ্গে একটা কোমল স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তাই বলে তর্কাতর্কিও কম হত না। আমার মাসিমা একবার মাকে বলেছিলেন, "আচ্ছা, এদের কারো সঙ্গে কারো মত মেলে না কেন?" মা কষ্টে হেসে বলেছিলেন, "বুঝতে পারছ না কেন? সবাই যে আর সকলের চেয়ে অনেক বেশি চালাক।" এহেন মন্তব্য শুনে আমরা একটুক্ষণের মতো হাঁ হয়ে গেছিলাম। মা-ও কিছু কম চালাক ছিলেন না।

১৯২৫ সালের মার্চ মাসে মায়ের ডবল নিউমোনিয়া হল। প্রাণ যায় যায়। ডাক্তার, ওষুধ, অক্সিজেন, রাত জাগা, টাকা-কড়ির শ্রাদ্ধ। একদিন সেই আমাদের ছোট বেলাকার পাতানো কাকারা দুজন আলাদাভাবে এসে দিদির আমার হাতে কয়েক শো টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, "বাবাকে এখন কিছু বলিস্ না। সে আমাদের বড় অফিসার। কিন্তু তাই বলে একা একা পারবে কেন?" বলে জোরে জোরে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। বাবাকে যখন দিদি

বলল, আশ্চর্যের বিষয়, বাবা এতটুকু রাগ করলেন না। বললেন, "তুলে রাখ। দরকার হলে খরচ করা যাবে।" পরে মা সেরে উঠলে ঐ টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মা বলেছিলেন, "টাকা শোধ হলেও ও ঋণ শোধ হয়নি।" মা সেরে উঠতে উঠতে কল্যাণের ম্যাট্রিক আর দাদা দিদির ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা এসে গেল। এবং দেখতে দেখতে শেষও হয়ে গেল। আড়াই মাস পরে ফল বেরোলে দেখা গেল তিনজনেই ভালো করে পাস্ করেছে। দিদি মেয়েদের একটা স্কলারশিপ্ও পেয়েছিল। এদিকে ডাক্তার বলেছিলেন রোগ সেরেও মা-র রোজ ৯৯° জ্বর হচ্ছে, কোনো শুকনো জায়গায় চেঞ্জে গেলে ভালো হয়। হাজারিবাগে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল ; মায়ের সঙ্গে দাদা, দিদি, কল্যাণ গেল ; তাদের লম্বা ছুটি। আর ছোট বোন লতিকা আর ছোট ভাই যতি স্কুল থেকে ছুটি করে নিয়ে সঙ্গে গেল। আমরা বাকিরা কলকাতায় রইলাম, গরমের ছুটি হলে আমরাও যাব। আমি হলাম বাড়ির গিন্নি। আমার গিন্নিপনা অমি -- সরোজের কিম্বা ভাইপো অশোকের নানান মন্তব্যের বিষয় ছিল। কিন্তু বাবা ঐ সময় আমাদের কাউকে একবারো বকেননি। তার মধ্যে আবার সরোজের গায়ে হাম বেরোল। সবাই মিলে সেবা করলাম। হাম বেরোলে লোককে কি বিকটই না দেখায়। সরোজকে সে কথা বলায় সে অনেকক্ষণ ধরে আয়নায় নিজের মুখ পরীক্ষা করে বলল, "ঠিক বলেছ!"

মাসিমা নোটন আমাদের সঙ্গে হাজারিবাগ যাবেন। মাঝে মাঝে শিবপুরে মাসিমার কাছে ছুটি-ছাটা কাটাতাম। বেজায় ভালো বাবুর্চি ছিল মাসিমাদের ; চপ কাটলেট যা বানাত। আর মাসিমা বড্ড আদর যত্ন করতেন, কি করবেন কোথায় রাখবেন ভেবে পেতেন না। নিজের আত্মীয় বলতে তো ঐ দুই বোন। তার মধ্যে ছোট মাসিরা পাটনায় থাকতেন, আমাদের বাড়িতে দু-একবার যদি বা থেকে গেছেন, বড় মাসির বাড়িতে কখনো না। মাসিমা তাঁর বঞ্চিত শৈশবের যত দাবি সব আমাদের ওপর মেটাতে চাইতেন। এখন মুশ্‌কিল হল যে ওঁদের কারো বেশি খিদেটিদে পেত না। দুপুরে বারোটায় পেটভরে ভাত খাবার পর, কারো যে চারটে বাজতে না বাজতে আবার খিদে পেতে পারে একথা মাসিমা ভাবতেই পারতেন না। অথচ আমাদের বেজায় খিদে পেত। বাড়িতে বিকেলে পাঁউরুটি, মোহনভোগ কিম্বা পাতলা পরটা আলু-কুমড়োর ছক্কা, নিদেন আলু পটল কুচি ভাজা দিয়ে মুড়ি খেয়ে আমাদের অভ্যাস। মাসির বাড়ি বিকেলে বড়রা এক পেয়ালা করে চা খেতেন ; জলখাবারের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। এমন সময় দেখা গেল বাগানে অযত্নে বেল গাছে পাকা বেল, পেয়ারা গাছে ছোট ছোট মিষ্টি পেয়ারা। জামরুল গাছ, কামরাঙা গাছও ছিল, কিন্তু সে-সব হয়তো ঐ সময়ে ফলত না। জলখাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল, আর আমাদের পায় কে!

বাস্তবিকই নোটনের মতো সুন্দরী আজ পর্যন্ত দেখিনি। সোনার মতো গায়ের রঙ। আঙুরের থোকার মতো কোঁকড়া চুল আর মুখখানি যেন প্রাচীন গ্রীসের ডায়নার মূর্তি থেকে কেটে বসানো। আমি একটা পুরনো ফটোগ্রাফ দেখে ডায়নার মুখের নকল করেছিলাম ; অবিকল নোটনের মুখ।

সত্যি বলছি মনের মধ্যে তখন আর এতটুকু হিংসে ছিল না। হিংসা হয় সমানে সমানে। যার সঙ্গে কোনো তুলনাই হতে পারে না, তাকে কি কখনো হিংসা করা যায় ? নোটনের রূপের গর্ব করতাম আমরা। শুধু রূপ নয়, চমৎকার গাইত, পিয়ানো বাজাত, ছবি আঁকত। আমাদের পেয়ে বেজায় খুশি হত। তবে কাউকে বেশি ভালোবাসার ক্ষমতা বোধহয় ওর একটু কম ছিল। কিন্তু বড্ড ভালো ব্যবহার করত, সেই যথেষ্ট। আমার কাছে রাতে চুল বাঁধতে আসত। আমি ইচ্ছে করে চুলে তেল ঘষে, একটা সরু চিরুণী দিয়ে হেঁচড়ে কোঁকড়া চুলগুলোকে মাথার পেছনে উঁচু করে এক টাইট্ বেণী বেঁধে দিয়ে, মুখখানি ঘুরিয়ে দেখতাম, তবু পদ্মফুলের মতো রূপ ঝরে পড়ছে। সমস্ত মনটা গলে জল হয়ে যেত।

সুন্দরকে নোটন নিজেও বড় ভালোবাসত। নিজের সৌন্দর্য নিয়ে ওর ভারি একটা প্রসন্নতা ছিল। একবার আমাকে বলেছিল, "ঠোঁটের তলার কোণে কুচকুচে কালো ছোট্ট গোল তিল থাকলে, মুখটা আরো সুন্দর দেখায়। ওকে বিউটি স্পট্ বলে।" আমি তখন পড়াশুনো করছিলাম, হাতে কুচকুচে কালো কাজল-কালি ভরা কলম ছিল। বললাম, "আয়, তোর মুখে আমি বিউটি-স্পট বানিয়ে দিই, আমার মুখে তুই দে।" নোটন ভারি খুশি হয়ে আমার মুখে খুদে একটি কালো তিল বানিয়ে বলল, "বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে !" তখন আমি কলমটা নিয়ে ওর ঠোঁটের নিচে খুদে একটা মাকড়সা এঁকে দিলাম। যখন আটটা ঠ্যাং আঁকছি, ও একবার বলল, "অত খোঁচা খোঁচা কি করছ ভাই ? গোল হবে না ?" আমি বললাম, "হুঁ, হবে, কিন্তু এখানে তোর একটা টোল আছে কি না, তাই অসুবিধা হচ্ছে।" ছোটবেলায় নোটনকে কখনো মিছে কথা বলতে শুনিনি। আর কেউ যে বলতে পারে ও স্বপ্নেও ভাবেনি। কাজেই মাকড়সা এঁকে আমি যখন তিলটার ভুরি-ভুরি প্রশংসা করতে লাগলাম ; ও ভারি খুশি হয়ে বসে রইল। আয়নায় গিয়ে দেখল না পর্যন্ত। এমন সময় আমার মা এসে সব মাটি করে দিলেন। নোটনের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে শূন্যে খাম্‌চা মারতে লাগলেন। নোটন বলল, "ও রকম কচ্ছ কেন, মাসিমা ?" মা বললেন, "ছোট্ট একটা মাকড়সা রে !" মাকড়সা শুনে নোটন আঁৎকে উঠল, মাকড়সাতে তার বড় ভয়। তার পরেই মা বললেন, "দাঁড়া দাঁড়া, এ যে আঁকা মাকড়সা দেখছি।" বলেই চোখ পাকিয়ে আমাকে বললেন, "নিশ্চয় তোর কাজ ?" নোটন এহেন

বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যথিত, মর্মাহত। কত বললাম যে মাকড়সার কুরূপের পাশে ওর মুখটা আরো সুন্দর দেখাচ্ছে, তা কে শোনে!

তবু সে আমাকে ক্ষমা করেছিল। এখানে ওখানে অদ্ভুত কথা বলে বলত, "আমার লীলুদি বলেছে। তার চেয়ে তোমরা বেশি জান? সে ক্লাসে ফার্স্ট হয়।" এই নোটন আর তার মা হাসিমুখে আমাদের সঙ্গে ট্রেনে উঠে বসল। গাড়িটা আলো হয়ে রইল। মাসিমা অনেক চপ কাটলেট করে এনেছিলেন নৈশ ভোজের জন্য। আমরাও লুচি, আলুর দম, ফল, মিষ্টি নিয়েছিলাম। বেশ জমেছিল। কিন্তু মাসিমার মনে সুখ ছিল না। সদাই নোটনকে নিয়ে ভাবনা। বাবাকে কেবলি বলছিলেন, "দেখ, মুখটা একটু ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে না?" বাবা বললেন, "ফ্যাকাশে নয়, ফর্সা।" মাসিমা বললেন, "মোটে খিদে হয় না।" বাবা বললেন, "বেশ তো খেল।" মাসিমা বললেন, "কিন্তু খেলে আবার রাতে হাত পা জ্বালা করে। কি করা যায় বল তো?" বাবার তো আর কখনো ধৈর্যের জন্য খ্যাতি ছিল না। এবার বললেন, "কেটে ফেলে দে!" শৈশব থেকে চেনাশোনা, বাবা বড় শ্যালীকে তুই তোকারি করতেন। মাসিমা ফোঁস করে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। সকালে জল খাবারের সময় দেখা গেল আমাদের আলুর দমের গা থেকে গরমের চোটে লম্বা লম্বা শুঁয়ো-মতো বেরিয়েছে, কিন্তু মাসিমার বাকি চপ্-কাটলেট অক্ষত রয়েছে। মাসিমা আমাকে ঘরকন্নার পাঠ দিলেন, "গরম জিনিস কখনো এঁটে বন্ধ করে রাখতে হয় না। ঠাণ্ডা হলে বন্ধ করলে টপ্ করে নষ্ট হয় না।" এই পাঠ যে পরে আমার কত কাজে লেগেছিল সে আর কি বলব।

হাজারিবাগে ছুটিটা খুব জমেছিল। সেখানে তখন উপেন্দ্রকিশোরের মেজজামাই অরুণনাথ চক্রবর্তী আর আমার মেজদি পুণ্যলতা ছিলেন। অরুণবাবু ওখানকার এস ডি ও। আমাদের জন্য সুন্দর বিলিতী কায়দায় তৈরি বাংলো ভাড়া করে দিয়েছিলেন। রোজ একসঙ্গে বেড়ানো; এদিকে ওদিকে দর্শনীয় স্থান দেখতে যাওয়া, রামগড়, ভেড়া নদী আর দামোদরের সঙ্গমস্থলে ছিন্নমস্তার ভয়াবহ মন্দির। বড় আনন্দে দিন কেটেছিল। আরেকটা কারণে আমার কাছে হাজারিবাগ যাওয়ার গুরুত্ব ছিল। সেখানে একজন বড় সুন্দর মানুষকে দেখলাম। তাঁর নাম কামিনী রায়। অনাত্মীয়া লেখিকা এই আমি প্রথম দেখলাম। চমরুবাগ বলে ছোট্ট একটি বাড়িতে তাঁর পঙ্গু কিন্তু অতিশয় বুদ্ধিমান এক ছেলেকে নিয়ে কিছুদিন থেকে বাস করছিলেন। বয়স হয়তো ষাটের কাছাকাছি। ঠিক বলতে পারছি না। চুল পেকেছে, থান পরা, কথায়-বার্তায় বুদ্ধি ঝলকাচ্ছে। কিন্তু তার পেছনে কোনো গভীর দুঃখ রয়েছে, বুঝতে পারছিলাম। দেখবামাত্র আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। উনিও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ওঁর

লেখা অজস্র কবিতা পড়ে শোনাতেন। বলতেন দুটি বই হয়ে কবিতাগুলি প্রকাশিত হবে ; এখন কে সেগুলি বেছে দেয়। ওঁর ছেলে মনাদা তখনো বি এ পড়ে, তার একার কর্ম নয়। আগ্রহের চোটে বলে বসলাম, "আমি দেব।" দিয়েওছিলাম, তবে একা নয়। মনাদার ভারি সাহিত্যানুরাগ ছিল। মাকে নিয়ে তার ভারি গর্ব ছিল। দেখে ভালো লাগত। এর আগে আমাদের পাঠ্য পুস্তকে কামিনী রায়ের লেখা কবিতা পেয়েছিলাম। ইংরিজি কবিতার বাংলা রূপ। 'নাই কি রে সুখ ? নাই কি রে সুখ ? এ ধরা কি শুধু বিষাদময়।' সেটি হল লংফেলোর, 'টেল্ মি নট্ ইন্ মোর্ণফুল নাম্বার্স লাইফ ইজ্ বাট্ অ্যান এম্প্টি ড্রীম' কবিতাটির বাংলা। সেই বয়স থেকেই আমি মৌলিক লেখার ভক্ত ছিলাম। অন্যের রচনা নিয়ে তাতে নিজের রঙ-ব্যাখ্যানা দিয়ে লেখা সম্বন্ধে আমার উৎসাহ ছিল না। তাই মনের মধ্যে কামিনী রায়কে বিশেষ স্থান দিইনি। এবার বুঝলাম তাঁর প্রতি অবিচার করেছিলাম। অপূর্ব সব মৌলিক রচনা আছে তাঁর। 'দীপ ও ধূপ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে আছে সেসব।

বিশেষ করে একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে। কামিনী রায়ের তখনো বিবাহ হয়নি, সবাই তাঁকে কামিনী সেন বলে জানত। একদিন তাঁরা জগদীশ বসুর পরীক্ষাগারে গিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এক ফোঁটা ময়লা জল দেখেছিলেন। তাতে প্রাণ-কণিকা ঝিকমিক করছে। তাই নিয়ে কবিতা। শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। অনেক পরে আবার ওটি পড়ে সমান ভালো লেগেছিল। খুব ইচ্ছা করত কবিতা লিখতে। কলেজের ম্যাগাজিনে ইংরিজিতে কিছু কিছু লিখে প্রশংসাও পেয়েছিলাম। কিন্তু নিজে জানতাম সেরকম কিছু হয়নি। এবার থেকে বাংলায় কবিতা লিখবার চেষ্টা করতাম। একটা খাতায়। সেটিকে ভরিয়ে ফেলে আরেকটা শুরু করেছিলাম। সুখের বিষয় ততদিনে মাস ছয় কেটে গেছিল এবং আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটে গেছিল। কাব্য আমার পন্থা নয়। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম যে রস তো আর কবিতায় সীমাবদ্ধ নয়, অন্য পন্থাও আছে। কিন্তু আমি কখনো কবি হব না, একথা জেনে মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। এখন ভাবি অন্য লোকে সেকথা আবিষ্কার করবার আগে আমি নিজেই যে করেছিলাম সে আমার বহু ভাগ্য। তবে একেবারে যে কবিতা লিখি না তা নয়। আমার নাটক ইত্যাদিতে অনেক কবিতা, মায় গান পর্যন্ত লিখেছি। তবে সে সবই আজগুবি, উদ্ভট, স্রেফ মজা করে লেখা। তাকে কাব্য বলে না।

॥ ২৫ ॥

সতেরো বছর বয়স আমার। জীবনের মাধুর্যের দিকটা চোখের সামনে একটু একটু করে ফুটে উঠছিল। সদাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম, এই বুঝি রোমাঞ্চময়

পৌষ মেলা ১৯৮০

মুরারির দল ও আমি ১৯৮২

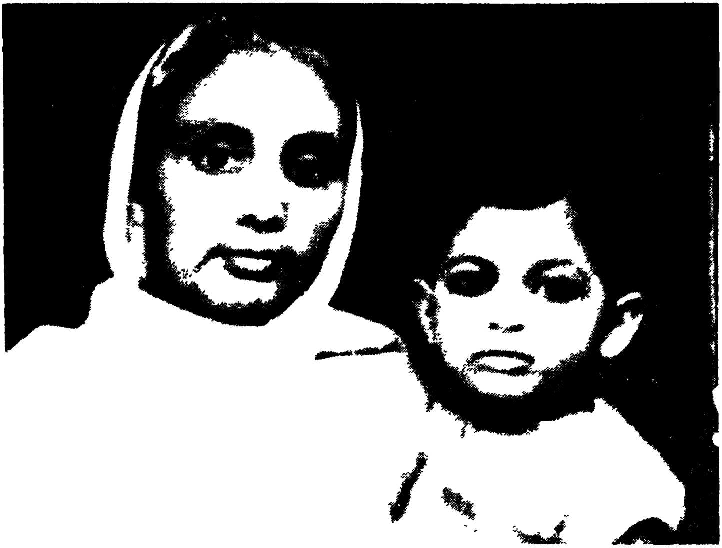

ননদ সবলা দেবী ও নাতনি ১৯৩৩

দিলীপ ও সত্যেন বিশী ১৯৩৭

আমি ১৯৭৫

কিছু ঘটবে। ছোট জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে, আমাদের বুলুদিও সে সময়ে হাজারিবাগে মেজদির বাড়িতে ছিল। সেই ছিল রোমাঞ্চের কেন্দ্রবিন্দু। তার মধ্যে ভারি একটা চমৎকারিত্বের সম্ভাবনা দেখতাম। আমার চাইতে সাত বছরের বড়, বি এ পাশ করেছে কোন কালে, ফর্সা রঙ, কোঁকড়া চুল, ভারি উজ্জ্বল উচ্ছল স্বভাব। তার অনেক ভক্ত ছিল। তারা ওকে গোলাপ ফুল, চকোলেট, হল্ কেনের ইংরিজি উপন্যাস উপহার দিত। অন্ততঃ ও আমাদের আগ্রহপূর্ণ ইচ্ছুক কানে এই সব বলত। ও নাকি তাদের মনে খুব আঘাত হানে। কখনো একটা ভালো কথা বলে না। উপহারগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাহলে নাকি ভক্তদের কাছে আদর বাড়ে।—এই অবধি শুনে আমরা প্রবল আপত্তি করেছিলাম। সে না হয় হল, কিন্তু অমন ভালো ভালো জিনিস ফেলে দেওয়া কি বুদ্ধির কাজ? বুলুদি আমাদের বুদ্ধির দৌড় দেখে কাষ্ঠ হেসে বলল, "তোরা তো দেখছি ভারি বোকা! সত্যি কি আর ফেলে দিই? ওরা হতাশ হয়ে চলে গেলে পর পাতির মাকে পাঠিয়ে জিনিসগুলো তুলিয়ে এনে ফুলদানিতে ফুল রাখি, বইগুলো পড়ি, চকোলেটগুলো খেয়ে ফেলি।" আমি বললাম, "সামনা-সামনি নিলে কি হয়?" বুলুদি বলল, "ছিঃ! বাইরের ছেলেদের দেওয়া উপহার কক্ষনো নিতে হয় না!"

কথাটা বোধহয় ঠিক। কারণ মা-মাসিরও সেই মত। তবে দিদিকে আমাকে দেখে কারো ফুল বা চকোলেট দিতে বোধহয় ইচ্ছা করত না। করলেও হয়তো বাবার ভয়ে কেউ দিতে সাহস পেত না। এক বুলাদা ছাড়া। এই মানুষটি যে আমাদের বাড়িসুদ্ধ সকলের হৃদয়ের কতখানি জুড়ে ছিল, ৬৩ বছর বয়সে ওর মৃত্যুর পর পদে পদে সে কথা বুঝেছিলাম। ও ছিল বুলুদির সব ভক্তদের মধ্যে সব চাইতে নীরব। বুলাদার কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়, নইলে ওর ওপর অবিচার করা হবে। কবে থেকে যে ও আমাদের বাড়ির একজন হয়ে গেছিল মনে পড়ে না। কালো, লম্বা মানুষটির চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় কিছু ছিল। চমৎকার বাঁশী বাজাত, ভারি সুরেলা গলা ছিল, কিন্তু গানটান বড় একটা গাইত না, খালি গুণ্‌গুণ্ করত। ছবি আঁকার হাত ছিল। মেদিনীর মতো হৃদয় ছিল। লোকের সাহায্য করতে পারলেই কৃতার্থ। যার যত দায় ও খুশি হয়ে এগিয়ে এসে নিজের ঘাড়ে তুলে নিত। আমি ওর মতো কাউকে দেখিনি। স্বনামধন্য প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ছোট ভাই; চৌরঙ্গীতে ওদের গ্রামোফোনের ও খেলার সরঞ্জামের দোকান ছিল নাম করা একটা সামাজিক মিলনস্থল। দোকানে বুলাদাই ছিল তার বাবার ডান হাত। ওর সঙ্গে কবে কিভাবে প্রথম দেখা হয়েছিল মনে নেই। সম্ভবতঃ শিলং থেকে কলকাতায় এসেই, গড়পারের বাড়িতে।

প্রশান্তদা ছিলেন বড়দার বন্ধু, বুলাদা ছিল তাঁর ভক্ত। ভারি চমৎকার শিল্পী

মন ছিল তার। চেনা-জানা কারো বাড়িতে বিয়ে-থা হলে, ওকে ডেকে নিয়ে যেত ফুল সাজিয়ে দেবার জন্য। কোনো প্রশিক্ষণ পাওয়া শিল্পীরও এমন সৌন্দর্য-বোধ ছিল না। আমার তখন হয়তো ১৩ বছর বয়স, বেঁটে, বেজায় রোগা, বড্ড কথা বলি—মোট কথা আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কিচ্ছু ছিল বলে মনে হয় না। দিদি আমার চেয়ে বড় সাইজের ছিল, কম কথা বলত ; কিন্তু ও-ও যে খুব আকর্ষণীয় ছিল মনে হয় না। তবু বুলাদা আমাদের রাশি রাশি আবদার সহ্য করত, ফাই ফরমায়েস খেটে দিত। তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের বেজায় ভক্ত। রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলে বুলাদা তাঁকে এখানে-ওখানে নিয়ে যায়। রোজ দেখা হয়। আমি এক টাকা দিয়ে দু ইঞ্চি বাই তিন ইঞ্চি, কালো চামড়া দিয়ে বাঁধানো একটা অটোগ্রাফ্ খাতা কিনে বুলাদাকে বললাম, "রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে আনো ; পুরনো জিনিস না, নতুন কবিতা যেন হয়।" বুলাদা দু-তিনদিন বাদে খাতাটা দিয়ে গেল। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "নামের আখর কেন লিখিস্ আপন সকল কাজে ? পারিস্ যদি প্রেমের আখর রাখিস্ জীবন মাঝে।"

যখন হাজারিবাগ গেছি তখন আমার বয়স সতেরো, বুলুদির চব্বিশ, বুলাদার সাতাশ। ততদিনে আমরা মেনে নিয়েছি যে বুলাদা হল বুলুদির ভক্ত, তাই আমাদের ওপর ওর অত টান। আসলে কিন্তু বিশ্ব-প্রেমিক যদি কেউ থেকে থাকে, সে হল বুলাদা। তাই বলে অবিশ্যি বুলুদির অন্য ভক্তদের ও খুব সুনজরে দেখত না। মুখে কিছু বলত না। বিশেষ করে ফর্সা, মোটা, গুণী, ভালো চাকরে এক পাণিপ্রার্থী ছিলেন, তাঁকে দেখলেই বুলাদার মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। আমরা ছিলাম বুলাদার দলে। ওকে এই বলে আশ্বাস দিতে ইচ্ছা করত যে বুলুদি বলেছে সেই লোকটি পাঁউরুটির মতো দেখতে, কাজেই ওঁর কাছ থেকে কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এত পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও কিছু বলতে সাহস পাইনি, কারণ ছোটবেলা থেকেই, আমাকে মুখ তুলতে দেখলেই বড়রা বলতেন, "মুখ বন্ধ।" সে যাইহোক আমরা হাজারিবাগে থাকতে থাকতে বুলাদা বার দুই মটর-সাইকেলে করে ঘুরে গেছিল। আমাদের মনে হত সীতাদেবী-শান্তাদেবীর কোনো রোমাঞ্চময় উপন্যাসের ঠিক মধ্যিখানে রয়েছি। বুলুদির মনের ভাব বোঝা দায় ছিল। এত বেশি কথা বলে এত কম তথ্য প্রকাশ করতে আর কাউকে দেখিনি। এর মধ্যে আসলে একটু বেদনার ইতিহাস ছিল। বুলুদির দাদা বুলাদার এক নিকট আত্মীয়াকে বিয়ে করবে বলে বিলেত গিয়ে মেম এনেছিল বলে, বুলুদির মনে ভারি একটা অপরাধ বোধ ছিল। তাই বোধ হয় বুলাদাকে দেখলেই ওর মেজাজ বিগড়ে যেত। তাছাড়া সব উপন্যাসেই দেখতাম প্রেমের পথ খুব সহজ নয়। সে যাইহোক এর পরেই ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স লাটে উঠেছিল ; বাড়ির বাসিন্দারা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ; মেজজ্যাঠাইমা

সুন্দর জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে উঠে, কয়েক মাসের মধ্যেই মারা গেলেন ; এসব কথা আগেই অন্য প্রসঙ্গে বলেছি। বুলুদি আমাদের বাড়িতে এসেছিল। ১৯২৮ সালে বুলাদার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বলা বাহুল্য বুলুদির সমস্ত আত্মীয়স্বজনরা এতে আহ্লাদে আটখানা হয়েছিলেন। বিশেষ করে আমার মা, বাবা, পরে আমার বিয়ের সময়ে বাবা যতখানি ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বুলুদির বিয়েতে সেই রকম আনন্দিত হয়েছিলেন।

হাজারিবাগে মাসিমা হঠাৎ বললেন, "তোদের বাবার এত উন্নতি হল, নিজ গুণে ইম্পিরিয়েল সার্ভিস হয়ে গেল, কই তোরা তো কিচ্ছু বলছিস্ না।" শুনে আমরা অবাক্! বাবার যে উন্নতি হয়েছে এই প্রথম শুনলাম। ঐ রকম ছিলেন আমার বাবা। নিজের কিম্বা ছেলে-মেয়েদের সাফল্যে এতটকু উল্লাস প্রকাশ করতেন না। সময়কালে আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলাম, তখনো আমাকে সোনার গয়না দেওয়া বা ভোজের আয়োজন করা দূরে থাকুক, একবারও মুখে বলেননি, "আমি খুশি হয়েছি।" কিন্তু খুশি নিশ্চয়ই হতেন। অথচ অখুশির বেলা সে-কথা পঞ্চমুখে প্রকাশ করতেন। এখনো ভাবি ঐ কটি কথা বললেই তো আমার মন ভরে যেত। কি এক কড়া ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন বাবা যে কিছুতেই মুখে প্রসন্নতার কথা আনতেন না! এখনো ভাবলে দুঃখ হয়। তখন খুশি হলেন কি না তাও বুঝতে পারতাম না। তবে বুলুদির বিয়েতে নিঃসন্দেহে খুশি হয়ে, দু-হাতে টাকা-কড়ি খরচ করেছিলেন।

মাসিমার ও-কথায় মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বাবার ততদিনে ছুটি ফুরিয়ে গেছিল, উনি কলকাতায় ফিরে গেছিলেন। মা আরো বললেন, কলকাতায় ফিরে আমরা আর ঐ ছোট ফ্ল্যাটে উঠব না। গড়পারের সংসার উঠে যাচ্ছে। মণিদা, নান্‌কুদা, বুলুদি আমাদের বাড়িতে আসবে। ছোট-জ্যাঠামশাই আর মেজ-জ্যাঠাইমা সুন্দর-জ্যাঠার বাড়িতে যাবেন। মেজ-বৌদি, বড়-বৌদি তখনকাব মতো বাপের বাড়ি যাবেন। কি আর বলব, শুনে বুকটা হু-হু করে উঠেছিল। কত স্বপ্নের কত আশার ঐ ১০০নং গড়পাব বোডের বাড়ি। আজ পর্যন্ত প্রেসের ঝম-ঝম শব্দ কানে বাজে, ছাপার কালির গন্ধ নাকে আসে। কখনো কোনো ছাপা-খানায়, প্রকাশালয়ে কিম্বা বইয়ের দোকানে পা দিলেই মনের মধ্যে কে যেন বলে এই আমি বাপের বাড়ি এলাম। ইচ্ছে করে নতুন ছাপা বইতে নাক ডুবিয়ে সারা দিন বসে থাকি।

জানতাম ওদের সম্পত্তির কিছুই রাখা যাবে না। শুধু মানিক নাবালক ছেলে বলে বাপের ভাগটুকু পাবে আর সামান্য একটা মাসোহারা। মায়ের কথায় চোখের সামনে মায়ার প্রাসাদ ঝুর-ঝুর করে ভেঙে পড়ল। আমরা নাকি জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডে একটা বড় তিনতলা বাড়িতে উঠে যাব। সেখানে সকলের

জায়গা হবে। বাবা এখন থেকে বাড়ি-ভাড়া বাবদ মোটা টাকা পাবেন। বাবাই বাড়ি ঠিক করে, আমাদের সামান্য যা আসবাব জিনিসপত্র ছিল, সব নতুন বাড়িতে তুললেন। আপিসের চাপরাশী, চৌকিদার, বাড়ির চাকররা আর বাবার বন্ধুরা সাহায্য করলেন। মাকে কোনো মতামত প্রকাশ করতে শুনিনি। বাবা যা ব্যবস্থা করতেন, মা তাতেই খুশি থাকতেন। এক্ষেত্রে কলকাতায় ফিরে দেখলাম রাস্তাটা ভালো, বাড়ির সামনে খুদে এক তে-কোণা ঘাসজমিতে মস্ত একটা কৃষ্ণচুড়ো গাছ লালে লাল হয়ে আছে। বড় বড় ঘর, বড় বড় জানলা, তিন পাশে একতলা বাড়ি, খোলা-মেলা, তিনতলায় আমাদের শোবার ঘরের পাশে জাল দিয়ে ঘেরা সুন্দর একটি বারান্দা। সেখান থেকে অর্ধেক ভবানীপুর দেখা যায়। ঐ বারান্দায় কয়েক বছর ধরে কত যে কবিতা পড়েছি, স্বপ্ন দেখেছি, পরীক্ষার পড়া তৈরি করেছি, পাঁচজনে মিলে কত গল্প করেছি, তার ঠিক নেই।

হাজারিবাগেও বড় আনন্দে ছিলাম। বাড়ির পেছনে একটা মাঠ। মাঠের ওপারে পোস্টঅফিস, সেখানে জানলা দিয়ে রোজ বেলা এগারোটা থেকে চিঠি-পত্র বিলি হত। পোস্টাপিসের পাশে বুথ্ সায়েবের বাড়ি। তাঁর দশটা মেয়ে, কেউই খুব কালো নয়, দেখতেও মন্দ নয়। পোস্টাপিসের সামনে পুলিশ সার্জেন্টদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র। শুনলাম কচি কচি সার্জেন্ট ধরে সায়েব এর আগেই নটা মেয়েকে পার করেছেন ; এবার দশ নম্বরের মহড়া দেওয়া হচ্ছে। আমরা থাকতে থাকতেই পোস্টাপিস থেকে চিঠি আনতে গিয়ে কে যেন শুনে এল দশ নম্বরও বাগ্‌দত্তা হয়েছে।

মেজদি ভারি রসিক মানুষ ছিলেন আর যেমন রান্নায়, তেমনি কারু-সেলাইতে দক্ষ। মেজ-জ্যাঠাইমার হাতে যতগুলি মেয়ে মানুষ হয়েছিল, সবকটি বেজায় ভালো রাঁধিয়ে। শুধু ঘরোয়া রান্নায় সিদ্ধহস্ত নয়, পান্তুয়া, রসগোল্লা, কেক, পুডিং, রোস্ট থেকে শুরু করে পেশাদার ময়রার হাতের খাজার মতো খাজা পর্যন্ত। শেষেরটিতে আমার বড়দি, সুলেখিকা সুখলতা সব চাইতে পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা লেখা-পড়া গান-বাজনাও শিখেছিলেন। খালি মায়ের গলায় গান আসত না, দিদির আমারও যেমন আসে না। ছবি আঁকতেও সব ওস্তাদ আর এঁদের স্বামী সেবা দেখে অবাক হতাম। বড়দির একটু মেজাজ ছিল ; মাকে কিম্বা মেজদিকে কখনো প্রকাশ্যে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করতেও শুনিনি। অবিশ্যি সে ব্যবস্থার আমি খুব প্রশংসা করতে পারছি না। কারণ কিঞ্চিৎ ন্যায্য কথা না শোনালে পুরুষদের বড্ড বাড় বেড়ে যায়। যতই ফেরবার সময় কাছে আসে, আমাদের ভ্রমণের নেশা ততই বাড়ে। শহরের ভেতরটা দেখতে কিছু বাকি রাখা হয়নি, কানহারি পাহাড়, লেক, কলাম্বাস কলেজ ইত্যাদি দেখা হয়ে গেছিল। এর মধ্যে দাদামশায়ের এক শিষ্যবাড়ি থেকে কি করে

আমাদের পরিচয় পেয়ে, নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল। কি ভালো লোক তাঁরা সে আর কি বলব। দাদামশাই ১৯০২ সালে কাশীতে মারা যান, আমি বলছি ১৯২৫ সালের কথা। ইতিমধ্যে তাঁর প্রকৃত শিষ্যরা সবাই পরলোকে গেছেন ; তবে তাঁদের ছেলে-বৌরা আছেন। তাঁদের কেউ কেউ দাদামশাইকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন। কিছু বই-পত্র ছিল তাঁদের কাছে, কি বই তা আর খুলে দেখাননি। একটা আসন, তা সে বাঘ-ছাল না হরিণের চামড়া মনে করতে পারছি না। আর একটা মস্ত বড় চীনে-মাটির পেয়ালা। তাতে করে দাদামশাই চা খেতেন। এত বড় পেয়ালা আজ পর্যন্ত আর দেখিনি। তবে অবনীন্দ্রনাথের কোনো বইতে পড়েছি যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মস্ত এক পেয়ালায় চা খেতেন। একবার কে যেন সে পেয়ালাটি ভেঙে ফেলাতে, মহর্ষির বড় নাতি দীপু ঠাকুর সমস্ত চীনা-বাজার ঢুঁড়ে, তবে একটি পেয়েছিলেন। তাও বোধহয় বুড়ো ভদ্রলোকের খুব পছন্দ হয়নি। আমার সেদিন ঐ পেয়ালাতে হাত বোলাতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু ওঁরা যেমন আল্‌গোছে ধরে দেখাচ্ছিলেন যে ঠিক সাহস পাইনি। দাদামশায়ের ব্যবহার করা কোনো জিনিস আমি চোখে দেখিনি। মায়ের কাছে একখানি চিঠি পর্যন্ত ছিল না। দাদামশায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সামান্য যা কিছু সংসার জীবনের সম্পত্তি ছিল, ওঁর শিষ্যরা কেউ কেউ সেগুলি ওঁর প্রতিষ্ঠিত ছোট আশ্রমটির জন্য দাবি করেছিলেন। তখন বড়-মাসিমার বিয়ে হয়ে গেছিল। মেসোমশাই অনাথা শ্যালীদের সম্পত্তি যাতে অপরে না নেয়, তাই কেস্ করেছিলেন। ঐ কেস্‌টি বেশ মনোজ্ঞ। বিচারপতি রায় দিয়েছিলেন যে ঐ সম্পত্তির ওপর আশ্রমের কোনো দাবি থাকতে পারে না। যে মুহূর্তে নিজের শ্রাদ্ধ করে কেউ সন্ন্যাসী হল, সেই মুহূর্তে সংসারের কাছে সে মৃত। মৃতের সম্পত্তি তখনি তার ন্যায্য ওয়ারিশদের হয়ে যায়। সে সময় আশ্রমের অস্তিত্ব ছিল না, ন্যায্য ওয়ারিশ হলেন দাদামশায়ের তিন মেয়ে। মায়ের কাছে শুনেছি তাঁর মন এই ব্যাপারে এতই বিরূপ হয়ে উঠছিল যে সেই ১৬-১৭ বছর বয়সেই তিনি তাঁর ভাগটি জ্যাঠামশাইকে বলে ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্র-ভাণ্ডারে আমার দিদিমার নামে দান করেছিলেন। দুঃখের বিষয় মা-মাসিদের পরিচয়ের প্রমাণস্বরূপ দাদামশায়ের লেখা যাবতীয় চিঠিপত্র আদালতে উপস্থাপিত করতে হয়েছিল। সেগুলি তাঁরা আর ফেরত পাননি। উকীল বলেছিলেন নাকি হারিয়ে গেছে। এই নিয়ে মাকে আক্ষেপ করতে শুনেছি। বিশেষতঃ সবার শেষে লেখা চিঠিখানিতে দাদামশাই মাকে বলেছিলেন, "তোমার এন্ট্রান্স পরীক্ষা হয়ে গেলে, তোমাকে কিছু দিনের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসব।" আমরা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "দাদামশাই ডাকলে তুমি এঁদের ছেড়ে চলে যেতে ?" মা অবাক হয়ে বলেছিলেন, "সেই মুহূর্তেই চলে যেতাম। যদিও এঁরাই আমাকে মানুষ

করেছিলেন।" ঐ পেয়ালার কথায় এত কথা মনে পড়ছে।

একটা আনন্দের বিষয় হল শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে আর প্রকাশক মিত্র ঘোষের চেষ্টায়, 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৯০০-১৯০১ সালে 'হিমারণ্য' নামে দাদামশায়ের লেখা কৈলাস ও মানসসরোবর ভ্রমণের যে কাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি সংগ্রহ হয়েছে। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী সহকারে মিত্র ঘোষ সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছেন। দাদামশায়ের সেই আসন আর পেয়ালা দেখে শুধু আমিই যে অভিভূত হয়েছিলাম তা নয়, মা-মাসির চোখে জল দেখেছিলাম।

কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন আগে আমাদের ভগ্নীপতি অরুণনাথ চক্রবর্তী হঠাৎ এসে বললেন, "কাল সারা দিনের জন্য কে কে ছিন্নমস্তার মন্দির দেখতে যাবে ? জায়গাটার ভারি কুখ্যাতি; যারাই যায় তাদের একটা না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কে কে যাবে বল।" মাসিমা বললেন, "নোটন আর আমি যাব না। অন্যদেরও যাবার কি দরকার আছে ?" অরুণবাবু বললেন, "আমাকে একটা তদন্তে যেতেই হবে। তিনটে গাড়ি আসবে, যতজন ধরে যেতে পারে।" অমনি সবাই ঝুলে পড়ল, সবাই যাবে ! শেষ পর্যন্ত লতিকা আর যতির সর্দি-কাশির জন্য ওরা গেল না ; মা তো সবে রোগ থেকে সেরে উঠেছেন, মা গেলেন না। মাসিমা নোটন গেলেন না। মেজদির জায়গা হল না। বাকিরা গাদাগাদি করে গাড়িতে চেপে বসলাম। আমরা ৬ ভাইবোন, অশোক, অরুণবাবু, ওঁদের বাড়ির পাঁচটা ছেলেমেয়ে। আর দুই ড্রাইভার। আমরা কেউই সাধারণতঃ যথেষ্ট খাদ্যাদি না নিয়ে এক পা নড়তাম না। কিন্তু অরুণবাবু বললেন, "যাদের গাড়ি তারা প্রচুর খাওয়াবে, জল পর্যন্ত নেবার দরকার নেই।"

অমনি রওনা হয়ে গেলাম। রামগড় হয়ে, ডাইনে চুটুপালুর রাস্তা, বাঁয়ে আমাদের পথ। কিছুদূর গিয়ে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রাম। সেখান থেকে এক স্থানীয় ভদ্রলোক সঙ্গে একটা আধ-ময়লা ন্যাকড়ায় বাঁধা একটা থালা আর এক পেতলের কলসী জল নিয়ে উঠলেন। উনিই নাকি মালিক। আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া কিছু বলেন না। অরুণবাবুও আঞ্চলিক ভাষা বলতেন। মালিক বললেন ওতে নাস্তা আছে। নাস্তা মানে জলখাবার। আমাদের বয়স ১৮ থেকে ৮, সেই সকালে চা-রুটি খেয়ে বেরিয়েছি। নাস্তার পরিমাণ দেখে মুষড়ে পড়লাম।

তারপর ভেড়া নদী যেখানে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে পৌঁছলাম। গাড়ি তখন আর যেত না। হেঁটে ভেড়ানদী পার হলাম। গ্রীষ্মকালে নদীতে হাঁটু জলও ছিল না। ওপারে উঠে একটা অন্য রাজ্যে পৌঁছলাম। সেখানকার আবহাওয়া থমথমে ভয়াবহ। খানিকটা বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে, দুই নদীর সঙ্গমস্থলে ছিন্নমস্তার মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছলাম। মনে হল মন্দিরটির

আবহাওয়া সমস্ত পরিবেশটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পাথরের মধ্যে দিয়ে বয়ে এসে ভেড়ানদী দামোদরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেখানে একটি জলপ্রপাত, নিচে ঘূর্ণির মতো স্রোত পাক খাচ্ছে। সেখানে নাকি কত লোকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরেছে। আগে এখানে নরবলি হত। কয়েকটা কালো লম্বা লোক মন্দিরের পাশে পাথরের ওপর বসেছিল। আমাদের দেখে উঠে গেল। মন্দিরের দরজা বন্ধ। বাইরে লাল মাথা কুচকুচে কালো বড় বড় গিরগিটি চলে বেড়াচ্ছিল। আমাদের গা শিরশির করতে লাগল।

মালিক আমাদের ডেকে ভেড়া নদীর জলে হাত-পা মুখ ধুতে বললেন। তারপর পোঁটলা খুলে নাস্তা বের করলেন। গোল গোল খাস্তা গজা। খুব ভালো কিন্তু খুব শুকনো। আর আঁজলা ভরে ভেড়া নদীর জল। সেই কলসীটার কি হল বুঝলাম না। তারপরেই দেখি অরুণবাবু হাত-ঘড়ি দেখছেন। নাকি এখনি ফিরতে হবে। সন্ধ্যার আগে ঐ এলাকা ছেড়ে যেতে হবে। ওখানে সে সময় কিছু গোলমাল হচ্ছিল। নিঃশব্দে গিয়ে সবাই ভেড়ানদী পার হয়ে গাড়িতে উঠলাম। মালিক ড্রাইভারদের তাড়াতাড়ি চালাতে বললেন। দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল ; সেই গাঁয়ে গিয়ে গাড়ি থামল। দুপুরে যে নাস্তা ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি, একথা কারো মনে ছিল না। এতক্ষণ পর বেজায় খিদে পেল।

মালিকের অতিথিশালা ছোট্ট দোতলা মাটির বাড়ি, মাটির সিঁড়ি, খড়ের চাল। বাড়ির চারদিকে সীতাহার গাছের বাহার। দোতলার ছাদটা এত নিচু যে আমিও সোজা দাঁড়াতে পারছিলাম না। বড় বড় দুটো তক্তাপোষ ছাড়া আসবাব নেই। চাকররা প্রকাণ্ড খুঞ্চিপোষে করে রাশি রাশি পুরী ; একটা পাথরের থালায় ১২ রকম আচার ; আরেকটাতে ক্ষীরের সন্দেশের পাহাড় এনে দিল। আচার বেজায় টক, বেজায় ঝাল। আলু চচ্চড়ি দিলে পারত। খেয়ে উঠে সকলের গলা শুকিয়ে কাঠ, কিন্তু জল কোথায় ? মালিক হেসে বললেন. "এখানকার বড় কুয়োর জলের বড় খ্যাতি। সেই জল আনতে পাঠিয়েছি, একটু সবুর করুন।" আমরা যে যার বসে রইলাম। আধ ঘণ্টা পরে কলসী ভরে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল এল। পেট ভরে জল খেয়ে, অরুণবাবু মালিককে আমাদের সকলের হয়ে ধন্যবাদ জানালেন। মালিক থেকে গেলেন, আমরা রওনা হলাম।

গাড়ি ছাড়তেই মনে হল মাথার ওপর থেকে একটা কালো মেঘ উঠে গেল, আমরা গান করে গল্প করে এগোতে লাগলাম। অরুণবাবুকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, "কই ? অ্যাক্সিডেন্ট তো হল না ?" সঙ্গে সঙ্গে সে গাড়ির একটা টায়ার ফাটল। দেখা গেল কোনো গাড়ির বাড়তি টায়ার নেই। ওটা মেরামত করতে হবে। চোদ্দবার ঐ গাড়ির টায়ার ফাটার পর, পথের ধারে ওটাকে ত্যাগ করে বাকি দুটোতে সবাইকে ভাগাভাগি করে নেওয়া হল। দেখা গেল জখম গাড়ির

চালকও এসে আমাদের গাড়িতে উঠে বসেছে। এ পথে নাকি বাঘ বেরোয়। মোট কথা বাঘ বেরোয়নি, অন্তত আমরা দেখিনি। রাত এগারোটায় হাজারিবাগ পৌঁছে যে যার বিছানা নিলাম। রাতে লুচি মাংস হয়েছিল, সে খাবারেও কারো উৎসাহ ছিল না। অথচ শিলং-এ পিকনিকে গেলে আমরা দৌড়-ঝাঁপ করে একাকার করতাম। এই পাঁচ বছরে কি আমরাই বদলে গেলাম ? নাকি জায়গাটা কেমন যেন ?

॥ ২৬ ॥

আবার সকলে দলেবলে কলকাতায় ফিরে এলাম। মেজদি তাঁর দুই মেয়ে কল্যাণী আর নলিনীকে নিয়ে শেষবারের মতো গড়পারে উঠলেন। শুনেছিলাম বাড়ি যে কোনো সময় ছেড়ে দিতে হবে। খালি বাড়ি নিলাম হবে। সেকালে স্ত্রীধনের নিয়ম ছিল, তাই বৌদিদিদের গয়নাগাঁটি, বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের সময় আনা খাট-পালঙ্ক বেঁচে যাবে। জ্যাঠামশায়ের আঁকা সুন্দর সুন্দর তেল-রঙের ছবি ছিল। তার মধ্যে যেগুলি একে ওকে দান করে গেছিলেন সেগুলিও বেঁচে গেল। কিন্তু রাশি রাশি ছবি, পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য বই, বহুমূল্য টেলিস্কোপ, ক্যামেরা, প্রেসের যাবতীয় সরঞ্জাম, সব যাবে। মেজদিরা, বুলুদি, নানকুদা সেই পরিবেশের মধ্যে গিয়ে উঠলেন।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠলাম। দেখলাম একতলার একটা বড় ঘর খালি রাখা হয়েছে ; গড়পারের যেসব বাক্স-প্যাঁটরা আসবাবপত্র নিলেম হবে না, কিছুদিনের জন্য সেখানে রাখা হবে। মাসিমা নোটন কয়েকদিন আমাদের সঙ্গে থেকে গেলেন। মা মহা খুশি। বোন দুটি মায়ের প্রাণ ; নিজের বলতে আর কেউ ছিল না। ছিল না বলাও উচিত নয়, কারণ ছিল অনেকেই, কোতরঙের অচলানন্দের বাড়িতে অনেকেই ছিলেন। তবে তাঁদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। এর অনেক বছর পরে, আমার বিয়েরও কয়েক বছর পরে, আমার শ্বশুরবাড়ির পুরোহিত-বংশের একজনের কোতরঙের দিকে বাড়ি ছিল। তিনি চার-পাঁচজনের খবর এনে, বলেছিলেন মা যদি যেতে চান, তিনিই নিয়ে যাবেন। মাকে সারাজীবনে ২-৩ বারের বেশি কাঁদতে দেখিনি। সেদিন ঐ কথা শুনে দুহাতে মুখ ঢেকে বলেছিলেন, "আর হয় না।"

সে যাইহোক গে, জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডের নতুন ভাড়াবাড়ি দেখে মাসিমা খুব খুশি হলেন। তবে পাশের একতলা বাড়িতে নাট্যজগতের বিখ্যাত নরেশ মিত্রের সপরিবারে বাস করাটা খুব একটা অনুমোদন করতে পারলেন না। আমরা কিন্তু খবর পেয়ে রোমাঞ্চিত। তারপর ৫২ বছর কেটে গেছে, সব কথা ভালো করে মনে নেই ; শুধু মনে আছে নিরিবিলি শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা ছিল ওঁদের।

নাট্যজগতের হট্টগোল, ওবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছত না। নরেশ মিত্রের স্ত্রীকে মনে পড়ে হাসিখুশি, ফর্সা, গিন্নিবান্নি মানুষটি। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা সম্ভবত ওঁর ভাই, ভাই-বৌ ইত্যাদি হবেন। একটা দোলের দিনের কথা মনে পড়ে। ছেলেমানুষের মতো ওঁরা দোল খেললেন। বিস্ময়ে, আহ্লাদে, হিংসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। ওঁদের বাড়িতে কোনো ছোট ছেলেমেয়ে দেখিনি। সেদিন ওঁরাই ছোট ছেলেমেয়ে হয়ে গেলেন। দুই দল হল। একদিকে পুরুষরা, একদিকে মেয়েরা। আমরা তিনতলার বারান্দা থেকে সপ্রশংস দর্শক। মেয়েরা মেয়েদের দিকে, ছেলেরা পুরুষদের দিকে। বলা বাহুল্য বড়রা অনুপস্থিত এবং আমাদের এই কুৎসিত কৌতূহল দেখে বিরক্ত।

মোট কথা ওঁদের বাড়িতে কখনো পুরুষরা জেতে, কখনো মেয়েরা, গেরিলাযুদ্ধে যেমন হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে "ট্রুস্" হচ্ছিল। রঙ মেখে ভূত হয়ে গিন্নিরা বড় কেৎলিতে চা করে পেয়ালায় ঢেলে, সিঙ্গাড়া সন্দেশ প্লেটে দিয়ে ছোকরা চাকরের হাতে বার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। পুরুষরা চা জলখাবার খেয়ে, সিগারেট ধরিয়ে সবে দুটো সুখটান দিয়েছেন, অমনি গিন্নিরা একেকজন একেকটা জানলা দিয়ে পি-ই-চ্ করে পিচ্‌কিরি দিয়ে রঙ ছুটিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রুস্ ভঙ্গ হল। ওঁরা ধুপধাপ করে বেরিয়ে এলেন। গিন্নিরা সবাই দৌড়ে উঠোনের কোণের স্নানের ঘরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে দিলেন। বাড়িটা দো-মহলা, মধ্যিখানে উঠোন। রাস্তার দিকে বৈঠকখানা ঘর, মধ্যিখানে মস্ত উঠোন, অন্যদিকে শোবার ঘর। উঠোনে কল, বালতি ইত্যাদির অভাব ছিল না। ঘরের ছাদ ছিল না। উভয় পক্ষের কারসাজি আমাদের উৎসুক চোখের সামনে প্রকট। পুরুষরা বার-বাড়িতে বারান্দায় ভূতের মতো চেহারা নিয়ে সংক্ষিপ্ত এক সামরিক মন্ত্রণা-সভা করে নিয়ে, একেকজন একেকটা বালতিতে প্রচুর রঙ গুলে, নিঃশব্দে অগ্রসর হলেন। তারপর কলঘরের ন্যাড়া দেয়ালের ওপর দিয়ে হু-স্ করে ৬/৭টা বড় বালতি ভরা রঙ ঢেলে দেওয়া হল। ঠিক মনে হল সেই রঙের স্রোতে গিন্নিরা ভেসে বেরিয়ে এলেন।

এদিকে আমাদের খাবার সময় হয়ে গেছিল, বড়দের ডাকাডাকির চোটে অনিচ্ছুকভাবে প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে যেতে হল। কিন্তু সেই একদিনের ঘটনায় বুঝতে পেরেছিলাম আধা-বয়সী গম্ভীর চেহারার নরেশ মিত্র একটি ফূর্তিবাজ কিশোর ছাড়া কিছু ছিলেন না। ওঁদের তখনকার বয়স জানি না, আমরা ভাবতাম আমাদের চাইতে অনেক বড়। পাশের বাড়ি গিয়ে আলাপ করার জো ছিল না। বলেছি তো ব্রাহ্মরা সেকালে থিয়েটারের ছায়া মাড়াত না। মন্দ ব্রাহ্মদের মুখে গল্প শুনেছি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রকে একজন অচেনা লোক স্টার থিয়েটারের পথ জিজ্ঞাসা করেছিল। উনি বিরক্ত হয়ে "জানি না।" বলে

বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবার পর মনে হল যে থিয়েটার যত খারাপই হক না কেন, মিথ্যাকথা তার চাইতেও ঢের খারাপ। অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ও মশাই, শুনুন, শুনুন।" লোকটি ভাবল তবে বোধহয় পথটা মনে পড়েছে। সে ছুটে কাছে এসে বলল, "জানেন তাহলে পথটা ?" হেরম্ব মৈত্র বললেন, "জানি, কিন্তু বলব না।" এই বলে আবার হন্-হন্ করে হাঁটা দিলেন।

মাসিমা নোটন হয়তো সেবার ৫-৬ দিন ছিলেন। তারই মধ্যে ওঁদের পুরনো বাবুর্চি সকুর এসে বলল, "মা চলুন। আমি তো সায়েবকে সামলাতে পারছি না। এই গরমে রোজ দুবেলা খিচুড়ি খাচ্ছেন। কিছুতেই কথা শুনছেন না।" পরে এই প্রসঙ্গে মেসোমশাই বলেছিলেন, "তোমার মাসিমাকে বুঝে উঠতে পারলাম না। দুপুরে খিচুড়ি মাছ ভাজা খাই, রাতে খিচুড়ি মাংস কষা খাই, তাতে দোষটা কি হল বল তো ?"

নতুন বাড়িতে এসে আমরাও অনেকখানি সচল হলাম। সমবয়সী আত্মীয়স্বজনরা, ভাইবোন, ভাইপো ইত্যাদি এসে জটলা করত, সারাদিন থেকে যেত, কখনো রাত কাটাত। এত বড় পরিবার আমাদের যে বাইরের লোকের অভাববোধ করতাম না। নিজেদের নিকট আত্মীয়দের গণ্ডিটিও খানিকটা বেড়ে গেছিল। মেজ-জ্যাঠাকে পুষ্যি নিয়েছিলেন তাঁর দূর সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর। তার ফলে হরিকিশোরের নিজের ছেলে ও মেয়েরাও আমাদের নিকট আত্মীয় হয়ে গেছিলেন। খেলার মাঠে স্বনামধন্য বেচু দত্তরায়, প্রেমা দত্তরায় হরিকিশোরের দৌহিত্র। ছোটবেলা থেকে তাদেরও আমাদের পিসতুতো ভাই বলেই জেনে এসেছি। আজ পর্যন্ত নিকট আত্মীয় বললেই তাদের কথাও মনে পড়ে।

তাই বলে সব আত্মীয়ের সঙ্গে সমান ভাব হয় না। নিকটতর বলেই যে তার সঙ্গে বেশি মতে মিলবে, তার কোনো মানে নেই। এই সময় আমাদের মনের আরেক দিকেও প্রসার হওয়াতে, এত দিন যে অন্তরঙ্গতা শুধু বোনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটা আরো বিস্তৃত হল। সেই যে অনেক দিন আগে একবার ইডেন গার্ডেনে ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছিলাম, সেই সময় থেকেই আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেছিল। ক্রিকেট জিনিসটাতেই আমাদের কেমন একটা স্বত্বাধিকার বোধ ছিল। বড়-জ্যাঠামশাইকে সায়েবরা সুদ্ধু ডব্লু-জি-গ্রেস্ অফ্ ইণ্ডিয়া বলত ভেবে আমাদের ভারি গর্ব হত। কোনো পত্রিকায় একবার পাশাপাশি দুজনার ছবি বেরিয়েছিল। সাদৃশ্যও যে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে বড়-জ্যাঠামশায়ের মধ্যে আরেকটা মানুষও ছিল যে ফতুয়া আর খাটো করে ধুতি পরে, হাতের গামছায় ভিজে কাপড় বেঁধে, রোজ হেঁটে গঙ্গার ঘাট থেকে স্নান সেরে ফিরত। আশ্চর্যের বিষয় হল দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না।

আমাদের সমস্ত পরিবারের আর পরিবারের দৌহিত্র বংশের অনেকের মধ্যে এই যে ক্রিকেট-প্রীতি, এর মূলে ছিলেন বড়জ্যাঠামশাই। এমন একটা পৌরুষের প্রতিমূর্তির প্রভাব কারো পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। বেচুদারা, সোনাপিসির আর সুন্দর জ্যাঠার বাড়ির ছেলেরা স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলত। বাবা জ্যাঠামশাইরা টাউন ক্লাবের পুরনো সদস্য। আমরা আগে টাউন ক্লাবেরই গল্প শুনতাম, তবে তাদের কোনো খেলা দেখিনি। অনেকের ধারণা যাঁরা টাউন ক্লাব পত্তন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী সারদারঞ্জন। কথাটা ঠিক নয়। আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকে নাটোরের মহারাজা, ভূকৈলাসের রাজা এবং আরো কয়েকজন উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় টাউন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, এ তথ্য বেচুদার কাছে পেয়েছি। এখন যেটাকে লোকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ বলে জানে, আগে সেইখানেই টাউন ক্লাব খেলত। কেন এ মাঠ ছাড়তে হল বলতে পারি না। পরে পাশের একটা মাঠ টাউন ক্লাব পেয়েছিল এবং এখনো সেখানেই খেলা হয়। যতদূর জানি ফুটবল, হকি, ক্রিকেট সবই খেলা হত। বড়জ্যাঠামশাই কলকাতায় এসেই, ভাইদের নিয়ে এই ক্লাবে যোগ দিলেন।

সে সময় এই ক্লাব ছাড়া আর মাত্র এক জায়গায়, ভবানীপুরের 'ডায়ানা' ক্লাবে, ক্রিকেট খেলা হত। প্রফেসার বিপিনবিহারী গুপ্তের সহযোগিতায় দেখতে দেখতে ছেলেরা দলে দলে এসে খেলার মাঠে নামতে লাগল। টাউন ক্লাব এঁদের চেষ্টায় অনেক উন্নতি লাভ করল। সারদারঞ্জনকেও কলকাতার ক্রীড়ামোদীরা চিনে নিল। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের নিজের দল ছিল। বড়জ্যাঠামশাই, ছোটজ্যাঠামশাই তাতে খেলতেন। শুধু এতেই জ্যাঠামশাই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন ব্যাপকভাবে ছেলেদের খেলার মাঠে নামাতে হলে, কলেজে কলেজে ক্রীড়া বিভাগ গড়া ছাড়া উপায় নেই। বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি ক্রীড়া বিভাগ আর তার জন্য আলাদা তহবিলের ব্যবস্থা করলেন। শুনেছি তিনি ছেলেদের খেলায় যোগ দিতে একরকম বাধ্য করতেন আর নিজেও শুধু উপস্থিত থাকতেন না, খেলতেনও। ছাত্রদের আর প্রফেসারদের নিয়ে আলিগড়ে গিয়ে তাঁরা জিতে ফিরেছিলেন। টিমের খ্যাতি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে কলকাতায় অনেক ক্রিকেট ক্লাব অনেক প্রশংসা অর্জন করেছে, কিন্তু খেলার প্রবর্তন করেছিল টাউন ক্লাব, একথা ভুলে গেলে চলবে না। বেচুদার মতে ক্রিকেট খেলার প্রবর্তক হলেও, উন্নতির ক্ষেত্রে এ ক্লাবের অবদান সে রকম উল্লেখযোগ্য নয়। তবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। উন্নতি তো আর একদিনে হয় না ; ক্রমে ক্রমে যত অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে, দক্ষতাও তেমনি বাড়ে। মান-ও উঁচু হয়।

মোটকথা আমাদের পরিবারের ছেলেরা ছিল স্পোর্টিং ইউনিয়নের সদস্য।

স্পোর্টিং ইউনিয়ন-ও নেহাৎ দুদিনের প্রতিষ্ঠান নয়। শুনেছি ১৯০০ সালের আগে কয়েকজন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবকের চেষ্টায় ব্রাহ্ম বয়জ্ স্পোর্টিং নামে একটা ছোট দল উত্তর কলকাতার পান্তির মাঠে ক্রিকেট খেলা শুরু করে। পরে দ্বিজেন সেন, এইচ্ বসু আর সারদারঞ্জনের উৎসাহে এর বদলে একটা নতুন দল গড়ে ওঠে, তারি নাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন। তারা খেলত মার্কাস স্কোয়ারে। সেখানে আমিও অনেকবার আমার সোনা-পিসি, অর্থাৎ এইচ্ বসুর স্ত্রী, আর তাঁর মেয়েদের সঙ্গে খেলা দেখেছি।

১৯২৫ সালে আমাদের পরিবারের অনেকগুলো ছেলে ক্রিকেটে নাম করেছিল। সবাই বলত তাদের দিয়েই একটা খুব ভালো টিম তৈরি হয়ে যায়। শুনে বেজায় গর্ব হত। একেক রকম খেলা কারো রক্তে থাকে কি না জানি না, বরং মনে হয় পরিবেশের জন্য খেলোয়াড় তৈরি হয়। বড়জ্যাঠামশাই যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, তারই জোরে অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় তৈরি হয়ে গেল। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হল যে তাঁর ভাইদের মধ্যে ছোট-জ্যাঠামশাই আর বাবা পাকা খেলোয়াড় তৈরি হলেন। সুন্দর জ্যাঠা অর্থাৎ মুক্তিদারঞ্জন হলেন বিস্ময়কর অ্যাথ্‌লীট, তার একটা ভালো বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাচ্ছি না কিন্তু তাঁর নিজের চার ছেলের মধ্যে কেউই খেলাধুলোর দিকে গেলেন না। গেল মুক্তিদারঞ্জনের ছেলেরা। তাদের বিষয়ে আরেকটু বলা দরকার, কারণ খ্যাতির এমনি বিড়ম্বনা যে আজ ঘরে ঘরে যাদের নাম, কুড়ি বছর বাদে তাদের কেউ মনেও করে না। তখন নব নব নায়ক অবতীর্ণ হয়ে মঞ্চ দখল করেছে। সেটাই অবশ্য বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বর্তমান জন্ম নেয় অতীতের কোলে। বিগত দিনের খেলোয়াড়রা খেলার গতি যেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন আজকের উন্নতি অনেকখানি তারি ওপর নির্ভর করে আছে। সেকালে মাইকেল তাঁর মেঘনাদ বধের চতুর্থ সর্গের আরম্ভে বাল্মীকি ইত্যাদিকে মনে করে লিখেছিলেন......"তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি, পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে, 'অমর...''

স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলায় মুক্তিদারঞ্জনের ছেলে শৈলজাকে অনেকবার ক্যাপ্টেন হতে দেখেছি। বলিষ্ঠ শরীর, প্রথম যৌবন পার হয়ে গেছে, একটা পা পুরনো একটা দুর্ঘটনার ফলে কিঞ্চিৎ খোঁড়া। কিন্তু খেলার জাদুকর। আসল কথা হল যে কোনো ক্ষেত্রেই জাদুই বলা যাক, কিম্বা প্রতিভাই বলা যাক, তার জন্ম শুধু হাতে কিম্বা পায়ে নয়, বরং মস্তিষ্কে এবং হৃদয়ে, তবে হাত-পায়ের কেরামতি না থাকলে, প্রতিভাই বা দাঁড়াবে কোথায়?

শৈলজারঞ্জন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আশির ওপর বয়স, এখনো বেঁচে আছেন। তাঁর ছোট হৈমজা ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। হকি, ক্রিকেট দুই-ই ভালো খেলতেন। তিনি নেই। তাঁর ছোট নীরজা ছিলেন আশ্চর্য গুণী

খেলোয়াড়, শুধু যে ক্রি. কট খেলতেন তা নয়, খেলোয়াড় তৈরি করতেন। আমি কয়েকজন দক্ষ ক্রিকেটারকে শুনেছি নীরজাকে 'গুরু' বলে উল্লেখ করতে। তাঁর ছোট ইন্দুজা লম্বাবলিষ্ঠ মানুষটি। একে আমরা বলরামদা বলে ডাকি। সেকালে একে দিয়েই পিসিমার ছেলেরা ওদের বদমেজাজী কুমীর পালালে, তাকে ধরাত। ভয়-ডর বলে ওর কিছু ছিল না, দড়ির ফাঁস দিয়ে অত বড় কুমীরটাকে ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসত। বলরামের ছোট দুই ভাই ক্ষীরজা আর নৃপজাও ক্রিকেট খেলত।

সোনাপিসিমার তিন ছেলে গণেশদা, কার্তিকদা আর বাপি রূপে-গুণে বিখ্যাত ছিল। শুধু খেলার মাঠে বল পিটিয়ে ওদের খেলার শখ মিটত না। আমহার্স্ট স্ট্রীটে ওদের বাড়ির ঘাস জমিতে কোনোদিন ফুলবাগান হল না। তার বদলে হল একটা ২২ গজি ক্রিকেট পিচ্। সেখানে কত যে অল্পবয়সী অজ্ঞাতকুলশীল সম্ভাব্য ক্রিকেটারকে উৎসাহ আর প্রশিক্ষণ দেওয়া হত তার ঠিক নেই। স্বনামধন্য পঙ্কজ গুপ্তের কাছে শুনেছি ও-বাড়ি থেকে তিনি যা লাভ করেছিলেন তার মূল্য হয় না। বেচুদা, প্রেমাদা এবং ওদের ছোট ভাই আরেক গণেশও ওখানে গিয়ে আলোচনার আর অভ্যাসের ফলে দক্ষ খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিল।

বেচুদার কথাও বলতে হয়। খেলা এক জিনিস আর পরিচালনা আরেক জিনিস। দুটিতেই দক্ষ হওয়া বড় সহজ কাজ নয়। ১৯২০ সালে শিলং থেকে আমরা যখন কলকাতায় এলাম তখন আমার বয়স ১২, বেচুদার হয়তো ২১। তখনো ওর নাম হয়নি, ওর মধ্যে এতখানি ক্ষমতা আছে বোঝা যায়নি। তাছাড়া ও একটু পিছনে সরে থাকত। সোনা পিসিমার চটকদার ছেলেদের যত ভক্ত ছিল, বেচুদার ছিল না। ওর প্রতিভা তো আর শুধু চোখেলাগা ছিল না, তার পরিচয় পেতে আরো গভীরে নামা দরকার। তাছাড়া তার প্রশিক্ষণ হয় হাতে কলমে এবং অনেক বছর ধরে। গণেশদা, কার্তিকদা যখন ভাবল ওদের খেলার বয়স অতিবাহিত হয়েছে, বেচুদার প্রতিভা তখনো খুলছে। বেচুদা হকি ফুটবলেও সমান উৎসাহী।

বেচুদাকে সবাই এম দত্তরায় বলে জানে। আজ পর্যন্ত আশির কাছাকাছি পৌঁছেও তার বিচারবুদ্ধি ম্লান হয়নি। ১৯৩৮ সাল থেকে ২৭ বছর আই-এফ্-এর সেক্রেটারি। অল ইণ্ডিয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট ৯ বছর, প্রেসিডেন্ট ১৪ বছর। ১৯৪৬ থেকে ভারতের ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত। আরো বহু উচ্চপদ বেচুদা দক্ষতা ও প্রশংসার সঙ্গে ভূষিত করেছে। সম্প্রতি ওলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস্ প্রেসিডেন্ট হয়েছে। আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। মেয়েদের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে বেচুদার মতো উৎসাহী কম লোক আছে। আমার উৎসাহটা স্রেফ

মানসিক বলে সে আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়েছে। তাছাড়া বেচুদা, প্রেমাদা দুজনেই স্বাধীনতা সংগ্রামী, জেল-খাটা ছেলে। অনেকদিন বাড়িতেও অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। সমালোচকও আছে অনেক এম দত্তরায়ের। যারাই দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে যায়, তাদেরই সমালোচক থাকতে বাধ্য। আপাতত সেকথা ছেড়ে দিয়ে প্রেমাদার বিষয়ে একটা ছোট গল্প বলি, যার সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে হলপ্ করে বলতে পারব না। ঘটনাব দিবস সন্ধ্যাবেলায় নীরজাদার কাছে শোনা। সম্ভবতঃ সত্যিই।

ইডেন গার্ডেনে বোধহয় স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবের খেলা হচ্ছে। প্রেমাদা ব্যাট করছে। সেদিন বেশ ফুর্তিতে আছে, সবাই আশা করছে বেশ কিছু তুলবে এমন সময় পিচের মধ্যিখানে থেমে মাটি থেকে কি একটা কুড়োতে গিয়ে আউট্ হয়ে গেল। খেলার ফলাফল মনে নেই, ছোট-জ্যাঠা বলতেন "ফলাফল আবার কি ? ভালো খেলা হল ভালো খেলা, তা যে দলই খেলুক।" ক্লাবে এসে অন্য সকলে ওকে চেপে ধরল। "কি কুড়োলে ?" প্রেমাদা বলল, পান। পকেট থেকে পড়ে গেছিল। "পান পড়ে গেছিল তো গেছিল, তার জন্য রান ছেড়ে দিলে ?" প্রেমাদা বলল, "গুণ্ডি আছিল।" শৈলদা বেজায় চটে গেল, "সায়েবরা পাছে গুণ্ডি দেখে তাই এত ভয় ? ছি ! ছি !" প্রেমাদা বলল, "সায়েবরা না, বড়-মামাও আছিলেন যে।" বড়-মামা অর্থাৎ সারদারঞ্জন। তক্ষুনি সবাই ওকে ক্ষমা করে দিল।

ওদের বাড়ির একটা ভূতের গল্প শুনেছি। ফ্ল্যাটবাড়ি, পাঁচতলার ছাদে সবাই কাচা কাপড় শুকোত। একদিন কাপড় তুলতে ভুলে গেছিল বলে রাতে ছোকরা চাকরকে ছাদে পাঠানো হল। সে সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে বলল, "ছাদে বাছুরের মতো বড় কুকুর আছে।" বেজায় অবাক হয়ে ধুপধাপ করে জনা পাঁচেক ছাদে ছুটল। গিয়ে দেখে সত্যি সত্যি বাছুরের মতো বড়, কুচকুচে কালো একটা কুকুর ! ওদের দেখেই কুকুরটা আকাশের দিকে মুখ করে বিকট স্বরে ঘৌ-ঘৌ করে ডেকে, এক লাফে আকাশে উঠে, তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। দর্শকদের চক্ষুস্থির। বলা বাহুল্য এটাও শোনা গল্প, সতি কিনা সন্দেহ হয়। তাতে কি খুব এসে যায় ? যারা মাছ ধরে, তাদের সব গল্পই কি বর্ণে বর্ণে সত্যি ?

॥ ২৭ ॥

মনে হয় বিধাতা যাকে যতখানি গুণ দেন, তার সবটুকুই দান করে দিতে হয়। দান করতে হলে অনুশীলন চাই, সাধনা চাই। অর্থাৎ নিজেকেও অনেকখানি দান করতে হয়। নইলে গুণ থেকেও, নেই। আমার পিসিমার গুণী ছেলেমেয়েদের দেখে বারে বারে সেই কথাই মনে হত। বড় ছেলে জিতেনদা রূপেগুণে মানুষের

মন জয় করে নেবার মতো ছিল। মৌলবী রেখে আরবি-ফারসি শিখল। ওমর খৈয়মের মূল রুবাইতের সুন্দর বাংলা অনুবাদ করল। কবি কান্তি ঘোষের মিষ্টি অনুবাদ মূল রুবাইত্ থেকে করা হয়নি, হুবহু ফিট্স্জেরাল্ডের ইংরিজির অতি মধুর বাংলা। কিন্তু ওমর খৈয়ামের রাৎ থেকে তার মেজাজই আলাদা। তবে কানে ঝম্ ঝম করে; চোখে ফুলঝুরি দেখায়; পাঠকদের বেশির ভাগ তাই চায়। কান্তি ঘোষকে সবাই চেনে, হিতেন বসুর নাম-ও শোনেনি। কি করে শুনবে? কোনো প্রকাশকের হাতে বই দিল না জিতেনদা। এত বিদ্যে সত্ত্বেও আর কিছু করেছে বলে জানতে পারলাম না। ছবি আঁকত সুন্দর। কিন্তু ঘরের কোণে বসে, সযত্নে বাইরের লোকের চোখ এড়িয়ে।

নীতিন আর মুকুল বসু সামাজিক জীবন পরিহার করে চলতে পারেনি, কারণ চলচ্চিত্র জগতে যে একবার নিজেকে জড়িয়েছে তার আর সে উপায় থাকে না। পিসিমার বড় মেয়ে মালতী ঘোষালকেও সবাই চেনে। যেমন গলা, তেমনি সাধনা। গোপেশ্বরবাবুর ছাত্রী ছিল। আজ পর্যন্ত গানের সাধনা অক্লান্তভাবে করে চলেছে। বেচুদা যেমন ক্রীড়ার সাধনা করে চলেছে। এসব মানুষ কখনো বুড়ো হয় না। মালতীদি বা বেচুদাও হয়নি। কিন্তু আমি বলছিলাম, অন্য ভাইবোনগুলির কথা। গণেশদা, কার্তিকদার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো হওয়া উচিত ছিল। বাপিকে কজন চেনে? মালতীদির আরো তিনটে গুণী বোন আছে। কে তাদের খবর রাখে? ময়নার গলা অনেকে বলত মালতীদির চেয়েও ভালো; কিন্তু সে সাধনা কোথায়? নমিতা অদ্ভুত ভালো গায়। অরুণা চমৎকার ছবি আঁকত। আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে শিখেওছিল অনেকদিন। কিন্তু কোথায় সেই সাধনা যা দিয়ে মানুষ শিল্পীত্ব পায়? একটা সুরের একটুখানি রেশ একবার কানে গেলেই হল। অমনি শেখা হয়ে গেল; গলায় এসে গেল; কে কবে, কি-রকম, সব জানা হয়ে গেল। কতটুকু প্রতিভা নিয়ে কত লোক বিশ্ববরেণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এদের বিধাতা দু-হাত ভরে দান করেছিলেন, তবু সবাই ওদের নামও জানে না। তবে ওদের সান্নিধ্য আর ভালোবাসা পেয়ে আমার জীবন আনন্দে ভরে গেছিল।

তারই মধ্যে দেখতাম দুটো দল আছে, একটা বুড়োদের একটা ছোটদের। বাবা, ছোট-জ্যাঠা স্পোর্টিং ইউনিয়নের নতুন খেলোয়াড়দের সমালোচনা করতেন এবং ভালো মনে করেই করতেন। তাঁদের মতে এরা নিয়মকানুন মেনে চলে না। গণেশদারা কিছু বলা হল কি না হল, অমনি ফোঁশ করে উঠত। তাদের মতে বুড়োরা সেকেলে; টেক্নিকের কিছু বোঝে না। আমরা পড়ে যেতাম মাঝখানে। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে দুই পক্ষের মধ্যেই কিঞ্চিৎ নাবালকত্ব প্রকাশ পেত। এরা ক্যাচ্ ফেলে দেয়। এই নিয়ে যে এত উষ্ণতা

জমে উঠতে পারে সে নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো খেলাটাকে ততটা গুরুত্ব দিতে পারিনি বলেই একথা বলছি।

সন্ধ্যে সাতটা বাজলেই আমি তিন তলায় নিজের ঘরে পড়তে চলে যেতাম। পাশাপাশি দুটি ঘর একটি দিদির, একটি আমার। মধ্যিখানে একটা দরজা, সেটিকে কখনো বন্ধ দেখিনি। আমার ঘরে একটি সরু খাট, একটি পড়ার টেবিল, একটি বুককেস্। দিদির ঘরটা একটু ছোট, তাতে শুধু একটি খাট। আমার বিয়ের আগে কখনো ড্রেসিং টেবিলের মালিক হইনি। বাড়িতে একটা কাপড় ছাড়ার ঘরও ছিল, মেয়েদের সার্বজনীন আলনা, দেরাজ আর দেরাজের ওপর একটা আয়না ছিল। দুটো কাঠের আলমারি ছিল। তার একটার দরজায় মস্ত আয়না ছিল। প্রসাধনী জিনিস বলতে মাথার জন্য নারকেল তেল, সাবান, ট্যাল্কাম পাউডার। শীতকালে $^1/_৩$ গ্লিসারিন, $^1/_৩$ লেবুর রস, $^1/_৩$ জল মিশিয়ে শিশিতে ভরে রাখা হত। রাতে শোবার সময় হাতে, পায়ে, মুখে মাখা হত। একশোবার বলব আজকালকার কোনো বৈজ্ঞানিক, সুগন্ধী প্রলেপ তার কাছে লাগে না। চামড়া হয়ে যেত স্যাটিন। যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে। একটিমাত্র বিলাসিতার কথা বলতে হয়। এইচ বসু কোম্পানির তৈরি কি যে সব চমৎকার নামওয়ালা সুগন্ধ দ্রব্য তৈরি হয় সে আর কি বলব। নামগুলোও যেমন রোমাঞ্চময়, গন্ধগুলোও তেমনি মৃদু মধুর। একটার নাম 'ওয়াইণ্ড গ্রাস্', শুকনো ঘাসের মধুর গন্ধ ; নাকে এলেই ছোটবেলাটাও হুড়মুড় করে ফিরে আসত। আরেকটার নাম 'মিশরী', ধূপধুনোর গন্ধ। আজকালকার কৃত্রিম ধুনোর গন্ধ নয় ; শিলং-এর সরল গাছের বনের আঠায় ভরা ধূপকাঠের গন্ধ। পিসিমার মেজ ছেলে আসানদা আমাদের কোল ভরে পারফিউম আর হেয়ার লোশন এনে দিত। ভাবি এমন জিনিস আর তো দেখলাম না। অথচ ব্যবসাটাকে পর্যন্ত এরা রক্ষা করতে পারল না।

সে যাইহোক, তারি মধ্যে আমার আই এ পরীক্ষা এসে গেল। সেই পুরনো অঙ্গীকারটা মনে পড়ল ; কিছুতেই ১২তম কি ১৩তম হব না। নম্বর তোলা তিনটি বিষয় ছিল আমার হাতে : লজিক, বটেনি, অঙ্ক। প্রথম দুটো মনে হত বেজায় সহজ। কোনো জিনিস দুবার মন দিয়ে পড়লেই বেশ শেখা হয়ে যেত। বইগুলো একেবারে পাখি-পড়া হয়ে গেল। অঙ্কের সব বইয়ের সব অঙ্ক কষে তৈরি করে ফেললাম। এ বিষয়ে আমার মস্ত একটা অবলম্বন ছিল দাদা। দাদার মতো আশ্চর্য অঙ্কের মাথা আমি আর দেখেছি বলে মনে হয় না। ম্যাট্রিকে পুরো নম্বর, আই এস-সিতে পুরো নম্বর পরে বি এস-সি-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে, হার্শেল সুবর্ণ পদক পেয়ে, জুবিলি স্কলার হয়ে, শেষটা কি হল ? না, কর্তৃপক্ষের কাউকে চটিয়ে এম এস-সি-তে তাঁর পেপার নাকোচ্ হয়ে, থার্ড ক্লাস পেয়ে,

পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। এমন পরাজয় আমি ভাবতে পারি না। আমি হলে পিওর ম্যাথেম্যাটিক্স নিয়ে, প্রথম হয়ে, দেখিয়ে দিতাম! দেখতে দেখতে পরীক্ষা হয়ে গেল। তার কয়েকদিন আগে বুলাদার ছোট বোন বাব্লির সঙ্গে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের বিয়ে হল ; ব্রাহ্মমতে, কিন্তু এ বিয়েও রেজিস্টার হল না। বাবা কোনো উচ্চবাচ্যও করলেন না, গেলেনও না, আমাদের যাওয়াতে কোনো আপত্তিও করলেন না। প্রশান্ত মহলানবিশ তখন কিছুদিনের জন্য আলিপুরের হাওয়া আপিসের অধ্যক্ষের কাজ করছিলেন। চাঁদনি রাত। ফাল্গুন মাস। শোনা গেল বাগানে বিয়ের সভা বসবে, মাথার ওপর চাঁদোয়া থাকবে না, ফুল দিয়ে বেদী সাজানো হবে—বলাবাহুল্য বুলাদা সাজাবে—কিন্তু কোনো আলোর ব্যবস্থা থাকবে না, কারণ কৃত্রিম আলোর এমন বদভ্যাস আমাদের যে প্রকৃতির দেওয়া চাঁদের আলো উপভোগ করতে ভুলে গেছি। মন্তব্যটা যে প্রশান্তদার সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। যাইহোক, বিয়েতে পৌরোহিত্য করবেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বিবাহস্থলে এসেই বললেন, 'আমি লিখিত পদ্ধতি অনুসারে পৌরোহিত্য করব,আলো না হলে আমার চলবে না।"

তখন আলোর ব্যবস্থা করার সময় নেই ; কয়েকটি মটরগাড়ি অকুস্থলে এনে, তাদের হেডলাইটের আলোকে বিয়ে হল। এমন বিয়ে কখনো কোথাও হয়েছে বলে শুনিনি। বিয়ের পর উৎকৃষ্ট জলযোগের সময় রোগা লম্বা একটা অচেনা ছেলে এসে আমাকে আসন্ন ইংরিজি পরীক্ষার দুটো প্রশ্ন বলে দিয়ে গেল। এবং পরে দেখলাম ঠিক তাই না হলেও, সেই বিষয়েই দুটি প্রশ্ন এল! যদি প্রশান্তদা ভেবে থাকেন যে ঐভাবে হিন্দু বিবাহানুষ্ঠানের মতো ব্রাহ্ম বিয়ে থেকেও রেজিস্ট্রির অমর্যাদা তুলে দেবেন, তিনি নিশ্চয় হতাশ হয়েছিলেন। কারণ সেটা হওয়া দূরে থাকুক, উল্টে এখন হিন্দু বিয়েও রেজিস্ট্রি হচ্ছে বলে শুনতে পাই।

পরীক্ষা হয়ে গেল। যথা সময়ে ফলও বেরুল। প্রেসিডেন্সি কলেজের সুনীতকুমার ইন্দ্র প্রথম এবং আমি দ্বিতীয় হয়েছি। আশ্চর্যের বিষয় ম্যাট্রিকে যারা প্রথম দশজনের মধ্যে হয়েছিল, তাদের প্রায় কারো নামই দেখতে পেলাম না। এই প্রসঙ্গে আমার অনেক সময় মনে হয়, একটা পরীক্ষায় কে দৈবাৎ প্রথম, কে বা দ্বিতীয় কি তৃতীয় কি নবম বা দশম হল, তাই দিয়ে তাদের যোগ্যতা বিচার করার নিয়মে অনেক খুঁৎ আছে। সাধারণত দেখা যায় দুজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১, কি ২ বা ৩ নম্বরের তফাৎ হয়, তাও সামগ্রিক সংখ্যায়। পরীক্ষকও একজন নন। একজনের কাছে যে ছাত্র ১০ পেল, আরেকজনের কাছে সে-ই হয়তো ৭ পেত, বা ১৫ পেত। তাহলে আর যোগ্যতা বিচার থাকে কোথায়? এ বিষয়ে একটা গল্প না বলে পারছি না।

আমার ছোট-জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন ম্যাট্রিকের বাংলার পরীক্ষক ছিলেন, সেকথা আগেও বলেছি। এ-ও তাঁর কাছেই শোনা। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন উপাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একরকম তাঁর সৃষ্টি বলা যেত, কাজেই প্রবেশিকা পরীক্ষার ওপরেও যে তাঁর সযত্ন দৃষ্টি থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি ? ওপরে আমি যে মন্তব্যগুলি করেছি, তিনিও সেই ধরনের যুক্তি প্রয়োগ করে, পরীক্ষকদের সবাইকে ডেকে একটা প্রশ্নপত্রের উত্তরে তাঁদের বিচারমতো নম্বর দিতে বললেন। নম্বর অবশ্য উত্তরের গায়ে লেখা হবে না। শেষে দেখা গেল ঐ পেপারে কেউ দিয়েছেন একশোতে ৭০, কেউ বা দিয়েছেন ৪০ ! তাহলে ন্যায্য বিচার কোথায় হল ? অবিশ্যি একথাও সত্যি যে ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত ভালো নম্বরই পেয়ে থাকে ; অপ্রত্যাশিত রকম বেশি বা সামান্য কম হতে পারে, কিন্তু খুব তফাৎ কদাচিৎ হয়। এক যদি না পরীক্ষার্থী কোনো গোলমাল করে ফেলে থাকে। সেকালে যে বছর ২০ হাজার পরীক্ষার্থী বসত, সবাই বলত, বাবা ! এত ছেলের মধ্যে সুবিচার হওয়া শক্ত ! তাও সে সময় সমস্ত পশ্চিম বাংলা এবং এখন যাকে বাংলাদেশ বলা হয় সে জায়গা, এই বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে পরীক্ষার্থী আসত। জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও কত বিস্তার ঘটেছে বলতে হবে। কাজেই গুণ বিচারের কাজও আরো কত জটিল হয়ে উঠেছে, সে কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই সব কারণে পরীক্ষার ফলকে আমি খুব বেশি প্রাধান্য দিই না। আরেকটা কথাও আছে। কতবার দেখেছি পরীক্ষায় যারা উচ্চ সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল, পরে কর্মক্ষেত্রে তারা ততখানি দক্ষতা দেখাতে পারল না। আবার কত কর্মী সাধারণভাবে পরীক্ষায় পাস্ করে, কর্মজীবনে আশ্চর্য গুণ দেখিয়েছেন। আসলে কতকগুলো অন্য লোকের চিন্তায়-ভরা বই গিলে, কাগজে সেগুলি উদ্গীরণ করা ছাড়া আরো কিছু সামর্থ্যের দরকার থাকে। অনেকে তো স্রেফ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জোরেই অনেকদূর এগিয়ে যায়।

আই এ পড়বার সময় আমার তিনটি গুণী বন্ধু লাভ হয়েছিল। এদের সঙ্গে কলেজে চার বছর পড়েছিলাম। আই এ পরীক্ষায় এদের মধ্যেও দুজন বৃত্তি পেয়ে, ইংরিজিতে অনার্স নিয়ে আমার সঙ্গে পড়তে লাগল। ওদের তিনজনের মধ্যে ভারি ভাব ছিল। দুঃখের বিষয় কেউ বেশিদিন বাঁচেনি। একজনের নাম সুধা ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়ের কি রকম ভাগ্নী ; একজন নীতা মুখার্জি, ডঃ পি কে রায়ের নাতনি, দেশকর্মী রেণুকা রায়ের ছোট বোন ; একজনের নাম লিলি সেন, আশ্চর্য রকম গুণী মেয়ে ছিল সে। এখন ভেবে দুঃখ হয় এদের অসুখী জীবন এবং অকাল মৃত্যুতে কত গুণ বৃথা নষ্ট হয়ে গেল। যাইহোক, তখন আমাদের ফুর্তি দেখে কে ! ছাত্রজীবন যে কত মধুর হতে পারে, ভেবে ভালো লাগে।

এখন মনে হয় কলেজের ঐ প্রথম দুটি বছর বড় ভালো ছিল। বড় হওয়ার বছর। আপনা থেকে সাবালিকা হবার বয়স। ১৮-তে আই এ পাস্ করলাম। তার আগে কলকাতার অতুলনীয় সাংস্কৃতিক জীবনের একটা দিকের আস্বাদ পেলাম। দেখলাম সাহিত্য উপভোগের একটা সামাজিক দিকও আছে। শুধু বই পড়ে যে-আনন্দ পাওয়া যায়, সেটাই সব নয়। পাঁচজন সাহিত্যিক আর সাহিত্যানুরাগীর সঙ্গে মিশে আরেক রকম রস পাওয়া যায়। তাতে এক দিকে যেমন আমার সাবালকত্ব পাওয়ার ভারি সুবিধে হয়েছিল, অন্যদিকে নিজের চিন্তাগুলোকে একটু যাচাই করার অভ্যাসও অল্পে অল্পে রপ্ত হয়েছিল। অন্তত শুরু হয়েছিল। দুটি মানুষের সংস্পর্শে এসে এটি সম্ভব হয়েছিল। তাঁরা হলেন ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী আর তাঁর স্বামী প্রমথনাথ চৌধুরী। এঁদের নতুন করে পরিচয় দেবার দরকার না থাকলেও, আমার জীবনে যখন তাঁরা নবাগত হয়ে প্রবেশ করলেন, মনের মধ্যে নতুন একটা সাড়া জেগেছিল। একটা সচেতনতা, নিজেকে প্রকাশ করার একটা ইচ্ছা, একটা পরিচ্ছন্নতার প্রয়াস। এমন মানুষ আমি আগে দেখিনি। কোথাও এতটুকু ছেলেমানুষি ছিল না তাঁদের। সারা জীবন যে স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত নির্মল রসের মধ্যে ডুবে থেকেছি, এ তার থেকে আলাদা। এর জন্য মনে হত অনেকদিন ধরে নিজেদের তৈরি করতে হয়েছিল, জন্মগত ক্ষমতাগুলোকে কঠোর শাসনে রাখতে হয়েছিল ; ভারি একটা সুশ্রী শালীনতার গণ্ডির মধ্যে নিজেদের বেঁধে রাখতে হয়েছিল। ফলে যা লাভ হয়েছিল, তাতে বৈদগ্ধ্য ছিল, সুরুচি ছিল, আত্মসচেতন শিল্পবোধ ছিল, তীক্ষ্ণ মেধা ছিল ; সঙ্গে সঙ্গে একরকম আড়ষ্টতাও ছিল, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে ফেলার একটা ভীতি ছিল। শেষ পর্যন্ত দুজনার মধ্যে কেউ একবারের জন্যেও মনের ঘোড়ার বল্গা ছেড়ে দেননি। ঝরঝরে সুন্দর গান, গল্প, সুর, স্বরলিপি তৈরি হয়েছিল। ভারি যত্নে লালিত, অত্যন্ত পরিপাটি পরিচ্ছন্ন সৃষ্টি সব ; কিন্তু বড় বেশি প্রশিক্ষণ পাওয়া, সভ্যভব্য। তার মধ্যে অসামাজিক কিছুর প্রবেশ করা অসম্ভব ছিল, এক যদি না কথাগুলো চতুর সরস বাক্যবিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে নীললোহিতের কিম্বা চার ইয়ারের বাক্যবাণের সঙ্গে সঙ্গে তার একটুখানি ঝল্‌কানি ঢুকে পড়ত। এসব হল গিয়ে আমার অনেক বছরের চেনা-জানার পরের কথা, এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা হলেও, নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। তবে একেবারে অবান্তর নয়। শিল্পসৃষ্টি করতে হলে এই সচেতনতা আর সযত্ন প্রয়াসেরও দরকার আছে। শুধু খচ্‌খচ্ করে যা মনে এল তাই লিখে গেলেই যথেষ্ট হল না। মনকেও সাবালক হতে হয়। নাবালকদের জন্য যারা গল্প লেখে, তাদের মনকেও। কাঁচা মন দিয়ে খুব বেশি কাজ হয় না। ঐ দুটি মানুষের কাছাকাছি এসে এই শিক্ষা আমার হয়েছিল। তবে দড়ি-দড়া বেঁধে দিলে আমি

এক লাইন্‌-ও লিখতে পারি না। ওঁদের যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন আমার ১৭ বছর বয়স। স্কুলের দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর কারণে। তারা ছিল দুই বোন, অলকা চৌধুরী ও পূর্ণিমা চৌধুরী, আমার আজীবনের বন্ধু। পরে অলকার মামার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়াতে সম্বন্ধটা আরো গভীর হয়েছিল, সে সময়ে ওরা ছিল নিতান্ত স্কুলের বন্ধু, যাকে বলে বেস্ট ফ্রেণ্ড্‌। একটা সুবিধা হয়ে গেল যে কথাচ্ছলে বেরিয়ে পড়ল অলকার মা বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে। শুনে মা ভারি খুশি, অলকার মা তাঁর কলেজের সহপাঠিনী, দুই বাড়িতে যাওয়া-আসাও ছিল। কাজেই অলকাদের বাড়িতে দিদির আমার অবাধ যাওয়া-আসার অনুমতি হল। সেকালের সামাজিক জীবনের এই সতর্কতার দিকটার হয়তো দরকার ছিল, কারণ মেয়েদের স্বাধীনতার তখনো তেমন প্রচলন হয়নি। স্কুলের বন্ধুদের মা-বাবাদের কাউকে আমাদের মা-বাবা বা মাসি-পিসি না চিনলে, তাদের বাড়িতে যাওয়ার অসুবিধা ছিল। পূর্ণিমা অলকার খুড়তুতো বোন।

অলকার বাবা বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও বাঘ-শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরীর বড় ভাই এবং যে কথা অনেকেই জানে না, নিজেও কম গুণী লেখক ছিলেন না। সম্প্রতি নাথ পাবলিশিং হাউস তাঁর ইংরিজিতে লেখা 'স্পোর্ট ইন ঝিল অ্যাণ্ড জাংগ্‌ল্‌'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আমার বন্ধু অলকাই তার বাবার বইয়ের অনুবাদ করে দিয়েছে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরাদেবীও মে-ফেয়ারের অলকাদের চমৎকার করে সাজানো যদিও বড্ড বেশি মরা জন্তুর দেহাংশ দিয়ে ভরা, বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়িতে, কিছুদিন ছিলেন। সেইখানে আমার সঙ্গে পরিচয়। অবিশ্যি সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে সে সময়ে কে না জানত ? আমরা তাঁর বেজায় ভক্ত ছিলাম। তাঁর গল্পে ভারি একটা সভ্য-ভব্য রোমাঞ্চ ছিল আর তাঁর ঝরঝরে মধুর 'বাঙ্গালী' বাংলার প্রবল আকর্ষণ কে অস্বীকার করতে পারত ? ভাবতাম আমিও ঐ রকম বাংলা লিখতে চাই। লিখিনি অবিশ্যি। এখন মনে হয় চমৎকার ভাষা বটে, তবু এত বেশি আত্মসচেতন যে একটুখানি কৃত্রিমতার ভাব এসে গেছে। কেউ ওভাবে চিন্তাও করে না, কথাও কয় না।

তবু বলব এমন মানুষের জুড়ি দেখিনি ; এত গুণী, এমন গুণগ্রাহী। অন্য লোকের মধ্যে এতটুকু গুণ দেখলে আহ্লাদে আটখানা হয়ে, তাকে পাঁচজনের কাছে পরিচিত করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের আয়োজিত পূর্ণিমা সম্মেলনের কথা পরে বলব। মুশকিল হল ওঁদের অন্য একটা দিক নিয়ে ; বিশেষ করে ইন্দিরাদেবীর। সঙ্গীত ছিল ওঁদের প্রাণ, ওঁদের বুকের নিশ্বাস, শিরার রক্ত। ইন্দিরাদেবীর সঙ্গীতে পারদর্শিতার কথা অনেকেই জানে ; রবীন্দ্রসঙ্গীতের তিনি

একজন কর্ণধার এবং শ্রেষ্ঠ কর্ণধার। তাঁর 'রবিকা' একরকম তাঁকে হাতে করে তৈরি করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যতখানি বুঝতেন, তেমন আর কেউ বুঝত বলে মনে হয় না। ভারতের প্রথম সিবিলিয়ান রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের একমাত্র মেয়ে, সুরেন ঠাকুরের ছোট বোন ; অল্প বয়সে বিলেত ঘুরে এসেছেন ; লোরেটো স্কুলে কলেজে পড়েছেন, ইংরিজি বাংলা ফরাসী, তিন ভাষায় পণ্ডিত। এসবই মেনে নিতে পেরেছিলাম। বিপদ হল যখন তখন অর্গ্যানের সামনে বসে, আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা একটা সুর ধরে বলতেন, "গাও দিকিনি !" আমাদের তো চক্ষুস্থির ! অথচ অলকা, পূর্ণিমা তাঁর প্রভাবে মানুষ. সঙ্গে সঙ্গে তারা গান ধরত ! শ্রদ্ধা ভক্তিতে মন ভরে যেত।

এই প্রসঙ্গে কুমুদনাথের কাছে শোনা একটা গল্প না বলে পারছি না। প্রমথনাথ তাঁর চাইতে মাত্র ১ বছরের ছোট ; ইন্দিরাদেবী আরো ৩-৪ বছরের ছোট হবেন ; তবে ঠিক কত বছর তা বলতে পারছি না। তাঁদের বিয়ের বেশ কয়েক বছর পরে, যখন সকলে কুমুদনাথের বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছিল, তখন তিনি নিজের চেয়ে প্রায় ২০ বছরের ছোট আমার পরমাসুন্দরী জ্যাঠতুতো ননদ রাধারানীকে বিয়ে করেন। মোট কথা প্রমথ চৌধুরীর বিয়ের পরেও অনেকদিন কুমুদনাথ ব্যাচেলার। একবার কোথাও পাশাপাশি দুই ঘরে দুজনের বাস। রাতে শোয়া অবধি কুমুদনাথ মধ্যিখানের দরজা ভেদ করে শুনতে পাচ্ছিলেন ভাই ভাদ্দর-বৌয়ের মধ্যে আলাপ চলছে। একটু পরে মনে হল প্রেমালাপের পক্ষে গলাদুটি যেন বড্ড চড়া এবং উষ্ম। আর থাকতে না পেরে, দরজায় কান দিয়ে শুনলেন প্রেমালাপ নয়, বাখ্ আর বেঠোফেনের তুলনামূলক সমালোচনা হচ্ছে ; দুই বক্তাই বেশ গরম।

তারপর হয়তো কুমুদনাথ ঘুমিয়ে পড়ে থাকবেন। ভোরে ঘুম ভাঙতেই অবাক হয়ে শুনলেন তখনো পাশের ঘরে আলাপ চলছে। আবার দরজায় কান লাগিয়ে শুনলেন তখনো বাখ্ আর বেঠোফেনের তুলনামূলক সমালোচনা চলেছে ও বক্তারা যেন আগের চেয়েও গরম। তবে মধ্যিখানে ঘুমের বিরতি নেওয়া হয়েছিল কি না বোঝা গেল না।

॥ ২৮ ॥

১৯২৬ – ২৭ সাল ; দেশ স্বাধীন হতে তখনো ২০ বছর বাকি। এখনকার ছেলেমেয়েরা পরাধীনতার গ্লানি কাকে বলে তাও জানে না, আবার স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরব কাকে বলে তাও জানে না। 'ফরেন' সাবান, এসেন্স, পেন্টেলুনের কাপড় কিনে দেমাক করে বেড়ায়। আমার যখন ১৭-১৮ বছর বয়স, তখন বাঙালী ছেলেমেয়েদের কারো যদি বিদেশী কিছু থাকত তো হয়

সেগুলো ফেলে দিত, জ্বালিয়ে দিত, নয়তো লুকিয়ে রাখত। মোট কথা গায়ে দিত না। এসব কথা আগেও বলেছি। খদ্দর সকলে না পরলেও, দেশের মিলের মোটা কাপড় পরত। বিদেশী সুতো ব্যবহার করা হয় বলে তাঁতের কাপড়ও অনেকে পরত না। এতদিন পর্যন্ত বাইরে থেকে এইটুকুই দেখা যেত। ভিতরে ভিতরে যে আগুন জ্বলত বাইরে থেকে তার সামান্যই বোঝা যেত। আবার উল্টো দলও ছিল। তারা বলত এত বড় দেশ শাসন করবার ক্ষমতা আমাদের নেই, এখন স্বাধীনতা পেলেও আমরা রাখতে পারব না ; শুধু খদ্দর পরে গরম গরম বক্তৃতা করে আর পুলিসের লাঠি খেয়ে দেশ শাসন করবার ক্ষমতা গজায় না। আমার একজন নিকট আত্মীয়াকে এতদূর বলতে শুনেছিলাম যে ব্রিটিশরা এ-দেশ ছেড়ে চলে গেলে, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব। আমাদের বয়সী অনেকেই এমন কথা শুনলে চটে যেত। কিন্তু আজ ৫০ বছর পরে, ত্রিশ বছর স্বাধীনতা উপভোগ করে, মাঝে মাঝেই মনে হয় আজ পর্যন্ত কি আমাদের সে বুদ্ধি গজিয়েছে ? আর শুধু আমরাই না, গোটা পৃথিবীসুদ্ধ সব দেশ দিনে দিনে ক্রমে নাবালকত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে না তো ? সে যাইহোক, তখনো চোখে আদর্শবাদের ঘোর লেগে ছিল, ভাবতাম একবার দেশটা স্বাধীন হলেই সকলের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। এসব বিষয়ে আমাদের সেই ভাইপো অশোক, যাকে মা-বাবা মানুষ করেছিলেন, সে আমাদের মস্ত সহায় ছিল। খদ্দরের জামায় ফুল তোলা হবে, তাকে দিয়ে রঙ মিলিয়ে সুতো কিনতে বলা হলে, সে বলে বসল, "ঐ সব এম্‌ব্রয়ডারি সুতো বিদেশ থেকে আসে, ও আমি কিনতে পারব না।" কি মুশ্‌কিল ! তাকে যত বলা হয় এগুলো ইংল্যান্ডের জিনিস নয়, এসব ফ্রান্স থেকে আসে, অশোক ততই বলে, "ঐ একই হল। সব সায়েবই একরকম।" এই বলে ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের দিশী সুতো কোত্থেকে এনে দিল। তা সে ছুঁচে পরিয়ে ফোঁড় তুলতে গেলে সুতো ফেঁসে যায় ! অশোক কিছুতেই বিদেশী সুতো আনবে না, তাতে নাকি খদ্দরের অপমান হয়। সেই সময় মুগার আর গরদের এম্‌ব্রয়ডারি সুতো ওঠাতে সমস্যা ভঞ্জন হল।

তবে মজার ব্যাপারও হত। ভারি গুণী এক বাঙালী মেয়ে, আই সি এসের কন্যা, বিলেত থেকে পাস্‌-টাস্‌ করে দেশে ফিরে খদ্দর পরা ধরল, কংগ্রেসের সভায় বক্তৃতা দিতে শুরু করল। একজন আই সি এস্‌ পাত্রের সঙ্গে তার বিয়েও স্থির হল। অশোক আই সি এসদের যেমন ঘৃণা করত—বলত সায়েবদের শেয়াল—খদ্দরধারীদের তেমনি ভক্তি করত। এবার সে দোটানায় পড়ে গেল। তার ওপর কে যেন বলে গেল ঐ বিয়েতে দিশীমতে অনুষ্ঠান ছাড়াও একদিন আগে কি পরে ফ্যাশানেব্‌ল্‌ বন্ধুদের জন্য—তাদের মধ্যে প্রচুর সায়েব থাকবে—কক্‌টেল পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে। বলাবাহুল্য তাতে বিলিতী পানীয়

পরিবেশন করা হবে। অবিশ্যি ইচ্ছা থাকলেও দিশী কড়া পানীয় দিতে পারত না, কারণ তাড়ি আর ধেনো ইত্যাদি ছাড়া দিশী মদ পাওয়াও যেত না। অশোক তখন এই রকম খদ্দরধারী কক্‌টেল-আমোদীদের প্রতি তিক্ত শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করতে লাগল। আমিও যে একটু হকচকিয়ে যাইনি তা নয়। পরে এরকম বহু তথা-কথিত দেশকর্মীদের মধ্যে এই অ-সংগতি লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু সত্যের খাতিরে এ কথা বলতে বাধ্য হলাম যে ঐ দুটি মানুষ, ঐ মহিলা ও তার আই সি এস স্বামী সারা জীবন অক্লান্তভাবে ব্যক্তিগত বিলাসিতা ত্যাগ করে দেশের জন্য কাজ করে করে বুড়ো হয়ে গেছেন। দেশ-সেবা আসলে কক্‌টেল পার্টির চাইতে অনেক বড় জিনিস।

ততদিনে বি এ ক্লাস্ শুরু হয়ে গেছে। ইংরিজিতে অনার্স নিয়েছি—নইলে বাংলা লিখব কি করে ? আর অঙ্ক ইকনমিক্স নিয়েছি। ফাঁকি দিয়ে নম্বর তুলব ভেবেছিলাম। কিন্তু আবার সেই ফাঁদে পড়ে গেলাম। অঙ্ক দেখলে আর না কষে থাকতে পারতাম না। ছ'টা বইয়ের সব অঙ্ক কষেছিলাম। অবিশ্যি তার জন্য প্রায়ই দাদার দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। এই একটা রহস্যের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারলাম না। সত্যি বলছি অঙ্ক কষতে আমার ভালো লাগত না, অথচ না কষেও থাকতে পারতাম না। যখন কাল্পনিক সংখ্যার পর্যায়ে উঠলাম, অ্যাস্ট্রনমি পড়তে গিয়ে অসীমের মোকাবিলা করতে হল, তখন কেবলি মনে হত এইবার সৃষ্টির রহস্য বুঝি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা দেবে, কিন্তু কেবলি সে আমার উৎসুক মুঠি এড়িয়ে যেত। দিদিকে ব্যাপারটা বলবার চেষ্টা করতেই, সে অবাক হয়ে বলল, "দূর ! তা কেন !" রইল ঐ পর্যন্ত। ভালো নম্বর পেয়ে বি এ পাস্ করবার পর আর একবারো অ্যাস্ট্রনমির বই খুলিনি।

ইকনমিক্স ছিল অন্য ব্যাপার। আধবুড়ি মেম মিস্ রাইট আমাদের পলিটিকেল ফিলসফি পড়াতেন, তখনো এটি একটা আলাদা বিষয় হয়নি। বেজায় ভালো লাগত। আর জেনারেল ইক্‌নমিক্স আর ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স পড়াতেন জ্যোতিশচন্দ্র ঘটক। তিনি ছিলেন সুলেখক সতীশচন্দ্র ঘটকের ছোট ভাই। কালো, মোটা, হেঁড়ে গলা, বদ-রসিক। ডবল এম্-এ, ভারি বিদ্বান, কিন্তু বদ্-রসিক। মাঝে মাঝে ওঁর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সংস্কৃত ছাত্রীরা মূল সংস্কৃত শ্লোকের ওঁর অ-প্রচ্ছন্ন ব্যাখ্যানা শুনে মুখটুখ লাল করে বলত, "জলের মতো করে বুঝিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ভাই লোকটা ভারি অসভ্য !"

তবে ইকনমিক্স ক্লাসে সে-সবের সুযোগ ছিল না। প্রথম দিনই ইকনমিক্সের বিষয়-বস্তুর ব্যাখ্যা করে বললেন যে অ্যাডাম স্মিথের মতে ইকনমিক্স হল প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে রত মানুষের অনুশীলন। আর ঐ প্রাত্যহিক কাজকর্মটি হল নাকি বেচা-কেনা। সস্তায় কিনে, বেশি দামে বেচা। শুনে আমি আর আমার

সহপাঠী বন্ধু লিলি সেন রেগে টং ! দুজনেই ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী, এসব কথা মানব কেন ? তৃতীয় ছাত্রী হলেন মিস্ ল্যাজারাস্ বলে একজন দক্ষিণ ভারতীয় মহিলা । আমাদের চাইতে অনেক বড় । অনেক বছর স্কুলে পড়িয়ে টাকা জমিয়ে, চাকরির উন্নতিকল্পে বি এ পড়তে এসেছেন । কারো সঙ্গে মিশতেন না । তবে আমি চেষ্টা-চরিত্তির করে ভাব করে ফেললাম । ওঁকে 'লেজু' বলে ডাকতাম । লিলি বলেছিল রেগে যাবেন, কিন্তু 'লেজু' দেখলাম খুশি হলেন । চমৎকার মানুষ । পাস্ করে আর যোগাযোগ রাখিনি বলে দুঃখ হয় ।

সে যাইহোক । সপ্তাহে পাঁচদিন কলেজ বসত, শনি, রবি বন্ধ থাকত । ঐ পাঁচদিনের মধ্যে তিনদিন ইকনমিক্স লেকচার থাকত, একদিন অধীত বিষয় নিয়ে লিখতে হত । প্রশ্ন আগেই বলা থাকত, তৈরি করে এসে, ক্লাসে বসে লিখতে হত । তাতে A, B, C, D নম্বর দেওয়া হত । লেজু প্রশ্ন নিয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে খেটেখুটে উত্তর তৈরি করে, সেটি শিখে নিতেন । লিলি আর আমি পাঠ্য-পুস্তকে যেটুকু বস্তু পেতাম সেটি শিখে সাজিয়ে-গুছিয়ে, তার থেকে ডালপালা বের করে, ফলাও করে লিখতাম । মিঃ ঘটক আমাদের সর্বদা A দিতেন আর লেজুকে B দিতেন । লেজু বড় দুঃখ পেতেন । তাছাড়া ন্যায়-অন্যায় বলেও তো একটা কথা আছে । শেষটা আর থাকতে না পেরে, ক্লাসের মধ্যেই প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হলেন । উঠে, মুখ লাল করে, নরম গলায় বললেন, "আপনি সর্বদা আমাকে B দেন আর ওদের A দেন, অথচ আমি কত খেটে বিষয়টা তৈরি করি । আর ওরা ? দে নো নাথিং ।"

মিঃ ঘটক এক গাল হেসে বললেন, "ইয়েস্, বাট্ দে রাইট দ্যাট্ নাথিং ইন্ সাচ্ বিউটিফুল ল্যাঙ্গোয়েজ্ !!" শুনে আমরা হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না আর লেজু একেবারে থ' ! বলবার মতো কিচ্ছু ভেবে পেলেন না ! অবিশ্যি ফাইনাল পরীক্ষায় নিশ্চয় আমাদের চাইতে অনেক বেশি নম্বর পেয়ে এইসব ক্ষোভের ক্ষতিপূরণ পেয়েছিলেন ।

পুজোর পর কলেজের বার্ষিক উৎসব হত । বক্তৃতা, ভোজ, নাটক । আমরা তেল দিয়ে কাঠ-কয়লা দিয়ে গোঁপটোপ এঁকে কেউ কেউ পুরুষ সাজতাম । চমৎকার দেখাত । মালকোঁচা দিয়ে বেনারসি শাড়ি পরতাম, মাথায় কার্ডবোর্ডের ওপর সোনালী কাগজ সেঁটে শিরস্ত্রাণ বানাতাম, কাঠের তলোয়ার হাতে নিয়ে, সে এক ভয়াবহ কাণ্ড করে তুলতাম । তবে সেই তেল-কাঠকয়লার গোঁফের দাগ তুলতে এক মাস লাগত, সে তো আগেও বলেছি। নাটক হত সর্বদা দ্বিজেন্দ্রলালের । সেই সময় লক্ষ্য করেছিলাম একমাত্র "সীতা"-র সংলাপ আগাগোড়া কাব্যে । সে সময় ডায়োসেসান কলেজের সব মেয়েদের নখাগ্রে থাকতেন দ্বিজেন্দ্রলাল । সে-ও তো কম লাভ নয় ।

সে বছরও "সাজাহান" মঞ্চস্থ করা হবে বলে মহড়া আরম্ভ হয়েছিল, এমন সময় দিদির, আমার, দুজনারই পা ফুলতে শুরু করল। তখন কলকাতায় সংক্রামকভাবে বেরি-বেরি হচ্ছিল। আসলে বেরি-বেরি নয়, ও-রোগকে বলে এপিডেমিক ড্রপ্‌সি। সেই হল। বহুলোক মরেও গেল। এমনি কোনো লক্ষণ নেই, শুধু অল্প অল্প পা-ফোলা, তারপর যখন-তখন হৃৎ-পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ঝপাঝপ কত লোক যে মরল তার ঠিক নেই। ডাক্তাররা হকচকিয়ে গেলেন। এ ধরনের মহামারির কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁদের। কেউ বলল সরষের তেল খেলে হয়, কেউ বলল চাল খেলে হয়। প্রথমে এককে বাড়ির সকলের, তারপর গোটা-গোটা পাড়ার। আমাদের বাড়িতেও ডাক্তার এলেন, চিত্তরঞ্জন দাশের আত্মীয় খগেন ঘোষ। পরীক্ষা করে বললেন, সেজভাই অমিয়র আর অশোকের ছাড়া সকলের বেরি-বেরি। এক্ষুনি কলকাতার বাইরে চলে যেতে হবে, দীর্ঘকালের জন্য। সরষের তেল বন্ধ, ভাত বন্ধ। যে-ই এই নিয়ম মেনে চলছে, সে-ই নাকি ৭ দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় না একজন লোকের কাছ থেকে আরেকজনের রোগ সংক্রমণ হয়। এ নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া থাকার ব্যাপার।

তাই স্থির হল। আমি থাকব বাবার আপিসের আমাদের সেই প্রফুল্লকাকাবাবুর কাছে, অশোক থাকবে সুন্দর জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। বাড়ির ওপর তলায় তালাচাবি দেওয়া হবে। এক তলায় দুজন চাকর থাকবে। রাঁধবার লোকেরও পা ফুলছে, সে আমাদের সঙ্গে চেঞ্জে যাবে। কিন্তু যাওয়া হবে কোথায়? ঠিক হল যাব গিরিডিতে। সেখানকার হাওয়া গায়ে লাগলেই রোগ পালায়, কুঁয়োর জল খেলেই বেজায় খিদে হয়, এক টাকায় দশটা মুরগি পাওয়া যায়। সেখানে গেলে মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। এই ধরনের সব কথা গগনদাদামশাই বাবাকে বলেছিলেন। তাঁর বাড়ি আছে গিরিডিতে, সে-বাড়ি যেন বাবা নিজের বাড়ি মনে করেন। এই বলে একগোছা চাবি বাবার হাতে তুলে দিলেন।

বাবা অবাক হয়ে বলেছিলেন, "মামা, অনেকে কিন্তু এ রোগকে ভয় পায়, বলে ছোঁয়াচে!" গগনদাদামশাই কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, "তাই না আরো কিছু! সরষের তেল খেলে হয়। তোরা ওখানে থাকগে, শীত পড়লে গিন্নি আর আমিও যাব। একটা ঘর বন্ধ থাকে, তোদের অসুবিধা হবে না তো?" এই রকম মানুষ ছিলেন অমল হোমের বাবা গগনচন্দ্র হোম এবং তাঁর স্ত্রী। তাঁদের হৃদয় এবং বাড়ির দরজা অনাত্মীয়ের জন্য খোলা থাকত। অবিশ্যি গগনদাদামশাই নিজেকে এক মুহূর্তের জন্যেও অনাত্মীয় ভাবতেন না। এর আগেও বলেছি মৃত্যুকালে বাবাকে আর ছোট-জ্যাঠামশাইকে তাঁর জন্য হবিষ্যি

করতে বলে গেছিলেন এবং বাবারা তাই করেছিলেন।

বারগাণ্ডায় তাঁদের বাড়িটি চোখের সামনে ভাসে। সামনে বারান্দা, পেছনে বাঁধানো উঠোন, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ছিঁচকে চোরের ভয়ে। বড় গরীব ছিল ওখানকার লোক। আতাগাছ, পেয়ারাগাছ। খরখরে শুকনো, কিন্তু কেমন একটা হাসিখুশি ভাব। ঘিয়ে আর তিলের তেলে রান্না হত, তাতে কোনো অসুবিধা হত না। অসুবিধা হত ভাতের বদলে আটার রুটি খেতে হত বলে। বেজায় খারাপ লাগত। অন্য জিনিস যা হয় তাতেই আমি খুশি থাকতাম, কিন্তু দুপুরে একটু ঝোল-ভাত না হলেই নয়। নিরামিষ ঝোলেও আপত্তি নেই, তার সঙ্গে চারটি আতপ চালের ভাত চাই। আর সেই জিনিসটিই বন্ধ! তবে মিষ্টিওয়ালা আসত ক্ষীরের পুর দেওয়া রসগোল্লা আর বড় বড় প্যাঁড়া নিয়ে। কিন্তু ভাতের দুঃখ না যাওয়া পর্যন্ত, কোনো সুখকেই সুখ মনে হত না। সুখের বিষয় ১০ দিন বাদে ঢেঁকি-ছাঁটা চালের ভাত খাবার অনুমতি পাওয়া গেল। লাল লাল, একটু মোটা, একটু কর্কশ ঢেঁকি-ছাঁটা চালের ভাত। স্বাদের আর পুষ্টির দিক দিয়ে তার তুলনা হয় না। খেতাম হয়তো ১ ছটাক, কিন্তু তাতেই সারা দিনের মেজাজ গেল বদলে।

সেকালে সাঁওতাল পরগনার এইসব জায়গার কত আদর ছিল। কি সুন্দর জায়গা; চারদিকে শালবন, ছোট ছোট টিলা, উশ্রী নদী, ফলের বাগান, ঠাণ্ডা শুকনো হাওয়া। তবে গরমের সময় নাকি বেজায় গরম। দূরে দূরে অভ্রের খনি, কয়লার খনি। মোটর রাস্তা ছিল, বন্ধুবান্ধবের যাওয়া-আসা ছিল। বারগাণ্ডাকে একটা ব্রাহ্ম পাড়া বলা যেত। ও-বাড়ির সামনে বুলাদার জ্যাঠামশাই সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের বাড়ি, তার এদিকে প্রখ্যাত শিশু-সাহিত্যিক যোগীন সরকারের বাড়ি, তার আকার আবার গোল, নামও গোল-কুঠি কি ঐ ধরনের কিছু। ছুটিতে বারগাণ্ডা গমগম করত। আমরা যখন গেছিলাম তখন বেশি লোক ছিল না।

তবে অনতিদূরে মাকাটপুরে আমার সোনাপিসিমাদের বাড়ি 'রোজ-ভিলা'। তার একটা বড় বৈশিষ্ট্য যে একটিও গোলাপ-গাছ ছিল না। গোলাপ-গাছ না থাকলেও পিসিমা ছিলেন, ছোট ছেলে-মেয়েরা কয়েকজন ছিল আর ছিল মুকুলদা এবং তার মটর সাইকেল। মুকুলদার কথা আগেও বলেছি, আজ পর্যন্ত সবাই মুকুল বসুকে চেনে, ৭৭বছর বয়সেও সে সিনেমার ছবি-তোলার কাজে অক্লান্তভাবে খেটে যাচ্ছে। ছবি তোলার রাজা সে। মজারও বটে। এক ঘর রুগ্ন ভাইবোনকে নিয়ে জাঁকিয়ে বসত।

ওদের বাড়িতে একটা মস্ত কামরাঙা গাছ ছিল, তাতে ফল পেকে মিষ্টি রসে টৈটম্বুর হয়েছিল। অথচ পিসিমা বলতেন কামরাঙা খেলে জ্বর হয়। ওদের ও-জিনিস খাওয়া বারণ ছিল। কিন্তু আমাদের তো আর বারণ ছিল না, রাশি

রাশি কামরাঙা বাড়ি নিয়ে আসা হত। তার ওপর মুকুলদা বলল, "আশা করি তোরা তোদের পাড়ার মুকুন্দ ডাক্তারকে ডাকছিস্ না ?" "কেন, ডাকব না কেন ?" "মানে, বিশেষ কিছু না, উনি একটু পাগল হয়ে গেছেন কি না। সেদিন দূর থেকে ওঁর স্ত্রী দেখেন তাঁর কোলের ছেলেটার মুণ্ডু ধরে বাপ তাকে এক কলসি সরষের তেলে নামাচ্ছেন ! ও কি করছ ! ও কি করছ ! বলে ছুটে যেতেই, মুকুন্দ ডাক্তার স্ত্রীকে এক হাতে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'থাক্ ! আচার হক !' ওঁকে না ডাকাই ভালো। তাছাড়া দ্বিজেনবাবুর স্ত্রীকে হঠাৎ কামড়েও দিয়েছেন !" ওর গল্পের কতখানি বিশ্বাসযোগ্য ভেবে পেতাম না। কিন্তু মানুষকে সুখী করার ক্ষমতা ওর ছিল। স্রেফ স্নেহ দিয়ে আমাদের বশ করে রেখেছিল। আমি একটু ভালো হলে ওর মটর সাইকেলের সাইড-কারে আমাকে চাপিয়ে পচম্বা ইত্যাদি জায়গায় ঘুরিয়ে আনত। বলত একদিন উশ্রী ফল্‌স্ দেখাবে, সে আর হয়ে ওঠেনি। সে আমার অ-দেখাই রইল।

আমাদের একজন জল তোলার লোক ছিল, তার দুই বৌ ছিল। দুজনকেই ও ভয় পেত। এদিকে আমার ছোটভাই বোনকে খুব তাড়া দিত। একদিন নিচু হয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে, এমন সময় ছোট বৌ ছুটে এসে এক হাত কাচের চুড়ি ওর পিঠে ভাঙল, পিঠ রক্তারক্তি। তারপর আবার ঝড়ের মতো ছুটে চলে গেল। মা বললেন, "কি ব্যাপার ?" ঝগড়ু বলল, "বড়-বৌকে হাট থেকে চুড়ি কিনে দিয়েছি কি না। বলেছি এ হাটে ওকেও দেব। তা কে শোনে !" মা বললেন, "দুজনায় ঝগড়া বুঝি ?" ঝগড়ু বলল, "তা হলে তো ভালোই হত, মা। দুজনায় বড্ড বেশি ভাব। এক সঙ্গে জোট করে আমাকে জ্বালায় ! ও দুটোকে আপনি যাবার সময় কলকাতায় নিয়ে যান। কি রকম হাতের জোর দেখছেন তো, পিঠটার আর কিছু রাখেনি !"

এ গল্পের শেষ হল যেদিন আমরা সত্যি সত্যি সেরে উঠে কলকাতায় ফিরে এলাম। ভোর-বেলায় ঝগড়ুর দুই বৌ মায়ের কাছে এসে কেঁদে পড়ল, "মা, বুড়োকে কলকাতায় নিয়ে যান, দেখেছেন তো কেমন খাটতে পারে ! ওর মাইনেটা আমাদের পাঠিয়ে দেবেন আর ওকে কখনো ছুটি দেবেন না।"

সত্যি কথা বলতে কি, বড় আনন্দে কেটেছিল আমার গিরিডি প্রবাস। দেখতে দেখতে তিনটে মাস কেটে গেছিল। জানুয়ারির গোড়ার দিকে বড় দিনের ছুটি ফুরোলে, আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। এসে দেখি একতলার সামনের একটা ঘরে বড় তালা ঝুলছে। ভিতরে গড়পারের বৌদিদিদের আসবাব বাক্স-প্যাঁটরা ভরা। গড়পারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সেই সপ্তাহেই নানকুদা, মণিদা, বুলুদি আর মানিক আমাদের বাড়িতে চলে এল।

॥ ২৯ ॥

মানিক হল বড়দার ছেলে সত্যজিৎ। তার তখন বছর পাঁচেক বয়স। তার দিদিমার মর্মান্তিক অসুখ, বড়-বৌঠান সেখানে গিয়ে নিজের মায়ের সেবা করছেন। মানিক আমাদের বাড়িতে কয়েক মাস ছিল। ওর দিদিমার মৃত্যুর পর বড়-বৌঠান ওকে নিয়ে গেলেন, ও মামার বাড়িতেই মানুষ হল। আমাদের বাড়িতে খুব কাছে থেকে দেখেও ভবিষ্যৎ গৌরবের আভাস পাইনি। আসলে তখন নিজের কলেজ জীবন নিয়েই ব্যস্ত, কাজেই অসাধারণত্ব খুঁজিওনি। মনে পড়ে বাবা একবার আমাদের কোথায় যেন নিয়ে গিয়ে আইস্‌ক্রীম খাওয়ালেন আর মানিক 'গরম করে দাও! গরম করে দাও!' বলে চেঁচাতে লাগল। বুলুদি ওর দেখাশুনো করত, খুব আদরেই রাখত, আমাদের কাউকে কিছু করে দিতে দিত না। তাতে আমাদের একটু দুঃখ হত।

তাছাড়া মণিদা নান্‌কুদার কথাও বলতে হয়। ওদের বাবা আমার মাকে মানুষ করেছিলেন; ওরা মায়ের ভাসুরপো হলেও, ছোট ভাইয়ের মতো। মা ওদের বড্ড ভালোবাসতেন। মণিদার ডাইবিটিস্ ছিল বলে রোজ দেখতাম নিজের হাতে বাড়িতে ছানা কেটে, ছানাটিকে প্রায় কাঁচা রেখে একেক দিন একেক রকম করে তৈরি করে দিতেন। নানা রকম রান্না জানতেন মা, প্রায় সবই মণিদার মায়ের কাছে শেখা। ভেবে কষ্ট হয় এই মণিদার পরম দুঃখের সময়, তার জন্য যতখানি করতে পারতাম তার কিছুই করিনি। খালি এন্তার তর্ক করেছি, কারণ মতের অমিল ছিল। মণিদা ছিল গোঁড়া ব্রাহ্ম, তাই বলে একটুও স্নেহশূন্য ছিল না। কিন্তু আমার মনে হত ওর উচিত অনুচিত বিচার বড় অনুদার। বাইরের মতটার নিচে হৃদয়বান মানুষটাকে দেখতাম না। ভারি রসিক ছিল; সেটি খুব উপভোগ করতাম এবং শ্রদ্ধাও করতাম। মণিদার ভালো নাম ছিল সুবিনয়। পাতলা, প্রায় ছয় ফুট লম্বা, ফর্সা মানুষটি; মুখ-চোখ সুন্দর, চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছিল। গানের গলা ছিল; সুন্দর জিনিসের চোখ ছিল; ছোটদের জন্য খুব ভালো লিখত। সব কিছু তলায় তলায় কৌতুকের স্রোত বয়ে যেত। সেটি ছিল তার মনের গুণ। নইলে সাংসারিক দিক থেকে দেখতে গেলে, কি এমন ছিল তার জীবনে যাকে কৌতুকের সামগ্রী বলা যায়, এক হৃদয়টি ছাড়া।

তখন কারো চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে শুনলেই মনে হত বুড়ো হতে আর বাকি নেই। মণিদার হয়তো ৩৩-৩৪ বছর বয়স হয়েছিল। ভাবতাম আধ-বুড়ো। আমাদের চাইতে মা-বাবার দলে। অথচ কেবলি আমাদের সঙ্গ খুঁজত। এখন বুঝি মনের কি নিদারুণ নৈরাশ্য নিয়ে ওর দিন কাটত। ব্যবসা লাটে উঠেছে; বাড়িও নিলাম হবে; দেশের জমিজমা আগেই বিক্রি হয়ে গেছে; ডাইবিটিসে শরীর ভেঙে পড়েছে; বৌদিদি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়িতে; মামলা

ঢুকবে, মণিদা কোথাও চাকরি পাবে, তবে ভাঙা পরিবার আবার একসঙ্গে হবে। মনের পিছনে এই বোঝা নিয়ে মণিদা আমাদের হাসি তামাশায় যোগ দিত। তার ওপর ব্যবসা ফেল করার জন্য আত্মীয়-বন্ধু কেউ কেউ ওকে দায়ী করতেন। অথচ ওর কোনো দোষ ছিল না, সর্বনাশটিকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল।

আমরা কলেজে চলে যেতাম, খুব কাছেই ডায়োসেসান কলেজ, হেঁটেই যাওয়া-আসা করতাম, আজকাল আর সঙ্গে চাকরও দেওয়া হত না। নান্‌কুদাও সকাল সকাল স্নান করে খেয়ে সিটি স্কুলে পড়াতে যেত। ওর কথায় মনে হত বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় একটা লম্বা কৌতুক নাটক শুরু হয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় বাড়িতে আবার পা দেওয়া পর্যন্তও শেষ হয় না। মণিদার দায়িত্ব এবং দুশ্চিন্তার অংশীদার ছিল না নান্‌কুদা। সে কোনো দিনই ইউ রায় এণ্ড সন্সের কর্মী হয়নি। দুশ্চিন্তার অংশীদার না হলেও ব্যবসার দায়িত্বের অংশীদার ছিল বৈকি। কিন্তু কি আশ্চর্য সহজভাবে সেটা সে ঘাড় থেকে ফেলে দিত দেখে অবাক্ হতাম। মণিদা সমস্ত ভাবনা-চিন্তা একা বয়ে বেড়াত, নান্‌কুদাকে কখনো উদ্বিগ্ন হতে দিত না। তবে একবার নান্‌কুদা ফাঁদে পড়েছিল।

সারাদিন মণিদা উকিল-আদালত করত, মামলা তখনো চলছিল, দেউলে হবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সন্ধ্যের আগে মণিদা বাড়ি ফিরত না। নান্‌কুদার সেদিন কোনো কারণে টিফিনের সময় ছুটি হয়ে গেছিল। আমরা কলেজের পর ব্যাডমিণ্টন খেলে বাড়ি এসে দেখলাম মা বিশেষ চিন্তিত। দুজন লোক নাকি কি একটা কাগজ নিয়ে এসে, সেই যে বেলা দুটোয় নান্‌কুদাকে কোথায় নিয়ে গেছে, এখনো তার দেখা নেই। মণিদা বেচারি আদালত থেকে শ্রান্ত মুখে ফিরে, একথা শুনেই বাড়ির চাকরদের জিজ্ঞাসা করল, দরজা খোলার সময় তারা কি বলেছিল। চাকররা বলল, "বলেছিল ওয়ারেণ্ট আছে, লালবাজার যেতে হবে। দাদাবাবু বললেন, ভেতরে বলে যাই, কাপড় ছেড়ে আসি। তা ওনারা শুনলেন না।"

সঙ্গে সঙ্গে এক পেয়ালা দুধ খেয়ে মণিদা আবার উকিলবাড়ি চলে গেল। অনেক রাতে খবর আনল বে-আইনী ভাবে নান্‌কুদাকে হাজতে বন্ধ করেছে। ওরা পাওনাদার। এরা দেউলে হলে কিছুই পাবে না বলে রাগ হয়েছে। কাল ভোরের আগে ছাড়ানো যাবে না।

নান্‌কুদা এক রাত হাজত-বাস করে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলল। "ওদের খরচে রাতে ফল আর তিন রকম সন্দেশ খেয়েছি। আজ সকালে মাতঙ্গী-মুদ্রা করলাম, নাক দিয়ে জল টেনে মুখ দিয়ে বের করলাম। তাই দেখে হাজত সুদ্ধ সকলের ভারি ভক্তি হয়েছে। আসার সময় বড় জমাদার পর্যন্ত পায়ের ধুলো নিয়ে আবার যেতে বলে দিয়েছে।" সব থেকে মজার কথা হল

নান্‌কুদারও দেখলাম আরেকবার যাবার খুব ইচ্ছে। বলাবাহুল্য সে ইচ্ছা সফল হয়নি।

কত মজা করত মণিদা। আমার জন্মদিনে আমি কলেজ থেকে ফিরতেই নিজে একটা সেলাইয়ের বাক্স উপহার দিয়ে আবার একটা চিরকুটও দিল। তাতে লেখা ছিল, স্নেহের লীলা, আজ তোমার জন্মদিনে গরীব পিসিমার এই সামান্য উপহারটি গ্রহণ করে আমাকে সুখী করবে। ইতি। আঃ তোমার নিস্তারিণীপিসিমা।

এখন আমার নিস্তরিণী পিসীমা বলে কেউ নেইও, তাঁর উপহার দেবার সম্ভাবনাও নেই, তবু আমি বললাম, "যে এনেছে এ চিঠি সে কোথায় ?" অশোক বলল, "ব্যাটাকে ভাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু উপহারটা কোথায় গেল ?" আমি আবার বললাম, "চিঠি আনল আর তাকে ভাগিয়ে দিলে ?" অশোক বলল, "মণিকাকা বলল।" মণিদা বলল, "গেছে ব্যাটা ! কিন্তু উপহারটা কোথায় ?" যেই না টের পেলাম ওরা আমাকে দিয়ে উপহার খোঁজাতে চায়, অমনি বুঝলাম এ সমস্তই মণিদার কাণ্ড ! দিদিকে বললাম, "সব বানানো। ঠিক কি না বল ?"

দিদি হাসি হাসি মুখে বলল, "মানে-ইয়ে—" ওকে তো মেরে ফেললেও মুখ দিয়ে মিছে কথা বেরোবে না ; ঠাট্টার সময়ও না। সকলের কি দুঃখ ! এত করে শিখিয়ে পড়িয়ে শেষটা সব ফাঁস করে দিল !

সে বছর পুজোর ছুটিতে আমার মেসোমশাই সুরেন মৈত্র আমাকে ঢাকায় নিয়ে গেলেন। তিনি তখন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ ; রমনায় এক সুন্দর বাড়িতে থাকেন। দিন কুড়ি ছিলাম। একটা কারণে ঐ ছুটিটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। ওখানে সত্যেন বসু আর জ্ঞান ঘোষ বলে দুজন আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। আর বুদ্ধদেব বসু বলে একজনের নাম শুনলাম। সে আমার সমবয়সী। বছর ১৮-১৯ বয়স। মেসোমশাই বললেন, "ছেলেটির আশ্চর্য সাহিত্য প্রতিভা। একদিন নাম করবে।" অমনি তাকে দেখবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে হবার উপায় ছিল না। আমার মাসিমারা বোধ হয় একটু উন্নাসিক ছিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল ছোকরা লেখকদের যে বাড়িতে ডাকবেন, বা তারা যেখানে বিচরণ করে সেখানে আমাকে নিয়ে যাবেন, সে আশা নেই বলে আর মুখে কিছু বলিনি। মনে মনে ভেবেছি যে একে আর কিছুদিন আগে প্রবাসীতে পড়া দুটি আশ্চর্য গল্পের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রকে দেখতেই হবে। এর অনেক অনেক বছর পরে এঁরা দুজনেই আমার প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। ঢাকার স্মৃতির সঙ্গে তাঁদের নাম জড়িয়ে আছে।

এমন একটা বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও আমি কি করে বহির্মুখী হলাম, এর মধ্যে কোনো রহস্যই নেই। বহির্মুখী না হলে কেউ গল্প কবিতা লেখে না ;

গান রচনা করে না ; ছবি আঁকে না ; মূর্তি গড়ে না। মনের কথা মনের মধ্যে বন্ধ করে না রেখে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে বৃষ্টির জলের মতো তারা ঝরিয়ে দেয় বলেই তাদের দিয়ে ঐ সব কাজ হয়। আবহাওয়া দিয়ে কারো মানসলোক রচনা হয়, এ আমার মনে হয় না। তবে লোকের কাছে বড় বেশি ধরা দিলে মাঝে মাঝে দুঃখ পেতে হয়। আমি যখন অনেক পরে আকাশবাণীতে প্রযোজনার কাজ করতাম, তখন আমার তরুণবন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী এই কথা বলে আমাকে বারবার সাবধান করে দিত। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না ; বড় বেশি প্রগলভতার অভ্যাস হয়ে গেছিল ; অন্য লোকের গোপন কথা ছাড়া মনে কিছু রাখতে পারি না ; নিজের তো গোপন কথা বলে কিছু নেই। কোন জিনিস সম্বন্ধে আমার কি মতামত, কাকে আমার ভালো লাগে আর কাকে তেমন ভালো লাগে না, চিরকাল সব বলে টলে একাকার করি। ওটি আমার নিজের প্রতি নিজের এক ধরনের সততা। তবে খুব বুদ্ধির কাজ বলে মনে হয় না। গুপ্তচরের চাকরি নিলে নির্ঘাৎ আমাকে তাড়িয়ে দিত।

একটা বড় দুর্বলতা ছিল, কেবলি ইচ্ছা করত সকলের আমাকে ভালো লাগুক। কেন যে লাগবে তা জানতাম না ; কিন্তু যখনি শুনতাম কেউ অকারণে আমার সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করেছে, অমনি ভারি কষ্ট হত। আমার নিজের প্রায় সকলকেই ভালো লাগত ; যেই শুনতাম কেউ আমার নিন্দে করেছে, চেনা লোক হলে মনের দুঃখে আর তার ধারেকাছে যেতাম না ; কিন্তু যদি সে অচেনা লোক হত, মনে মনে সঙ্কল্প করতাম, এর সঙ্গে ভাব না করে ছাড়ব না। আগে আগে ভালো মন্দ বিচার করতাম ; ক্রমে ক্রমে বুঝলাম ভালো-মন্দর সঙ্গে আসলে ভালোলাগার কোনো সম্বন্ধ নেই। ভালোবাসা তো আর ইস্কুলের প্রাইজ্ নয় যে যে যত ভালো তাকে তত বেশি ভালোবাসব। সারা জীবনে কত লোককে ভালোবাসলাম, কত লোকের ভালোবাসা পেলাম, কিন্তু এই সন্ধ্যাবেলাতেও বুঝে উঠলাম না কি দিয়ে ভালোবাসা হয়। শুধু জানি এর তুলনা নেই ত্রিভুবনে। দুঃখের বিষয় কৈশোরে আর প্রথম যৌবনে ভালোবাসার এই না-বোঝার বিদ্যেটা আয়ত্ত হয়নি।

এত কথা বললাম কারণ বুলুদি থেকে থেকেই বলত, "এই তোদের সবুজ জামার হাতা অত ছোট করে কেটেছিস্ কেন ? পিসিমার বাড়িতে সবাই নিন্দে করছে !" অমনি মন খারাপ হয়ে যেত। কিম্বা হয়ত বলল, "বীণার বিয়ের সময় ঐ অল্প চেনা ছোকরা তোর মুখের সামনে যখন দেশলাই জ্বেলে ধরেছিল, ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়েছিলি কেন ? খুব খারাপ দেখিয়েছিল।" নাচার হয়ে হয়তো বললাম, "তাহলে কি করা উচিত ছিল ?" "সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়া উচিত ছিল নিশ্চয়। ও-রকম করলে আত্মসম্মান থাকে না। ওটা অসামাজিক।"

সেই তখন থেকেই 'সামাজিকে'র ওপর ঘেন্না ধরে গেছিল। এখনো মনে হয় লোকের মনে কষ্ট দিয়ে সামাজিক হতে হবে কেন আর যেখানে কিছু নেই সেখানে 'কু' ভাবলেই বা আত্ম-সম্মান রক্ষা হবে কি করে। তবু ভাবতাম হয়তো দোষ হয়ে গেছে, মনটা খারাপ হয়ে যেত। মাকে কিছু বলতাম না, তাঁকে বিব্রত করা কেন?

এখনো মনে পড়ে কবি কামিনী রায়ের সেই পঙ্গু ছেলের সঙ্গে আমাদের সকলের ভারি ভাব হয়ে গেছিল। সে মাঝে মাঝে ছুটির দিনে এসে ভাইদের সঙ্গে ক্যারম খেলত, আমাদের সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে তর্কাতর্কি করত। সকলেই তাকে পছন্দ করতাম। এর মধ্যে আমার জন্মদিনে সে আমাকে এক গোছা বাছাই করা ইংরিজি বই উপহার দিয়ে গেল। সেকালে দেড় টাকা দু টাকা দিয়ে বিখ্যাত বইয়ের সুলভ সংস্করণ পাওয়া যেত। সবগুলি মিলে হয়তো ৭-৮ টাকা খরচ হয়েছিল আর আমি বেজায় খুশি হয়ে মনাদাকে পায়েস, সিঙ্গাড়া খাইয়ে দিয়েছিলাম। তখন আর বন্ধুবান্ধব ডেকে জন্মদিন করা হত না। যে আসত তাকে একটু মিষ্টিমুখ করানো হত।

ইতিমধ্যে বুলাদার সঙ্গে বুলুদির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছিল; বুলুদিকে মাঝে-মাঝে বুলাদার জ্যাঠাইমা নেমন্তন্ন করতেন। একদিন ফিরে এসে বলল, "তুমি অনাত্মীয় ইয়ং ম্যানের কাছ থেকে উপহার নিয়েছ বলে মনার বড় ভাই ওদের বাড়ি গিয়ে তোমার নিন্দে করেছে!" মা তো শুনে ভারি দুঃখিত। কথাটা মনাদার কানে গেল। সে বাড়ি গিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করল। দাদা রেগেমেগে বলল, "মোটেই আমি কিছু বলিনি!" এক কথায় ইংরিজিতে যাকে বলে 'চায়ের পেয়ালায় ঝঞ্ঝা', তাই শুরু হয়ে গেল। আবার ঝড়ের মতো থেমেও গেল। এখন ভাবি যে-জিনিস একেবারে উপেক্ষা করা উচিত ছিল, তাই নিয়ে এত উষ্ণতা কেন। মনে হয় দাদাটি বলেছিল নিশ্চয় কিছু। মেয়েদের ছোট জিনিস নিয়ে জীবন কাটে বলে দেখি অকিঞ্চিৎকরকে প্রাধান্য দেয়। তবে তার জ্বালা খুব কম নয়।

মণিদাও সবই শুনেছিল, কানও দেয়নি। ও ছিল অন্যরকম মানুষ। একটা সফল প্রকাশনালয়ের সম্পাদক ও প্রকাশক হবার জন্য ও জন্মেছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে তা হয়নি। ছোটদের জন্য কি সুন্দর সব তথ্যমূলক সরস প্রবন্ধ লিখত, মজার মজার গল্প লিখত। লেখে তো অনেকেই, ভালোই লেখে। কিন্তু তাদের মধ্যে গুণগ্রাহী কজন হয়? কেউ ভালো আঁকতে পারে বা লিখতে পারে বুঝতে পারলেই মণিদা তাকে কি ভাবে সাহায্য করা যায় তাই ভাবতে বসত। ইউ রায় এণ্ড সন্সের মতো একটা কার্যালয় থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ওর নিজের গুণগুলো ঠিক ফুর্তি পাচ্ছিল না। তবে কত লোক যে ওর গুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিল তার

ঠিক নেই। একবার দেব-সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকীর সম্পাদনা করেছিল। সে বইয়ের তুলনা হয় না। 'রামধনু'র সম্পাদক সেদিন বলছিলেন, "ঐ মানুষটির কাছে যে আমি কত ভাবে ঋণী সে আর কি বলব! সম্পাদনার কোনো সমস্যা হলেই ওঁর কাছে ছুটে যেতাম। কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না।"

আমিও মণিদার কাছে গভীরভাবে ঋণী। ইউ রায় এণ্ড সন্স উঠে যাবার বছর দুই পরে, নতুন মালিকরা আবার 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হন। সুবিনয় রায়ের মতো ভালো সম্পাদক আর কোথায় পাওয়া যাবে? মণিদাও আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আমাদের সকলেরও কি আনন্দ! মনে হল হারানো সাম্রাজ্যের সবটাই তাহলে ধ্বংস হয়নি। বছরটা মনে নেই। আমি হয় চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, নয় বি-এ পরীক্ষা দেব দেব করছি। মণিদা জিওলজিকেল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে ভালো চাকরি পেয়ে, নিজের ছোট্ট ফ্ল্যাটে উঠে গেছে। ছেলে নিয়ে বৌদিদিও এসেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর উৎকৃষ্ট রান্না খেয়ে আসি। এমন সময় মণিদা এসে বলল, সন্দেশের জন্য গল্প না দিলে চলবে না।

কি আর বলব, প্রাণটা পক্ষিরাজের মতো খানিক তড়বড় করেই, ডানা মেলে আকাশে উড়ে পড়ল। মণিদা বলল, "দিন দশেকের মধ্যে দিস্।" সেই আমার 'দিন-দুপুরে' গল্পটি লেখা হল। সেই যে ১৯২২ সালে বড়দাব কথায় 'লক্ষ্মী ছেলে' লিখে আমার নিজের কাজ সম্বন্ধে চৈতনা হওয়া; তারপর আর কখনো গল্প লিখে ছোটদের কোনো পত্রিকায় দেবার কথা মনেও আনিনি। ইতিমধ্যে আমার সমবয়সী বুদ্ধদেব বসু একজন নামকরা লেখক হয়ে উঠেছেন। আরো কতজন খ্যাতি লাভ করেছেন। 'সন্দেশ' নেই; আমার কোথাও গল্প পাঠাতে ইচ্ছে করত না। মণিদার কথায় হাতে স্বর্গ পেয়েছিলাম। দশ দিন পরে মণিদা গল্প নিয়ে গেল। পড়ে কোনো মন্তব্য করল না। আমি দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করে রইলাম।

পরদিন মণিদা এসে মাকে বলে গেল, "গল্পের জন্য ছবি চাই।" বুঝলাম গল্প উৎরেছে। আঁকলাম ছবি। চাইনিজ ইংক দিয়ে। ছবিটা নিজের খুব পছন্দ হল না। মজার বটে, কিন্তু লাইন আরো বলিষ্ঠ হওয়া দরকার। তবু সে গল্প, সে ছবি, পাঠকদের পছন্দ হল। আর আমাকে পায় কে! তখন থেকে শুরু করে যতদিন না এম এ পাস করে, নিজে ইচ্ছা করে পুরনো জীবনের পালা বদলালাম, ২-১ মাস পরে পরেই একটা করে সচিত্র গল্প 'সন্দেশে' দিয়েছি। অবনীন্দ্রনাথের মতো আমারো মনে হল অন্তরের একটা বাধা সরে গেছে। আমি নির্ভয়ে একটার পর একটা ছোটদের গল্প লিখে গেছি। সবগুলি সমান উৎরোয়নি। কোনোটা বেশি ভালো, কোনোটা কম ভালো আর কোনোটা আমার মতে ভালোই না। যেগুলি

আপনা থেকে মনের মাটিতে ফুল হয়ে ফুটেছে সেগুলি সব চাইতে ভালো। আর যেগুলো দায় পড়ে ফরমাসী লেখা সেগুলো যথেষ্ট ভালো নয়। তার বেশির ভাগই আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। যাতে কোনো ভবিষ্যৎ প্রকাশকের আমার 'অপ্রকাশিত' রচনা প্রকাশ করার সম্ভাবনা না থাকে।

॥ ৩০ ॥

আমি ডায়োসেসান্ কলেজ থেকে পাস্ করে বেরোবার পর ৫০ বছর কেটে গেছে, কিন্তু এতদিনেও তার চাইতে ভালো একটা কলেজ দেখলাম না। মনে হত প্রত্যেকটি ছাত্রী সেখান থেকে কপালে একটা ছাপ নিয়ে বেরোত। সে ছাপ শুধু কৃতিত্বের বা যোগ্যতার ছাপ নয়, সে এক আশ্চর্যরকমের আত্ম-প্রত্যয়ের, একটা বলিষ্ঠতার ছাপ। সে সময় সে জিনিসের বড় প্রয়োজন ছিল্, কারণ আমাদের নেতারা কাঁধ থেকে ভূত ঝাড়বার মতো করে সমস্ত ব্রিটিশ্ আদর্শ ঝেড়ে ফেলার কথা ভাবতেন, ভালোমন্দ নির্বিচারে। আমরাও ভুলে যেতাম যে জ্ঞানের কোনো দেশকাল-পাত্রের বিচার নেই, জ্ঞান মানবজাতির সম্পত্তি। সুখের বিষয় এই সঙ্কীর্ণতা থেকে ডায়োসেসান কলেজের সন্ন্যাসিনী পরিচালিকারা মুক্ত ছিলেন। হয়তো বিদেশে এসে সারা জীবন একটা শিক্ষালয়ে পড়ে থাকার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল খানকতক আত্মাকে খৃষ্টের পাদপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়া। তাই যদি হয়েও থাকে, আমি চার বছর ডায়োসেসান স্কুলে আর চার বছর কলেজে পড়েও একদিনের জন্যেও নান্দের মুখে হিন্দু ধর্মের নিন্দা বা খৃষ্টীয় ধর্মের প্রকৃষ্টতার কথা শুনিনি। একবার বটে গুজব শুনেছিলাম যে কলেজের অধ্যক্ষা সিস্টার ডরথি ফ্রান্সিস্ কোনো অধ্যাপিকার কাছে নাকি আক্ষেপ করেছিলেন যে হিন্দুদের না হয় অনেকগুলো প্রাচীন নিয়ম ও বিশ্বাসের গণ্ডি কেটে বেরিয়ে আসা মুশকিল, কিন্তু ব্রাহ্মদের তো সেসব বালাই নেই, তারা কি বলে খৃষ্টীয় ধর্মের মতো একটা উন্নত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় না? মিশনারীদের খাতা পরীক্ষা করে নাকি দেখা গেছে যে যদি বা কিছু শিক্ষিত হিন্দু খৃশ্চান হয়েছেন, সে তুলনায় শিক্ষিত ব্রাহ্ম খুব কমই হয়েছেন। এর উত্তরে আশা করি তাঁকে বলা হয়েছিল যে ব্রাহ্ম হয়েই যাঁরা তাঁদের বাঞ্ছিত সুখ-সুবিধাগুলো পেয়েছেন তাঁদের আর খৃশ্চান্ হবার প্রলোভন কিসের।

সে যাই হোক, এঁরা ভারি বুদ্ধিমতী ও উদার ছিলেন। সিস্টার ডরথি ফ্রান্সিস্ একটি অসাধারণ চরিত্র ছিলেন, যেমনি কড়া তেমনি ন্যায়নিষ্ঠ, যেমনি গম্ভীর তেমনি সরস, যেমনি কঠিন তেমনি দয়ালু। অতিশয় বুদ্ধিমতী, উচ্চশিক্ষিতা, নিষ্কাম, শান্ত-সমাহিত, অথচ সহানুভূতিশীলা। এঁরা সন্ন্যাসিনী হবার সময় নিজেদের শ্রাদ্ধ না করলেও, পূর্ব-জীবনের সমস্ত ব্যক্তিগত পরিচয় লুপ্ত করে

দিয়ে সিস্টার হতেন, এঁদের ধর্মই হল সেবা। যখনই খৃশ্চান মিশনারিদের নিন্দা শুনি, আমার সিস্টার ডরথি ফ্রান্সিসের কথা মনে পড়ে। মানুষকে যে মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে, সে আমার মনের মানুষ। তবে অন্যদের কথা বলতে পারি না। বিলিতী মেমদের কাছে ইংরিজি পড়তাম, ছোটবেলা থেকে তাই পড়েও এসেছিলাম, বিশুদ্ধ ইংরিজি উচ্চারণ একেবারে স্বভাবগত হয়ে গেছিল। তখন এদেশে সাহেব-মেমদের প্রাচুর্য ছিল ; যেকোনো সাধারণ বি-এ পাস করা ছেলেমেয়ে নির্ভুল ইংরিজি বলত ; যারা সায়েব অধ্যাপকদের ছাত্র ছিল তাদের অনেক সময় চমৎকার উচ্চারণ করতে শোনা যেত। এখন এই জিনিসটির একান্ত অভাব। নির্ভুল ইংরিজি বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা। অনেকে বলেন, "তাতে কি হয়েছে ? হাজার হোক বিদেশী ভাষা। কটা বিদেশী ভালো বাংলা উচ্চারণ করে ?" ওসব হল গিয়ে কৈফিয়ৎ এবং ঐ নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। তবে সুন্দরভাবে সম্পন্ন কাজের মর্যাদাই আলাদা। চার বছর বিলেত অ্যামেরিকায় কাটিয়ে যখন কেউ ভুল উচ্চারণ করে, আমার গা শিউরে ওঠে। যাক গে সেকথা, আজকালকার লোকদেরও এমন অনেক গুণ আছে, যা আমাদের সময়ে ছিল না। যেমন, এরা অনেক বেশি স্বাভাবিক ও স্বাবলম্বী, কাজকে অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে। আমার মেয়ে ও তার বন্ধুরা নিজেরা একলা বাজারে গিয়ে সুবিধে মতো দরে উৎকৃষ্ট মাছ কিনে আনে ; রান্নাবান্না, কাপড়-কাচা এক হাতে করে, মটর-গাড়ি চালায়, ব্যাঙ্কের কাজ, ট্যাক্সের কাজ অবলীলাক্রমে সারে। আমাদের সময় এসব দুঃস্বপ্নের বাইরে ছিল।

বি-এ পরীক্ষার জন্য নিজেকে খুব ভালো করে তৈরি করেছিলাম। ইংরিজি সাহিত্যের যেকোনো ভালো বইয়ের কথা শুনলেই লাইব্রেরি ইত্যাদি থেকে জোগাড় করে পড়ে ফেলে, নোট করে, ছেড়ে দিতাম। একেকটা ছোট নোট-বই হঠাৎ হঠাৎ খুঁজে পাই আর নিজের অধ্যবসায় দেখে অবাক হয়ে যাই। বেড়ে নোটগুলো, একথা মানতেই হবে। অথচ সর্বদা মনে মনে জানতাম ইংরিজিতে বিদ্যাদিগ্‌গজ হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় ; আমি বাংলায় আমাদের দেশের ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখতে চাই। বড় পদ অলংকৃত করতে চাই না ; একদিন যদি আমার দেশবাসীরা বলে, 'এ মেয়ে তার বংশের উপযুক্ত সন্তান' তবেই আমার জীবন সার্থক হবে।

এসব কথা সত্যি হলেও সাহিত্যিক বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবার জন্য কেবলি কলমটা উস্‌খুস্‌ করত। কিন্তু কলেজের খাতায় এবং ইংরিজিতে ছাড়া তাকে কোথাও মুক্তি দিতাম না। নিজের যোগ্যতার ওপর এতটুকুও আস্থা ছিল না। অন্তরে অন্তরে জানতাম যে ক্রমে বাংলা শব্দের ওপর দখল আসছে ; দু-চারটি সহজ কথায় যতখানি আমি বলে ফেলতে পারি, অন্যদের ততখানি বলতে আধ

পাতো জায়গা লাগে। কিন্তু তৎসম শব্দের বানান মাঝে-মাঝেই অভিধান খুলে দেখে নিতে হয়। বলেছি তো বাংলায় আমি কাঁচা ; কিন্তু বাংলা আমার প্রাণ ; তাই টপ্ করে কথা ধরি, ধরি আর মনের মধ্যে জমা করি। যেমন করে ইংরিজি কথা শেখে সবাই ; দেখে দেখে, চিনে চিনে, ভালোবেসে-বেসে, আমিও তেমনি করে দেখে দেখে, চিনে চিনে, ভালোবেসে-বেসে বাংলা শিখেছি। ব্যাকরণকে শ্রদ্ধা করি বটে, তৎসম তৎভব শব্দ সম্বন্ধে সাবধানে থাকি বটে, কিন্তু হৃদয় ভরে যায় লোকের মুখে শোনা বঙ্গজ শব্দে, দিশী গেঁয়ো কথায়, তার মধ্যে হাজার ব্যাকরণের অশুদ্ধি আছে তাও জেনেশুনে।

তবে এসব নিয়মের বাইরের ভালোবাসায় নম্বর ওঠে না। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলা বাদ দিলে আমি প্রথম হতাম। বাংলা জুড়তেই সুনীতকুমার ইন্দ্র হয়েছিল প্রথম, আমি দ্বিতীয়। বি-এতেও যদি বাংলার নম্বর জোড়া হত, তাহলে আবার তাই হত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুখের বিষয় যারা কোনো বিষয়ে অনার্স নেয়, তাদের অন্য বিষয়ে পাস্ নম্বর রাখলেই হল। অবিশ্যি কয়েকটা পদক, বৃত্তি ইত্যাদি দেবার সময় সব নম্বর জোড়া হত। যাই হোক, বি-এতে আমি প্রথম হলাম, সোনার পদক পেলাম, অনেক পুরস্কার পেলাম, জুবিলি স্কলার হয়ে ৫০ টাকার বৃত্তি পেলাম। যারা নানা বিষয়ে প্রথম হয়েছে তাদের মধ্যে যাদের নম্বর সবচেয়ে বেশি, সেইরকম ১০-১২ জনকে জুবিলি স্কলার বলত। দাদাও আগের বছর জুবিলি স্কলার হয়েছিল।

এদিকে দিদি তো আগের বছর থেকেই এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে, হাতে হাত-ঘড়ি, বগলে হ্যাণ্ডব্যাগ আর একটা নোটবই, গলায় এক ফাউণ্টেন পেন নিয়ে কলেজে যেত। পরে দেখতাম দুটো একটা কবিতা-নাটকের বইও নিত। শুনলাম প্রফুল্ল ঘোষ বলে একজন আশ্চর্য মাস্টারমশাই আছেন, শেক্সপীয়র পড়ান, তাঁর ক্লাসে বই না নিয়ে উপায় নেই। আমাদের পাড়ায় লীলালতিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে একজন বয়স্কা বিবাহিতা মহিলা শখ করে বেশি বয়সে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন ; আমার মা যখন বেথুন কলেজে পড়তেন তিনি তখন বেথুন স্কুলে পড়তেন। তিনি বললেন, "তাতে কি, সুলেখা একা যাওয়া-আসা করবে কেন ? আমাদের গাড়িতে যাবে আসবে।" ইনি পরে বহু বছর ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের অধ্যক্ষা ছিলেন। সেই ব্যবস্থাই হল। এখন ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে ৫০ বছর আগেও মেয়েদের ট্রামে করে কলেজ যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠত। বাস তখনো ঠিক চালু হয়নি, তবে পরীক্ষার্থে দুটো চারটে প্রাইভেট বাসকে পথে ছাড়া হয়েছিল। অনেকটা এখনকার পুলিসের ভ্যানের মতো, পেছনে কিম্বা পাশে দরজা, মাঝখানে প্যাসেজ, দুদিকে দুটি লম্বা সীট। কিন্তু ট্রামের অর্ধেক সময়ে পৌঁছে দেয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে বাস ভারি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ট্রাম কোম্পানী

বড় বড় বাস নামাল, দোতলা বাসও নামাল, তার ছাদ থাকত না। বৃষ্টি পড়লে নেমে এসে একতলার ভিড় বাড়াতে হত।

অন্য লোকের সঙ্গে চলাফেরা দিদির পছন্দ ছিল না ; আমি ভর্তি হতেই, দুজনে একসঙ্গে ট্রামে যেতাম। এসপ্ল্যানেডে গাড়ি বদল করতাম। সে তো আমাদের চেনা পথ ; ছোটবেলায় ছোটজ্যাঠার সঙ্গে, পরে মা-বাবার সঙ্গেও কত গেছি। বাবা কোনোদিনও গাড়ি কেনেননি, যদিও তাঁর জুনিয়র পদাধিকারীরা কিনেছিলেন। পরে ট্রামে বেশি সময় লাগে বলে আমরা বাসেই যেতাম। এক বছরের মধ্যে বহু মেয়েকে একা যাতায়াত করতে দেখা যেত। বলাবাহুল্য কলেজেও মেয়েদের আলাদা বসবার ঘর ছিল ; ক্লাসে যাবার সময় সেখান থেকে অধ্যাপকরা মেয়েদের ডেকে নিয়ে যেতেন, আবার ক্লাসের পর পৌঁছে দিতেন। কিন্তু লাইব্রেরিতে ছেলেমেয়েরা মাঝে মাঝে পাশাপাশি বসে কাজ করত। মোট কথা কর্তৃপক্ষ ছেলেমেয়েদের আলাদা করে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন, আর ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগই পরস্পরকে জানবার প্রাণপণ চেষ্টা করত। তবে প্রেম করবার জন্য নয়, যদিও তাও হত মাঝে মাঝে, কিন্তু সেটাই আসল উদ্দেশ্য ছিল না। এতকাল পারিবারিক পাখনার আড়ালে মানুষ হয়েছিলাম।২০ বছর বয়স হল তবু আলাদা একটা নিজস্ব জীবন গড়ে তুলবার সুযোগ পেলাম না। এমন একটা জীবন যেখানে বাইরের সাহিত্য-শিল্পও স্থান পায়। যেখানে লেখা বলতে শুধু সন্দেশের আর রায় বাড়ির আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কৃতিত্ব বোঝায় না। তবে একটা বিষয় মানতেই হবে, আমার মা-বাবা কখনো আমাদের বাইরের পড়াশুনোয় হস্তক্ষেপ করতেন না। যেখান থেকে যা খুশি বই এনে আমরা পড়তাম, কোনো দিনও বাধা দেননি। অবিশ্যি বাইরের পুরুষমানুষদের কথা আলাদা। তাদের সকলকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছিলাম। এর আগেও বলেছি ৫০ বছর আগে এর একটা কারণ ছিল, তখন যেসব মেয়েরা স্বাধীনভাবে বাইরে বিচরণ করত—অর্থাৎ পুরুষ রক্ষাকর্তা ছাড়া কলেজ যেত, সিনেমা দেখতে যাবার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবত না—তাদের মধ্যে সবাই না হলেও $^{২}/_{৩}$ ভাগ ছিল ব্রাহ্ম মেয়ে। যেসব হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে তাদের দেখাশোনা হত, তাদের ৯০% হিন্দু এবং ৮০% ছেলের বাড়ির মেয়েরা অন্য পুরুষদের সঙ্গে কথা বলত না। এসব ছেলেদের পক্ষে একথা ভাবা অসম্ভব ছিল না যে যে-সমস্ত মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পড়াশুনো করে, তাদের পক্ষে ভালো থাকা অসম্ভব। এই মনে করে মেলামেশায় তাঁরা বাধা দিতেন, কানে সতর্কবাণী ঢালতেন। তবে আমাদের বাড়ির আবহাওয়া একটু অন্যরকম ছিল। কারণ আমরা ছিলাম যাকে বলা হত "এক পুরুষের ব্রাহ্ম"। আমাদের আপন জ্যাঠা-পিসিদের অর্ধেক হিন্দু কেউ কেউ গোঁড়া হিন্দু। হিন্দুদের নৈকট্য

আমাদের হাড়ে হাড়ে।

তাছাড়া হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে মিশব না তো কার সঙ্গে মিশব ? আমাদের ক্লাসের ১০০টি ছেলের মধ্যে একটিও ব্রাহ্ম ছিল কি না সন্দেহ। তিনটি মেয়ের মধ্যে অবশ্য দুজন ব্রাহ্ম ! তৃতীয়জন একজন অসাধারণ মেয়ে, তার নাম কমলা দাশগুপ্তা, সে সারা জীবন স্বদেশকে ভালোবেসেছে, সাধ্যমতো সেবা করেছে, দীর্ঘকাল জেল খেটেছে, সাধ আহ্লাদ উচ্চাশা সব ত্যাগ করেছে। তার স্বাস্থ্য ভেঙেছে, জনসাধারণ তাকে ভুলেছে, কিন্তু আমার হৃদয়ে আমি তাকে সোনার সিংহাসনে বসিয়ে রেখেছি। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। বছরের পর বছর যদিও তার সঙ্গে দেখা হয় না।

তারপর অধ্যাপকদের কথাই যদি ধরা যায়, তাঁদের মধ্যে তিনজন মাত্র ব্রাহ্ম ছিলেন। অগ্রণী হলেন অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, যাঁর বৈদগ্ধ্য ও খটমট বাক্যালাপ এবং গোঁড়া ব্রাহ্মত্বের পিছনে একটা উজ্জ্বল পৌরুষ বিরাজমান ছিল। সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। ট্রাস্ট-ডীড অনুসারে সেখানকার মাটিতে কোনো ধর্মানুষ্ঠান হতে পারে না। অথচ ছেলেরা সরস্বতী পুজো করবেই। তখন আইন-অমান্য আন্দোলন আর ছাত্র জাগরণ চরমে উঠেছিল ; কোনোরকম বাধা. তা সে ন্যায্যই হোক কি অন্যায়ই হোক, ছেলেরা সইতে পারল না। সরস্বতী পূজা বন্ধ করার জন্য রেগেমেগে তারা ঐ পরম পণ্ডিত মানুষটির গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দিয়েছিল। আমি সেখানে ছিলাম না, কিন্তু একজন সহপাঠী—বলাবাহুল্য সে হিন্দু—আমাকে বলেছিল যে তাঁর মুখে এতটুকু রাগ-অপমানের ছাপ পড়ল না, বললেন—একটু নাকি সুরে কথা বলতেন—"দাঁও, তাই দাঁও, অন্য লোকে ফুলের মালা পায়, আমাকে জুতোর মালাই দাঁও !" এখানে বলা উচিত যে সিটি কলেজে যাই হোক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদিনের জন্যেও কেউ তাঁকে অশ্রদ্ধা দেখায়নি।

আমি দু-বছর পড়লাম নানারকম হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে, কখনো কারো আপত্তিকর ব্যবহার চোখে পড়ল না। মাঝে মাঝে খানিকটা দূরত্ব রেখে পিছন পিছন আসত বটে, কিন্তু কিছু বলত না। এর বহু কাল পরে, বেতারে কাজ করার সময় গোপাল দাশগুপ্ত বলে একজন সঙ্গীত প্রযোজকের কাছে কিছু সহযোগিতা চাইতে গেছি, তিনি বললেন, "কি, এখন কেন ? ইউনিভার্সিটির দালান দিয়ে যখন কেবলি পেছন পেছন হেঁটেছি, তখন তো নাক তুলে চলে যেতেন !"

এমনি লেকচারের সময় কথা বলবার সুযোগ না হলেও ৮-১০টি ছাত্র-ছাত্রী দিয়ে একেকটি টিউটরিয়েল গ্রুপ হত, তখন আমরা খোলাখুলি নানা বিষয়ে আলাপ করতে পারতাম। ক্লাসের ভালো ছাত্রদের বেছে আমাদের গ্রুপটি তৈরি করা হয়েছিল। এদের মধ্যে কয়েকজন আমার আজীবনের বন্ধু হয়ে গেছে ; শুধু

তারাই নয়, তাদের পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের আত্মীয়তার সম্বন্ধ হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই প্রিয় বন্ধুগুলির মধ্যে অনেকেই আর নেই। তাদের কথা না বলে পারছি না। একজন হল সেই সুনীতকুমার ইন্দ্র, যে আই-এতে প্রথম হয়েছিল। বেঁটে, শামলা, অল্পভাষী মানুষটি. মাঝে মাঝে তারার মতো জ্বলজ্বল করে উঠত, কি কোমলতা কি স্নেহ তার মধ্যে ছিল, কি সাহিত্যানুরাগ। আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করত, পরে মৌলানা আজাদ কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিল। সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকতে থাকতেই নিতান্ত অকালে হৃদ্‌রোগে মারা গেছিল।

আরেকজন ছিল গোপাল মজুমদার। খুব ভালো ছাত্র, আদর্শবাদী। কয়েক বছর আগে রেলের চাকার তলা থেকে দুটি অচেনা শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে, নিজের প্রাণ দিয়েছিল। একটি শিশু বেঁচেছিল। আরেকজন ছিল অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, পরে বিদ্যাসাগর কলেজে দেখেছিলাম। শিক্ষা ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। বিশ্বভারতীর বিনয় ভবনের জনপ্রিয় অধ্যক্ষ সুনীলকুমার সরকার আরেকজন। কয়েক বছর হল সেও আমাদের ছেড়ে গেছে। যেমন মধুর গানের গলা ছিল, তেমনি মিষ্টি মানুষটি। চমৎকার সাহিত্যবোধ ছিল ; অতিশয় উৎকৃষ্ট কিছু লেখা রেখে গেছে। সুনীলের স্ত্রী কৃষ্ণাকে আমি বড়ই ভালোবাসি ; ওর একমাত্র ছেলে বিশ্বভারতীর সম্মানিত কর্মী। প্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায় বলে আরেকজন ছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি মধুর তার ব্যবহার, শিল্পী মন ছিল, সাহিত্যানুরাগী ছিল। দীর্ঘকাল জামশেদপুরে প্রশংসার সঙ্গে কর্মজীবন কাটিয়ে এখন কলকাতার অধিবাসী। এই মানুষটির সঙ্গে আমার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর দৌহিত্রের কন্যা বিবাহ করেছে। সবচাইতে গভীর ও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব যার সঙ্গে হয়েছে, তার নাম জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের বড় ছেলে। জ্যোৎস্না আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো, আমাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। পড়াশুনোয় ভালো ছিল, আইন পরীক্ষার উজ্জ্বল তারকা ; পরে মুন্সেফি করে, জজিয়তি করে, এখন অবসর নিয়েও নানান উচ্চ পদ ভূষিত করছে। তবে সেইটেই বড় কথা নয়। এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সরস, সস্নেহ মানুষ কম হয়। সাহিত্যের এমন বুদ্ধিমান সমালোচকও খুব বেশি নেই। বিদগ্ধ প্রবন্ধ লেখে, তবে ক্বচিৎ কদাচিৎ। ভালো প্রবন্ধ লিখতে হলে যে নির্মম ভেদজ্ঞানের সঙ্গে, গভীর বৈদগ্ধ্য রসবোধ আর সহানুভূতি থাকা দরকার সেসব গুণ যে জ্যোৎস্নার প্রচুর পরিমাণে আছে, একথা তার সম্প্রতি প্রকাশিত "সাহিত্যের সীমানা" নামক প্রবন্ধ পুস্তক পড়লেই বোঝা যায়।

এম-এ ডিগ্রি ও পদক আমার জীবনে বিশেষ কোনো কাজে না লাগলেও, এই বন্ধুত্বগুলি এবং এই বন্ধুত্বের স্মৃতি আমার পরম সম্পদ।

মাস্টার মশাইদের কথাও বলতে হয়। এর আগে আমার "আর কোনোখানে" নামক স্মৃতি-গ্রন্থে আমি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলাম যে এম-এ ক্লাসে ঢুকে প্রথম বাঙালীদের কাছে ইংরিজি পড়লাম। গোড়ায় তাঁদের ইংরিজি উচ্চারণ শুনে চমকে গেলেও, অনতিবিলম্বে বুঝেছিলাম যে উচ্চারণ যতই অশুদ্ধ হোক না কেন, এঁদের গভীর পাণ্ডিত্যর কাছে আগেকার ঐ মেমরা দাঁড়াতে পারবেন না। তবে পূর্বোল্লিখিত সিস্টার ডরথি ফ্রান্সিসকে এই মন্তব্য থেকে বাদ দিতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে শুনেছিলাম তিনি ইংল্যাণ্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ খেতাবধারিণী এবং এক কালে একটি সুখী পরিবারের গৃহিণী ছিলেন। সেই সুখে বজ্রাঘাত হবার পরে হয়তো সন্ন্যাসিনী হয়েছিলেন। তবে সাংসারিক সম্পদ ছাড়লেও হৃদয়ের সম্পদগুলো সঙ্গে করে এনেছিলেন।

সে যাই হোক, ইউনিভার্সিটির মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আমাদের নিতান্ত লেখাপড়ার সম্বন্ধ ছিল। তার বেশি আমরা আশা করতাম না, পাইওনি। তাঁরা ছিলেন নিতান্ত মাস্টারমশাই ; গুরুর আসন নেবার কোনো চেষ্টা করেননি। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, যাঁর অসাধারণত্বের জোরে তিনি স্বচ্ছন্দে ঐ শতাধিক ছেলেমেয়ের গুরুর পদ দাবি করতে পারতেন। তাঁর নাম প্রফুল্ল ঘোষ। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথ্যে অধ্যাপনা করতেন। পড়াতেন শেক্সপীয়র, মাঝে মাঝে চসার। মোটা বেঁটে শ্যামলা খাঁদামতো নাক-মুখ, গলাবন্ধ কোটের সঙ্গে সাধারণ ধুতি পরা ; সাজসজ্জা করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই ; বয়স তখন হয়তো ৫১-৫২র বেশি নয়, তবে মাঝখানে ৩০বছরের ব্যবধান থাকাতে আমাদের মনে হত বুড়ো ; বাবার কাছাকাছি বয়সী তো বটেই।

কারো সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করবার চেষ্টা ছিল না, কাউকে কাছে ডাকতেন না, ভালো ছাত্রদেরও কখনো বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না, সবাই তাঁর কাছে সমান। শেষ দুটি ঘণ্টা ক্লাস নিতেন, সপ্তাহে এক দিন। সেই দুই ঘন্টা মাঝে মাঝে সাড়ে তিন ঘন্টায় দাঁড়াত। শেক্সপীয়রের এককেটি নাটক একবারে পড়ে শেষ করতেন। পড়তেন বললে ঠিক বলা হবে না ; অভিনয়ও করতেন না, তাতে কিছু কৃত্রিমতা থাকে ; বরং বলতে হয় দান করতেন। প্রফুল্ল ঘোষ আমাদের চোখের সামনে একটির পর একটি চরিত্র বলে যেতেন। এমন কি ওঁর সেই শামলা ভোঁদা শরীরটা চোখের সামনে সুন্দরী ডেস্‌ডিমোনা হয়ে যেত। একটা মানুষের গলা দিয়ে যে এত চরিত্র কথা বলতে পারে এ আমার ধারণা ছিল না। কোনো নাটুকেপনা ছিল না ; হাত পা এতটুকু নাড়তেন না ; কণ্ঠ দিয়ে সমস্ত সম্পন্ন হত। ওঁকে যেন দৈব-দশায় পেত। ক্লাসরুমের দেয়াল কোথায় সরে যেত ; আমরা সকলে নিঃশব্দে কোনো এক রসলোকে উপনীত হতাম। দেখতে দেখতে অন্য ক্লাসের, অন্য কলেজের ছাত্ররা এসে ভিড় করত। কারো

মুখে কথা নেই। পড়া শেষ হলে, কি অধ্যাপক কি তাঁর শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো যে যার পথ দেখত। শুধু শেক্সপীয়র পড়াতে নয়, চসার পড়াতেও তাঁর অসাধারণ প্রতিভা প্রস্ফুটিত হত। একবার একটি রঙের নাম পাওয়া গেল, কিন্তু সে শব্দটি এখন আর ব্যবহার হয় না, ঠিক কি যে রঙ বোঝা গেল না, মেটে কি বেগ্নি, কি ঐ ধরনের কিছু। আমাদের অধ্যাপকও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। পরের সপ্তাহে ৫-৬টি মোটা মোটা মধ্য-যুগীয় ইংরিজি কাব্যের বই এনে রঙটি যে বাস্তবিকই মেটে-বেগ্নি সে কথা প্রতিষ্ঠা করলেন। দুঃখের বিষয় এমন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও, তিনি পরবর্তী কালের ছাত্রদের জন্য এক লাইনও লিখে গেলেন না। তাঁর নাম এখন একটা প্রবাদ মাত্র।

॥ ৩১ ॥

আমার ছাত্র-জীবনের কাহিনী ক্রমে শেষ হয়ে আসছে। এম্-এ পাস্ করবার পর আর আমি কখনো কোনো পরীক্ষা দেবার কিম্বা মস্ত প্রবন্ধ লিখে খেতাব পাবার চেষ্টা করিনি। ও-সবের সঙ্গে আমার কি? ঐ দু-বছরে আমি অনেক বিদগ্ধজনের দেখা পেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে সকলে আমার মাস্টারমশাই ছিলেন না। যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম আগে বলি। বিদগ্ধ-শিরোমণি জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। আমাদের শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইত্যাদি পড়াতেন। ছোট খাটো প্রৌঢ়, ফিটফাট কাপড়চোপড়, কিঞ্চিৎ কাঠখোট্টা চেহারা, কিন্তু কাব্যরসে ডুবে থাকতেন। শেলি কীটসের গুণ স্বীকার করেও ওঁদের আমার মনে ধরত না। কেমন একটু মরে গেলাম, গলে গেলাম, উচ্ছ্বাসের ভাব মনে হত। ওয়ার্ডসওয়ার্থ অমনটি না হলেও এত সামান্য জিনিস নিয়ে এত দীর্ঘ ভাব জমান যে আমার ধৈর্য থাকত না। সেকালে যাঁর দ্বারা আমি সব চাইতে প্রভাবিত হয়েছিলাম, তিনি হলেন রবার্ট ব্রাউনিং। তাঁর বলিষ্ঠ, মাঝেমাঝে রূঢ় রুক্ষ পদগুলি আমার মনের মধ্যে গেঁথে যেত। দুঃখের বিষয় আমাদের বিশেষ পাঠ্য-বিষয় ছিল রোমাণ্টিক কবিদের গোড়ার কজনা। তাই কার্য-কলাপে যিনি সব চাইতে রোমাণ্টিক চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁকে নমোনম করে ছেড়ে দেওয়া হত। কিন্তু আমি তাঁকে আজ পর্যন্ত ছাড়তে পারিনি।

আরেকজন ছিলেন রজনীকান্ত গুহ, প্রৌঢ়, ব্রাহ্ম, প্রচ্ছন্ন একটু সরসতায় চোখ মিটমিট করত, বার্ক কারলাইল্ পড়াতেন। দিদিদের ক্লাসে একদিন যা বলেছিলেন, তার বাংলা হল, "বন্ধুগণ, আমি তোমাদের এমন সব কথা বলতে পারি, যার ফলে যদি এখনো অবিবাহিত থাক, তো চিরকাল অবিবাহিতই থাকবে!" দেশকর্মী ছিলেন, অশ্বিনীকুমার দত্তের সহকর্মী, দেশের জন্য অনেক কষ্টও সহ্য করেছিলেন, কিন্তু সে-সব তাঁর মনে কোনো তিক্ততা রেখে গেছে বলে

মনে হত না। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম।

মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন, মেধাবী, আইনজ্ঞ, বিদ্বান, কিন্তু দুঃখের বিষয় মেয়েদের দিকে পাশ ফিরে গড়গড় করে ল্যাগুর পড়িয়ে যেতেন বলে, আমাকে একটুও প্রভাবিত করেননি। আরো অনেকে ছিলেন, প্রত্যেকে পণ্ডিত মানুষ, কর্তব্যপরায়ণ, কিন্তু কেউ আমার মনে আলো জ্বালাননি, সেটা নিশ্চয় আমারি অনবধানতার জন্য। প্রিয়রঞ্জন সেন, কুমুদবন্ধু রায়, সুহাসচন্দ্র রায়, পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু এঁদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার পথ আমার যে বড়ই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। আরেকজন ছিলেন, তাঁর পুরো নামটি নিয়ে গোলমাল লাগছে, বোধ হয় কে-সি মুখার্জি, শৌখিন, অমায়িক, বিদগ্ধ, অক্সফর্ড কিম্বা কেমব্রিজে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিতও ছিলেন, তাঁকে আমার ভালো লাগত।

সে-সময়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে ছাত্ররা ভারি শ্রদ্ধার চোখে দেখত। দুঃখের বিষয় তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাইনি, কারণ তিনি ছিলেন বি-গ্রুপের মাস্টারমশাই। যে-দুজন অধ্যাপককে আজ-ও মাঝে মাঝে দেখি, তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার সেন আর শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যাঁর স্নেহ লাভ করে এ-বয়সেও আমি কৃতার্থ। তবে সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হচ্ছি এঁরা কেউ আমাদের দিকে ফিরেও দেখতেন না ; আমরা আছি কি নেই সে বিষয়ে চৈতন্য ছিল কি না টের পেতাম না। সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভাষায় অমন পাণ্ডিত্য আমি আর কারো মধ্যে দেখিনি। তার ওপর ছিল রসবোধ, সেকালের অধ্যাপকদের মন থেকে যে জিনিসটি উপচে পড়ত, কিন্তু এখন খুঁজে দেখতে হয়। একদা আমার বড়দা সুকুমার রায়ের মণ্ডে ক্লাবের সদস্য ছিলেন সুনীতিকুমার। তাঁর পি-আর-এস্ লাভ উপলক্ষ্যে তাঁর ঘাড় ভেঙে অন্য সদস্যরা ১৭½ টাকার ভোজ খেয়েছিল, অন্য সূত্রে সে-কথাও জানতাম।

যতদূর মনে হচ্ছে তখন ভারতীয় ভাষা বিভাগে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী অধ্যাপনা করতেন। আমাদের প্রিয় বন্ধু নীহাররঞ্জন রায়ের বৈদগ্ধ্য তখনি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খুবই কম বয়সে পি-আর-এস্ হয়ে, ফাইন-আর্টস বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সারা জীবন তাঁর বঙ্গ-সাহিত্যের দিকে, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের দিকে মন ছিল। আমার চাইতে খুব বেশি বড় নন, বড় জোর বছর চারেকের, কিন্তু সে সময়ে দুজনার মধ্যে তাঁর জ্ঞানের গরিমার জন্য আকাশ-পাতাল ব্যবধান ছিল। আমার সাহিত্য জীবন অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে, মাঝে মাঝে অনেক দিনের নীরবতা রেখে, অগ্রসর হয়েছিল। আমি যখন পায়ের নিচে মাটি খুঁজছি, তখন আমার সম-বয়সীরা, বুদ্ধদেব বসু, আশাপূর্ণা দেবী, অজিত দত্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইত্যাদি যশস্বী লেখক বলে সকলের কাছে পরিচিত। তবে ছোটদের জন্য লেখার কথা অন্য এক জিনিস। নীহারদাকে আমার ষোল বছর বয়স থেকেই চিনতাম। উনি অমল হোমের আপন খুড়তুতো ভাই। ওঁদের আসল পদবী হোম রায়। অমল হোমরা রায়টা ছাড়লেন, নীহারদারা হোমটা ছাড়লেন। যতদূর মনে হয় নীহারদা সে সময়ে ইউনিভার্সিটি ত্রৈমাসিকের সম্পাদক ছিলেন। আশুতোষ বিল্ডিং-এর তিন তলায় রঙীন কাচের জানলা দেওয়া আশুতোষ হল্-এর উদ্বোধন হল। আমি সেখানে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর সনেট্স্ ফ্রম দি পর্টুগীজ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলাম। নীহারদা পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ত্রৈমাসিকে ছেপে দিলেন। সমালোচনার জগতে এই আমার প্রথম পদক্ষেপ ; ইংরিজি কাব্য প্রসঙ্গ, ইংরিজিতে রচনা। বাংলা সমালোচনায় নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে আমার এতটুকু আস্থা ছিল না, কিন্তু কিছু পড়লেই মনের মধ্যে কতকগুলো জিজ্ঞাসা সর্বদা ভিড় করে আসত। ঐ জিজ্ঞাসাই হল সমালোচকের প্রধান উপজীব্য এ-কথা পরে বুঝেছিলাম। অপরের চিন্তারাজ্যে পথ চিনে হাঁটা ; নিজের চিন্তারাশির তার ওপর আরোপ করা নয়। অন্যের লেখার ভালো-মন্দ বিচার করা নয়, বলিষ্ঠতা দুর্বলতা প্রকাশ করা। যে পড়বে সে বিচার করুক। এ-কাজ বড় সহজ নয় ; এক সঙ্গে নির্মমভাবে অন্যের চিন্তা-রাজ্যে দৃষ্টিপাত করা, এবং হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি দিয়ে তার যুক্তি অনুধাবন করা। অবশ্য তার মানে নয় যে যুক্তি গ্রহণ করতে হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর কোমল সমবেদনা না থাকলে, সমালোচনায় হাত না দিলেই ভালো। আমি কে যে আমার উপলব্ধি আরেক জনের ওপর চাপাব? শুধু সমালোচনা লিখে সাহিত্যিক হতে ১০০জনের মধ্যে একজন হয়তো পারে। শুধু অপরের দোষ গুণ বলে দিয়ে তো আর সাহিত্যিক হওয়া যায় না, নিজেকে কিছু দিতে হয়।মৌলিক লেখা ছাড়া অন্য কিছুকে আমি সাহিত্যের আসরে আসন দিই না। সমালোচনা লিখি মাঝেমাঝে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে, সেই ইংরিজি কবিতা মনে রেখে

"ট্রেড সফ্‌ট্‌লি, ফর ইউ ট্রেড্ আপন মাই ড্রীমস!" আস্তে পা ফেল, কারণ আমার স্বপ্নের ওপর পা ফেলেছ। সে যাই হক একটি বয়ঃপ্রাপ্তদের পত্রিকায় আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে 'ফরওয়ার্ড' বলে একটি ইংরিজি সাপ্তাহিক, তার সম্পাদক কে মনে নেই, যে-কোনো বিষয়ে একটি প্রবন্ধ চেয়ে বসল। আমি আধুনিক ছেলেমেয়েদের মনোভাব সম্বন্ধে ছোট-খাটো একটি প্রবন্ধ লিখে দিলাম। ইংরিজিতে। পাঠকদের সেটি ভালো লেগেছিল। কিন্তু আমার এতটা ভালো লাগেনি যে যত্ন করে তুলে রাখব। বয়স্ক পাঠকদের জন্য বাংলায় লিখব্যর সৎ-সাহস আমার ছিল না, অথচ বক্তব্য যথেষ্ট ছিল। আমি আমাদের পূর্ববর্তীদের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলাম।

তবে আমার চিন্তাগুলো যে বড় কাঁচা তাও জানতাম।

ছোটদের জন্য গল্প লেখায় নিজেকে ছেড়ে দিতে পারতাম। সবগুলি গল্প যে খুব ভালো হত তাও নয়। তবু মনে হত আমার মনের মধ্যে থেকে কেউ আমাকে লিখতে বাধ্য করে। গল্পগুলো তৈরি করে আমার কলমের আগায় এনে উপস্থিত করে। রাফ্ খাতা থাকত না ; ভুল-ভাল শুধরে একটা সংশোধিত সংস্করণ নেই ; মনে মনে টৈটম্বুর হয়ে না উঠলে, কলম সরে না। লেখা হয়ে গেলে একবার বানান ব্যাকরণ দেখে দেওয়া। আর কিছু নয়। তবে মাঝেমাঝে খানিকটা লেখা হলে আমার ঐ ভেতরকার মানুষটা আমাকে ত্যাগ করে, তখন লেখা ছিঁড়ে ফেলতে হয়। মাঝেমাঝে সে আমাকে ভুলে যায় ; তখন আমি কিছু লিখতে পারি না। যদি পেড়াপিড়ির পাত্রী হয়ে জোর করে লিখি, সে লেখা উৎরোয় না। ইঁট কাঠ খড় দিয়ে আমি গল্পটা তৈরি করতে পারি না। মোট কথা 'সন্দেশে' ২-১ মাস পর পর একটি করে গল্প লিখি। তার জন্য একটি করে চাইনিজ্ ইংক দিয়ে ছবিও এঁকে দিই। একবার সন্দেশের সম্পাদক আমার মণিদা, (অর্থাৎ সুবিনয় রায়) ধরলেন, "জল রঙ দিয়ে ফুল-পেজ একটা ছবি এঁকে দাও, তাকে দিয়েই গল্প হবে।" জল-রঙ-এর কাজ ভালো করে শিখিনি। সেই যে আমার স্কুল-জীবনে পরেশ গুপ্ত বলে একজন ছবি আঁকার মাস্টারমশাই ছোট জ্যাঠা ঠিক করে দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে যত্ন করে ক্রেয়নের কাজ আর তেল-রঙের কাজ শিখিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমার বড়দিকে তাঁদের কটকের বাড়িতে বসে তেল-রঙে অপূর্ব সব সমুদ্রের দৃশ্য আঁকতে দেখেছিলাম। নিজেও কিছু কিছু এঁকে একে ওকে দিয়েছিলাম। কিন্তু জল-রঙ সামান্যই জানতাম। তবে শখ ছিল'। শখ মানুষকে যতদূর নিয়ে যায়, তেমন আর কিছুতে নয়। দিলাম একটা পুকুরের দৃশ্য এঁকে। পুকুরে মাছ-মায়ের পাশে মাছ-মেয়ে বিকট মেছো ভেংচি কাটছে। অবিশ্যি এ-সব করবার সঙ্গে সঙ্গেই জানতাম, এ আমার কাজ নয়। ঐ লেখাটুকু আমার আসল কাজ। গোটা দশেক সচিত্র গল্প সন্দেশে ছাপা হবার পর, "সন্দেশ" বন্ধ হয়ে গেল। আমার গল্প লেখায় ছেদ পড়ল। কিন্তু তখন আর থামবার কথা ওঠে না। রামধনুতে, মৌচাকে, মাঝে-মাঝেই গল্প বেরুত। একটা বিষয়ে সচেতন ছিলাম, আমার লেখা ছোটদের গল্প যদি সম্পাদক গ্রহণ না করেন, তাহলে দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে। তাই জীবনে কখনো নিজের থেকে কোনো সম্পাদককে লেখা পাঠাইনি। সম্পাদক চেয়েছেন, তবে দিয়েছি। ফেরৎ দেননি কেউ। শুধু অনেক পরে বুদ্ধদেব বসুর আমার একটি গল্প পছন্দ হয়নি। তার বদলে 'বৈশাখীর' জন্য আরেকটি চেয়ে নিয়েছিলেন। অপছন্দের গল্পটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। তার নাম 'সবুজ যার চোখ'।

এই সময় শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে প্রথম দেখলাম। তাঁর লেখা কবিতা অনেক দিন থেকেই পড়তাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে এক সাহিত্য-সভা হয়েছিল, কে উদ্যোক্তা কি উপলক্ষ্য কিছুই মনে নেই। বক্তা শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। তখনো তাঁর কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে বিবাহ হয়নি। শুনেছিলাম বাল-বিধবা। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন মেয়েরা পড়ত না, তাই আসর জমাবার জন্য ইউনিভার্সিটির ছাত্রীরা নিমন্ত্রিত হল। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে বলেছিলেন। মনে আছে যে ভালো লেগেছিল, কিন্তু বক্তব্যের বেশি কিছু মনে করতে পারছি না, তবে এটুকু মনে আছে তিনি বলেছিলেন ঘরে-বাইরের একেকটি চরিত্র একেকটি প্রতীক। শুনে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সব চরিত্রই একেকটি বিশেষ চিন্তাধারার প্রতীক। এখনো ভাবি সত্যিই তাই, ওরা কেউ রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরি আস্ত আস্ত মাটির মানুষ নয়। ওদের স্থান সাধারণত্বের খানিকটা ওপরে। মনটা রাধারাণী-বৌদির কথায় সায় দিয়েছিল। পরে তাঁকে আরো কাছে থেকে অনেকবার দেখেছি। প্রথম দিনের ঐ কথাগুলি যতখানি মনে ধরেছিল তেমন আর কোনো কথা নয়।

সে সময় কলেজের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে মোট ২০জন মেয়েও পড়ত কি না সন্দেহ। তাদের মধ্যে দেশকর্মী কল্যাণী দাশ ছিল। এমন নির্মল দৃঢ় চরিত্র, এমন আদর্শবাদী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। পরবর্তী কালে এর ছোট বোন বীণা দাশেরও লাট সাহেবকে হত্যা করার চেষ্টার জন্য বহু দিন কারাবাস দণ্ড হয়েছিল। কল্যাণীও দীর্ঘকাল জেলে থেকে অশেষ অপমান আর লাঞ্ছনা ভোগ করেছিল। এদের আজকালকার সাধারণ লোকরা ভুলেই গেছে। এক দিকে নির্মম দেশকর্মী, অন্য দিকে কি কোমল স্বভাব, মানুষের দুঃখে ওদের চোখে জল আসত। গান্ধীজি যেদিন অনশন করতেন, ওরাও সেদিন জল স্পর্শ করত না। পরিবারটাই ছিল অন্য রকম। আদর্শবাদী। কটকে ওদের বাবা বেণী মাধব দাশের ছাত্র ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এবং গুরুর কাছেই স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। কল্যাণী দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পড়ত। আমার কৈশোরের বন্ধু মীরা দত্ত গুপ্তা পড়ত গণিতে। মেয়েদের আলাদা একটা কমনরুম ছিল, দোতলার দালানের এক মাথা পার্টিশন দিয়ে আলাদা করে বসবার ঘরটি হয়েছিল। মধ্যিখানে একটা বড় টেবিল, তার চারদিকে অনেকগুলি কাঠের চেয়ার। মেয়েদের ব্যবহারের জন্য আলাদা একটা বাথরুম্-ও ছিল। কিন্তু সেটি কমনরুমের সংলগ্ন না হয়ে, তিনতলায় অবস্থিত ছিল। তার দরজায় তালা দেওয়া থাকত। দরোয়ানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলতে হত। তবে সে তালা-চাবি অভেদ্য ছিল না। ঘরের দেওয়ালে মাঝে মাঝে পেনসিল দিয়ে অশ্লীল মন্তব্য লেখা আর ছবি আঁকা থাকত। এখানে সব ভদ্রঘরের শিক্ষিত

যুবকরা পড়ত, তবু কি করে সেটা সম্ভব হত জানি না। আগেও বলেছি যে-মেয়েরা উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণ করত, তখনো আমাদের দেশের লোকদের বেশির ভাগ তাদের শ্রদ্ধা করতে শেখেনি। আমরা আমাদের আত্মসম্মান রক্ষা-কবচের মতো হাতের মুঠোর মধ্যে করে নিয়ে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে ছেলেরা ব্ল্যাক-বোর্ডে আমাদের নামেও কবিতা লিখে রাখত। আমার নামেও বার দুই লিখেছিল। কিন্তু সেগুলো খোশামোদ-প্যাটার্নের হওয়াতে, যতটা চটতে পারতাম, ততটা চটিনি। একদিন কমনরুমে ঢুকে দেখি আবহাওয়া কেমন থমথমে।

টেবিলের ওপর 'ভোট-রঙ্গ' বলে গোলাপী একটা দৈনিক পড়ে আছে। আমরা 'ভোট-রঙ্গ' পড়তাম না, এর আগে কখনো হাতেও পাইনি। ভোটরঙ্গ ঘিরে হাঁড়ি-মুখ করে ৬-৭জন মেয়ে বসে আছে। কি ব্যাপার ? না, খুলে পড়েই দেখ না। ভোটরঙ্গে একটা লম্বা কবিতা। কোনো ছাত্রীকে নাকি বৃষ্টি পড়ার সময় লেকের ধারে একজন ছাত্রের সঙ্গে এক বর্ষাতি গায়ে দিতে দেখা গিয়েছিল। এই হল ব্যাপার। কবিতার শিরোনামায় অপরাধী যুগলের নামের ইঙ্গিত রয়েছে। উত্তেজিত ভাবে ছাত্রীরা বলতে লাগল, এতে সমস্ত ছাত্রীদের নিন্দা হয়। এ-রকম হতে দেওয়া উচিত নয়। ওকে এক-ঘরে করা হবে। ওকে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হক। আমরা ওকে একশো বার বলেছি ঐ রিসার্চ স্টুডেন্টের সঙ্গে অত কি ভাব ! ইত্যাদি। শুনে আমি অবাক হলাম, "তোমরা একথা জানতে নাকি ?"

"নিশ্চয় জানতাম, রোজ রোজ ওর সঙ্গে বেড়তে যায়। সে ভালো ছাত্র হলে কি হবে, এ কি রকম জঘন্য ব্যবহার !"

"জানতে তো এর আগে ওকে একঘরে করনি কেন ? মোট কথা আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। কোথায় সে ?"

"কোথায় আবার ? দালানে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে, এখানে মুখ দেখাতে লজ্জা করছে।" সেই মেয়েকে খুঁজে নিয়ে তার ক্লাসের দোর-গোড়া অবধি পৌঁছে দিয়েছিলাম। ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ায়নি, ছাত্রীরা ঠাণ্ডা হয়ে গেছিল। পরে ঐ মেয়ের সঙ্গে ঐ রিসার্চ স্টুডেন্টের বিয়ে হয়েছিল। ভোটরঙ্গের ঘটকালিতে বিয়েটা একটু আগেই হল, নইলে ওদের ইচ্ছা ছিল পাত্র ডক্টরেট নিয়ে চাকরি পেয়ে তবে বিয়ে করবে। বড় কষ্টে কিছুদিন কাটাতে হয়েছিল, আশা করি পরে সুখী হয়েছিল।

আমিও এই ব্যাপার থেকে শিক্ষিত নর-নারীর মন সম্বন্ধে আমার প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। নিজেদের দুর্বলতা বিষয়ে যত ক্ষমাশীল, অন্যের ভুল-চুক বিষয়ে ঠিক ততটা সচেতন। এর মধ্যে খানিকটা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে অনেকখানি

নিষ্ঠুরতা থাকে। লোকে পাপ বলতে ভাবে নারী-পুরুষ সংঘটিত কিছু, কিন্তু আসলে নিষ্ঠুরতা হল সব চাইতে জঘন্য পাপ।

পুজোর সময়ে মীরাদের সঙ্গে এই প্রথম দারজিলিং গেলাম। শিলং ছাড়বার পর এই প্রথম পাহাড় দেখা। মীরার জ্যাঠামশাই এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বাবার সহপাঠী ছিলেন। নইলে একটা অচেনা হিন্দু পরিবারের সঙ্গে কোথাও একা যাবার অনুমোদন পাওয়া যেত না। বড় ভালো এই পরিবার । শিক্ষিত. উদার, কিন্তু সেকালের নিয়মে ওদের ঘরকন্না চলত। ওদের সঙ্গে কদিন থেকে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আর পাহাড় ? এমন মহান পাহাড় আমি ভাবতে পারিনি। হিমালয়ের মতো আছে কি ?

শিলং-এ যে হিমালয় দেখেছিলাম, কোনো কোনো বিশেষ জায়গায় দাঁড়িয়ে, পরিষ্কার দিনে, সে হিমালয় দেখে মনে হত বুঝি আকাশের পটে তুলি দিয়ে আঁকা, বাস্তব নয়। আর এই হিমালয়ও বাস্তব নয়, বাস্তব জিনিস এমন মহান মহিমাময় হয় না। কেবলি আমার দাদামশায়ের কথা মনে হত। তিনি হিমালয়ের তীর্থে তীর্থে শেষ জীবনটা কাটিয়েছিলেন। বাস্তব ছিল বটে আমার হৃদয়ের শিলং পাহাড়। এর মধ্যে দুর্গাপুজো এসে গেল। বাজারের ওপরে সুন্দর ঠাকুর গড়ে, ঘটা করে পুজো হল। বিকেলে দেখতে গেলাম। পথে 'মহারাণী স্কুলের' ২-৩ জন ব্রাহ্ম শিক্ষিকার সঙ্গে দেখা, তারাও আমার সঙ্গে গিয়ে ঠাকুর দেখে এল। পরদিন স্কুলের অধ্যক্ষা, শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়ে হেমলতা সরকার ওদের বকলেন, "ব্রাহ্ম হয়ে মূর্তি পুজো দেখতে গেলে ?" ওরা আর কিছু ভেবে না পেয়ে বলল. "লীলাও গেছিল।" হেম মাসিমা বলেছিলেন, "ওর কথা আলাদা। ওর দাদমশাই একবার ব্রাহ্ম হয়েও আবার হিন্দু হয়েছিলেন।" শুনে আমি অবাক ! আবার মনে হয়েছিল যে যারা উপনিষদের মন্ত্র পড়ে উপাসনা করে, তারা আবার অ-হিন্দু কিসে ? তবে মূর্তি পুজোয় আমারো মন সায় দেয় না ; তাই বলে তাকে নিরাকার পুজোর থেকে ছোট বলে দেখি না। সেদিন ওদের এত কথা বলিনি। কলকাতায় ফিরে এসে দিদিকে বলেছিলাম, "আমি যখন বিয়ে করব, একজন হিন্দুকে বিয়ে করব।" দিদি বলেছিল, "সে আমি সর্বদাই জানি।"

তারপর পড়াশুনোয় ডুবে গেছিলাম। বড় অশান্তির সময় ছিল সেটা, ১৯৩০, আইন-অমান্য আন্দোলনের বছর। হিংসাত্মক কার্য-কলাপ। অত্যাচার। সন্ত্রাস। নির্দোষ লোকদের গ্রেপ্তার। গুলি চালানো। এমন কি কলেজ স্ট্রীটের দোকান থেকে 'রোম্যান্টি রেভলুশ্যন ইন্ দি নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি' বইটিকেও দোকানের মালিকের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী পাঠ্য বিক্রির দায়ে ধরে নিয়ে গেল। বন্ধু-বান্ধব অনেকে জেলে গেল। বিলিতী জিনিসের ব্যবহার প্রায় উঠে গেল। বই ছাড়া আমরা কোনো বিলিতি জিনিস কিনতাম না। বিলিতী ? স্ত্রান কখনো কোনো

দেশের সম্পত্তি হয় ?

আমাদের পরীক্ষা পেছিয়ে গেল। মে-জুনে না হয়ে হল নভেম্বরে। আমি পরীক্ষা দিয়েই হেম-মাসিমাকে চিঠি লিখলাম আমাকে কিছুদিনের জন্য শিক্ষিকার পদ দিতে। হেম-মাসিমা শক্‌ড্। এ ছোট কাজ কি তোমার ভালো লাগবে ? কি করে বোঝাই যে আমার জীবনে এমন একটা সময় এসেছে যখন আমার একান্তভাবে একা থাকা দরকার। আমাদের বাড়িতে সবাই সবাইকে এত ভালোবাসত যে কারো পক্ষে একা থাকা অসম্ভব ছিল। সেই জীবনযাত্রা তার নিরাপত্তা আর স্নেহ দিয়ে আমাদের 'আমিত্ব'কে পঙ্গু করে দিত। তার ওপর বাবার সঙ্গে আমার কিছুতেই মতের মিল হত না।

গেলাম চলে দারজিলিং-এ, ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি। আমার তখন ২৩ বছর বয়স। দিদির ২৪। আমাদের বাড়ির অভিভাবকরা ঠিক-করা বিয়েতে বিশ্বাস করতেন না আর বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশাও পছন্দ করতেন না। অনেকে বলতে লাগলেন আমাদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে।

যাবার কয়েক দিন আগে পরীক্ষার ফল বেরোল। একজন ফিরিঙ্গি মেয়ে আর আমি একসঙ্গে প্রথম হয়েছি। এইখানেই আমার ছাত্র-জীবনের শেষ। কোনো উচ্চতর উপাধির জন্য চেষ্টাও করিনি। ছাত্র-জীবনের শেষ আর সংসারের প্রতিদিনকার বিদ্যালয়ের শিক্ষা-জীবনের শুরু। তার পাট চলেছে আজ পর্যন্ত।

এরপর আমার কর্ম-জীবন। সে আরেক কাহিনী।

॥ ৩২ ॥

২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সালের সন্ধ্যায় দার্জিলিং মেলে রওনা হলাম। তার আগের দিন ২৩ বছর পূর্ণ হয়েছে, বাড়িতে রাতে কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল ফুলকপি দিয়ে ঘি-ভাত, মাংস, টোমাটোর চাট্‌নি, পায়েস। অন্যান্য বছরের মতো গণেশদা, বাপি,.বড় জ্যাঠামশায়ের বড় নাতি নরেশ, বুলুদি, বুলাদা ইত্যাদি এসে আমার জন্মদিনের ভাগ নিয়েছিল। সকলেই জানত একটা যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর কখনো এভাবে জন্মদিন করা হবে না হয়ওনি। ঐ আমার বাপের বাড়িতে শেষ জন্মদিন।

তারো কয়েকদিন আগে এম-এ পরীক্ষার ফল বেরিয়েছিল। আমি আর একজন ফিরিঙ্গি মেয়ে একসঙ্গে প্রথম হয়েছিলাম। সোনার মেডেল পেয়েছিলাম, অবশ্যি ১ বছর পরে। সবাই ভেবেছিল হয়তো গবেষণা করব, পি-আর-এস হব। আমি মনে মনে জানতাম ও-সব কিছুই হব না, কোনো উচ্চ পদও অলংকৃত করব না, জীবনে একটিমাত্র কাজ করব, সেটি হল সাহিত্য। কি ভাবে করব, কোথায় করব তার কিছু ভাবিনি। আগের বছর ভেবেছিলাম একটা

স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে যাব, তা আমাকে ইন্টারভিউতেও ডাকেনি। ডাকলে আমাকেই দিতে হত, আমার চাইতে যোগ্য প্রার্থী ছিল না। ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, কারণ অন্যায়টার প্রতিবাদ করতে পারলাম না, কিন্তু নিরাশ হইনি। আমার মনে অন্য চিন্তা।

আমার কিছুদিন একলা থেকে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করার দরকার ছিল। পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই দার্জিলিং-এর মহারাণী স্কুলের অধ্যক্ষ, শিবনাথ শাস্ত্রীর মেয়ে, হেমলতা সরকারকে চিঠিতে লিখেছিলাম তাঁদের স্কুলে আমাকে ইংরিজি পড়াবার কাজ দেবেন কিনা। তাঁকে আমরা হেম-মাসিমা বলতাম, তাঁর মা-বাবা আমার ছোট মাসিকে মানুষ করেছিলেন। তাই একটু আত্মীয়তার দাবি ছিল। হেম-মাসিমা খোলাখুলি লিখলেন, এসো, কিন্তু বলে রাখছি সোনার করাতকে এখানে কাঠ কাটবার কাজে লাগাবো। একশো টাকা মাইনে পাবে। তার বেশি একমাত্র মিস বোস পান। ভাবলাম একশো টাকা তো অনেক টাকা। আসলে আমার নিজের পরিবেশের বাইরে অনাত্মীয়দের মধ্যে কিছুকাল কাটানো দরকার। অবিশ্যি সে কথা বাইরে বা বাড়িতে কোথাও প্রকাশ করিনি।

বলাবাহুল্য অক্ষত হৃদয়ে আমার তেইশ বছর বয়স হয়নি। সেকালের অনেকের মতে ২৩-এ মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। আমাদের পরিবারের সবই আলাদা। মেয়েরা বড় বেয়াড়া, যাদের কম বয়সে ধরে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা কেউ কেউ অবাধ্য ঘোড়ার মতো পা ঠুকতে ঠুকতে, চোখের সাদা দেখাতে দেখাতে ছাদনা-তলায় গেছিল। এবং সকলে শ্বশুরবাড়িতে সুনাম কিনেছিল। মা কিন্তু বিয়ে-টিয়ের বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। কোনো সম্বন্ধ এলে এমনি ভাগিয়ে দিতেন, আমাদের জিজ্ঞাসাও করতেন না। কিন্তু আমার একজনকে ভালো লাগত। এবং আমাদের বাড়ির সকলেও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে দিয়েছিল।

খুব যা-তা ছিল না সে, মাথায় লম্বা, রং ফর্সা, দেখতে সুন্দর, স্বভাব কোমল, ব্যবহার মিষ্টি সুকুমার, কমনীয়, সাহিত্যানুরাগী সদ্বংশজাত, আমার চেয়ে দু বছরের বড়। আমি মনে মনে মুগ্ধ। একটুখানি মন জানাজানি, দুটি সলজ্জ কথা, পৃথিবীটাকে স্বর্গ মনে হয়েছিল। কিন্তু যতই দিন যায় ততই বুঝি সে বড় ছেলেমানুষ, বড় কোমল, আমার আরো কড়া ওষুধ দরকার। কিন্তু সে কি মায়া, তার মনে কষ্ট দিতে বুক কাঁপে। চলে না গিয়ে উপায় ছিল না।

স্টেশনে সবাই এসেছিল বিদায় জানাতে, হাসি গল্প, নানা রসিকতা। ট্রেন ছেড়ে দিল, আমি আমার পুরনো জীবন থেকে শেকড়গুলো উপড়ে নিলাম। নিজে বুঝিনি, কিন্তু আসলে তখনি আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছিল। চারদিক থেকে কিসের একটা বেড়া খসে গেল, আমি মুক্তি পেলাম। সেকালের

সেকেণ্ড ক্লাস কামরা, পাশাপাশি দুটি। একটিতে হেম-মাসিমা আর প্রবীণ চারজন দিদিমণি, অন্যটিতে তিন-চারজন অপেক্ষাকৃত কমবয়সীদের সঙ্গে আমি। আমাদের সঙ্গে বছর চোদ্দ বয়সের, মণিকা। আমার সুখলতাদিদির মেয়ে, তার পিসি বনলতা রাও ওখানে পড়াতেন, তাঁর হেপাজতে যাচ্ছে। শুনলাম স্কুলের বোর্ডিং নানা কারণে উঠে গেছে, তবে মণিকা তার পিসির কাছে থাকবে। ক্লাস্ নাইনে পড়বে। মণিকা অসাধারণ গুণী মেয়ে ছিল, গান বাজনায় জন্মগত প্রতিভা, চমৎকার পিয়ানো বাজাত, ঐ বয়সেই সুর রচনা করত। দুঃখের বিষয়, মাত্র সতেরো বছর বয়সে ওর মা বাবা ওর বিয়ে দেন, তার এক বছর পরে ওর মৃত্যু হয়। এই কোমলা ভীতু স্বভাবের মেয়েটি আমার ঘরে শুত। আমি বকাবকি করলে, কাঁদত। কাঁদলে আমার খুব খারাপ লাগত, তাই আরো খানিকটা বকতাম। ভালোও বাসতাম। আসলে আমার নিজের মনে অশান্তি ছিল।

পরদিন সকালে শিলিগুড়িতে নেমে আমরা ছোট ট্রেনে উঠলাম। উদগ্রীব হয়ে জানলা দিয়ে চেয়ে রইলাম। কখন দিগন্তে নীল নীল পাহাড় দেখা দেবে। আমি পাহাড়ের মেয়ে, পাহাড় বড় ভালোবাসি। শিলিগুড়ির পর অনেকখানি পথ পার হলে পর দূরে বিশাল বিশাল কালো ছায়ার মতো দেখলাম। তারপর ঘন বনের মধ্যে দিয়ে রেলগাড়ি আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। যতই উঠি মন ততই হাল্কা হয়। দুপুরে যখন দার্জিলিং স্টেশনে নামলাম, বুঝলাম সমতলের দুশ্চিন্তা সমতলেই পড়ে আছে।

বাড়ির নাম অর্কিড লী, রেলের লাইনের ঠিক নিচে, ঢালের ওপর বাড়ি, পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ, তার ডালে ডালে অর্কিড ফুল। কার্ট রোড থেকে খাড়া পথ ধরে নেমে দেখি ফুল বাগানের সামনে লাল টিনের ছাদ দোতলা বাড়ি, ছাদের ওপর চিমনির ধোঁয়া বেরুবার টুপি পরানো নল। আমাদের সাড়া পেয়ে এক ঝাঁক নীল রঙের ছোট ছোট পাখি ছাদের তলা থেকে উড়ে বেরিয়ে এল। কে যেন বলল ওরা হল হাউস্ মার্টিন। বাগানে থোপা থোপা নীল ফর্গেট-মি-নট্ আর হলুদ প্রিম্‌রোজ ফুটেছিল, উত্তরের আকাশ জুড়ে রূপোলী কাঞ্চনজংঘা। নাকে এল কুয়াশার ধোঁয়াটে গন্ধ। ভাবলাম এখানে আমার সব দ্বন্দ্বের অবসান হবে।

বেজায় শীত, বাসিন্দারা সবে এসে পৌঁছেছে, ঘরকন্না গোছানো হয়নি। রান্না ঘরের উনুনে আঁচ দেওয়া ছিল বটে, কিন্তু এতগুলো মানুষের গরম জল করে দেওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। ফেব্রুয়ারির শেষ দিন, বড় ঠাণ্ডার সময়, শরীর মন জমে বরফ। খিচুড়ি আর ভাজাভুজি খেতে ভালোই লাগল। দোতলায় মস্ত উত্তুরে ঘরটিতে মণিকা আর আমি থাকব ; সমস্ত উত্তর দিকটা জুড়ে বে-উইণ্ডো,

গোল করে জানলা বসানো। বাইরে তাকালেই বরফের পাহাড়। জানলায় পাতলা গরম কাপড়ের পরদা, পুরনো হয়ে তার গরমত্ব চলে গেছে। কাঠের মেঝের ওপর গাল্‌চে নেই। একশো টাকা মাইনের দিদিমণির জন্য কে গাল্‌চে পেতে দেবে। ঐ ঘরে স্বচ্ছন্দে ২০টা খাট পড়তে পারত। বে-উইণ্ডোতে মস্ত আয়না দেওয়া পালিশজ্বলা সেগুন কাঠের ড্রেসিং টেবিল। মণিকার জন্য আরেকটি ছোট ড্রেসিং টেবিল। ঘরটির এক কোণে দুটি লড়ঝড়ে সস্তা লোহার খাট। বাকি ঘরটা ফাঁকা খাঁ-খাঁ করছে। আমাদের দুজনের জন্য দুটি আগাগোড়া পেতলের তৈরি সুন্দর খাট। তার লোহার স্প্রিং মচ্‌মচ্‌ করে কিন্তু সুঠাম পেতলের গড়ন এতটুকু টস্‌কায়নি। কে থাকত এ-ঘরে ? কারা শুত এমন সুন্দর খাটে। এই লম্বাটে বিলিতী আয়নায় কে মুখ দেখত ? আয়নার তলাকার দেরাজ টেনে খুললাম। হলদে হয়ে যাওয়া খবরের কাগজ পাতা, আর কিছু নেই। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। তার ওপর স্নানের জল যথেষ্ট গরম ছিল না। ঠাণ্ডা স্নানের ঘরে ঢুকে হঠাৎ মনে হল ও-ঘরে নিশ্চয় কারো ভালোবাসার মানুষ থাকত। জলের গামলাতে নীল ফুল আঁকা।

বাড়ির গিন্নি কমলা সেন, গোলগাল বেজায় ফর্সা মানুষটি, মাথা ভরা কালো কোঁকড়া চুল। বছরের পর বছর পাহাড়ে থেকে থেকে দু গালের মধ্যিখানটুকু আপেলের মতো লাল। সে এমনি পাকা রঙ যে শীতকালে তিনমাস কলকাতায় বাস করেও ঝরে যায় না। তখন মনে হয়েছিল প্রচুর বয়স, এখন ভাবি হয়তো চল্লিশের বেশি নয়। মেজাজ রুক্ষ। কোনোরকম উচ্ছলতা সইতে পারতেন না। খুব সুন্দরী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সব জমে বরফ হওয়া। পরে শুনেছিলাম তাঁর ভালোবাসার মানুষটি অন্য মেয়েকে বিয়ে করেছিল বলে তিনি আর বিয়ে-থা করেননি। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। আমাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। আমি তো আর সভ্যভব্য বাধ্য ছিলাম না। এক খাঁচা থেকে বেরিয়ে পাখি কি আর অন্য খাঁচায় ঢোকে ?

সেই প্রথম দিনই খেতে বসে লীলা বোসের সঙ্গে ভালো করে আলাপ হল। বিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক ললিত ব্যানার্জির ভাগ্নী, আমাদের ডায়োসেসান কলেজ থেকে বি-এ বি-টি পাস করা, আমি তাঁকে অনেক দেখেছি। তবে তাঁর চেয়ে অনেক নিচের ক্লাসে পড়ি, তিনি আমাকে লক্ষ্য করেননি। রোগা ফর্সা মানুষটি ভালো কাপড়চোপড় পরা, নাকে চিমটি-কাটা চশমা, তার ফ্রেম নেই। মিস্‌ বোস বললেন, আমি আশা করে আছি, তুমি আমার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে। আমার আয়া রান্নাবান্নাও করে। সে তোমার বিছানাও করে দেবে, কাপড় কেচে দেবে। তুমি মাসে ৫০ টাকা দেবে। আমি রোজ মাংস খাই, সসেজ হ্যাম আনাই।

লীলা বোস থামতেই ফোঁশ করে একটা নিশ্বাসের শব্দ শুনলাম। কমলাদি বললেন, আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলে আমরা খুশি হব। সাদাসিধে ব্যাপার, মাসে ২০ টাকা। সোমবার থেকে সাঁইলা রান্না করবে, সে আলুবাড়িতে মামার কাছে গেছে। ততদিন আমিই রাঁধার ভার নেব। রবিবারের জলখাবার পালা করে করা হয়। কাল থেকে মালী স্যালামাণ্ডার স্নানের জল করবে। আজ বোধহয় কষ্ট হল। নিশ্বাস নেবার জন্য কমলাদি থামলেন। আমি 'আলুবাড়ি' আর 'স্যালামাণ্ডার' শুনে মুগ্ধ হয়ে বললাম, 'সকলে যা খায়, আমিও তাই খাব।'

মিস্ বোস চুপ করে রইলেন।

বিকেলে হেম মাসিমা এসে কমলাদিকে বললেন, 'সেই খিচুড়ি আর ভাজা খাওয়ালে ওদের ? ওদের অন্য রকম অভ্যাস। আমি তো বাড়িতে মাংস করেছিলাম।' আমাকে বললেন, 'মণিকা তার পিসির কাছে থাকবে, কিন্তু আমার কাছে দুজন টিচার থাকে, তুমিও থাকতে পার। যথেষ্ট জায়গা আছে।'

কমলাদি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমি বললাম, 'এখানে সকলের সঙ্গে আমার ভালোই লাগবে।' হেম-মাসিমা বোধহয় খুসি হলেন। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন উনি, হয়তো সেকালের বি-এ পাস, বি-টি পড়েননি। কালো রং, কর্মঠ শরীর, প্রফুল্ল চিত্ত ; সকলের সঙ্গে মেলামেশা ; ওঁদের ভাড়াবাড়ি নর্থভিউয়ের অবারিত দ্বার, যে আসত আদর পেত। দুঃখ কষ্ট কম পাননি ; স্বামী শুনেছি পরম সুদর্শন এবং তার চেয়েও বেশি খামখেয়ালী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত কম বয়সে মারা যান। হেম-মাসিমা তাঁর দুই ছেলে আর তিন মেয়েকে চমৎকার করে মানুষ করে ভালো ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন। সহানুভূতিশীলা আর সুরসিকা ছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্ম। আনন্দমোহন বসুর বেয়ান, অমল হোমের আর হিরণকুমার সান্যালের শাশুড়ি।

সত্যি কথা বলতে কি মহারাণী স্কুলের শিক্ষিকাদের মধ্যে একটা উগ্র ব্রাহ্ম ভাব ছিল। হয়তো সেই জন্যেই বাবা পর্যন্ত আমার দার্জিলিং যাওয়া সমর্থন করেছিলেন। রবিবার সকালে সবাই দল বেঁধে ব্রাহ্ম-মন্দিরের উপাসনায় যেতেন। পিসির সঙ্গে মণিকাও যেত। আমিও প্রথম রবিবার ওদের সঙ্গে গেছিলাম। দ্বিতীয় রবিবার খোলাখুলি বললাম,আমি যাব না। কমলাদি শক্ড।

'ঐ সময়টা কি করবে ?' 'হিমালয়ের ছবি আঁকব।' কমলাদি বললেন, 'বনলতা, চল আমরা যাই। উপাসনার পর একেবারে সপ্তাহের বাজার করে ফিরব।'

সারা সকাল আমার শোবার ঘরের জানালায় বসে কাঞ্চনজংঘার ছবি আঁকলাম। আর যাইনি মন্দিরে। সমবেত উপাসনায় আমার মন সায় দেয় না। এখনো দেয় না। বিকেলে হেম-মাসিমার বাড়ি গেলাম। ভাবলাম বকুনিটা

খেয়েই আসি। হেম-মাসিমা বললেন, 'তোমার দাদামশাই হিমালয় ভালবাসতেন। একরকম বলতে গেলে তাঁর জীবনের অর্ধেকের বেশি হিমালয়ের কোলে কেটেছিল।'

আমি বললাম, 'আপনি তাঁকে দেখেছিলেন?' হেম-মাসিমা অবাক হলেন, বাঃ রে, দেখব না? আমার বাবার বন্ধু ছিলেন যে। পরে ব্রাহ্ম সমাজ ছেড়ে গেলেন, বাবা তাতে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন।' বলে আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালেন। দাদামশায়ের কথা শুনলেই আমার মনটা অন্যরকম হয়ে যেত। ভাবতাম আমিও যদি আরো দশ বছর আগে জন্মাতাম, দাদামশাইকে দেখতে পেতাম।

হেম-মাসিমা বললেন, 'স্কুলে পড়িয়ে তোর কি হবে রে? তার চেয়ে ঘর-সংসার করা ঢের ভালো। যখন শুনি কালো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, আমার বেজায় হাসি পায়। আমার মতো কালো কে? কিন্তু আমার স্বামীকে যদি দেখতিস, কি চমৎকার দেখতে ছিলেন। প্রথম দিন দেখেই ভেবেছিলাম এঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হলে বেশ হয়। হয়েছিলও তাই। ওরে, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। বলে হেম-মাসিমা হাসতে লাগলেন। ওঁর মতো মানুষ আমি আর দেখিনি। মতে না মিলতে পারে, কিন্তু মনের কি বলিষ্ঠতা আর আত্মপ্রত্যয়ের প্রসন্নতা। উইমেন্স লিব্ বলতে আমার এই আরেকজনের কথাও মনে পড়ে। সামাজিক ব্যাপারে যে রকম আগ্রহ, ভগবানেও তেমনি গভীর বিশ্বাস। এঁরাই হলেন ব্রাহ্মসমাজের উদার আদর্শের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। হাসিমুখে পুরুষের কাজ করে গিয়েছেন, নারীর কোনো গুণ খর্ব না করে।

হেম-মাসিমার বাড়ি 'নর্থ ভিউ' শুনেছিলাম বাস্তু-বিভাগের বাড়ি, নিচু ছাদ, ছোট ছোট জানলা—উত্তুরে হাওয়ার ভয়ে প্রায় সর্বদাই সেগুলোকে বন্ধ থাকতে দেখেছি, ঘরগুলো একটু অন্ধকার মতো, একটু স্যাঁতসেতে গন্ধ, কিন্তু বাইরের দেয়ালে ফুলগাছ বেয়ে উঠত, টবে চন্দ্রমল্লিকা গজাত, বাড়ির বাসিন্দারা হাসত গল্প করত। অবিশ্যি অতগুলো মেয়ে এক বাড়িতে থাকত, নিশ্চয় মান-অভিমান মন-কষাকষিও হত, তবে আমি কখনো দেখিনি।

'অর্কিড লী' ছিল ঠিক তার উল্টো, ওখানে প্রাণের স্পন্দন ছিল না। বাসিন্দারা কাজকর্ম করতেন, কিন্তু বেশি হাসি-গল্প শোনা যেত না। কমলাদি নিজে বাজার করে এনে কি চমৎকার রাঁধতেন ; সাঁইলা এলে পরেও রান্নার মান নিচু হয়নি, কারণ সাঁইলা কমলাদির নিজের হাতে তৈরি। অবিশ্যি কুড়ি টাকায় আর কত ভালো খাবার হয়, তার মধ্যে থেকে সাঁইলার মাইনেও বাদ যেত। বাড়িতে খাবার টেবিলে আমাদের যত রাজ্যের রসের গল্প হত, এখানে কেউ বিশেষ কথাই বলত না। তার ওপর মিস্ বোস একদিন আমাকে বললেন,

'সোনার মেডেল তো পেয়েছ শুনলাম, অ্যাটাভিজম্ মানে জান ?' আমি অ্যাটাভিজম্ মানে বলে বললাম, 'আপনার বুঝি এসব জিনিসে খুব ইণ্টারেস্ট ? আমি ঐ রকম আরো অনেক কথা বলতে পারি।' কমলাদি কটমট করে চেয়ে রইলেন, পরে আমাকে বললেন, 'ওটা বলা উচিত হয়নি, হাজার হক বয়সের একটা সম্মান আছে তো ?' কিন্তু খুব অখুসি মনে হল না।

অর্কিড লী নাকি কোনো চা-বাগানের সাহেব তাঁর রুগ্না স্ত্রীর জন্য করেছিলেন। আমার ঐ বড় ঘরটি ছিল তার শোবার ঘর। স্ত্রী মারা যাবার পর সাহেব আর ওখানে টিকতে না পেরে, সব বেচেবুচে দিয়ে দেশে চলে গেলেন। বাড়ির নাম আর গাছে গাছে অর্কিড ফুল তাঁদের চিহ্নস্বরূপ পড়ে রইল। আর রইল শখ করে কেনা কিছু আসবাব। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করাই যদি আমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তার জন্য প্রচুর সময় পেয়েছিলাম। নিজের বিষয়ে একটা আবিষ্কারও করে ফেলেছিলাম। কারো প্রভুত্ব আমি সইতে পারি না। কেউ হুকুম দিলে আমি বিগড়ে যাই অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো দায়িত্বপূর্ণ কাজের আমি উপযুক্ত নই। কেবলি মনের সঙ্গে মনের মিল খুঁজি। সারা জীবন ধরে এর প্রমাণ পেয়েছি। এরমধ্যে অহংকারের কথা নেই। অপর পক্ষের যুক্তি যদি গ্রহণযোগ্য মনে হয়, সর্বদা মত বদলাতে প্রস্তুত থাকি। কিন্তু আর কেউ বলল বলে কোনো কিছু মেনে নিতে পারিনি। এইখানেই বাবার সঙ্গে আমার বিরোধের মূল।

এর মধ্যে মাসিমা চিঠি লিখলেন, 'আমরা এপ্রিল মে দার্জিলিং-এ কাটাতে চাই। একটা মাঝারি গোছের ফ্ল্যাট ঠিক করে দাও।' পাওয়াও গেল ফ্ল্যাট ; অর্কিড লী'র সামনেই কার্ট রোডের ওপারে, পাহাড়ের ওপরের তিনতলা বাড়ির দোতলাটি, নাম উড্‌ল্যাণ্ডস। ভাঙা বাড়ি বারান্দার তক্তা ঝুলে পড়েছে, মস্ত মস্ত ঘর, পুরনো আসবাব, মেঝের ওপর ম্যাটিং। তাতে লক্ষ লক্ষ পিসু বাস করলেও ঘর বেশ গরম থাকে। বাগানের বালাই নেই, একতলার মাঠেও যা ছিল সব শুকিয়ে খড়। কিন্তু যে দিকে তাকানো যায় ঘন নীল আকাশে হিমালয়ের ছবি আঁকা। আরো ওপরে উঠলে দেখা যায় গোল দিগন্তের তিন ভাগ জুড়ে বরফের পাহাড়। জলাপাহাড়ের একেবারে চুড়ো থেকে মনে হয় বালার মতো গোল হয়ে এসেছে হিমালয়, মুখটি একটু খোলা। পৃথিবী যে গোলাকার তার আর কোনো প্রমাণ বাকি থাকে না। পাহাড়ের গায়ে লম্বা লম্বা ঝাউ গাছ। নীল আকাশে বাজপাখি ওড়ে। বাগান-এর কিবা দরকার।

কমলাদি, বনলতা, মীরা সরকার বলে আমার চেয়ে অল্প বড় একজন শিক্ষিকা, এদের সকলের বাড়ি-খোঁজার ব্যাপারে ভারি আগ্রহ। ছোট্ট মানুষটি বনলতা ; আমি মাথায় ৫ ফুট, আমার চেয়েও খানিকটা বেঁটে। মাথা ভরা ঢেউ

খেলানো চুল, কাটাকাটা নাক-মুখ, কথায় কথায় মুখ রাঙ্গা হয়ে ওঠে, বড়দের কথা মাথা নিচু করে মেনে নেয়, নাম রাখলাম 'খুদি'। খুদিকে আমি ক্রমে কমলাদির কাছ থেকে ভাগিয়ে এনে, ঝোড়ো সন্ধ্যায় আমার ঘরের আড্ডায় ঢুকিয়ে দিলাম। আমার চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু কি কোমল কি মিষ্টি। মীরা সরকারকেও আগে দেখেছিলাম। ডায়োসেসানে বি-টি পড়ত। আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। আমার এতটুকু কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারলে ব্যাকুল হয়ে উঠত, কি করবে ভেবে পেত না। আর ছিল মণিকা, সে ভালোমানুষ হলেও এটা জানত যে নীরব শ্রোতা হয়ে থাকলে কেউ বলবে না—'অ্যাঁ! তুমি বড়দের কথা শুনছ?' কমলাদি নেই, মীরা নেই, মণিকা নেই, খুদিও বোধ হয় নেই। জলে আঁকা ছবি সব। আমার মনের মণিকোঠায় জমা। এ লেখা অমৃতে ছাপা হলে পর খুদি চিঠি লিখেছে সে আছে! বড্ড ভালো লাগল।

মাসিমারা বুদ্ধি করে রাঁধবার লোক নিয়ে এসেছিলেন। দু মাসের মতো উড্‌ল্যাণ্ডস্-এ সংসার পাতলেন। আমাকে বললেন, 'তুই এসে থাক। এখান থেকে স্কুল করিস।' আমার তাতে মত ছিল না। আমার ওপর যাদের দাবি আছে, তাদের আমি ঝেড়ে ফেলে এসেছি। তবে ওঁদের সঙ্গে কত যে শনি-রবি আনন্দে কাটিয়েছি সে আর কি বলব। নোটনের তখন ২০ বছর বয়স। সর্বাঙ্গ থেকে সুষমা ঝরে পড়ছে। আই-এ পাস করে আর পড়েনি। নাকি শরীব দুর্বল। আমি অবিশ্যি দুর্বলতার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাইনি। চমৎকার পিয়ানো বাজায়, ভালো গায়, ভালো ছবি আঁকে, বাপের অবস্থা ভালো, ওর একমাত্র সন্তান। এন্তার বিয়ের সম্বন্ধ আসে।

মুশকিল হল কন্যের কাউকে পছন্দ হয় না। খালি বলে অমুক পাত্রের রূপ-গুণের সঙ্গে তমুক পাত্রের টাকাকড়ি থাকলে হত। অর্থাৎ পাত্ররা হিসাব-খাতায় স্থান পায়, মনের মাঝে পায় না। এক বছর আগে একজনের দিকে মনটা একটু ঝুঁকেছিল, রূপে গুণে ধনে মানে তার জুড়ি মেলা ভার। দুঃখের বিষয় পাত্রটি যবন। মেসোমশাই ব্যাপারটা আঁচ করে বলে বসলেন—'ওকে বিয়ে করলে আমি তোমাকে ত্যাগ করব। সব সম্পত্তি ব্রাহ্ম সমাজকে দিয়ে যাব।' ব্যাপার শুনে আমি রোমাঞ্চিত। এমন ঘটনা বইয়ের পাতার বাইরে দেখব ভাবিনি। নোটন আমার পরামর্শ চাইতে এল। আমি বললাম, এ আবার একটা সমস্যা নাকি! আমি যদি কাউকে ভালোবাসতাম এবং অন্য কোনো আপত্তির কারণ না থাকত, তাহলে কারো কথা শুনতাম না। কিন্তু নোটন মন ঠিক করতে পারেনি। সে পাত্র এক বছর অপেক্ষা করে অন্য মেয়ে বিয়ে করে আমাদের জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছিল। আর নোটন অন্য কারো গলায় মালা দিতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত আইবুড়োই থেকে গেল। ১৯৩১ সালে অবিশ্যি মেসোমশাই

অপাত্র ভাগিয়ে প্রসন্ন মনে সুপাত্র দেখছিলেন। সুপাত্রদেরও নোটন একের পর এক সবাইকে ভাগাতে লাগল।

সঙ্গে এক গাদা বই এনেছিলেন মেসোমশাই। ব্রাউনিং-এর কবিতার বাংলা অনুবাদ করছিলেন, কাব্যে। আমাকে মাঝে মাঝে দুটো একটা পদ তর্জমা করতে বলে নিজে যেভাবে করেছেন তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। চোখ বুজে বসে থাকতেন, আমাকে বলতেন, তোমার ইচ্ছামতো ইংরিজি কবিতা পড়ে শোনাও। আমি শেলিকে বাদ দিতাম। ঐ সব ফিকে বেগুনি ফিকে নীল ছাই ছাই ধোঁয়া ধোঁয়া বর্ণনা আর ভালো লাগত না। বেন জনসন পড়তাম, লী হাণ্ট, শেক্সপিয়র। হঠাৎ চেয়ে দেখতাম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন মেসোমশাই কিন্তু অন্য কিছু দেখছেন। বইখানি ওঁর হাতে দিয়ে বলতাম তুমি পড় আমি শুনি।

নিরাশ্রয়ের মতো দু-একবার বইয়ের দিকে তাকিয়ে হয়তো বলতেন, ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না কেন? চোখ দুটো একেবারে গেছে। আমি মেসোমশায়ের নাক থেকে চশমা নামিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে আবার নাকে বসিয়ে দিতাম। খুসি হয়ে বলতেন, হ্যাঁ এইবার ঠিক হয়েছে। নোটন একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে হয়তো বলত আর কতক্ষণ পড়া হবে? মেসোমশাই যেন কোনো অচেনা বিঘ্নকারীকে বলতেন, যাও ব্যাঘাত কর না। আরো পরে আমাকে বলতেন, তুমি আমার মেয়ে হলে আমি সুখী হতাম। আমি হাসতাম। না মেসোমশাই, কারণ তুমি আমাকে যদি বলতে কাউকে বিয়ে করলে সম্পত্তি দেবে না, আমি তক্ষুণি গিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলতাম। পরে আমার জীবনের সমস্যার সময় মেসোমশাইয়ের সস্নেহ প্রশ্রয় পেয়েছিলাম।

একদিন একজন সাধু এসে মাসিমাদের ছোট বসবার ঘরে ঢুকে বললেন, আমি মন পড়ে দিতে পারি। বেটিরা দুজনে দুটি ফুলের ইংরিজি নাম মনে কর তো। নোটন ভাবল গোলাপ, রোজ, আমি ভাবলাম গন্ধরাজ গার্ডেনিয়া। সে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বলল, তুমি ভেবেছ রোজ আর তুমি ভেবেছ গার্ডেনিয়া। মাসিমা ভারি প্রভাবিত হলেন। তাহলে এদের ভাগ্যেও কি আছে বলে যান। সাধু নোটনের দিকে ফিরে বললেন, তোমার ভাগ্যে আছে দীর্ঘ জীবন আর মেলা টাকা। আমাকে বললেন, টাকা যার কাছে ছাই, তুমি সেই জিনিস পাবে। নোটন আশ্চর্য হয়ে বলল, সে আবার কি জিনিস? সাধু বললেন, সে তুমি বুঝবে না। বলে চলে গেলেন। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, এক হপ্তা বাদে একটা চিঠি পাবে। এক মাস বাদে এখন যেমন আছ, সব বদলে ফেলবে। এই বলে চলে গেলেন। পরীদের গল্পের মতো।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় দলবল নিয়ে দার্জিলিং-এ এসেছিলেন। ম্যাকিনটশ

রোডে আশানটুলি এবং তার পাশেই আরেকটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। দিনু ঠাকুর তাঁর স্ত্রী, এক ভাগ্নী, দুই ভাগ্নে সঙ্গে এলেন। তাছাড়া রথি ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, প্রশান্ত মহলানবিশ, তাঁর স্ত্রী, নীলরতন সরকারের মেয়েরা এবং আরও অনেকে। দার্জিলিং-এর যত বাঙালী বিকেলে সব সেখানে ভেঙ্গে পড়ত। মেসোমশাই আমাকে নিয়ে গেলেন। নোটন বলল, আমি তো অনেকবার দেখেছি, অতটা হাঁটতে পারব না। এই প্রথম আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বললাম। দিনু ঠাকুরের ভাগ্নী পূর্ণিমা আমার বাল-বন্ধু। তার বাবা সুহৃদনাথ প্রমথনাথ চৌধুরীর ছোট ভাই। পূর্ণিমার ডাক নাম বুবু। পরে ওর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে সুবীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়। সুবীর মাত্র ৪৭ বছর বয়সে মারা যায়, বুবু আজ পর্যন্ত আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। ওর বড় ছেলে সুপ্রিয় শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের দক্ষ অধ্যক্ষ।

মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আমাকে দেখে বুবু কি খুসি। অমনি আমি ওদের বাড়ির একজন হয়ে গেলাম। সন্ধ্যের পর সেদিন অর্কিড লীতে ফিরলাম। বুবুর দুই দাদা—তাদেরও ছোটবেলা থেকে চিনতাম—আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। কমলাদি বললেন, তোমার মা-বাবা কি ওদের চেনেন?

মনে আছে একটুও খুসি হইনি, মনে হয়েছিল কমলাদি অনধিকার প্রবেশ করছেন। এখন ভাবি অধিকার আবার কি? আমার অনিষ্ট হলেই বা কমলাদির কি?

প্রায় রোজ গেছি আশানটুলিতে, রবীন্দ্রনাথকে দেখার সুযোগ ছাড়ি কি করে? কোনো দিন বুবু বলে চা খেয়ে যা। কখনো বলে কাল ছুটির দিনটা এখানে কাটাস। দিনু ঠাকুরের আলাদা মহল, সেখানে গিয়ে অতিথি হই আর সেই মোটা মানুষটিকে যত দেখি তত মুগ্ধ হই। গান তো রোজই গাইতেন, আগেও গেয়েছেন। আমার বন্ধু অলকার বিয়েতে একটা কৌচে বসে আশ্চর্য ভালো গাইলেন। উনি উঠে গেলে পর দেখা গেল কৌচের তলা ফুঁড়ে স্প্রিংগুলো ঝুলছে। তা এখন সেকথা বলাতে দিনদা কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। বললেন, মোটা হতে পারি, তবে সে রকম কিছু নই। বড্ড ভালো লাগত ওঁকে। তখন হয়তো বছর পঞ্চাশেক বয়স ছিল। পরে আরো ভালো করে চিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

দেখতাম রবীন্দ্রনাথও ভারি আমুদে মানুষ। একদিন আমি গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, তোমার বন্ধু যে মাদরাজিতে আদ রাজি। নাকি এক দক্ষিণী আই সি এস ঠাকুর বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে চায়, না পেলে ঠাকুর বাড়ির দৌহিত্রীতেও রাজি। তা বুবু কিছুতেই মত দিচ্ছে না। আর সব ভালো হলেও রংটা যেন আবলুস। সে পাত্র অন্য ভালো মেয়ে বিয়ে করেছিল।

আরেক দিন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, একটি ছোট মেয়ে কিছুতেই উঠবে না। তার মা বললেন, 'এই তো রবি ঠাকুর দেখা হল আবার বসে আছিস কেন ?' মেয়ে বলল, 'চলতে দেখিনি।' সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উঠে একটু পাইচারি করে এসে বললেন, 'এই তো চলতেও দেখলে, এবার তাহলে বাড়ি যাও।'

তারপর একদিন রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনলাম, পাহাড় আমার ভালো লাগে না। মনে হয়, চারদিক থেকে বুকের ওপর চেপে বসছে। শুনে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। দুদিন বাদে গিয়ে দেখি বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে, ওঁরা সদলবলে নেমে যাচ্ছেন। বাবামশায়ের আর ভালো লাগছে না। তারপর দিনই চলেও গেলেন সবাই। বিকেলে একবার ঐ দিকে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম সব শূন্য খাঁ-খাঁ করছে, চৌকিদার কয়েকটা রোদে দেওয়া গালচে তুলছে। আমার সঙ্গে খুদি আর মীরা গেছিল। সকলের সে কি দুঃখ। ফিরবার পথে মাসিমার বাড়ি গেলাম। ওঁদের ছুটির অর্ধেক ফুরিয়ে গেছে, মেসোমশাই অবিশ্যি অবসর নেওয়া মানুষ কিন্তু আলিপুরের নিউ রোডে ওঁদের বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার তদারক করা হল চাকরির বাড়া। আপিস থেকে যদি বা বলে কয়ে ছুটি বাড়ানো যায়, নিজে বড় কড়া মুনিব, তার কাছে কোনো ওজর চলে না।

সত্যি কথা বলতে কি অধ্যাপনা আমার ভালো লাগত না। এ সত্য আবিষ্কার করে নিজেই স্তম্ভিত। আমি কেবল তৈরি করতে চাই, নতুন কিছু বানাতে চাই। কতকগুলো অপোগণ্ড শিশুকে অন্যের লেখা বই থেকে অন্যের দ্বারা নির্দিষ্ট পাঠক্রম অভ্যাস করাতে গিয়ে আমার হাঁপ ধরত। উঁচু ক্লাসের অঙ্ক আর ইংরিজি পড়াতে বেজায় খারাপ লাগত। সারা সপ্তাহে মাত্র দুটি ক্লাস আমি উপভোগ করতাম : একটি হল ৬-৭ বছরের ছেলেমেয়েদের গল্প বলা আর একটি হল তাদের ছবি আঁকার ক্লাস। হয় বানিয়ে গল্প বলতাম, নয় তো রামায়ণ-মহাভারত থেকে মজার মজার ঘটনার কথা বলতাম। ছবি আঁকার ক্লাসে বলতাম বাগান থেকে যা খুসি দেখে এসো বা নিয়ে এসো তারপর সেটিকে আঁকো। এ দুটি ক্লাস ওরা বেশি উপভোগ করত, নাকি আমি করতাম জানি না। ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে বড্ড ভাল লাগত।

ভালো অধ্যাপিকা ছিলাম না বোধ হয়, তবে জনপ্রিয় হয়েছিলাম। মিস বোস গিয়ে হেম-মাসিমার কাছে নালিশ করেছিলেন যে আমি ডিসিপ্লিনের ধার ধারি না। বোকা মেয়েরা পড়া না বুঝলে তাদের পাশে বসে, তাদের পিঠে হাত রেখে, বুঝিয়ে দিই। কমলাদি গিয়ে নালিশ করলেন, আমার গল্প বলার আর ছবি-আঁকার ক্লাসে বড্ড হট্টগোল হয়। হেমমাসিমার কাছেই কথাটা শুনলাম। একটুও অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। আমিই বরং অসহিষ্ণু হয়ে বলতাম, 'ঘণ্টা পড়লেও ওরা উঠতে চায় না।' হেমমাসিমা একটু হাসলেন, সে-হাসির মানে

বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হল না—'অবিশ্যি ছাত্রদের খুসি করাই অধ্যাপনার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।' আমি আবার মনে করি ঐ খুসি হওয়ার ওপর দিয়েই অনেক শিক্ষা পাচার করে দেওয়া যায়। সে যাক গে, ওখানে অধ্যাপনা করতে আমার ভালো লাগত না। পালাবার পথ খুঁজতাম। ইচ্ছা করে এসেছি, কাউকে কিছু বলারও জো ছিল না।

এমন সময় পথ পেয়ে গেলাম। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েই আমাকে চিঠি লিখলেন : 'আশা অধিকারী শিশু-বিভাগ পরিচালনা করেন, তিনি এক বছরের ছুটি নিচ্ছেন, তুমি এসে এক বছরের জন্য তাঁর জায়গা নাও।' সাধুর বলার এক সপ্তাহ পরে চিঠিটা এল।

আর কথা নেই। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই লিখে দিলাম গরমের ছুটির পর থেকে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দেব। রবীন্দ্রনাথ ডেকেছেন, সেই যথেষ্ট। এ-ও যে অধ্যাপনার কাজ মনেও হল না। মাসিমা মেসোমশাই শুনে খুব খুসি, মা হতাশ, বাবা রেগে চতুর্ভুজ! শান্তিনিকেতনের ওপর বাবা হাড়ে চটা ছিলেন। যত সব লম্বা-চুলো, চিবিয়ে-কথা বলা ন্যাকার দলের আবাস। তার ওপর এরকম কথায় কথায় মত বদলানোর কোনো মানে হয় না। এদিকে বিপরীত সমালোচনায় আমি হাতে-পায়ে বল পাই। হেমমাসিমার কাছে গিয়ে কথাটা বললাম। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, একটুও রুষ্ট হলেন না। বললেন, আমি তো বলেইছিলাম সোনার কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটা যায় না। এ-ও হতে পারে যে অসন্তোষজনক অধ্যাপিকা নিজের থেকে খসে পড়াতে পুনরায় শান্তি বিরাজ করবে ভেবে একটু প্রসন্নও হয়েছিলেন। মোট কথা তাঁর কাছ থেকে আর তাঁর ছেলে-মেয়ে জামাইদের কাছ থেকে অশেষ স্নেহ ছাড়া কিছু পাইনি।

খুদিকে আর মীরাকে দলে টেনে ছিলাম, তাদের সান্ধ্য আড্ডা ভেঙে যাবে বলে একটু ক্ষুণ্ণ হলেও, সবাই খানিকটা স্বস্তি বোধ করছিল, এটা আমি টের পাচ্ছিলাম। মীরা আমাকে ঘোর নীল মীনে করা কাঠের মোমবাতিদান, উপহার দিয়েছিল। অনেক দিন সে-দুটিকে যত্ন করে রেখেছিলাম। তবে আর তাকে এত কাছে পাইনি। খুদি মহারাণী স্কুলে জীবন কাটিয়েছিল, মীরা কলকাতায় এসে শিক্ষাবিভাগে, পরে গোখলে স্কুলে কাজ করেছিল। বিয়ে করে সুখী হয়েছিল, একটি মেয়ে রেখে সেও চলে গেছে। যতদূর মনে হয় মে মাসের শেষে মাসিমাদের সঙ্গে নেমে এলাম মানে পাহাড়ের রেলে গয়াবাড়ি স্টেশন অবধি এলাম। সেখানে মাসিমারা নেমে গেলেন। ওখানে ওঁদের ভাগ্নী ইলা পালচৌধুরীদের চা-বাগান আর বসতবাড়ি। দুদিন কাটিয়ে যাবেন। স্টেশনে ওরা মাসিমাদের নিতে এসেছিল, আমাকেও পেড়াপিড়ি করতে লাগল। কিন্তু আমার থাকার উপায় ছিল না। ইলা পালচৌধুরীর ডাক নাম ছিল টুবলি, আমাদের

পুরনো বন্ধু হয়তো বছর তিনেকের বড় । ওর বাবা বিজয় বসু ছিলেন আলিপুরের চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ । ছোটবেলা থেকে কত ছুটির দিনে বাগানে বেড়িয়ে, টুবলিদিদের পুকুর ধারের ঘাসজমিতে বসে নানারকম উপাদেয় সামগ্রীর সঙ্গে চা কিম্বা লেমোনেড খেয়েছি, তার লেখাজোকা নেই । ঐখানে বিজয় বসুর ভাগ্নে কালিদাস নাগ, তাঁর অল্পায়ু ছোট ভাই গোকুল নাগ, হেমমাসিমার ছোট জামাই হাবল সান্যালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল । অবিশ্যি তাঁদের চাইতে প্রায় ১০-১২ বছরের ছোট হওয়াতে, তাঁরা সে আলাপে খুব একটা গুরুত্ব দেননি । টুবলিদির মাকে আমরা বলতাম ইন্দুমাসি, মাসিমার ননদ, তিনি আমাদেরও মাসিই ছিলেন । অবারিতদ্বার তাঁদের বাড়ি, সকলেই খুব বাজনার ভক্ত ছিলেন । গোকুল নাগ চমৎকার বেহালা বাজাতেন এবং সেকালের বহুআলোচিত ফোর আর্টস ক্লাবের সভ্য ছিলেন । আমাদের কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনত না । ভালো কথা, বিজয় বসুকে নিয়েও তাঁর বাড়ির লোকরা মাঝে মাঝে মহা মুশকিলে পড়তেন । গান-বাজনার ধার ধারতেন না তিনি । বাড়ির লোকরা তাঁর সাংস্কৃতিক উন্নতিকল্পে অনেক টাকা খরচ করে তাঁকে চেম্বার অফ মিউজিকের কনসার্টে নিয়ে যেতেন, উনি পত্রপাঠ চেয়ারে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন । এবং তার চেয়েও খারাপ হল যে থেকে থেকে বাজনার মার্গ চড়লে, নাক দিয়ে খুব জোরে 'ফঁ-ড়া-ৎ' করে একটা শব্দ করে জেগে উঠে বলতেন, 'এ্যাঁ কি বলল ?' শুধু স্নানের ঘরে তাঁকে গুণ গুণ করে গান গাইতে শোনা যেত তবে নোটনের কাছে শুনেছিলাম যে ওরা নাকি কৌতূহলবশত দরজায় কান দিয়ে শুনেছে বিজয়-মেসো ঘরের ভেতরে গাইছেন, সা-গা । গা-ধা । গা-ধার-পা নাকি মা-নু-ষের 'পা' !

বেঁটে গাঁট্টা গোঁট্টা মানুষটির চোখের পেছনে হাসি চক চক করত । আমাদের ওঁকে বড্ড ভালো লাগত । উনি টের পেতেন কিনা জানি না । ওঁর শোয়ার ঘরে মশারির ভেতরে পাখা ঘুরত, আমরা হাঁ করে দেখতাম । বাগানে একবার এক জোড়া পার্শিয়ান ক্যাট দেখেছিলাম, ফিকে নীল-ছাই গা, গাঢ় নীল চোখ । কাছে যেতেই ফ্যাঁচ করে আমার ভাই অমির হাতে আঁচড়ে দিল । আইডিন লাগাতে হল । মাসিমারা নেমে গেলে এত কথা আমার মনে পড়ল । টুবলিদির বিয়ের ঘটকালি মা করেছিলেন । টুবলিদির বড় ননদ ছিলেন মার প্রাণের বন্ধু । মহেশগঞ্জে একবার তাঁদের কাছে থেকেও এসেছিলাম । তার মেজ ভাই অমিয় পালচৌধুরী । তার সঙ্গে ১৭ বছর বয়সে টুবলিদির বিয়ে হল । আমরা গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম । টুবলিদি দেখতে ভালো ছিল, বেহালা বাজাত, মিষ্টি নরম ব্যবহার ছিল । অপেক্ষাকৃত কম বয়সে বিধবা হয়েছিল, তারপর দুই ছেলে এক মেয়ে মানুষ হয়ে গেলে, রাজনীতিতে ঢুকে, রাজ্যসভার সদস্য হয়েছিল অনেকদিন । সে-ও আর নেই । '

স্টেশনে আমাদের ভাইপো অশোক এসেছিল। তার কথায় বুঝলাম আমার শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনাটি মোটেই জনপ্রিয় হয়নি। তবে আমি যে কারও কথা শুনে চলব না এও সবাই জানত। ভাইবোনরা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, মাও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যেকোনো কারণে ভাইবোনদের প্রীতি হারালে আমার বড্ড কষ্ট হবে। সুখের বিষয় সারা জীবন ধরে আমার সব কাজে তাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি পেয়ে এসেছি। মতে না মিললেও। আমরা ভাইবোনরা চিরকাল যে যার নিজের বিচার অনুসারে কাজ করেছি, তাই নিয়ে কখনো কোনো ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। গুরুজনদের কথা আলাদা। তবে স্বাধীন সাবালকত্ব পেয়ে অবধি আর কখনো তাঁদের কথামতো চলিনি। বাড়িতে আমার শেকড় নড়ে গেছিল। আমি অন্য কোনো জায়গার নাগরিক হয়ে গেছিলাম। বাবা বলতেন আমার মনে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে, তাঁকে কোনোদিনও বোঝাতে পারিনি, ওটা অনিশ্চয়তা নয়, নিশ্চয়তার বহিঃপ্রকাশ, আমার আত্মপ্রত্যয় জন্মেছে।

বাড়ি এসে দেখি রবীন্দ্রনাথের এক চিঠি এসেছে। তাতে লিখেছেন তুমি জায়গাটা একবার দেখে যাও, তারপর বিদ্যালয় খুললে স্থায়ীভাবে এসো। আমি সেই নিদারুণ গরমে একা শান্তিনিকেতনে গেলাম। কলকাতাতেও তখন গরমের ছুটি শুরু হয়ে গেছে, তবু কেউ যে আমার সঙ্গে আসতে চাইল না সেটা আমি লক্ষ্যই করিনি। দুপুরের গাড়ি দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, তাতে করে একদিন একলা একলাই চলে গেলাম। মা পথে খাবার জন্য লুচি তরকারি করে দিলেন। মায়ের মতো আছে কে ? আমার সেজভাই অমি আমাকে গাড়িতে তুলে দুটো রসের কথা বলে গেল।

এখন যে পথের প্রত্যেকটা স্টেশনের গুদোম, গুমটি, কোয়ার্টার্স, বাড়ি, বাগান, সাঁকো, পুকুর, খাল, গাছপালা এমনকি মগরার ক্রসিং-এর চুল-পাকা মোষ পর্যন্ত, নিজের হাতের তেলোর মতো চেনা হয়ে গেছে, সেই পথ সেদিন আমি প্রথম দেখলাম। খানা জংশনের পর থেকে লুপ লাইনও আলাদা হয়ে গেছে, পৃথিবীর চেহারাও বদলে গেছে। লুপ লাইনে আগে কখনো আসিনি, সেই প্রথম দেখার বিস্ময় আজো ভুলিনি। শুকনো মাটির রঙ ক্রমে লালচে হয়ে এল। বড় গাছের দূরত্ব বেড়ে গেল। বর্ধমানের বড় বড় তাল-পুকুরের জায়গায় ছোট ছোট ডোবা, গুটিকতক খড়ের চালের ঘরকে ঘেঁষে আছে, বড় বড় ধান-ক্ষেত। ক্রমে বেঁটে বেঁটে খেজুর গাছ দেখা দিল, দুপাশে শিমুল গাছ। রেলের লাইন থেকে থেকে কাটিং-এ নামলে চাকার ঝমঝমানির সুর বদলায়। স্টেশনের লোকেরা কালো, লম্বা, কোঁকড়া চুল, তাঁদের মুখের ভাষা অনেক বেশি শুদ্ধ। হয়তো এ-সব মন্তব্য প্রথম দেখার ফল নয়, বারে বারে দেখে একটু করে মনে জমা

হয়েছে। মেয়েদের গলার স্বর তত কর্কশ নয়, একটু যেন লাজুক, টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে বেঞ্চিতে না বসে মাটিতে বসতে চায়। খরার সময়, দুপুরের গাড়ি বড় গরম। তারপর একসময় বোলপুর পৌঁছলাম।

তখন স্টেশন আরো ছোট ছিল। এক সারি অপিস-ঘর, অনেকখানি লাল কাঁকর বিছানো প্ল্যাটফর্ম, ওরা বলত লাটফর্ম। পেণ্টেলুন পরা সাহেব সুবো দেখলে ভাবত লাট সাহেব হবেও বা। শান্তিনিকেতনের সাহেবরা তো অনেকেই খদ্দরের ধুতি পরত, মেমরা শাড়ি পরত। সবার পায়ে চটি, নয়তো খালি। অনেকেই বাংলা বলত। বোলপুর স্টেশনের লোকরা অমন ঢের ঢের সাহেব দেখেছিল। প্ল্যাটফর্মের ধারে ধারেও পলাশ শিমুলের গাছ।

'ধীরেনদা, অর্থাৎ ডঃ ডি· এম· সেন, যিনি পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিব হয়েছিলেন, আমাকে নিতে এসেছিলেন, অনঙ্গবাবুর লড়ঝড়ে মটর গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার সঙ্গে ছোট্ট একটা স্যুটকেস, ছোট একটা হোল্ড-অল। অনঙ্গবাবু কেঠো কেঠো হাত দিয়ে সেগুলো গাড়ির পেছনে তুললেন। কুলি-ভাড়া এক আনা। মটর ভাড়ার কথা কেউ কিছু বললেন না, আমি ভাবলাম হয়তো মিনি-মাগনা বিদ্যালয় থেকে পাঠিয়েছে। পরে এক বছর ধরে কতবার যে অনঙ্গবাবু সে ঋণের কথা আমাকে মনে করিয়ে ভাড়া আদায় করেছিলেন মনে নেই। ধীরেনদার সাইকেল ছিল। বললেন, শ্রীভবনে আপনার ঘর ঠিক আছে। হাত মুখ ধুয়ে তৈরি থাকবেন। আমি এসে উত্তরায়ণে নিয়ে যাব। গুরুদেব ওখানে চা খেতে বলেছেন।

তখন ঐ একটিই ছাত্রী আবাস ছিল, শ্রীভবন। দোতলা বাড়ি, পেছনে পাঁচিলে ঘেরা ঘাসে ঢাকা উঠোন, তার পেছনে স্নানের ঘরের সারি আর মস্ত কুয়ো। কলের জল ছিল না। রাত দশটায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেত। অনঙ্গবাবুর গাড়ি আমাকে নিচু বাংলার পথ, দেহলী, মহর্ষির উপাসনার পাহাড়, তার পাশের পুকুর, সেটি এখন বুজিয়ে দিয়ে বাগান হয়েছে—তারপর তালধ্বজ কুটির, কাঁচের মন্দির, শান্তিনিকেতন বাড়ি, ছাতিমতলা বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলল।

বাঁয়ে মোড় নিতে নিতে অনঙ্গবাবু বললেন, 'উত্তরে উত্তরায়ণ, ডাইনে আমাদের ছাপাখানা, বাঁয়ে স্কুলের অপিস ঘর, তার ওপাশে লাইব্রেরী, আমরা ডাইনে ঘুরছি। এই গেল রান্নাঘর, সামনের গুজরাটি কিচেন, তারপর গোয়াল ঘর, লাল গরু পাজি, যখন তখন খুঁটি উপড়ে তাড়া করে, খুব সাবধানে থাকবেন—বাঁয়ে খেলার মাঠ তার দক্ষিণে গুরুপল্লীর মাটির ঘরের সারি, ক্ষিতিমোহনবাবু, নন্দবাবু, অজিত চক্রবর্তী মশায়ের পরিবার, প্রমোদবাবু—তাঁকে সবাই 'মশাই' বলে—নেপালবাবু, গোঁসাইজী ইত্যাদি সবাই ওদিকে থাকেন।

খেলারমাঠের দক্ষিণে বীরেনদার ছোট বাড়ি, উনি কন্ট্রাকটরী করেন—স্টেশনে যাঁকে দেখলেন তিনি বীরেনদার ছোট ভাই ধীরেনদা, বিলেত থেকে ডক্টরেট পাওয়া, শ্রীনিকেতনে কাজ করেন—এই যে শ্রীভবনের ফটক, ভেতরে আমার যাওয়া নিষেধ, নেমে পড়ুন। বাড়িটা অবিশ্যি মেয়েদের জন্য হয়নি, ছেলেদের জন্য হয়েছিল। তারপর যখন মেয়েদের দেওয়া হল, ছেলেদের কি রাগ। রাতারাতি গেট উপড়ে ফেলে দিল—একবার নয়, দুবার—কোন ফল হল না, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—এই রইল আপনার বাক্স, বিছানা, সিঁড়ির ওপর রেখে গেলাম—আচ্ছা চলি।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে গাড়ি থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের যতটুকু দেখা গেল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়ে অনঙ্গবাবু চলে গেলেন। সামনের দরজা খুলে দুজন থান-পরা আধা-বয়সী মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন, একজন রোগা, দুঃখী চেহারা, তাঁর নাম সরোজিনীদি, অন্যজন মোটা-মোটা হাসি-খুশী, তিনি বালবিধবা হিরণদি। এঁরা রান্নাঘরের মেট্রন। শ্রীভবনের অধ্যক্ষা হেমবালা সেন ছুটিতে রাঁচি গেছেন। উত্তর দিকে আমাকে যে ঘর দেওয়া হল, তার লাগোয়া বাথরুম, জানলা আছে, কিন্তু সেদিক দিয়ে হাওয়া আসে না, গুমোট গরম, পাখাটাখার বালাই কোন ঘরেই নেই। স্নান করে তৈরি হলাম। ধীরেনদা এসে উত্তরায়ণে নিয়ে গেলেন।

এখন যাকে বলা হয় উদয়ন, তখন তাকেই সবাই বলত উত্তরায়ণ, অন্য বাড়িগুলোর মধ্যে শুধু উত্তরায়ণের উত্তরে কোণার্ক ছিল, আর তার পাশে বাঁধান ভিতের ওপর সুন্দর একটি মাটির বাড়িতে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী হৈমন্তী তাঁদের ছোট্ট মেয়ে নিয়ে থাকতেন। বাকী সব খোলামেলা, উত্তর-পূর্ব কোণে পঞ্চবটি বনের মত। তার বাইরে লাল মাটির পথ গোয়ালপাড়া পার হয়ে, কোপাই পার হয়ে, সিউড়ির দিকে চলে গেছে। উত্তরায়ণের সামনে গোলাপ-বাগান, টেনিস-কোর্ট, দক্ষিণের গাছের আড়ালে একটা ছোট বাড়ি, সেটি চোখেই পড়ত না। সেখানে কাজকর্ম হত।

যেদিকে তাকাই ধূ-ধূ করছে খোলা মাঠ, দূরে দিগন্তের কাছে নীল বনরেখা, পুবে রেলের উঁচু বাঁধ, নীচের কাটিং দিয়ে ট্রেন গেলে ধোঁয়া দেখা যায়। রেলের ওপারে মাঠ পেরিয়ে পারুলডাঙা। পূর্বপল্লী নেই, উঁচু উঁচু ছাত্রাবাস নেই, গেস্ট হাউস নেই, বিশ্বভারতীর মস্ত আপিসবাড়ি নেই, নতুন লাইব্রেরী নেই। গোয়ালপাড়ার পথে শুধু হাসপাতালটি একটু পেছিয়ে আছে। একতলা একটা ডাকঘর, তার লাগোয়া পোস্ট মাস্টারের বাড়ি, অসময়ে ডাকলেও হাসি মুখে বেরিয়ে আসেন। আর কতকগুলি মাটির ঘর, তাতে মাস্টারমশাইরা থাকেন। পশ্চিমে শ্রীনিকেতন পর্যন্ত ফাঁকা রাস্তার দু ধারে খোলা মাঠ, ভাঙা খোয়াই ধূ-ধূ

করছে। চেয়ে চেয়ে দেখলাম আর বুঝতে পারলাম রবীন্দ্রনাথ কেন বলেছিলেন, পাহাড় তাঁর বুকের ওপর বোঝার মত চেপে বসে। তবে ভালও লাগত নিশ্চয়, নইলে কেন ছুটে ছুটে কালিম্পং যেতেন ?

মনে আছে উত্তরায়ণের সামনের চওড়া বারান্দার একেবারে পূবের কোণে খুদে এক চাপার্টির মত হল। প্রতিমাদি সেজেগুজে এসে আমাদের চা জলখাবার পরিবেশন করলেন, বনমালী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইল। আরও অতিথি ছিলেন, শ্রীনিকেতন থেকে কোয়েকার ডাক্তার হ্যারি টিম্বার্স, তাঁর স্ত্রী আর ৬/৭ বছরের দুটি মেয়ে, অমিয়দা, হৈমন্তী, আরও কে কে। যা দেখি তাই ভাল লাগে। ভাল লাগার জন্য মন তৈরি হয়েই এসেছিল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আমি চাই তুমি এখানে মনের সুখে থাক। ভেবেছিলাম তুমি ছোটদের জন্য গল্প লেখ—সন্দেশ পড়ি আমি—তোমাকে দিয়ে শিশু বিভাগের কাজ করিয়ে নেব। এখন মনে হচ্ছে তার চেয়ে তুমি কলেজে ইংরিজি সাহিত্য পড়িও, স্কুলের ওপরের ক্লাসেও ইংরিজি পড়িও। টাকার আছেন, তনয় আছেন, তাঁদের তোমার ভাল লাগবে। কিছু বলবার থাকলে আমাকে বলে যেও।'

আমার কিছু বলবার ছিল না। কি থাকতে পারে ? রবীন্দ্রনাথ আমাকে ডেকে কাজ করতে বলেছেন, সে-ই আমার যথেষ্ট।

রাতে রান্নাঘরে খেলাম, ভাত, ডাল, তরকারি, নিরামিষ তরকারি, মাছের ঝোল, ভালই লাগল, ভাল রান্না। অনেকে অনেক কথা বলত, কিন্তু আমার কখনো রান্নাঘরের খাবার খারাপ লাগেনি। যদিও কিঞ্চিৎ একঘেয়ে। তবে বিকেলের জলখাবারটি যথেষ্ট বলে মনে হত না। হিরণদি, সরোজিনীদি খুব যত্ন করে খাওয়ালেন, পরে কোত্থেকে একটু সন্দেশও এনে দিলেন। বিদ্যালয় খুলতে কয়েকদিন বাকি ছিল, রান্নাঘরে মুষ্টিমেয় খাইয়ে টিম টিম করছিল।

পরদিন সকালে দুটি ছেলে আমাকে সমস্ত আশ্রম দেখিয়ে দিল। তখন আশ্রম এলাকা ছিল ছোট্ট, এক বেলাতেই দেখে নিলাম। বাইরের লোকের বাস ছিল না। কাচের মন্দিরের পরে শান্তিনিকেতনের আদি বাড়ি, আগে এরই একতলায় দীপু ঠাকুর থাকতেন, আর আমবাগানে যেসব ছোট ছেলেরা আম চুরি করতে আসত, তাদের লজ্জা দিতেন। তখন সবটাই অতিথিশালা। বাইরের কুয়োর একটা পোস্তোয় লেখা ছিল 'অতিথি', উল্টোদিকের পোস্তোয় লেখা ছিল 'শালার জন্য।' তাই দেখে অতিথিরা হাসাহাসি করত। দক্ষিণে আমবাগান তখনো ছিল, আরও সতেজ, আরো সবুজ। তখনো কাউকে পাকা আম খেতে হত না। আরও দক্ষিণে শালবীথি।

বড় রাস্তা থেকে ঢুকতে শালবীথির প্রথম বাঁয়ের বাড়ি 'দ্বারিক' ছিল কলাভবনের ছাত্রাবাস। সে বাড়ি আর নেই। তার সামনে দেহলী, আগে যেখানে

রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন থেকেছেন। এখন সেখানে মৃণালিনী পাঠশালা। তখন কলেজের অধ্যক্ষ গাঙ্গুলীমশাই থাকতেন। তারপর অনেকগুলো মাটির বাড়ির শেষে একতলা পাকা লাইব্রেরী, তার দেয়ালে সুন্দর ছবি আঁকা। আমাকে দেখে কাল দাড়ি, লম্বা, ফর্সা, সুন্দর একজন মানুষ বেরিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে সেই মুহূর্তেই একটা গভীর প্রীতির সম্বন্ধ তৈরি হয়ে গেল। তিনি হলেন শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, লাইব্রেরিয়ান।

লাইব্রেরির সামনে ঘণ্টাতলার মাঠ এখন যেমন, প্রায় তেমনি ছিল, শিশু বিভাগ, সিংহ সদন। তার পেছনে খোলা মাঠ। একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে গুরুপল্লীর মাটির বাড়ির সারিতে গুরুরা সকলে থাকতেন। ছবির মত দেখতে লাগত। তারই পূবে দ্বিজেন ঠাকুরের নিচু বাংলা, তার ফলের গাছের ছায়া মেখে অপেক্ষা করে থাকত। আশে-পাশে কয়েকটা মাটির বাড়িতে কয়েকজন মাস্টারমশাই থাকতেন। কিছু ছোট ছোট ইঁটের বাড়িও বোধহয় ছিল। আগের দেখা, পরের দেখা ভাল করে মনে করতে পারি না।

বিকেলের গাড়িতে আমাকে তুলে দিয়ে, ধীরেনদা বললেন, 'গুরুদেব বলেছেন, বিদ্যালয় খুলে গেলে আর দেরি করবেন না। জিজ্ঞাসা করতে বললেন কত হলে আপনার চলবে?' ভারী লজ্জা পেলাম। বললাম, 'উনি আমাকে যা দেবেন, তাতেই আমার চলে যাবে।'

বিদ্যালয় খুলবার সময় আমার শরীর খারাপ হয়েছিল, সাত দিন দেরি করে গেছিলাম। আমার এক সপ্তাহ পরে আমার বাল-বন্ধু পূর্ণিমা—দ্বিজু ঠাকুরের মেয়ে নলিনী চৌধুরীর ছোট মেয়ে, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর দেওরঝি এবং পরে যখন পূর্ণিমার সুরেন ঠাকুরের বড় ছেলে সুবীরের সঙ্গে বিয়ে হল, তখন ভাইপো-বৌও বটে—এসে কাজে যোগ দিল। তাকেই দার্জিলিং-এ দেখেছিলাম। সে মিনি-মাগনা পড়াবে। তার অভিভাবকদের মতে মেয়েদের পরনির্ভরশীল হতে হয়, নইলে তাদের পুরুষ আত্মীয়দের মনে থাকে না। আমার মাইনে ঠিক হল ৮৫ টাকা, তার থেকে হস্টেলের খরচ ২০ টাকা কাটা হত। বাকিটা ওস্তাদ বলে একজন চাপরাশি আমার হাতে নগদ দিয়ে, সই করিয়ে নিত। আমি তাতেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলাম। বাপের বাড়িতে কে আমাকে মাসে মাসে ৬৫ টাকা দিত? তাছাড়া বেশির ভাগ অধ্যাপকরাই ছিলেন অত্যন্ত গুণী এবং মাইনে পেতেন ৩০ থেকে ৭০—৭৫-এর মধ্যে। নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন ঘোষ, নেপালচন্দ্র রায় ইত্যাদিও কেউ ২০০—২২৫-এর বেশি পেতেন না বলে আমার ধারণা। তাতেই সকলের সাদাসিধেভাবে চলে যেত, শান্তিনিকেতনের কর্মীরা বিলাসিতার ধার ধারতেন না। দারুণ ভাল লাগত। কি কি ভাল লাগত একটু বলি:

গাছতলায় ক্লাস, বাহুল্যবর্জিত ব্যবস্থা। একটা ব্ল্যাকবোর্ড, যে-যার বগলে বসবার আসন, একজন গুরু, কয়েকজন ছাত্র, খানকতক বই, এর বেশি কি-ই বা দরকার ? মাথার ওপর ছাদ নেই, চারদিকে দেয়াল নেই।

আরও ভাল লাগত আশ্রম এলাকা তকতক ঝকঝক করছে। বুধবার ছুটির দিন। সেদিন ছেলেরা ছোট ছোট দল বেঁধে আগাছা পরিষ্কার করত। রান্নাঘরের পরিবেশনের কাজ, বাসন ধোয়ার কাজ, অতিথি আপ্যায়নের কাজ, পালা করে ছেলে-মেয়েরা করত। তাতে পড়ার যেটুকু ক্ষতি হত, সেটুকু তৈরি করে নিতে বিশেষ অসুবিধা ছিল না। দুষ্টু ছেলেমেয়ে তখনও ছিল, তাদের শাসনের জন্য বিচার সভাও ছিল, তার সদস্যরা সবাই ছাত্রছাত্রী। কোন অন্যায় কাজ বা অন্যায়কারী পার পেত না, নিজেরাই বিধান দিত, আন্দোলন করবার কোন দরকার হত না।

রবীন্দ্রনাথের তখন ৭০ বছর বয়স, নিয়মিত পড়ান না, কিন্তু অবারিতদ্বার। যার সাহসে কুলোত সেই গিয়ে তাঁকে মনের কথা বলে আসতে পারত। সপ্তাহে সপ্তাহে সাহিত্য সভা হত, ছেলেমেয়েরা নিজেদের রচনা পড়ত, অধ্যাপকরা উপস্থিত থাকতেন, সভাপতিত্ব করতেন। ভোর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত গানের হাওয়া বইত। মনে হত সমস্ত আশ্রমটাই গান গাইছে। বাংলার ছয় ঋতু যে কি মহান, কি মধুর, সেকালের শান্তিনিকেতনে পা দিলেই টের পাওয়া যেত। এখনো যায়। গান বন্ধ হয়ে গেছে, তব যায়।

সাত দিন পরে বুবু এসে অবাক হয়ে দেখল আমি আশ্রম-জীবনের মধ্যে একেবারে তলিয়ে গেছি। আমার মনে হত আমার মনের দরজা-জানলাগুলো একে একে খুলে যাচ্ছে। ভিতরে ভিতরে কত কথা গুণগুণিয়ে উঠত তার ঠিক নেই। যত দূর মনে পড়ছে দার্জিলিং-এর ঐ তিন মাসে একে-ওকে কয়েকখানা আবেগপূর্ণ চিঠি লেখা, চার্কোল দিয়ে খানকতক নিরাভরণ কাঞ্চনজংঘার ছবি আঁকা ছাড়া আর কোন কাজ করিনি। তবে নিজের সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়া করেছিলাম বটে। শান্তিনিকেতনে তার সময় পাইনি। কিন্তু প্রতি মাসে দুটো-একটা গল্প, প্রবন্ধ, সন্দেশে, মৌচাকে ও অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন, 'ওগুলো সংগ্রহ করে একটা ছোট বই করে ফেল, নইলে হারিয়ে যাবে। আমার কত লেখা হারিয়ে গেছে।' আমি কিন্তু সাহস পেতাম না, ইউ রায় এন্ড সন্স উঠে গেছে, কে আমার বই ছাপবে ? তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, যদিও ২৩ বছর পূর্ণ হয়ে গেছিল, কাছাকাছি বয়সের অনেক লেখক,—বুদ্ধদেব বসু, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ—পাকা সাহিত্যিক বলে খ্যাতি পেয়েছিলেন—তবু আমার নিজের ওপর কোন আস্থা ছিল না। মনে হত বড় বেশি আশ্রিত—আচ্ছাদিতভাবে জীবন কাটিয়েছি, গাদা গাদা

বই পড়েছি বটে, কিন্তু বহির্জগতের হালচাল কতটুকু জানি।

একটা শিক্ষা আমার অল্প দিনের মধ্যেই হল। আশ্রমে যত স্বাধীনতাই থাকুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে এত বেশি পরচর্চা যে নিজের কানকে বিশ্বাস করা যেত না। সামনা-সামনি বেশির ভাগ লোক যা বলে, পেছনে তার একেবারে উল্টো কথা বলে। পরের আচরণে খুঁৎ দেখলে মুখে রাগমাগ করলেও, বেশির ভাগ লোক ব্যাপারটাকে বেজায় উপভোগ করে। দয়া-মায়া-ক্ষমা এসব জিনিসের এত অভাব আগে জানিনি। একদিন উত্তরায়ণে কবির কাছে গিয়ে শুনতে পেলাম কলেজের উচ্চপদস্থ একজন অধ্যাপক, বি-এ ক্লাসের একজন মেয়ের নামে নালিশ করছেন। তাই নিয়ে উপস্থিত পুরুষ ও মহিলারা—যাঁদের অনেকের সঙ্গে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না—নানারকম বিরূপ মন্তব্য করলেন। মেয়েটিকে ডাকা হল না, জিজ্ঞাসা করা হল না, তখন-তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ওকে চিঠি লিখে শান্তিনিকেতন থেকে চলে যেতে বলা হবে। মনে আছে আস্তে আস্তে চলে গেছিলাম। আমার জ্ঞানচক্ষু একটু একটু করে ফুটছিল।

পরে ভেবেছি ব্যক্তিগত আক্রোশ, কিম্বা একটা ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি হিংসা-দ্বেষ, পরনিন্দা, নিজের সুবিধা করে নেবার চেষ্টা—এসব হবেই। কিন্তু এতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ এতটুকু ম্লান হয় না। প্রকৃতির বুকে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দেবার কথা যে কবি বলতেন, এখানে এসে দেখলাম সে কি মনোহর জিনিস। প্রকৃতির এমন অপরূপ প্রকাশই বা আছে কোথায়। যেমন চাঁদের আলো, তেমনি কাল মেঘের ঘনঘটা, যেমন সকাল, তেমনি সন্ধ্যা, সমস্ত আকাশটা যেন নাগালের মধ্যে চলে আসত। কি কঠিন রুক্ষ জমি। কিন্তু কি উর্বরা, এতটুকু জল, এতটুকু যত্ন পেলেই যা ছিল মরুভূমি, তা হয়ে ওঠে তপোবন। কি সে পাখির কি সে পলাশ শিমুলের বাড়াবাড়ি। এইটুকু বাতাস উঠল তো চারদিকে শিরশির সরসর করে মাতন লেগে গেল। মনে হত একটা নিশ্বাসের শব্দও এখানে নষ্ট হয় না। রবীন্দ্রনাথ একদিন পাকা ধানের ক্ষেতের ধারে আমাকে দাঁড় করিয়ে ধানের গান শোনালেন। বাতাসের দোলা লেগে পাকা ধানের শীষ একটার পর আরেকটা আছড়ে পড়ছে আর মধুর এক ঝম-ঝম-ঝম শব্দ উঠছে।

এর আগেও কত সুন্দর জায়গায় থেকেছি, প্রকৃতির লীলাভূমি শিলং-এ শৈশব কাটিয়েছি, পরে দার্জিলিংয়ের মহান সুন্দর দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু শৈশবে ছাড়া প্রকৃতি কোথাও এমন করে আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেনি। এখানে আমার সমস্ত অনুভূতিগুলো সচেতন সজীব হয়ে উঠেছিল। আমার পুরনো সমস্যা যা কিছু ছিল, সমস্তই আপনা থেকে সমাহিত হয়ে গেছিল। সমস্যার

সমাধান মন নিজে করে, বাইরে থেকে হয় না। এখানে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম। ছোটবেলার সেই চেতনা আবার মনে জেগে উঠেছিল। আমি নতুন করে টের পাচ্ছিলাম ২৩ বছরেও বিশেষ কিছু করিনি, কিন্তু লেখা ছাড়া আমাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। বাংলায় লেখা। যে ভাষায় বাঙালী শিশুরা মাকে ডাকে, বাঙালী বুড়োরা মরার সময় ভগবানকে ডাকে, সেই সহজ ভাষায় লিখতে হবে। কোন বই পড়ে সে ভাষা শেখা যাবে না। শান্তিনিকেতনে এক সঙ্গে এত মানুষকে এত ভাল লেগেছিল, সেখানে, এত আজীবনের বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল যে বারে বারে বলেও মন ওঠে না যে, ঐখানে আমার মনের নিবাস। সেই সব মানুষদের কথা বার বার বলি।

মাত্র এক বছর ছিলাম বিশ্বভারতীর কর্মী হয়ে। তারপর কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছিলাম। বুবুও সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল। কিন্তু দুজনেই চিরজীবনের মত হৃদয় দান করে এসেছিলাম। ওখানকার কাজ আমার ভাল লাগত না। হয়ত অধ্যাপনাই ভাল লাগত না, সে-ই ছিল একটা বড় কারণ। প্রতিদিনের জীবন আকণ্ঠ উপভোগ করতাম, শ্রদ্ধা করবার অনেক পেতাম, মাথার ওপর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। গলদ সেইখানে। মাঝে-মাঝেই দীর্ঘকালের জন্য অদৃশ্য হয়ে যেতেন, পারস্যদেশে, নানা জায়গায়। তা না হলে অশান্ত হৃদয় নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই উনি বাজপাখির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে একবার তাকিয়ে নরম গলায় যেই বলতেন, 'ওরা বলেছে বলে কি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়েছে ?' অমনি ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হয়ে যেত। বলতেন—'ছোট মুখের ছোট কথায় কান দিও না। আমাকেও তো কত কি বলে। চিরকাল বলেছে।' তবু শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুত এক বছরের বেশী থাকিনি। ভাবতাম নিজে চলে না গেলে এরা আমাকে ঝেড়ে ফেলে দেবে। রবীন্দ্রনাথ তখন ইরানে। ছোট মুখের ছোট কথাই বটে। বার-তেরো বছরের ছেলে-মেয়েদের কোপাই নদীর ধারে পিকনিকে নিয়ে গেলাম। সারা দিন আনন্দ করে ফিরে এলাম। পর দিন কবি মুচকি হেসে বললেন, 'তোমরা নাকি কাল মিকসড বেদিং করে এসেছিলে ?' ঝপ করে মনের মধ্যে আনন্দের বাতিটা নিবে গেল। দোলের মেলা থেকে আমার বি-এ ক্লাসের ছাত্র গোবর্ধন মপারা আমাকে একটি সুন্দর ফুলের মালা কিনে গলায় পরিয়ে দিল। তাও ডালপালা গজিয়ে, সব মাধুর্য হরণ করে কবির কানে গিয়ে উঠল। বৃহৎ যাঁরা ছিলেন, নমস্য যাঁরা, আমার আজীবনের অনুকরণীয় আদর্শ যাঁরা, আমার প্রিয় বন্ধু যাঁরা, ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দনাল, প্রভাতদা, তেজুদা, গোঁসাইজী, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য এঁরাও ঐ পরিবেশে দীর্ঘকাল, কেউ কেউ আজীবন কাটিয়ে দিলেন। হয়ত এসব তুচ্ছ জিনিস লক্ষ্যই করলেন না, তার কারণ তাঁরা তাঁদের কর্মজীবনের দিশা পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি পাইনি।

অধ্যাপনা আমার কাজ নয়। অথচ তার মানে নয় যে, ক্লাস নিতে আমার খারাপ লাগত। প্রায়ই ভারি মজা হত। তবু কেবলই মনে হত এ কাজে জীবনের অমূল্য সময় বৃথা ব্যয় করছি। কবির কাছ থেকে তাঁকে দেখবার আগে যা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে চলে আসার পরেও যা পেয়েছি এবং আজও যা পাচ্ছি, তা যেন ঐ কাছে কাছে থাকার এক বছরের পাওয়ার চাইতে ঢের বেশি। তবে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানবার এমন সুযোগ আর কোথায় পাব। একবার অমিয়দা ছুটিতে গেলেন, আমি এক মাস কবির সচিব হলাম। মেয়ে বোর্ডিং-এর অধ্যক্ষা হেমবালাদি চাইতেন অন্যান্য বোর্ডিং-বাসিনীদের মতো আমরাও বাধ্য মেয়ে হয়ে থাকি, ঘণ্টা পড়লে ছাত্রীদের মতো ঘরে গিয়ে ঢুকি। চিরকাল আমি নিয়ম-শৃংখলার ভক্ত, কিন্তু কারো প্রভুত্ব সইতে পারি না। হেমবালাদির পক্ষে কি করে আমাকে ভালো লাগা সম্ভব হতে পারে? রাতে খাওয়ার পর, হয়তো পৌনে ন'টার সময় বুবু আর আমি প্রায় রোজ উত্তরায়ণে চলে যেতাম। সেখানে চারু দত্ত বলে একজন আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। আই সি এস। স্বদেশীয়ানার জন্য বরখাস্ত হওয়া, সাহিত্যপ্রেমিক, অপূর্ব চন্দর শ্বশুর। এককালে টাউন ক্লাবের সদস্য হয়ে আমার বড় জ্যাঠা সারদারঞ্জনের কাছে ক্রিকেট খেলা মকস করেছিলেন, পশ্চিম ভারতের পরিবেশে অতি চমৎকার অনেকগুলি রোমাঞ্চময় বই লিখেছিলেন। কি সুন্দর গল্পই যে করতে পারতেন। সে সময়ে বিশ্বভারতীর মিনি-মাগনার পরিদর্শক গোছের হয়ে ছিলেন। তাঁর পরে আসতেন আরিয়মদা, যিনি পরে আশা অধিকারীকে বিয়ে করে ওয়ার্ধা সবরমতী ইত্যাদি নানা জায়গায় কাজ করে জীবন কাটিয়েছিলেন, ডঃ আলি যিনি শ্রীনিকেতনের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ম্যালেরিয়া দূরীকরণের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, প্রফেসার টাকার অ্যামেরিকার কোনো সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন এবং কলেজে ইংরিজি পড়াতেন, ধীরেনদা, তিনিও লণ্ডন থেকে ডি এস সি হয়ে এসে শ্রীনিকেতনের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং অপটুত্বের জন্য আমাকে বকাবকি করতেন, ভারি কর্মদক্ষ এবং কটুভাষী মানুষটি নিজেকে অপ্রিয় করতে ওস্তাদ। দেশ-বিদেশের গল্প হত, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, খেলাধুলো কিছু বাদ যেত না, কেউ কেউ ব্রিজ খেলতেন, লোক কম পড়লে আমাকে নিতেন, খুব দক্ষ ছিলাম না, ধীরেনদা বকতেন। হস্টেলে ফিরতাম রাত দশটায় আলো নিবে যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে কিম্বা সঙ্গে সঙ্গে। হেমবালাদি এই নিশাচরণ সমর্থন করতেন না। কবিকে বলেও কোনো লাভ হত না। একে আমরা অধ্যাপিকা, তায় তাঁর বাড়িতেই বসে দেরি করছি! তাছাড়া তাঁর মন ছিল সমুদ্রের মতো উদার।

ভোর থেকে ঘণ্টা, কুঁড়েদেরও শুয়ে থাকার জো ছিল না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে জলখাবার খেয়ে ঘণ্টাতলার মাঠের ধারে লাইব্রেরির সামনে বৈতালিকে

যোগ দিতাম। সারাদিন ধরে ভোরের বৈতালিকের আমেজ আমার মনে লেগে থাকত।

অথচ ব্যাপারটা কিছুই নয়, দুটি গান, একটু মন্ত্রপাঠ, পাঁচ-সাত মিনিটেই শেষ। কিন্তু সমস্ত বিদ্যালয় উপস্থিত থাকত। ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপকমণ্ডলী, অতিথি অভ্যাগত মায় উত্তরায়ণ থেকে অনেকে। মাথার ওপর স্নিগ্ধ নীল আকাশ তার নিচে শাল – মহুয়া গাছের সারি, বাতাস তখনো শীতল, পাখিরা গাইছে। ভালোভাবে দিন শুরু হত। আমার পাশে জগদানন্দ রায় অঙ্ক ক্লাস নিতেন, মাঝে মাঝে ধমক-ধামক কানে আসত, শুনেছি রেগে বই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াও ওঁর অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ছাত্রগত প্রাণ,অজস্র ভালো ভালো বই লিখেছেন, প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিষয়ে। আরো দূরে তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরিজি পড়াতেন, যেমনি কড়া, তেমনি স্নেহশীল। প্রথমদিন ক্লাস নাইনে ইংরিজি ক্লাস নিতে গিয়ে একজন ছেলের কাছ থেকে বই নিয়ে খুলে দেখি ইংরিজি শব্দ 'সুট'-এর পাশে বাংলায় মানে লেখা 'ঝোল'। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'সুট' মানে 'ঝোল' লিখেছ কেন রাখেশ ? সে অম্লান বদনে বলল, 'তনয়দা বলেছেন।' তাই শুনে ক্লাসশুদ্ধ সকলের কি হাসি ! একজন বুঝিয়ে বলল, 'ও বাঙাল দেখুন। রান্নাঘরে মাছের ঝোলকে 'মাছের ঝুল' বলেছিল বলে আমরা হেসেছিলাম। তাই ও ভেবেছে তনয়দাও নিশ্চয় বাঙাল 'সুট' মানে ঝোল বলতে বলছেন, 'ঝুল'। শুনে মনটা বেজায় ভালো হয়ে গেছিল। ঐ তনয়দার মতো সৎ, সৎসাহসী, রাশভারি, স্নেহশীল শিক্ষক আর দেখিনি।

নিচের ক্লাস নিতেন তেজেশচন্দ্র সেন, সকলের তেজুদা। সাদাসিধে হাসিখুসি, বাগান বলতে পাগল, গাছপালা সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল অপার। কাচের মন্দিরের পাশে মাঝখানে তালগাছ ঘিরে যে কুটির, তার নাম তাল-ধ্বজ, কবির দেওয়া। সেখানে তেজুদা থাকতেন, বাইরে কয়েকটা পুরনো ভাঙা থাম পড়ে থাকত, তার ওপর বসতেন। ছোটরা তেজুদা বলতে অজ্ঞান, এমনি রসের গল্প বলতেন। তেজুদার বন্ধু ছিলেন দিন্‌দা, দ্বিজেন ঠাকুরের বড় ছেলে দীপেন্দ্রনাথ, তাঁর ছেলে দিনেন্দ্রনাথ। সঙ্গীতের রাজা, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলতেন ওঁর গানের ভাণ্ডারী, কারণ কবি গান লিখে সুর দিয়ে নিজেই সে সুর ভুলে যেতেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে দিনুকে না শেখালেই নয়, দিনু কখনো ভুলতেন না।

বুবুর আপন মামা দিনদা, আমি তাঁর বিশাল হৃদয়ের অগাধ স্নেহের ভাগ পেয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে নাতি। এমন ভক্ত শিষ্য তাঁর আর ছিল কিনা সন্দেহ। পরে ভুল বোঝাবুঝির ফলে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেছিলেন। বুক ভেঙে গেছিল। সে আঘাত বেশিদিন সইতে পারেননি, মাত্র ৫২-৫৩ বছর বয়সে মারা গেছিলেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে তাঁর বাড়ি ছিল আনন্দ

নিকেতন। গান বাজনা, গাল-গল্প। ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা এসে আলাদা করে বিনি পয়সায় গান শিখে যেত, সবাইকে প্রচুর জলপান করানো হত। আমিও যে কত খেয়েছি ওঁদের বাড়িতে, দিনদার আর কমলবৌঠানের কাছ থেকে আদর পেয়েছি তা বলতে পারব না। বই পড়ার নেশা ছিল, বাড়ি ভরা ইংরিজি বই, কত নিয়ে পড়েছি।

এক ছুটির দিন তেজুদার বাড়িতে বুবু আমি মাছ তরকাবি রাঁধলাম, দিনদার বাড়িতে তেজুবাবু শুঁটকি মাছ রাঁধলেন। দিনদার বাবুর্চি শিক্‌কাবাব রাঁধল। সে এক এলাহি ব্যাপার। তবে ওই শুঁটকিটা কিছুতেই গিলতে পারলাম না। যদিও দিনদা আর তেজুদা বার বার বলতে লাগলেন যে এভাবে রাঁধলে কক্ষণো গন্ধ লাগতে পারে না, শিলেটের ছেলে তেজুবাবু জানবে না তো কে জানবে, ইত্যাদি। তবু আমার নাক সে কথা মানল না। দিনদা আর তেজুদা রেগে টং। যত সব বেরসিক মেয়ে।

এই গল্প শুনে, রবীন্দ্রনাথও আমাদের দিয়ে উত্তরায়ণের ছোট রান্নাঘরে রাঁধালেন। একজন চাকর উনুন ধরিয়ে মশলা বেটে দিয়ে চলে গেল। আমরা মাছ কোটা থেকে পায়েস নামানো পর্যন্ত সব করলাম। তবু কবিকে খুসি করতে পারলাম না। বলেছিলেন সাড়ে বারোটায় খাবার পরিবেশন করা চাই, আমাদের হয়ে গেল ১টা।

কত কথাই মনে পড়ে। সন্ধ্যায় রোজ উত্তরায়ণের বারান্দায় এসে বসতেন। অধ্যাপক কর্মী অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় জমে যেত। বেশিরভাগই নিঃস্বার্থভাবে তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর মুখের কথা শোনার আশায় থাকতেন। কেউ হয়তো তাঁর গলায় যুঁই ফুলের মালা পরিয়ে দিল, তিনি তাই পরেই বসে রইলেন। আমার বাবা বলতেন ওখানে যতসব মেয়েলীপনা। আমি রেশমি জোব্বা পরে গলায় ফুলের মালা পরে রবীন্দ্রনাথকে বসে থাকতে দেখতাম, বলিষ্ঠ দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দৃঢ় কণ্ঠ, যেন পৌরুষের প্রতিমূর্তি। ফুলের মালা পরলে কি পৌরুষ কমে?

সন্ধ্যা হয়ে যেত, কবি তাড়াতাড়ি খেতেন। বনমালী এসে দোরগোড়ায় দাঁড়াত। যে যার উঠে প্রণাম করে বাড়ি যেতেন।

একদিন বুবু নেই, আমি একা। আমাকে বললেন, 'তুমি যেও না, আমার কাছে বস।' উনি খেতে বসলেন, আমি ওঁর পাশে বসে দেখতে লাগলাম। বনমালী খাবার দিল। মীরাদি আসেননি, প্রতিমাদি অসুস্থ। এরকম মাঝে মাঝে হত, উনি একা খেতেন। সেদিন নিজের ছোট কোয়ার্টার-প্লেটখানি আমার সামনে ঠেলে দিয়ে, নিজের হাতে পাত থেকে লুচি তরকারি সন্দেশ তুলে আমাকে দিলেন আর কত যে গল্প করলেন। তারপর প্রণাম করে চলে আসবার

সময় বললেন, 'দাঁড়াও, দক্ষিণা দিতে হবে না ?' বলে গলা থেকে ফুলের মালাটি খুলে আমার হাতে দিলেন। আমি কিছুই বলতে পারলাম না, মনে মনে বুঝলাম এ আমার জীবনের একটি বিশেষ উজ্জ্বল মুহূর্ত।

এইরকম ছোট ছোট স্নেহের নিদর্শন শান্তিনিকেতনের কর্মীরা সবাই হয়তো পেতেন, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আমার কোনো যোগ্যতাই নেই। চাঁদের হাট জমা হয়েছিল তাঁর চারপাশে। তার মধ্যে যিনি আমাকে সব চাইতে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন, তিনি হলেন নন্দলাল বসু, আমাদের মাস্টারমশাই। রোজ সকালে ক্লাসের পর কলাভবনে গিয়ে জল-রংয়ের ছবির সরঞ্জাম নিয়ে আমার ছোট নিচু ডেস্কটির সামনে বসতাম। কখনো একাই তালগাছ-টাছ আঁকতাম, কখনো সুরেন কর এসে পাশে বসে পাঠ দিতেন, কখনো মাস্টারমশাই নিজে। যেই তিনি গিয়ে কারো পাশে বসতেন, অমনি কলাভবনে সে সময়ে যারা যারা উপস্থিত থাকত, সবাই এসে ঘিরে দাঁড়াত। এই হল সৃষ্টিকর্মের সবচাইতে ভালো পাঠের নিয়ম।

একবার আমার পাশে বসে ছবির পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলছেন আর আমার ফ্যাঁচড়া মতো তুলিগুলোকে ছেঁটে ঠিক করে, তুলি ধোয়া জলে ডুবিয়ে, একটা ছেঁড়া কাগজে পরখ করে দেখছেন। অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছি আমাদের মতো যেমন তেমন তুলির আঁচড় দিচ্ছেন না, একেক টানে একটা পাখির বাসা, তাতে পাখির ছানা, তাদের এই বড় বড় হাঁ, দূরে মা-পাখির আসার ইঙ্গিত—সব হল। এইসব করছেন আর বলছেন 'ছবি তৈরি হয় মনের মধ্যে, হাত দিয়ে কাগজের ওপর নয়, সে তো শুধু সেই মনের ছবিটার বাইরের প্রকাশ।' আর গোটা ছবিটা মনের মধ্যে তৈরি হয়ে না গেলে, কাগজে আঁচড় দিও না। ছবি আঁকা হয়ে গেলে মিছিমিছি বাড়তি আঁচড় দিও না।' এইভাবে গল্প করতে করতে ছবি আঁকার বিদ্যে শেখাতেন। কেউ পারত, কেউ পারত না। আমার শখ ছিল, কিন্তু সেরকম বলিষ্ঠ প্রতিভা নেই। ছবি ভালোবাসি, কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু আঁকি না। এক সময় কিছু এঁকেছি, প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে, রূপোর পদকও পেয়েছি, কিন্তু হাতে আমার সে জাদু নেই। ছবির বিষয়ে পড়েছি অনেক। অনেক সাহস করে মাস্টারমশায়ের গুরু অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী বক্তৃতামালার ইংরিজি অনুবাদ প্রায় শেষ করে এনেছি। এমন বই পৃথিবীতে আর আছে কিনা জানি না। এর মধ্যে সৃষ্টিকর্মের—তা সে শিল্পই হক, সঙ্গীতই হক, নাচই হক, নাট্যই হক, কি সাহিত্যই হক—মর্মকথা ধরা আছে। লিখি আর ভাবি এইখানে আমাদের মাস্টারমশাইও তাঁর অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, যদিও এ-বই তখনো কাগজে প্রকাশ পায়নি, গুরুর অন্তরে ধরা ছিল, ছাত্ররা তার ভাগ পেয়েছিল।

এই আরেকটি মানুষ যে আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। শুধু ছবি

আঁকার পাঠ দিয়েই উনি সন্তুষ্ট থাকতেন না। রবীন্দ্রনাথ যে প্রকৃতির লালন-ভূমিতে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করার স্বপ্ন দেখতেন, আজকের বিশ্বভারতী যে স্বপ্ন হারাতে বসেছে, মাস্টারমশাইও সেই স্বপ্নে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই ১৯৩১ সালে তিনি নিজে উপস্থিত থেকে কলাভবনের ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে 'ভলি-বল' খেলাতেন। কি সব মানুষ তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই আবহাওয়ায়, বিনোদদা, মাসোজি, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, রামকিংকরদা, নিজের দুই মেয়ে গৌরী, যমুনা, মুকুলদার দুই বোন বুড়ি আর রাণী, আরো কত। তারা শিখেছিল শিল্পীর জাতটাত নেই, দুনিয়ার সব কাজই শিল্পীর কাজ। গান্ধী দিবসে আশ্রমের পরিচারকদের ছুটি দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা আর অধ্যাপকরা সব কাজ করেন। তখন ছিল খাটা পায়খানার যুগ। মাস্টারমশাই তাঁর শিল্পীর দল নিয়ে কোদাল কাঁধে বালতি হাতে খাটা পায়খানা সাফ করতে যেতেন। রান্নাঘরে মেয়েরা বাসন মাজছিল, রান্না চড়াচ্ছিল। আমি একবার মুখ তুলে দেখলাম শরদিন্দু সিংহ, বনবেহারী ঘোষ, সত্যেন বিশী, কোদাল নিয়ে, 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে' গাইতে গাইতে চলেছে। এমনি ছিলেন আমার মাস্টারমশাই।

লাইব্রেরীতে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন কড়া পাহারাদার। হট্টগোল করবার জো ছিল না। প্রায় ছ' ফুট লম্বা, কুচকুচে কালো চুল দাড়ি, ফর্সা রং, সুন্দর নাক-মুখ—এই মানুষটিকে সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরাই দেখতাম। জামা-জোব্বা ধরেছিলেন চুল-দাড়ি পাকলে 'পর। তদ্গতচিত্তে কাজ করতেন। ভারি শ্রদ্ধা হত। ডিগ্রি ডিপ্লোমা ডক্টরেটের চাইতে সে বড় জিনিস। অবসর সময় রবীন্দ্র-জীবনীর নোট লিখতেন। কাজের পর রোজ বিকেলে একবার উত্তরায়ণে গিয়ে গুরুদেবকে শুনিয়ে, দরকার মতো সংশোধন করিয়ে আনতেন। এখন যখনি কেউ বলে, 'জীবনীতে ভুল আছে, তখনি আমার সেই কথা মনে হয়। এমন তথ্য-বিশিষ্ট, সযত্নে সংযোজিত বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা সন্দেহ। কোথাও নিজেকে জাহির করা নেই। আগাগোড়া নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ; মাঝে মাঝে ছোটখাটো নীতিপাঠ থাকলেও সেগুলি মানিয়ে যায়। যত দিন যায় এ বইয়ের দাম ততই বাড়ে।

শ্রীনিকেতনে মাঝে মাঝে সান্ধ্যভ্রমণে যেতাম। হেঁটে যাওয়া আসা করতাম। কোয়েকার ডাক্তার হ্যারি টিম্বার্সের বাড়িতে কফি আর জলখাবার খেতাম। নানান মারাত্মক সংক্রামক রোগের বিশেষজ্ঞ। বয়স হয়তো ৩৫-৩৬, নাচ-গান ভালোবাসতেন, নিজেও চমৎকার নাচতেন, অমায়িক, পরদুঃখকাতর। আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'তোমার নিজের দেশের জন্য তুমি কি করছ বল দিকিনি ?' প্রশ্নটা ধক্ করে বুকে বেজেছিল। আমি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে ভালোবাসি, আমি কি শের কোনো কাজে আসতে পারি ? এখনো মাঝে মাঝে সে প্রশ্নের

জবাব খুঁজি। ডঃ টিম্বার্স রাশিয়াতে টাইফাসের গবেষণা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন।

শ্রীনিকেতনে আরো বন্ধু ছিলেন, গৌর ঘোষ ফুটবলার, যিনি মুকুলদার বোন বুড়িকে বিয়ে করেছিলেন ; ধীরানন্দ রায়, যিনি জাপানী কর্মী কাসাহারার মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন ; বৌদিকে জাপানী বলে চেনাও যেত না। কাসাহারা ছিলেন বৃক্ষপালনের বিশেষজ্ঞ ; গোটা গোটা বড় বড় আমগাছ এক জায়গা থেকে তুলে আরেক জায়গায় লাগাতেন। ১৯৩১ সালে তিনি ইহলোকে ছিলেন না, কিন্তু একটা বড়গাছের ওপর একটা কাঠের তৈরি সুন্দর গাছ-ঘর তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনের সাক্ষী ছিল। কল্পনাপ্রবণ না হলে কখনো গাছ তৈরি করা যায় ? ডঃ আলির কথা আগেই বলেছি। তিনি আমাদের ডেকে চা খাওয়াতেন, হেমবালাদি অসন্তুষ্ট হতেন। এক বছর গভীরভাবে বাঁচলে কি তার কথা কটা পাতার মধ্যে ধরে দেওয়া যায় ? কলাভবনে সুকুমারী দেবী আশ্চর্য সব সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে শেখাতেন। আমার সময় হত না, পরে মেয়েদের কাছ থেকে শিখে নিতাম। ভালোমানুষ নগেন আইচ মশাই সামান্য বেতন পেতেন, কিন্তু স্বয়ং কবির কাছে শুনেছিলাম একবার আশ্রমের অর্থসংকটের সময় দুর্ভাবনায় তাঁর রাতে ঘুম হয় না, এমন সময় নগেনদা তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় গুরুদেবের পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। সে দান তাঁর গুরুদেব মাথা পেতে নিয়েছিলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবী ভুলে গিয়ে, নিচু ডেস্কের সামনে বসে অভিধান রচনা করতেন। ক্ষিতিমোহনবাবু প্রসন্নবদনে বাংলার হারানো সাহিত্য সম্পদ উদ্ধার করতেন। নেপালবাবুর স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব আর অযাচিত আতিথেয়তা জীবনে কখনো ভুলব না। তাঁর বিষয়ে নানান সরস গল্প প্রচলিত ছিল। যদিও তাঁর পুত্র আমাদের প্রিয় বন্ধু কালিপদদা সে গল্প বললে বিরক্ত হন, বলেন সব বানানো, তবু একটি না বলে পারছি না।

ভুলো মানুষ নেপালবাবুকে একবার কলকাতা যেতেই হবে। অভ্যাস মতো তোড়জোড় করতে দেরি করে ফেলে, স্টেশনে পৌঁছে দেখেন ট্রেন প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তখন আশ্চর্য উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে নেপালবাবু গার্ডের গাড়ির পা-দানি থেকে, গার্ডের কোমর জড়িয়ে তাকে নামিয়ে নিলেন। সবুজের বদলে লাল নিশান উড়ল, ট্রেন থামল। অমায়িকভাবে নেপালবাবু গার্ডকে বললেন, 'কিছু মনে কর না, বাবা, ডোণ্ট মাইণ্ড, আই হ্যাভ টু গো।' গার্ড আবার সবুজ নিশান নাড়তে লাগল।

আরো ছিলেন, সবাই আপনজনের মতো হয়ে গেছিলেন। প্রমোদবাবুর কথা মনে পড়ে। তাঁকে সবাই ডাকত 'মশাই' বলে, নিচের ক্লাসে পড়াতেন। আমাদের জন্য সাড়ে তিন টাকা দিয়ে সুন্দর সুন্দর রংয়ের বাগের হাটের শাড়ি

এনে দিতেন। শ্রীসত্যেন বিশী কলাভবনের পাঠ সবে শেষ করে এনেছিল, সে আমাদের জন্য দেড টাকা দামের চটি কিনে এনে দিত কলকাতা থেকে। তখনকার বোলপুরের এত বোলবোলাও ছিল না। 'ডেলি প্যাসেঞ্জার' বলে একজন লোক যাবতীয় দরকারি জিনিস সরবরাহ করত। আশ্রমের ধারেকাছে কোনো খাবারের দোকান ছিল না, কিছু কিনতে হলে বোলপুর অবধি হাঁটতে হত। বাস ছিল না, রিকশা ছিল না। রান্নাঘরের পেছনে 'কো-অপ' বলে একটা ব্যবস্থা ছিল, সেখানে দু পয়সা দিয়ে কাগজে মোড়া মাখন আর চার পয়সা দিয়ে প্রমাণ সাইজের একটা পাঁউরুটি পাওয়া যেত। তার একটা বড় সুবিধা ছিল যে টোস্ট করবার দরকার হত না, নোড়া দিয়ে ভেঙে নিলেই হল।

নদীর স্রোতের মতো দিনগুলো কেটে গেছিল। সে বছর রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছরের জন্ম-জয়ন্তীর উৎসব হল কলকাতায়। টাউন হলে বিরাট সম্বর্ধনা সভা হল, প্রদর্শনী হল, তিনদিন ধরে জোড়াসাঁকোয় আর নিউ এম্পায়ারে নাটক হল। টিম্বার্স নৃত্যনাট্যের 'রাজা' হয়ে খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। নটির পূজায় আমি গেরুয়া পরে ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা সাজলাম। নিউ থিয়েটার্স নাটকটির ফিল্ম তুলল, রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন, তবু জনতার সে ফিল্ম পছন্দ হল না, বেঞ্চিটেঞ্চি ভেঙে দিয়ে চলে গেল। বছর তিনেক আগে বোলপুরে সেই ছবি আবার দেখানো হয়েছিল, এবার লোক চুপ করে আগাগোড়া শুনেছিল। সাধারণের জন্যে নয় ও জিনিস। তবে সত্যি কথা বলতে কি, বোধহয় খুব ভালো হয়নি। এর মধ্যে গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন, উৎসব বন্ধ করে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। মাঝে মাঝে ক্লাস নিতে চাইতেন। আমি একবার ১৩-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেলাম, উনি শেলির স্কাইলার্ক পড়ালেন। ইংরিজি কথাগুলো পাঠ করলেন, পড়ালেন বাংলায়। সেই ক্লাসটাই একটা কাব্য হয়ে উঠল। আজো মনে পড়ে কবির ঘাড়ের ওপর দিয়ে নীল আকাশে চিল উড়ছিল।

প্রথম গুবগুবি পাখির ডাক শুনলাম, সুন্দরী হাঁড়ি চাঁচা দেখলাম। বছর ঘুরে এল। আমার প্রথম পৌষ উৎসব দেখলাম। আজও যারা বলে পৌষ উৎসবে দেখবার কিছু নেই তারা বোধহয় দেখতে জানে না। আসল জিনিসই আছে, নানা রকম মানুষ। পৌষের শেষে দল বেঁধে হেমবালাদিকে পাণ্ডা পাকড়ে কেঁদুলীর মেলা দেখে এলাম। সারা রাত শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা ঘটনার বিষয়ে দলে দলে বাউলরা গান গাইল। দেখলাম এদের দলে ঠাকুমা থেকে নাতি গাইছে।

গাছের পাতা খসল ; দলে দলে বুনো হাঁস দুমাস আগেই এসেছিল, রোজ তাদের ডানার শব্দ শুনতাম। শীত। পরপর শীত গেল, পাখিরা গাইতে শুরু করল, রাতারাতি গাছে গাছে পাতার কুঁড়ি দেখা দিল। সকালের বৈতালিক

আরো মধুর হয়ে উঠল, কোনোদিন শান্তিদেব গান করত, কখনো বা সুধীর কর, কিম্বা আর কেউ। মহুয়া গাছে ফল ধরল, তার নিচে ক্লাস নিতাম, টুপটাপ করে কোলের ওপর ফল পড়ত আর আমিও টের পেতাম এবার আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। এত সুন্দর জায়গা, এমন চাঁদের হাট, এখানে আমি থাকি কি করে ?

গরমের ছুটি হলেই দলের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে গেলাম, আর এলাম না। রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন, যদি আস, দেখবে তোমার জায়গা তোমার জন্যেই রয়েছে। সেই জায়গাটুকুই আজ পাথেয় ! তাই এখন শান্তিনিকেতনে আমার বাড়িঘর।

সারা বছর ধরে প্রতিদিনকার জীবনে যে রসের পালা চলত, এর মধ্যে তার কথা কিছুই বলা হল না। কলকাতায় ফিরে এসে, দিনের পর দিন ধরে সারা গ্রীষ্মকাল আমি সেই সব রসের কথা আরেকবার করে উপভোগ করেছি। তার ছোঁয়া লেগে আমার সমস্ত চিন্তাধারায় রঙ ধরে গেছিল। সে এক নতুন পালা।

দ্বিতীয় পর্ব

আমাদের বিয়ের একটা যেমন-তেমন ন্যাড়া বিবরণী দিই শোন। আমাদের বিয়ের দিন দারুণ বৃষ্টি পড়েছিল। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, বৃষ্টি পড়ার কোন কারণ ছিল না। পথ-ঘাট ভেসে গেল, সন্ধ্যার আগে গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। সুখের বিষয়, ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে জল থেমেও গেল। পরে যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তর মেম স্ত্রী নেলী বললেন, এরকম হওয়া ভালো। আমাদের দেশে বলে, এর ফলে 'বিবাহিত জীবনে ঝগড়া-ঝাঁটি হয় না।' তা জানি না, কিন্তু গত ঊনপঞ্চাশ বছরে আমাদের যথেষ্ট ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে। সে যাক্‌গে।

মোট কথা, আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় লেগেছিল পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট। পৌর অ্যাক্‌ট নতুন চালু হয়েছিল, নাম সই করে বিয়ে। তার তিন-চার জন সাক্ষী, আবার সেই সাক্ষীদের আরো তিন-চার জন সাক্ষী সই হয়ে গেলেই চুকে গেল। রেজিস্ট্রারের অফিসে এক কপি, আমাদের কাছে এক কপি। তা সেই কপিটা আনা হয়নি শেষ পর্যন্ত। কি লেখা ছিল, তা-ও মনে নেই। তবে একথা মনে আছে, আমার সোনা পিসিমার ছেলে মুকুল বসু, (আমার মুকুল দা) শুধু আমার পক্ষের সাক্ষী হয়নি, ওর নিজের গাড়ি করে আমাকে অকুস্থলে নিয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। সেজন্য এক বছর বাবার কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়েছিল।

অবিশ্যি এর মূলে ছিলেন আমার পিসিমা। বাবাকে কব্‌জা করতে না পেরে, আমার দরকারের সময়ে এইভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। মা-মাসি-পিসি-খুড়ি-জেঠির মতো কে-বা আছে। ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গে পিসিমার ঝগড়া, বাবা নাকি গায়ের জোরে জিততেন।

আসল ব্যাপার হল যে, বাবার অমতে বিয়ে হয়েছিল। সে এক বছর-জোড়া লোমহর্ষণ কাহিনী। পাত্রকে বাবা আগে চিনতেন এবং খুবই পছন্দ। সেই হল মজা। হিন্দু পাত্র। যদি ব্রাহ্ম মতে বিয়ে করে তো আপত্তি ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা নিজেও ছিলেন হিন্দু পাত্র, তবে ব্রাহ্ম মতে বিয়ে করেছিলেন। আমাদের বেলা তাও নয়। ফলে যা হবার তাই হল। আমাদের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হল না। ভাবো একবার, না আশীর্বাদ, না অধিবাসের তত্ত্ব, (পূর্ব বাংলায় যাকে অধিবাস বলে, এদিকে তাকে গায়ে-হলুদ বলে) না রসুনচৌকি, না বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা, এমন কি, না পুরুত-আচার্য, মন্ত্র-গান, না কিচ্ছু।

তবে কি করে ভালো স্ত্রী হতে হয়, সে বিষয়ে দু-চারটি চোখা-চোখা কথা

বলতে রেজিস্ট্রারমশাই ছাড়েন নি। কে-না জানে এম্‌-এ পাস করা, কলেজের মাস্টারনী এবং প্রায় পঁচিশ বছর বয়সের মেয়েদের পক্ষে ভালো স্ত্রী হওয়া কি কঠিন ব্যাপার।

আমার বন্ধু অলকা মালা বদল করাল, আমার আঙুলে প্লেন সোনার একটা তিন সাইজ বড় আংটি পরানো হল। বিয়ের বর অলকার মামা, বিয়ে হচ্ছে অলকার বাবা বাঘ-শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরীর মে-ফেয়ারের বাড়িতে এবং তিনি নিজেও একজন সাক্ষী। কাজেই আমার চেয়ে দেড় বছরের বড় অলকা একরকম কন্যা-কর্ত্রী হয়ে বসল।

দু-পুরুষের জানা-শুনো পরিবার। অলকার মা-মাসিরা আমার মা-মাসিদের বেথুনের সহপাঠিনী। বিয়েটাই বলা যেতে পারে অলকার একা-হাতের চক্রান্তে সম্ভব হয়েছিল। তবে পাত্রটিকে মনে ধরেছিল বলে আমিও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলাম। বাড়িতে এত গঞ্জনা, এত অশান্তি সত্ত্বেও মত বদলাইনি। তবে সত্যি কথাই বলব, যদি মনে হত, মা এতে দুঃখ পাবেন, তাহলে কতখানি সাহস পেতাম জানি না। মায়ের নীরব সমবেদনা থাকলেও বাবার একটি কথার প্রতিবাদ করেননি। এই রকম ছিল তাঁর কর্তব্যবোধ। ভাই-বোনেরা সকলে আমার পক্ষাবলম্বী। যদিও প্রায় সবাই তখন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী। দিদি এম-এ বিটি পাস করে, গোখ্‌লেতে সামান্য মাইনেয় পড়ায়। সে আমাকে বেনারসি শাড়ি আর কিংখাবের ব্লাউজ আর তার জমানো এক হাজার টাকা দিয়েছিল।

সে এক বিয়ে বটে। কনের বয়স প্রায় পঁচিশ, অনেকেরই মতে বিয়ের বয়স পার হয়ে গেছে। অবিশ্যি দেখে মনে হত আঠারো-উনিশ। রোগা শ্যামা, মাথা-ভরা কোমর অবধি লম্বা চুল, দেখতে খারাপ না হলেও, কোনোমতেই রূপসী বলা চলে না। চলেছি ছত্রিশ বছর বয়সের—দেখে মনে হতো ছেচল্লিশ, কারণ কুড়ির আগেই চুলে পাক ধরেছিল—সদ্য আমেরিকা ফেরত, ছ-ফুট লম্বা, সুদর্শন, সংস্কৃত জানা, সাহিত্য সঙ্গীত-রসিক, দাঁতের ডাক্তার পাত্রকে বিয়ে করতে। আমার না ছিল বিশেষ রূপ, না ছিল এক কানা কড়ি যৌতুক। ওদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনরা আড়ালে কি মন্তব্য করেছিলেন খানিকটা আঁচ করা যায়।

তবে আমার ভক্তরা আর আশুতোষ কলেজের ছাত্রীরা হতাশ! আড়াল থেকে দেখে, তাদের চোখে জল! লীলাদির বাবা কি নিষ্ঠুর! অমন গুণের মেয়েকে কি-না বুড়ো বরের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন! অনেকটা অন্ধদের হাতি দেখার ব্যাপার! তবে এ বিষয়ে কারো কোনো কথায় আমাদের বিন্দুমাত্র এসে যেত না। অনেক চিন্তা করে মন ঠিক করে ফেলেছিলাম, তার আর নড়চড়

হয়নি। এখন মনে হয়, বাবা যদি রাগমাগ না করে, বেদনা-আবেগের শরণাপন্ন হতেন, তাহলে মন ঠিক করাটা আরো শক্ত হত। ভাগ্যিস্ আমার সঙ্গে কনসাল্ট করেননি!

সে যাক গে। সেই সন্ধ্যায় কলকাতার পথে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়েছিল। আধঘণ্টার বৃষ্টিতে। যারা বলে পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতার রাস্তায় বেশি জল দাঁড়াত না, তারা কিচ্ছু জানে না। তবে খানিকটা স্নেহের বশে আর বেশিটা কৌতূহলের জন্যে ঐ জল ভেঙে সাড়ে সাতশো অতিথি আমাদের বিয়ের ভোজ খেয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। অবিশ্যি খাননি। সেকালে গাড়িও উঁচু উঁচু হত। তাই আসতে পারলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের নকশায়, নিজের হাতের তৈরি ছোট একটি চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ উপহার দিয়েছিলেন। সেটি আমার কাছে এখনো আছে।

মে-ফেয়ারে রেজিস্ট্রির পর আমরা জল ঝড় মাথায় করে উত্তর কলকাতায় কারবালা ট্যাংক লেনে আমার শয্যাশায়ী সাতাত্তর বছর বয়সের শ্বশুর মশাইকে প্রণাম করে এলাম। তিনি আমার হাতে সোনা-বাঁধানো লোহা পরিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করতেন না, কিন্তু আমাকে আদর করে নিয়েছিলেন। আমার মা ব্রাহ্মণের মেয়ে, বাবা কায়স্থ, আমরা ব্রাহ্ম—এ সব তুচ্ছ ব্যাপার তিনি গ্রাহ্যই করলেন না। আমাকে বললেন, 'মুরগি খাওয়াটা যদি ছাড়তে পার, আমি সেরে উঠে তোমার কাছে থাকব, তোমার রান্না খাব।' মনে হয়েছিল এই উদার মানুষটির জন্য সব ছাড়তে পারি। কিছুই ছাড়তে হয়নি অবিশ্যি, উনি আর সেরে ওঠেননি। লিভারের অ্যাবসেস হলে তখন কেউ বাঁচত না, উনিও পাঁচ মাস না কাটতেই স্বর্গে গেলেন। রেখে গেলেন আমার মনের মধ্যে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের জন্যে একটি কোমল উষ্ণ জায়গা। ছোট বেলায় অনেক শুনেছিলাম, হিন্দুরা বড় অনুদার। কাজের বেলায় ঠিক তার উল্টোটি দেখলাম। হিন্দু পরিবারে বিয়ে হয়ে আমি খুব সুখী হয়েছি। আমি ঠাকুর পুজো করি না, জাত মানি না। তাছাড়া কোন তফাৎ দেখি না। বহু হিন্দু বন্ধুরাও ওসব করেন না। অনুষ্ঠিত ধর্মের ওপর চিরকালই আমার বিরাগ।

যাই হোক, কারবালা ট্যাংক থেকে ফেরবার পথে দেখলাম সার্কুলার রোডে জল বেড়েছে। আমার স্বামীর বুইক গাড়ি সন্তর্পণে তারি উপর দিয়ে যখন থিয়েটার রোডে আমার জ্যাঠতুতো ভাসুর খগেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ির সামনে দাঁড়াল, দেখলাম লোকজনে, আলোয়, আনন্দ-কোলাহলে বাড়ি গমগম করছে। ঐখানে আমাদের বিয়ের ভোজ হল। সাড়েসাতশো লোক চিংড়িমাছের মালাই কারি, রাবড়ি, ইত্যাদি ভালো ভালো জিনিস খেয়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে অনেক রাতে বাড়ি গেল। দুঃখের বিষয় আমার মনের অবস্থা এমন ছিল না যে

ঐসব উপভোগ করি।

সেই উনিশে ফেব্রুয়ারী, উনিশশো তেত্রিশ থেকে আমার নতুন জীবন শুরু হল। বলেছি তো সবই হল উল্টোরকম! বিয়ের ভোজ হল বরের বাড়িতে, এমন কথা কেউ শুনেছে? সেই সন্ধ্যায় যাদের সঙ্গে দেখা হল, তারাই হয়ে দাঁড়াল আমার সারা জীবনের সঙ্গী। তাই বলে পুরনো বন্ধুরা কেউ আমাকে ছেড়ে যায়নি। যাবেই বা কেন, তারা তো প্রায় সবাই হিন্দু। বিয়ের নেমন্তন্ন হয়েছিল আমার আত্মীয়-স্বজনদেরো। এসেওছিলেন সবাই। বাবা এবং মা, ভাইবোনরা ছাড়া। দাদা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, বলেছিলাম 'অশান্তি বাড়িও না।'

আমার বড়দি সুখলতা রাও এ-রকম শুধু নাম-সই করা বিয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে অনেকগুলো কড়া কথা বলেছিলেন। কিন্তু তিনি আর আমার ভগ্নীপতি ডাঃ জয়ন্ত রাও-ও এসেছিলেন। এঁরা আমার স্বামীর পুরনো পেশেণ্ট ও বন্ধুজন। সেকালের ঐসব বিরোধের কথা ভাবতে এখন আশ্চর্য লাগে। এত তিক্ততা, উষ্ণতার কিন্তু আদৌ হৃদয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক ছিল না। ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ মতামতের ব্যাপার। তবু এত ধোঁয়া, এত আগুন কেন, বোঝা যায় না।

খালি বাবা আমাকে ত্যাগ করলেন। পরদিন সকালে সব কথা ভুলে, দুজনে গেলাম বাবাকে প্রণাম করতে। তিনি আমাদের দেখেই ঘর থেকে উঠে চলে গেলেন। শুধু ঘর থেকেই নয়, আমার জীবন থেকেই সরে পড়লেন। তারপর আঠারো বছর বেঁচে ছিলেন, কখনো আমার বা আমার ছেলে মেয়ের দিকে ফিরে চাননি। আমি তবু দু-চার দিন পরপর ওঁদের বাড়িতে গিয়েছি। মা ভাই-বোনদের অজস্র আদর পেয়েছি, বাবা আর আমার সঙ্গে কথা বলেননি। তিলে-তিলে আমার মনেরো নিশ্চয় পরিবর্তন হয়েছিল। আঠারো বছর পরে যখন তিনি চোখ বুজলেন, আমি এতটুকু ব্যক্তিগত অভাব বোধ করিনি। যে অভাব, যে বেদনা ছিল, ঐ সময়ের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে, টের পেলাম। শিউরে উঠেছিলাম। সবাইকে বলেছি, 'এমন কাজও কর না। ভালোবাসার উপরে মতামতকে স্থান দিও না।' ভাবি যদি জঘন্য কোনো অন্যায় কাজ করতাম, তাহলে আমাকে এর বেশি কি শাস্তি দিতে পারতেন? ভালোবাসা আর মতামত। দুইয়ের মধ্যে আসলে কোনো সম্বন্ধ নেই। তাছাড়া মতামত বড় সাংঘাতিক জিনিস। আমারো যেমন নিজস্ব মতামতের অধিকার আছে, আমার বুদ্ধিমান বয়স্ক সন্তানদেরো সমান অধিকার আছে। সবচেয়ে মজার কথা হল, এটা বাবার কাছেই শিখেছিলাম। যখন বুঝলাম যা হবার নয়, তা হবার নয়, তখন ঐ অধ্যায়টা খরচের খাতায় লিখে নতুন জীবন শুরু করলাম।

নিতান্ত আঘাটায় পড়িনি। আমার স্বামীর নিজের বাপ, দাদা, দিদি বৌদিকে না চিনলেও, আমার বন্ধু অলকার কারণে সমবয়সী ভাসুরপো-ভাসুরঝি, মায়ের বয়সী ভাসুর, জা, দেওর, ভাগ্নে-ভাগ্নী অনেককেই বহুদিন ধরে জানতাম। বিয়ের রাতে লাইন দিয়ে বয়েসে বড়রা অনেকে এসে প্রণাম করল। আমি তো কোন দিকে তাকাব ভেবে পাইনে।

একজন বলিষ্ঠ, কালো, প্রায় সমবয়সী ছেলে এসে বলল, 'তুমি আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট, কিন্তু সম্পর্কে মামীমা হও, তাই প্রণাম করতে এলাম।' তার নাম ছিল রবীন্দ্রলাল রায়। ছোটদের জন্য গল্প, প্রবন্ধ লেখায়, আর ক্যারিকেচার করাতে তার জুড়ি ছিল না। সে আমার নতুন জীবনের প্রথম বন্ধু। বছর দুই আগে তার মৃত্যু পর্যন্ত সে বন্ধুত্বে এতটুকু ছেদ পড়েনি। অধ্যাপক নীরেন রায়ের সঙ্গে চেনা হল। তখন তিনি পরিচয় পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ইংরিজি সাহিত্যে দক্ষ, ঘোর কমিউনিস্ট। ওঁর কল্যাণে মার্ক্সবাদ সম্বন্ধে কিছু পড়তে বাকি রাখিনি। তবু কেন দলে ভিড়ছি না বলে চটে যেতেন। আমাকে দিয়ে 'পরিচয়ের' জন্য সমালোচনা লিখিয়ে নিতেন। মতে না মিললে রেগে-মেগে ফেরৎ দিয়ে যেতেন। শানানো সব কথা বলতেন! মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট চকোলেট খাওয়াতেন। কবি সুধীন দত্তকে আগের বছর শান্তিনিকেতনে দেখে তাঁর রূপে হাঁ হয়ে গেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখুনি বললেন, 'মনে রেখো, ও বিবাহিত এবং খটমট কাব্য রচনা করে।' এবার তাঁকে বন্ধুভাবে পাওয়া গেল। পরে আমাদের বাড়িতে অনেক সন্ধ্যা কাটিয়েছিলেন। চৌকস্ কইয়ে-বলিয়ে মানুষ। ভালো ইংরিজি বলতেন। একদিন কফি খেতে খেতে বললেন, কফি কেমন হওয়া উচিৎ বলব—'ডার্ক অ্যাজ দ্য ডেভিল, হট অ্যাজ হেল, অ্যাণ্ড সুইট অ্যাজ সিন।'

একটা মজার গল্প বলি। আমাদের সেই বিয়ের রাতে অনেকের জুতো চুরি গেছিল। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন সুধীন্দ্রনাথ। খালি পায়ে সুন্দর মানুষটি অনেকক্ষণ তাঁর নতুন ভালো পাম্‌শু জোড়া খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে, খালি পায়ে গাড়ি চেপে বাড়ি চলে গেলেন। পরে আমাদের কাছে গল্প করলেন, 'শুধু যে জুতো হারাল তাই নয়, চোরটাকে দেখেও কিছু করতে পারলাম না এই দুঃখ।'

আমরা বললাম, 'কেমন চোর?' 'ভদ্রলোকের মতো দেখতে, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, একটা ফিকে গেরুয়া উড়নি কাঁধে ফেলা, রোগা, লম্বা, ফর্সা, কুচকুচে কালো দাড়ি। আরেকবার দেখলেই চিনতে পারব। সকলের পায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খালি পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেখেই বুঝলাম প্রফেশনাল, সঙ্গে দল আছে, তাদের কাছে আমার জুতো পাচার করেছে।' আমি তো শক্‌ড্। 'আরে ও যে আমার নানকু দা, উপেন্দ্রকিশোরের ছোট ছেলে

সুবিমল। ওর-ও নতুন জুতো সেদিন খোয়া গেছিল, তাই সকলের পা দেখছিল, কেউ যদি ভুল করে পরে থাকে।' সুধীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওঁকে যেন আবার আমার কথা বলা না হয়।'

হার্ডিং বলে এক ছোকরা সাহেবের সঙ্গে চেনা হল। আমার স্বামীর বন্ধু; মরিস মোটর্সে চাকরি করত, ইংরেজ। ওরা মা ম্যাডেলিন হার্ডিং রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত ছিলেন, বই টইও লিখেছেন। হার্ডিং এ দেশ আর এ দেশীয়দের ভালোবাসত। নানারকম দোষ ধরে দিত, আমরা তেড়ে তর্ক করতাম। গাড়ি নিয়ে বাংলার গাঁয়ে, বনে জঙ্গলে বেড়াবার শখ ছিল। আমরাও কতবার সঙ্গে গেছি। বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেছিল। দেশ স্বাধীন হলে ওদের আপিস গুটিয়ে আনা হল। ও-ও উগাণ্ডা চলে গেল। যাবার আগে একটি চঞ্চলা আইরিশ মেয়ে বিয়ে করেছিল। এখন তাদের কোনো খবরই জানি না।

সেই দিন থেকেই একটা নতুন পরিবেশে নতুন জীবন আরম্ভ হয়ে গেল। পুরনো চেনা লোকরাও নতুন চেহারা ধরল। এতকাল যাকে যা বলে ডেকে এসেছি, অনেক জায়গায় সে ডাক বদলাতে হল। আমার শ্বশুর ছিলেন বাপের সবার ছোট ছেলে। আমার স্বামী তাঁর ছোট ছেলে, আমি তাঁর চেয়ে এগারো বছরের ছোট। হঠাৎ কেমন বড় হয়ে গেলাম। আমার বড় ভাসুর ডাক্তার জে এন মজুমদারের মেজো ছেলে ডাঃ জ্ঞান মজুমদার আমার কলেজ জীবন থেকে চেনা, আমার চেয়ে বছর দুইয়ের বড়। সে আমার ভাসুর-পো হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল। দেখাদেখি তার বড় ভাই ডাঃ প্রতুল মজুমদার-ও করল। দিলীপ কুমার রায়ের ছোট বোন মায়া হল সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্জের পুত্রবধূ, আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড়, আমার ভাগ্নী। কাজেই সে-ও প্রণাম করল।

তার চেয়েও খারাপ হল আমার বন্ধু অলকার মা-মাসিরা আমার মা-মাসিদের সহপাঠিনী, আধ-বুড়ি গিন্নি-বান্নি সব। তাঁরা এক দিনেই আমার সমবয়সী হয়ে গিয়ে মনের কথা প্রাণের কথা বলতে শুরু করে দিলেন। খালি অলকা, বুবু, আমার নিজের আত্মীয়রা যেমন ছিল তেমনি রইল।

আসলে আমিও আর আমাতে ছিলাম না। কেমন যেন হকচকিয়ে গেছিলাম। আগে অধ্যাপক সুশোভন সরকার, কালিদাস নাগ, হিরণকুমার সান্যাল ও তাঁদের সমবয়সীদের বেশ কিছু বড় মনে হত। হঠাৎ আমিও বড় হয়ে তাঁদের সমান হয়ে গেলাম। জীবনের খুঁটিগুলো নড়বড় করতে লাগল। ভাবলাম এ আবার কি, পুরনো কাপড়চোপড়, জিনিসপত্রের বেশির ভাগের যেমন বিলি বন্দোবস্ত করে এসেছি, এ-ও কি তাই নাকি। সব কিছুকে অবাস্তব আর অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হতে লাগল।

রাত জাগতে পারতাম না কোনো দিনই। পরীক্ষার আগেও দশটায় শুতে

যেতাম, ভোরে উঠে পড়তাম। দেয়ালে ঝোলানো বড় ঘড়িতে দেখলাম কোন কালে এগারোটা বেজে গেছে। পরে আমার স্বামীকে বলতে শুনেছি 'দ্য ইভিনিং স্টার্টস্ এ্যাট টেন।' শুনে আমার মনের অবস্থা ভাবা যায় না!

তারপর এক সময় সব চুকে বুকে গেল। অতিথিরা বিদায় নিলেন একে একে। বাড়ির লোকদেরো খাওয়া-দাওয়া সারা হল। ঠিক বিয়ে বাড়ি তো আর নয়, বাসর-ঘরেরো বালাই ছিল না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল সবাই ক্লান্ত, শুতে পারলে সবাই বাঁচে।

আমরা ওখানে রাতে থাকব না। এল্‌গিন রোডে, হাসপাতালের সামনে আমরা একটা চারতলা বাড়ির দোতলায়, ফ্ল্যাট্ নিয়েছি। সেটাকে মহাফুর্তি করে সবাই মিলে সাজিয়েছি। হয়তো রাত দেড়টার সময় অলকারা জনা পাঁচ ছয় আমাদের নিয়ে সেইখানে গেল।

অমনি খুঁটিগুলো আবার যে যার পুরনো জায়গায় বসে পড়ল। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। দেখি কোনো সময়ে, অলকারা এসে ঘরে ঘরে সুন্দর ফুলদানিতে গোলাপ ফুল সাজিয়ে গেছে। মনটা হঠাৎ ভালো হয়ে গেল। এই তাহলে আমার নিজের জায়গা। কোথাও যাইনি আমি, সবই আছে আমার। সবাই আছে।

এই পাড়ায় আমার কৈশোর কেটেছে। এই এল্‌গিন রোড দিয়ে হেঁটে স্কুলে গেছি, মোড়ে ট্রাম ধরে এম-এ ক্লাস করতে গেছি। এখান থেকে সাত মিনিটের হাঁটা পথ দূরে আমার মা বাবা ভাই বোন এখন নিশ্চয় গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে কাদা। এর পর আর আমি কখনো বাপের বাড়ি রাত কাটাইনি। প্রায়ই গিয়ে দেখা করে এসেছি। পরে ভাই বোনদের নিজেদের আলাদা ঘর-বাড়ি হলে সেখানে ছুটি কাটিয়েছি। ওরাও আমাদের কাছে থেকেছে, সর্বদা যাওয়া-আসা করেছে। মা-ও প্রায়ই এসেছেন, খেয়েছেন, কিন্তু রাতে থাকেননি। এই ভাবে আমি বাপের বাড়ি থেকে খসে পড়লাম, কিন্তু কাছ-ছাড়া হলাম না। মনকে বোঝালাম যে পৃথিবীতে কম ভালো জিনিসই বিনা পায়সায় পাওয়া যায়। আমার বিয়ের দিনে সুখ দুঃখের বোধ ছিল না।

ফ্ল্যাট খুব ছোট ছিল না। চারটি মাঝারি ঘর, দুটি চানের ঘর, একটা বড় ভাঁড়ারের আলমারিসুদ্ধু রান্নাঘর, তাতে গ্যাসের উনুন, ওভেন, কল। ব্যাস্। একটা খোপ না, টং না, বারান্দা না। নিচে একটা গ্যারাজ আর গুদোম। একশো টাকা ভাড়া। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম খোলা। বাড়ির মালিক আমার জ্যাঠ্‌তুতো ননদাই, হোমিওপ্যাথ্ ডাঃ নগেন চৌধুরী। ভারি দক্ষ ডাক্তার, স্নেহশীল মানুষ। চার বছর ঐখানে ওঁর পাখ্‌নার তলায় পরম নিরাপদে কাটিয়েছিলাম। সেই চার বছরে অনেক সাংসারিক অভিজ্ঞতা জমেছিল, অনেক লেখক, প্রকাশক,

সম্পাদককে কাছের থেকে দেখেছিলাম ; বেশ কিছু সমালোচনা আর প্রবন্ধ লিখেছিলাম, পড়েওছিলাম রাশি রাশি বই। কিন্তু গল্প উপন্যাস মনে আসেনি। তার জন্যে যে মনের নির্জনতা চাই, তখনো তা পাইনি।

বাড়িটার একটু বদনাম ছিল। নাকি একতলার একটা ফ্ল্যাটে এক জোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা এসে উঠেছিল। প্রেমিকার বেরসিক স্বামী এক দিন রাতে এসে দুজনকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। তার কি হয়েছিল আমাদের বেয়ারা নারাণ বলতে পারল না, কিন্তু ব্যাপারটা স্বয়ং নগেনদার খাস বেয়ারা মঙ্গলের কাছে শোনা। বাড়িটা নাকি ভালো না। নতুন হলেও, নানা রকম অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়, খালি ফ্ল্যাটে আলো দেখা যায়। মোট কথা নারাণের ইচ্ছা আমরা আর কোথাও উঠে যাই। মিছিমিছি তো আর ৬টা ফ্ল্যাট্ ৫ বছর খালি পড়ে নেই। বাসিন্দার মধ্যে চারতলার দুটি ফ্ল্যাট জুড়ে নগেনদার নিজের সংসার, দোতলায় দক্ষিণের ফ্ল্যাটে আমরা। বাকি সব খালি। তবে আমরা নিরাপদে আছি দেখে, এক বছরের মধ্যে সব ফ্ল্যাট্ ভাড়া হয়ে গেল। মালকিন্ বললেন 'তোদের পয় আছে।'

আমার ইচ্ছে করত যে সময় ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে এবং আমার কাছে দু-তিন জন লোক আছে, সেই সময়ে একটা অলৌকিক কিছু হোক। বলাবাহুল্য কিছুই হয়নি। তবে একবার ফ্ল্যাটে একা রাত কাটিয়েছিলাম। সব ঘরে আলো জ্বেলেও ঘুম হয়নি।

আগেই বলেছি অবশ দেহমনে বিয়ের সেই রাতে বাড়ি এসে দেখি ঘরে ঘরে গোলাপ ফুল, নতুন টেবিল-ল্যাম্পে কোমল আলো জ্বলছে। ফ্লাস্কে ঠাণ্ডা জল ভরা, বিছানা পাতা। সব ঘর যেমন সুন্দর করে আগের দিন সবাই মিলে সাজিয়ে গেছিলাম, তেমনি সাজানো। খালি বাড়ি নয়, ভূতুড়ে বাড়ি নয়, মানুষ থাকার বাড়ি। মনে সাহস এসেছিল ; ভেবেছিলাম এখানে সংসারের কাজ শেখার অসুবিধা হবে না। সব কিছু তক্‌তক্ করছিল, খালি স্নানের ঘরের হাত ধোবার বেসিনটা কুচকুচে কালো। ঐ একটি জিনিস সাফ করানোর ভার যিনি নিয়েছিলেন, তিনি মানুষের অনির্ভরযোগ্যতা দেখে অবাক হলেন। আমিও নিঃশব্দে সেই মুহূর্ত থেকে সংসারের সব ভার মনে মনে তুলে নিয়েছিলাম, এই উনপঞ্চাশ বছরেও আর নামাইনি। অলকার ছোট বোন করুণা নিজের রুমাল দিয়ে বেসিন পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

দুটি শোবার ঘর, খাবার ঘর, বসবার ঘর, ছিমছাম সাদাসিধে সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে ছবি, দরজা জানলায় নীল পর্দা। শোবার ঘরের কোণে রাখা আমার মেজো ভাসুরের দেওয়া সেলাই-কলে তিন দিন ধরে সেলাই করে রেখেছিলাম। বাসন-পত্র, কাঁটা-চামচ, গালচে, দেয়ালের ছবি, সবই স্নেহময়

আত্মীয় বন্ধুদের উপহার।

এমনি করে আমার ঘরকন্না শুরু হয়েছিল। এতদিন পড়াশোনা করে কাটিয়েছি, শখ করে আঁকা, সেলাই, এমব্রয়ডারি শিখেছি। রান্নাও শখের জিনিস ছিল, কিন্তু দু-বেলা আটপৌরে কাজ চালাতে হলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ত। তাছাড়া বাড়ির আসবাব করতেই আমি দেউলে, রান্নার বাসন কিনতে একমাস অপেক্ষা করতে হবে। আমার স্বামী বললেন, 'কিচ্ছু ভেবো না, আমার সব আছে।' সব আছে মানে তেড়া বাঁকা, পুড়ে কালো, ঢাকনি-বিহীন কটা ডেকচি, ফ্রাই প্যান, আর হাঁড়িমুখো, জঘন্য নোংরা, তাল ঢ্যাঙা এক নেপালী বাবুর্চি। মোদো মাতাল, কিন্তু রান্নায় সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। অর্থাৎ বিলিতী রান্নায়। দিশী রান্নাকে সে ঘৃণা করত। তবে নারাণ সব ঘাটতি পূরণ করত। তারপর আমার মায়ের বয়সী বিধবা ননদ এসে দেড় মাসে আমাকে কাজ চালাবার মতো শিখিয়ে গেলেন। এই সময়কার সব কথা আমার গুলিয়ে গেছে। কারণ আমি আর পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছিলাম না। খালি মনে হত আমাকে বিয়ে করে আমার স্বামী আমাকে ছাড়া আর কিছুই পেলেন না, সেই আমি যেন তাঁকে নিরাশ না করি। সুখের বিষয় কোনো দাবিই করতেন না ; কিসে যে খুশি হবেন, কিসে বিরক্ত হবেন, সব সময়ে ভেবে উঠতে পারতাম না।

বিয়ের দু-দিন পরে মা এসে ঘরদোর দেখে ভারি খুশি, কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে মুখ গম্ভীর হল। আমিও শক্‌ড্। দেখলাম বাবুর্চি রান্নার যাবতীয় বাসন একে একে ব্যবহার করে, কলতলায় নামিয়ে রেখেছে। আ-ধোয়া অবস্থায়। সবকিছুতে সবুজ রঙ ধরেছে। অম্লান বদনে যা বলল, তার মানে হল রোজ বাসন ধোয়ার বড় বেশি ঝামেলা। তাই সব বর্তন খরচা হয়ে গেলে সে একটা গ্র্যাণ্ড ওয়াশিং ডে পালন করে!

মা খাবার ঘরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'রান্নাঘরটা সব সময় গিন্নির হাতে থাকা ভালো।' আসলে ঐ বাবুর্চিকে কিছু বললে সে শুনতে পেল কি না বোঝা যেত না। দু-দিন পরে সকালে আশুতোষ কলেজের মহিলা বিভাগ ছুটি হলে পর বাড়িতে এসে দেখি আমার খাবার ঘরের টেবিল বোঝাই চকচকে নতুন ক্রাউন এলুমিনিয়মের বাসন নিয়ে, হাসিমুখে মা বসে আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'তোর দাদা দিদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে কিনেছি।' সাধারণ সংসারে যা কিছু বাসন দরকার সবই ওর মধ্যে ছিল। এসব কিছু লেখিকা-জীবনের কথা নয়, কিন্তু এই সব দিয়েই লেখিকাদের মূলধন তৈরি হয়। টুকরো টুকরো অকিঞ্চিৎকর জিনিস, যার দামের হিসাব করা যায় না। রোজ রাতে আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে নেমন্তন্ন হত, বাড়িতে হাঁড়ি চড়ত না। আমি সবাইকে বলি জন্মাবার সময় একটা সম্পূর্ণ মানুষ জন্মায় না। রক্ত কণিকায় যা আনল তা আনল, তার ওপর যা

দেখে, যা শোনে, যা বলে যা করে, তাই দিয়ে মানুষ হয়। আমার ঐ পঁচিশ বছর বয়সে আমি আরো অনেকখানি মানুষ হয়ে গেলাম।

পাশের বাড়িতে ছোটদিদিমারা থাকতেন, খুব ভালো করে চিনতাম না। একশো নং গড়পারে মেজ-জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে দেখেছিলাম। ছোটদাদামশাই হলেন জ্যাঠামশাইয়ের মামাশ্বশুর। কাদম্বিনী-গাঙ্গুলীর ছোট ভাই। ছোটদিদিমা খ্রীশ্চান মেয়ে। তিনি আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে গল্প করলেন, 'ওমা! জানলা দিয়ে দেখলাম, খুব ঘটা করে গোঁড়া হিন্দু মতে আবার বিয়ে হল।' অথচ কিছুই হয়নি। শুনে আমি অবাক হলাম।

ক্রমে ক্রমে সংসারের সঙ্গে আরো পরিচয় হল। একদিন আমার স্বামী চেম্বারে চলে যাবার পর সদর দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুললেই বসবার ঘর, হল্ টল্ ছিল না। খুলে দিতেই হাসিমুখে এক আধাবয়সী ভদ্রলোক বাইরে থেকেই বললেন, 'আমি বাড়িওলার লোক। আপনাদের সব পাখাগুলো খুলে নিয়ে যাব, অয়েলিং ক্লিনিং করতে। বাড়িওলার এই রকম নিয়ম।' আমি বললাম, 'আমরা সব নতুন পাখা কিনেছি, কিছু করবার দরকার নেই।' তিনি বললেন, 'আহা, আমার কথা বুঝলেন না, পয়সাকড়ি দিতে হবে না। সে আমি বাড়িওলার কাছে পাই।' আমি বললাম, 'তা হতে পারে, কিন্তু নতুন পাখার ও সব দরকার নেই।' তাঁকে আমি একটুও সন্দেহ করিনি, অমায়িক প্যাটার্নের ভদ্রলোক। দরজা বন্ধ করে দিলাম। পরে শুনলাম বাড়িওলার ওরকম কোনো লোক নেই। স্রেফ পাখা সরাতে এসেছিল।

সেকালে এত বেশি অসৎ লোক ছিল না; হয়তো এত বেশি আর এত গরীবও ছিল না। জিনিসও সস্তা ছিল। মনে আছে আমার স্বামী বাবুর্চিকে রোজ দু-টাকা বাজার খরচা দিতেন। তাই দিয়ে ডেলি নিয়মে আমাদের সংসার চলত। এই ছিল, ওঁর ব্যাচেলর সংসারের নিয়ম। রোজকার রসদ রোজ আসত, মায় চাল, ডাল, তেল, ঘি সব। আমার মা-র খুব আপত্তি। এতে আমার বরং সুবিধা হত। ভোরে উঠেই উনি যেতেন রোয়িং ক্লাবে নৌকো বাইতে, আমাকে নামিয়ে দিতেন আশুতোষ কলেজের পুরনো বাড়িতে। এখন সে সব সেবা-সদনের এলাকার মধ্যে পড়েছে। বাড়ি ফিরতে বেলা হত। এসে দেখতাম রাঁধাবাড়া সারা। বাবুর্চিকে কিছু বলবার সাহসও ছিল না। তাছাড়া বাড়ির হালচাল শিখে নিতেও সময় লেগেছিল। বলাবাহুল্য মৌলিক লেখা এক লাইনও লিখিনি। মনের যে নিরবচ্ছিন্ন নিরিবিলিতে কথার বীজের শেকড় গজায় সেটা পাচ্ছিলাম না। এমন কি সেটা যে আমার দরকার, তাও টের পাচ্ছিলাম না।

তখন চোরটোর তেমন ছিল না। ও বাড়িতে জানলায় শিক ছিল না। জানলার পাশেই বৃষ্টির জল নামবার পাইপ। অচেনা বাবুর্চি, অচেনা নারাণ। খুব

সুখেই ছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় এক ফিরিঙ্গি যুবক এল। এক্সাইজের লোক। তাদের নাকি খবর যে এই ঠিকানায় ডাঃ এস্ কে মজুমদারের বাড়িতে বে-আইনি মদ চোলাই হয়। বাড়ি তল্লাসী করবে।

আমি নারাণকে বললাম, 'সব দেখিয়ে দাও।' আমাদের চারটে ছিমছাম ঘরে মাছি ঢুকলে মাছি দেখা যেত। তল্লাসী করতে বেশি সময় লাগল না। তখন সায়েব জিজ্ঞাসা করল 'গো-ডাউন নেই?' নারাণ তাকে নিচে নিয়ে গিয়ে গ্যারাজ আর বাবুর্চির ঘর দেখিয়ে দিল। সব ভোঁ-ভাঁ, কোথাও কিছু নেই। ফিরে এসে সায়েব ক্ষমা চেয়ে গেল। 'কত রকম উড়ো খবর আসে ম্যাডাম, প্রত্যেকটার তদন্ত করা আমাদের কর্তব্য, কিছু মনে করবেন না।' আমি তাকে অকপট চিত্তে ক্ষমা করলাম। সন্ধ্যায় আমার স্বামী ফিরলে হাসতে হাসতে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বললাম। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। এমন সময় নারাণ কি কাজ করতে করতে বলে বসল, 'হ্যাঁ, ভাগ্যিস খবর পেয়ে চোলাইয়ের জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলেছিলাম।' আমরা শুনে হাঁ!

পুরনো বন্ধুরা কেউ আমাদের ছাড়েনি। শান্তিনিকেতন থেকে ডঃ টাকার, টিম্বার্স, আরিয়মদা, ধীরেনদা, তনয়দা, উপহার নিয়ে বিয়ের দিন এসেছিলেন, ছবির মতো দেখেছিলাম। কলকাতায় এলেই তাঁরা শান্তিনিকেতনের নানান্ সরস গল্প করে যেতেন। এঁদের অনেকে আমার স্বামীর পুরনো রুগী, আমাদের আজীবনের বন্ধু হয়ে গেলেন। কয়েক বছরের মধ্যে তনয়দা ছাড়া সবাই শান্তিনিকেতন ছেড়ে অন্য কর্মক্ষেত্রে চলেও গেলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম শান্তিনিকেতন কেমন তাদের গা-ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিয়ে, দিব্যি সুন্দর আপন চালে চলতে লাগল! তেমনি ততদিনে আবার সেখানে আরেকটি সুন্দর মানুষ জুটেছেন। তাঁর নাম অনিলকুমার চন্দ। অল্প ক-দিনেই কেমব্রিজ-ফেরত এই সুদর্শন কালো মানুষটিকেও শান্তিনিকেতন আপন করে নিয়েছিল। যে যায়, আশ্রম তাকে ঝেড়ে ফেলে, যে আসে তাকে আপন করে নেয়! নদী থেকে ঘটি করে জল তুলে ফেললেও জল কমে না।

কয়েক দিন পরে যখন রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে দুই-তিন দিনের জন্য অলকাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা শান্তিনিকেতনে গেলাম, দেখলাম আমাকেও আশ্রম বিদায় দিয়েছে, আমাকে দিয়েও আর তার কোনো দরকার নেই। আশ্রমবাসীরা খুবই আদর করেছিলেন। উত্তরায়ণে ডেকে কবি কত আপ্যায়ন করলেন। ক্ষিতিমোহনবাবু, নন্দবাবু, তনয়দা, ধীরেনদা, বীরেনদা, টাকার, টিম্বার্স আর অতুলনীয় সঙ্গীত রসিক বাকে দম্পতি, কারো বন্ধুত্ব এতটুকু টস্কায়নি। এঁদের সঙ্গে আমাদের চিরকালের আত্মীয়তা। তনয়দা আগে আমার স্বামীকে চিনতেন না, এখন থেকে তাঁর অকালমৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে

ছিলেন। মুখে মাঝে মাঝে কটু কথা বলতেন বটে, বুক ভরা ছিল শুধু স্নেহ। দুজনে সিগার খেতেন আর রাজ্যের গল্প করতেন। এমন খাঁটি মানুষ আর দেখলাম না।

আমার বুড়ো শ্বশুরমশাই আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। শাশুড়ি এর আঠারো বছর আগেই মারা গেছিলেন। শুনেছি অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন, পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি মাথায়, চওড়া কাঁধ, মাথা ভরা কালো কোঁকড়া চুল। চমৎকার হাতের কাজ করতে পারতেন, কাঁথা সেলাই, নরুণ দিয়ে পাথর কুঁদে অপূর্ব সব সূক্ষ্ম নক্সা তুলে ছাঁচ বানাতেন। তাছাড়া রাঁধিয়ে বলে পাঁচটা গ্রামে খ্যাতি ছিল। ব্যাপার বাড়িতে, পর্ব-তে তাঁর ডাক পড়ত। সেকালের মেয়েরা নেহাৎ অকেজো ছিলেন না। আমার শ্বশুর পোস্টেল ইন্সপেক্টর ছিলেন। আই-এ পাস করে, অধ্যাপকদের সঙ্গে যখন কিছু নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছিল, পড়াশুনো ছেড়ে চাকরিতে ঢুকলেন।

কলেজের অধ্যক্ষ স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'নাঃ, তোর আর কিছুই হবে না!' বিয়ের কয়েক দিন পর শয্যাশায়ী অবস্থায় আমাকে শ্বশুরমশাই এ-কথা বলেছিলেন। তার পর একটু হেসে বললেন, 'হলও না কিছু। মহাপুরুষদের বাণী কি আর মিথ্যে হয়। এতদিনে সে দুঃখ গেল। আমার বৌমা ইংরিজিতে এম্-এ, ফাস্ট ক্লাস্ ফার্স্ট! তাঁকে দেখাতে পারলাম না।'

এ কথা শুনে আমার মনটাও ভরে গেছিল। এই মানুষ আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করতেন না, অব্রাহ্মণের ছোঁয়া খেতেন না। কিন্তু আমাকে বলেছিলেন, 'এখন মধুপুর যাচ্ছি, ফিরে এসে তোমার কাছে থাকতে চাই। তুমি আমাকে রেঁধে খাইও।' আমার বিধবা ননদ তাঁর দেখাশুনো করতেন, তিনি বললেন, 'আপনি তো আর ব্রাহ্ম মেয়ের হাতের রান্না খাবেন না। তাহলে আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে।' এক গাল হেসে বললেন, 'ও মুরগি খাওয়া ছাড়লেই, ওর হাতে খাব। কি বল মা?' আমি তখুনি রাজি। কিন্তু সে আর হয়নি। চার মাস পরেই তাঁর ডাক এসেছিল।

॥ ২ ॥

বলেছি তো, পঞ্চাশ বছর আগের কথা মনে করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমার এই কাহিনীতেও এন্তার ভুল আছে। নাম গুলিয়ে গেছে। আগের কথা পরে, পরের কথা আগে বলা হয়েছে। তবে ঘটনাগুলো সত্যি। তা-ও নির্ভেজাল সত্যি কি করে বলি? কত কথা বাস্তবিক ঘটেছে, কতক খালি ভেবেছি, কতক স্বপ্নে দেখেছি, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তবে কয়েকটা দুঃখ তেমনি

আছে। তা হল তিনটি মানুষকে না দেখার দুঃখ। অথচ বছরের পর বছর একই জায়গায় বাস করেছি, হয়তো একই শব্দ শুনেছি, একই দৃশ্য দেখেছি। এই তিনজন হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম মানুষটিকে চোখেও দেখিনি। অন্য দুজনের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে মাত্র একবার বাঘ-শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরীর বাড়িতে একটা ছোটখাটো গানের আসরে দেখেছিলাম। হয়তো সেই আসরে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের দিলীপকুমার রায় গান গেয়েছিলেন। 'বৃন্দাবন কি লীলা অভিরাম',—ঐ রকম কিছু। সালটা মনে হয় উনিশশো ছত্রিশ হতে পারে। দিলীপ কলকাতায় এসেছিলেন, ওঁরই অনুরোধে শরৎচন্দ্র গান শুনতে এসেছিলেন। সে সময় তাঁর শরীর খুব ভালো যাচ্ছিল না।

কুমুদনাথ তখন বেঁচে নেই। তাঁর বড় ছেলে, আমার সমবয়সী ভাগ্নে কল্যাণের কাঁধে ভর দিয়ে শরৎবাবু এসে বসেছিলেন। কেমন জানি মনে হচ্ছিল অপার্থিব বস্তু দিয়ে গড়া একটি মূর্তি। মুখখানি সুন্দর ছিল, তাতে সূক্ষ্মতা আর কেমন একটা তীব্রতা ছিল। কল্যাণদের সেই বসবার ঘরে রাখা হাতির দাঁতে খোদাই করা লক্ষ্মী-সরস্বতীর বড় বড় মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্য লাগছিল। কোন কথা বলতে শুনিনি। দূর থেকে শুধু দেখেছিলাম। কেউ আলাপও করিয়ে দেয়নি। আমি তখন অখ্যাত, শুধু সাহিত্যলোকের স্বপ্ন দেখি, বয়স আটাশ হতে বাকি নেই। অবনীন্দ্রনাথকেও জোড়াসাঁকোয় দূর থেকে দেখেছি। গলার আওয়াজও শুনতে পাইনি।

আরেকটি মানুষ মাঝে মাঝে আমাদের এলগিন রোডের ফ্ল্যাটে ও পরে রায় স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে আসতেন, তাঁর চেহারার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের চেহারার একটু আদল আসত। যদিও ইনি ছিলেন বড় বেশি কোমল, বিনয়ী, বিনম্র। শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, জোরালো ব্যক্তিত্ব খুব বেশি লোকের ছিল না। এঁর নাম ছিল অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়। কেউ কেউ বলত 'ছোট শরৎবাবু', একথা ওঁর কাছেই শুনেছি। শেষ বয়সে উনি শরৎচন্দ্রের নিত্য সঙ্গী ছিলেন। 'শরৎচন্দ্রের সঙ্গে' বলে একটি অন্তরঙ্গ বইও লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যগুণ বেশি না থাকলেও, শরৎচন্দ্রের চরিত্রের আর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও মনোভাবের ওপর এমন সরল ও সততাপূর্ণ মন্তব্য আর দেখিনি। বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য আর অমূল্য।

আমাকে এক কপি উপহার দিয়েছিলেন। আরো ক-খানি গল্পের বই দিয়েছিলেন ; 'সকলি গরল ভেল', 'থার্ড ক্লাস', 'মাটির স্বর্গ', আরো কি কি। রবীন্দ্রনাথ 'মাটির স্বর্গে'র বড় বেশি বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন বলে নিরীহ মানুষটি মর্মাহত হয়েছিলেন।

অনেক বছর পর, ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে অসমঞ্জবাবু আমাদের বাড়িতে শেষবার এসেছিলেন। তখন তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, সুন্দর চেহারা কালি হয়েছে, সাজ-সজ্জার সে পারিপাট্যও নেই। বোধহয় অবস্থাও খুব ভালো নয়। এই মানুষটির কথা মনে হলেই মন কেমন করে। আসতেন, গল্প করতেন, চা খেতেন, চলে যেতেন। এর বেশি কিছু বলতেন না। এমন কি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা নিয়েও গর্ব করতেন না। তবে মাঝে মাঝে ওঁদের 'রসচক্র' নামক আসরের গল্প করতেন। তাঁরা যে ওঁকে শরৎবাবুর প্ররোচনায় সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন, তা-ও তাঁর বই পড়ে জেনেছি। আরেকজন লোকও আসতেন, তাঁর নাম হারিৎকৃষ্ণ দেব। লম্বা কোঁকড়া চুল, কাগজের মতো পাতলা শরীর, মুখে কেমন একটা তীব্রতা। ইনি অত নিরীহ ছিলেন না, চোখে-মুখে কথা বলতেন। মনে হয় 'পরিচয়' গোষ্ঠীর কোনো বন্ধুর সঙ্গে প্রথম আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। মনে আছে আফ্রিকার কথা বলেছিলেন। ওঁর কোনো নিকট আত্মীয় সেখানে মারা যান। হারিৎকৃষ্ণ তাঁর শোকার্ত পরিবারকে নিয়ে আসতে সেখানে গেছিলেন। দেশ দেখার সময় বা মনের অবস্থা ছিল না। কথাগুলো কেন জানি আমার মনে লেগেছিল। এঁরা হয়তো বাংলার সাহিত্যসম্ভারে সে রকম মূল্যবান কিছু দিয়ে যাননি, কিন্তু সে সময়কার বাংলার বাঙালীত্বের অনেকখানি এই রকম মানুষরাই বহন করতেন।

আমার বিয়ের আগেও লেখক দেখেছিলাম। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই কাছের থেকে দেখেছিলাম। প্রমথ চৌধুরী আর ইন্দিরাদেবীর বাড়িতে পূর্ণিমা সম্মেলনী হতো। চাঁদের হাট বসত। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছিলাম। নরেন দেবের সঙ্গে তখন থেকেই একটা স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। হিরণকুমার সান্যাল, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, সুশোভন সরকার প্রমুখকেও দেখেছিলাম। এমন কি একদিন সুশোভন এসে বললেন, 'তোমার বোধহয় ছোটদের জন্য আজগুবি গল্প লেখা বন্ধ করতে হবে। গিরিজাবাবু বলেছিলেন—ভদ্রমহিলাকে কাগজ নষ্ট করতে বারণ কর। কিন্তু যে কামারশালায় নতুন দিনের বাংলা সাহিত্যের লোহা পিটিয়ে শক্ত করা হচ্ছিল, দূর থেকে তার একটু স্ফুলিঙ্গ দেখা ছাড়া আর কিছুর সুযোগ পাইনি। অথচ বুদ্ধদেব বসু আমার সমবয়সী।

গতানুগতিকের পথে লেখাপড়া শিখেছি। সম্পাদকরা বাড়িতে এসে লেখা চেয়ে নিয়ে গেছেন, কোনো সাহিত্যচক্রে যোগ দেবার কথা ভাবতেও পারতাম না। তবে পেছনে একটা সাহিত্যের পটভূমিকা ছিল, হোক সে শিশু সাহিত্য। একটা জোরালো গঠনশীল আবহাওয়ায় মানুষ। জ্যাঠামশায়ের বাড়ি ছিল আমাদের অনুপ্রেরণা আর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। সিঁড়িতে হাফটোন ব্লকে ছাপা ছবির নানা রঙের প্রুফ পড়ে থাকত। নিচে প্রেস চলত। আর বড় দাদারা লম্বা

লম্বা প্রুফের কাগজে নাক ডুবিয়ে কলম হাতে বসে থাকতেন। কথা বলতে গেলে বিরক্ত হতেন। দপ্তুরিরা আসত। ডাকে বই যেত। দাদামশাই, বড়-জ্যাঠামশাই নামকরা পণ্ডিত মানুষ। এ তো কোনো অচেনা জগতের কথা নয়, তবু খাপছাড়া হয়ে থাকি। বাড়ির সেই সাহিত্যের অন্দরমহলের সঙ্গে বাইরের পোশাকি এবং মজলিশি জগৎ মিল খেত না। এদিকে 'কল্লোল' যুগ কবে শুরু হয়ে গেছে। সমবয়সী লেখক বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত এবং সামান্য বড় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার নাম করে ফেলেছে। 'পরিচয়' আর 'পি-ই-এনে'র মতো শৌখিন বৈঠকখানার সাহিত্য সভা ছাড়া কখনো কোনো সাহিত্য সভায় যোগ দিইনি। এখন নিন্দুকরা যাই বলুক, ওগুলো নেহাৎ ফেলনা ছিল না। বন্ধুজনের বাড়িতে উৎকৃষ্ট জলযোগ করলেই সাহিত্যালোচনা খেলো হয়ে যায় না। তেমনি কেৎলির চা আর জিলিপি খেয়েও সাহিত্য কিছু পুষ্ট হয় না। সাহিত্য তৈরি হয় অন্য কর্মশালায়। তাছাডা, সত্যি কথাই বলব, ঐ আসরগুলোর জন্য মন কেমন করে। চারু দত্তের বাড়িতে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষকে প্রথম দেখলাম। আমার মেসোমশাই সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের বাড়িতে সোফিয়া ওয়াডিয়াকে, অন্নদাশংকরকেও বোধহয়, আর মনে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আর তাঁর স্ত্রী বীণাকে। তাঁদের বড় ভালোবেসেছি। এরা সবাই নিশ্চয়ই একটু একটু করে আমার চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল, কিন্তু আমার ত্রিশ বছর বয়স অবধি আমি ভাবতাম আমার নিজের লোকরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র—এই তিনটি মহামানবের কাছেই আমি ঋণী।

কথাটা ভুল। প্রত্যেক পরিবারেরি নিজস্ব একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ থাকে। ঐ বংশে ছেলেমেয়েরা নিজেদের অজান্তেই তাতে পুষ্ট হয়। সেইজন্য দেখা যায় পণ্ডিতের ঘরে পাণ্ডিত্যের, সাংগীতিকদের ঘরে গান-বাজনার, শিল্পীদের ঘরে শিল্পচর্চার, লেখকদের ঘরে সাহিত্য রচনার একটা জন্মগত প্রবণতা নিয়ে ছেলেমেয়েরা বড় হয়। হয়তো জন্মগত প্রবণতাও নয়, সবটাই পরিবেশ থেকে পাওয়া। আমিও একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের, রবীন্দ্রনাথের, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রতি একটা শ্রদ্ধা, আমাদের পারিবারিক কাজকর্মে আস্থা, আমার অদেখা দাদামশাই রামানন্দ ভারতীর প্রতি ভক্তি নিয়ে বড় হয়েছিলাম। সেটাকেই স্বাভাবিক মনে হতো। তাঁদের বুঝতাম, তাঁদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। এই মনোভাবটা যে অনুদার, তা-ও জানতাম না।

বিয়ের পর দেখি এ-বাড়ির অন্যরকম চিন্তা, অন্য রকম আদর্শ, অন্যরকম কাজকর্ম। আরো আশ্চর্য হয়ে দেখলাম তার পাশে আমার মনোভাবেরো যথেষ্ট জায়গা আছে। অবিশ্যি এটা আমার উদার মনের স্বামীর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। এঁদের বাড়িতে উচ্চাংগ সংগীতের আদর ও চর্চা ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক,

গান, কাব্যের আদর ছিল। তার মধ্যে একটা স্বজনপোষণের গন্ধ থাকলেও থাকতে পারে। যদিও দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ অবদান যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি।

কিন্তু এই দ্বিজেন্দ্রপ্রীতির সঙ্গে একটা রবীন্দ্রবিদ্বেষ মেশানো ছিল। রবীন্দ্রসংগীতকে এঁরা সে সময়ে গান বলেই মানতেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাইপো আরেক রবীন্দ্রলাল নিজে মধুর গাইয়ে ছিলেন, সংগীতবিদ্যাবিশারদও ছিলেন, পরে গানের স্কুল করেছিলেন। ইনি আমার চাইতে অল্প বড় ছিলেন, আমার সঙ্গে ভাব ছিল। মাঝে মাঝে গল্প করে যেতেন। তার মধ্যে আমাকে একদিন বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রসংগীতকে গান বল না, মামিমা।' আমি তো অবাক !

'গান নয় বুঝি ? তবে কি ?' 'ওগুলো হলো সুর দেওয়া কবিতা।' নিজের অবিদ্যার কথা মনে করে গানেতে আর সুর দেওয়া কাব্যেতে তফাৎটা কোথায়, জেনে নেওয়া হয়নি।

এই মানুষটি পরে শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনে কয়েক বছর উচ্চাঙ্গসংগীতের অধ্যাপক ছিলেন। এঁরই অসাধারণ মেয়ের নাম মালবিকা কানন। সে, রূপে-গুণে-আচরণে অদ্বিতীয়া।

তবে মালবিকার দিদিমা স্নেহলতা মৈত্রের কাছে, আমার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-কুটুম্বরা কেউ দাঁড়াতে পারত না। অসাধারণ কাকে বলে তাঁকে দেখলে বোঝা যেত। তাঁর কথা এর আগেও কিছু কিছু বলেছি, মালবিকার কাছেও গল্পের ঝুড়ি আছে। সে যাই হোক, এঁরা কেউ রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রকাব্য, রবীন্দ্র-শিল্প, বা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন না। আমার বিয়ের পর এঁদের মধ্যে প্রচলিত নানা আশ্চর্য ও অলীক গল্প শুনে আমি অবাক হয়ে যেতাম। রবীন্দ্রনাথের কোনো রকম রচনাই এঁরা কেউ পড়েন নি, পড়তেন না। পড়বেন বলেও কোন আশা ছিল না। আমার স্বামী গোড়ায় বলতেন, রবীন্দ্রসংগীত শুনলে তাঁর ঘুম পায়! শুনে তাজ্জব বনে যেতাম! ওঁদের একটা উচ্চাঙ্গসংগীতের 'আসর' ছিল। তিমির বরণের দাদা মিহির বরণ তার কর্ণধার। সমস্ত ভারতবর্ষ ঢুঁড়ে ভালো ভালো গুণী নিয়ে আসতেন। সামান্য প্রণামী নিয়ে তাঁরা একেকজন একেকদিন গান গেয়ে যেতেন। মনে আছে একদিন ওস্তাদ রতন জঙ্কারকেও দেখেছিলাম।

আসর বসত চৌরঙ্গীতে, আমার স্বামীর চেম্বারে। তিনি ছিলেন সেক্রেটারি। এত ভালো গানের আসর সে সময়ে খুব বেশি ছিল না। ছোট, অথচ নিখুঁৎ। কিন্তু দশটার পর থেকে আমার জেগে থাকা মুশকিল হতো। আর আমার স্বামীর কিনা তিন থেকে পাঁচ মিনিট ব্যাপী রবীন্দ্রসংগীত শুনলে ঘুম আসত ! তবে পরে সুচিত্রা মিত্র, পঙ্কজ মল্লিক ইত্যাদির গান শুনে মুগ্ধ হতেও দেখেছি।

মানুষটির সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। দেখতে ভালো, প্রায় ছয় ফুট মাথায়, এককালে সাঁতরে গঙ্গা এ-পার ও-পার করতেন, তখনো লেক ক্লাবে নৌকো চালান, এন্তার পড়াশুনো, আমেরিকায় গিয়ে দাঁতের ডাক্তারি পড়ার আগে প্রাচীন ইতিহাসের কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রথম বিভাগে বি এ অনার্স পাস করে, এম· এ-র শেষ বছরে পড়তে পড়তে ইতিহাস ছেড়ে আমেরিকায় গিয়ে চার বছরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে, বস্টনের ফরসাইট্ ডেন্টাল হাসপাতালে তিন বছর চাকরি করবার পর দেশে ফিরে এলেন উনিশশো সাতাশ সালে। এসে চৌরঙ্গীতে ফ্ল্যাট ভাড়া করে প্র্যাক্টিস শুরু করলেন। এবং পাঁচ বছরের মধ্যে ডাক্তারি মহলে নাম করে ফেললেন। হেনকালে আমার সঙ্গে পরিচয়। বাপ ছিলেন পোস্টেল ইন্সপেকটর, বেশি টাকা কড়ির বালাই ছিল না। তবু সমবয়সী ভাগ্নে দিলীপকুমার রায়ের প্ররোচনায় এবং জ্যাঠতুতো দাদা জিতেন্দ্রনাথের সাহায্যে, কপর্দকশূন্য অজ্ঞাত কুলশীলের পক্ষে আমেরিকা যাওয়ার মতো অসম সাহসিক কাজটি করে ফেলেছিলেন। সেখানকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাঁর কাছে অনেক আশ্চর্য আর মজার গল্প শুনেছি। কখনো হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, ডেয়ারিতে, এমনকি মেয়েদের হস্টেলে চাকরি করে ঐ স্বনামধন্য কলেজের খরচ চালিয়েছিলেন। যেমন আরো অনেক ঐ-দেশী আর কিছু বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরাও চালাত।

বড় ভালো ব্যবহার পেয়েছিলেন। ঐদেশে মন বসে গিয়েছিল। ভেবেছিলেন নাগরিকত্ব নিয়ে, ঐখানেই বিয়ে থা করে থেকে যাবেন। তা আর হলো কই? তিন বছরের বড় মেজদা ছিলেন। দুই ভাইয়ে বড় ভাব। মেজদাও আমেরিকা গিয়ে পড়বেন বলে সব ঠিক, এমন সময় তিনি মারা গেলেন। মা আগেই গেছিলেন। বুড়ো বাবা এবার ভেঙে পড়লেন। তাঁর জন্যেই ফিরে আসা। তার ওপর যে দিলীপ আট বছর আগে যাবার জন্য উৎসাহ দিয়েছিল, সে-ই এখন ফিরবার জন্য তাগাদা দিতে লাগল। সব ছেড়েছুড়ে চলে এলেন। মানুষটার মধ্যে এই ছেড়ে দেবার গুণটি দেখে অবাক হতাম।

ফিরে এলেন মনের ওপর আট বছরের আমেরিকা বাসের ছাপ নিয়ে। দেখলাম শুধু ওঁর নিজের আত্মীয়-স্বজনদের থেকে নয়, আমার চেনা-জানা সবার থেকেও আলাদা রকম চিন্তা করেন। এত বছর পরেও গভীর ভাবে বাঙালী কিন্তু কোনো রকম গোঁড়ামি নেই। না দিশী, না মার্কিন।

আমার মনে হয় মানুষের মন শৈশবে যে রূপ পায়, সেটি কাটিয়ে ওঠা খুব শক্ত। আমার ছোটবেলা কেটেছিল বন-পাহাড়-নদী-ঝরনার মধ্যিখানে, লেখাপড়া শুরু হয়েছিল মেমদের হাতে। সেই নির্মল প্রবল আদর্শ আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। সব ছোটদের শৈশব কাটা উচিত শহরের বাইরে,

প্রকৃতির কাছাকাছি। তা সে যেখানেই হোক।

ওঁর ছোটবেলা কেটেছিল নদে জেলার গোরাই নদীর ধারে, কুষ্ঠিয়ার কাছে, চাপড়া গ্রামে। সেখানে চারশো বছর আগে ওঁদের এক পূর্বপুরুষ নাকি স্বপ্নে আদেশ পেয়ে কাশী কি প্রয়াগ থেকে কষ্টিপাথরের অপূর্ব সুন্দর জনার্দন মূর্তি নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওখানকার জমি জমা সব দেবোত্তর ছিল। পালা করে দেব সেবা হতো। সে মূর্তি কলকাতায় এক শরিকের বাড়িতে দেখে এসেছি। সেই বুড়ো ঠাকুরদাদের ঠাকুরদা তাকে কাপড় দিয়ে বুকে বেঁধে পায়ে হেঁটে সেই দীর্ঘ পথ পার হয়েছিলেন। ফল-মূল খেয়ে, রাতে প্রায় না ঘুমিয়ে—মূর্তি যদি মাটি পায় তাহলে সেইখানেই প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে এই ভয়ে—দেবতা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ সব গল্প আমার ননদ, জা-দের মুখে শুনেছিলাম। সবাই বৈষ্ণব। পুজোতে চালকুমড়ো বলি পর্যন্ত হতো না। সন্দেশ আর ফলমূল নিবেদন করা হতো।

পরিবারটার মধ্যেও এক ধরনের উদারতা দেখতে পেতাম। যাঁদের অবস্থা ভালো তাঁরাও হাল ফ্যাশানের ধার ধারতেন না। আমার জ্যাঠশ্বশুর মেয়েদের কাউকে কাউকে কলেজে পড়িয়েছিলেন, বাকি সব মেয়েরা সামান্য লেখাপড়া জানতেন। পুরুষ মেয়ে সবার লম্বা-চওড়া গড়ন, জোরালো গলা, মতামত প্রকাশ করতে আপত্তি নেই, আবার স্নেহশীলও বটে। আমি তাঁদের কাছে যেমন আদর পেয়েছিলাম, তেমনি অজস্র পারিবারিক গল্পও শুনেছিলাম।

সে যাই হোক, ঐ চাপড়া গ্রামে মাটির ঘরে আমার স্বামীর শৈশব কেটেছিল। বাবার বদলির চাকরি, মা এই ছোট ছেলে আর তার চেয়ে সাত বছরের বড় ছোট মেয়ে নিয়ে অনেক সময়ে গ্রামে থাকতেন। লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু যেমনি সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিমতী। তাঁর প্ররোচনায় তিন ছেলেই লেখাপড়ায় ভালো হয়েছিলেন। বড়ছেলে কলকাতায়, মেজ ময়মনসিংহে আত্মীয়-স্বজনের কাছে থেকে পড়তেন। ছোট গ্রামের স্কুলে।

মুশকিল হলো যে সেকালের হেডমাস্টার মশাই শুধু ক্লাসের পড়ার ব্যবস্থা করেই থামতেন না। ছেলেদের ওপর সর্বদা কড়া দৃষ্টি। একবার মিশনারি সায়েব-মেমরা গ্রামের কাছেই তাঁবু করেছিলেন। তাঁরা যেমন গ্রামের পুজোও দেখে যেতেন, তেমনি ছোট ছেলে-মেয়েদের হাতে যীশুর আর তাঁর সন্তদের সুন্দর সুন্দর ছবিও দিতেন। একথা হেডমাস্টার মশাইয়ের কানে যেতেই তিনি ঐ সব অযোগ্য হিন্দু সন্তানদের ধরে বেতিয়ে পরধর্ম-লোভের ব্যামোর চিকিৎসা করেছিলেন।

আরেকবার ছোট ছেলেদের সঙ্গে আমার স্বামীও স্কুলে যাচ্ছেন। বয়স ছয়। এমন সময় ভোলা গয়লা বাঁকে করে দই নিয়ে কোনো ব্যাপারবাড়িতে জোগান

দিতে যাচ্ছে। বন্ধুরা বলল, 'আঙুল ডুবিয়ে একটু চেখে দ্যাখ্ কি ভালো দই। তুই বামুনের ছেলে, তুই খেলে দোষ হয় না।' যেমন বলা তেমনি কাজ। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে আঙুল ডুবিয়ে দই তুলে মুখে পুরে দিল! দইওয়ালাও তাকে ধরে নিয়ে গেল হেড মাস্টার মশাই-এর কাছে। হেড মাস্টার মশাইও তাঁর জানা সেই একই ওষুধ দিয়ে এ ব্যামোও ছাড়ালেন।

ছেলে বড় দুরন্ত। শেষ পর্যন্ত জমির বলে এক মুসলমান রক্ষী রাখা হলো। সে সারাদিন ছেলে আগলায়। এই জমিরদা এমন এক চরিত্র যে তাকে ভোলা যায় না। এদিকে একা হাতে সংসারটাকে মাথায় করে রাখত, ওদিকে বিস্ময়কর ওঝাগিরি জানত। কাউকে ভূতে পেলে, কি সাপে কাটলে ওর ডাক পড়ত। ও নাকি প্রায়-মরাকেও সারিয়ে তুলত। একবার ওঁদের হাঁসের ঘরে পরপর দু-দিন দুটো হাঁস সাপের কামড়ে মারা গেল। জমিরদা সবাইকে তফাতে থাকতে বলে কি একটা শুকনো শিকড়ের মতো জিনিস নিয়ে হাঁসের ঘরে ঢুকল। কিছুক্ষণ পরেই রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে এক মস্ত কেউটে তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল।

বাইরে এসে জমিরদা ঝুলি থেকে একটা মরার হাড় বের করে সাপের চারদিকে চকিতে একটা গোল দাগ কেটে, নিজে তার বাইরে দাঁড়াল। ওঁর কাছে শুনেছি সেই সাপ গর্জাতে গর্জাতে দাগ অবধি এসেই, মাথা নুইয়ে পেছিয়ে যায়। কিছুতেই দাগ পার হতে না পেরে নিজের গায়ে ছোবল মেরে, নিজের বিষে মরল। তখন তার শরীরটা পুড়িয়ে ফেলা হল।

বাংলার মফঃস্বলের চেহারা কিছু জানতে বাকি রইল না। মাঝে মাঝে বাবার কর্মস্থলেও যেতেন। উত্তর বাংলার চলনবিল, কলমগ্রাম চোখে দেখা হল। বর্ষায় সব জলে-জল, খালি টিলার ওপরকার বাড়িঘর যেন দ্বীপের ওপর জেগে থাকত। নৌকো করে এ বাড়ি ওবাড়ি যাওয়া-আসা। কই মাছরা কানকোয় ভর দিয়ে জল ছেড়ে দলে দলে টিলার গা বেয়ে উঠছে।

ছেলে আরো বড় হলে জামতাড়ার বিখ্যাত কেশব হাজারীর স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাস্ করলে, কলকাতার স্কটিস চার্চ কলেজে আই এ পড়ল, তারপর ইতিহাসে অনার্স নিয়ে প্রথম বিভাগে বি এ পাস্। তারপর এম এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে আমেরিকায় যাওয়া।

এত কথা এক দিনে জানিনি, একটু একটু করে অনেক বছর লেগেছিল। ততদিনে এই অন্যরকম পরিবারটার ওপর গভীর মায়া পড়ে গেছিল। স্মৃতিকথা লিখতে গেলে সাংসারিক জীবন আর লেখিকার জীবন আলাদা করা যায় না। দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে থাকে। লেখিকামন সংসারের কাজে বাধা ঘটায়। পদে পদে ভুল করায়। যে সব মেয়ে সংসার-গত প্রাণ, তাদের মতো চৌকোস্ গিন্নি হতে দেয় না।

আবার এর উল্টো দিকটাও আছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে সংসারের কর্তব্য পালন করতে গেলে ঐকান্তিক ও একাগ্রভাবে সাহিত্য-সাধনা করা যায় না। আর শুধু সাহিত্য-সাধনাই-বা কেন, সঙ্গীত-শিল্প জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো সাধনাই সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে করা যায় না। অথচ কোন্ মেয়েই বা নিজের স্বামী-সন্তান-সংসারের অযত্ন করতে চায়? নারীত্বকে অস্বীকার করে কোন্ নারী?

এই একটি কারণেই দুনিয়ার সব কালে, সব দেশে, সব বিষয়ে, সমান প্রতিভা সমান দক্ষতার অধিকারী হয়েও মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে এক পা পেছিয়ে থাকে। অবিশ্যি সব নিয়মের মতো এরও দু-একটি যুগান্তকারী ব্যতিক্রম আছে। তবে হয়তো সে-রকম ব্যতিক্রমও নয়। সে সব ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল স্বামী কি অন্য আত্মীয় ঐ মেয়েদের কাঁধ থেকে সংসারের কর্তব্যের বোঝা নামিয়ে নিতে পেরেছেন। হয়তো মিসেস্ ব্রাউনিং, মাদাম কুরি, খনা-লীলাবতী-গার্গী ইত্যাদির সেই সৌভাগ্য হয়েছিল। তবে মাঝে মাঝে কোন কিছুর অপেক্ষা না রেখে নিজের অন্তরে ছোট একটি ফুল যদি ফোটে, তাকেও অস্বীকার করা যায় না।

এত কথা বলছি কারণ আমাকেও ঐরকম আতান্তরে পড়তে হয়েছিল। চমক লাগানো প্রতিভার অধিকারিণী না হয়েও, সংসারের কাজে নিজেকে অভ্যস্ত করার মাঝে মাঝে তীব্র একটা খেদ সমস্ত মনপ্রাণকে পেয়ে বসত। মনে হত যে জন্যে এসেছিলাম তার কিছুই করা হলো না। শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধব, এমন কি মাঝে মাঝে আমার স্বামী পর্যন্ত দুঃখ করতেন, 'অমুক এত লিখছে, তমুক এত নাম করছে, তুমি কি লেখা-টেখা ছেড়ে দেবে নাকি?' আমার অন্তরের নিদারুণ ব্যর্থতা বোধ খুলে বলতে বাধো-বাধো লাগত। জানতাম বললে কেউ বুঝবে না। আমার স্বামী মাঝে মাঝে খানিকটা আঁচ করে বলতেন, 'একজন ফিরিঙ্গি হাউস-কীপার রেখে দিই না কেন? সে তোমার চেয়েও ভালো করে সংসার চালাবে আর তুমিও লিখবার অনেক সময় পাবে।'

শুনে পিত্তি জ্বলে যেত। কি করে বোঝাই যে বিঘ্নটা কাজের তাড়ায় বা সময়ের অভাবে নয়, বিঘ্ন আমার মনে। কি একটা আছে আমার মধ্যে যে আমাকে আমার সংসার থেকে অব্যাহতিও দেয় না। আবার যে-কাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, সেটা করতে পারছি না বলে সব ব্যর্থ মনে হচ্ছে। হঠাৎ যদি হাতে এন্তার সময় পেয়ে কলম ধরে বসি, তবুও সে আমাকে পড়বার মতো কিছু লিখতে দেবে না। এমন সময় মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা গোটা গল্প একেবারে তৈরি হয়ে, আমার কলমের আগায় ছাড়া পাবার জন্য আঁকু-পাঁকু করত। তখুনি সান্ত্বনা পেতাম। বুঝতাম সব নষ্ট হয়ে যায়নি। বয়স ত্রিশের দিকে এগিয়ে চলেছে।

বলাবাহুল্য, সময় থেমে থাকেনি। পরের বছর আমার ছেলে রঞ্জন জন্মেছিল। আরো চার বছর পরে মেয়ে কমলা। তাতে আমার জীবনে এমন একটা পরিপূর্ণতা এসেছিল যে ক্ষোভের কিম্বা খেদের খুব জায়গা ছিল না। অনেক লেখক সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপও হয়েছিল। জীবনের ক্ষেত্রটাও বেড়েছিল।

ততদিনে এল্‌গিন রোড়ের বাস তুলে আমরা চার নম্বর রায় স্ট্রীটের এক তলায় উঠে এসেছিলাম। চারদিকে মস্ত ঘাস জমি, বাগান, আম-জামের গাছ। কোনো কোনো বাড়ি শুধু ইঁট-কাঠ, চুন-সুরকি, টাকা-কড়ি দিয়ে তৈরি হয়। তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। এল্‌গিন রোডের ঐ চারতলা বাড়িটা ঐ রকম ছিল। আগেও কেউ থাকত না, আমরা চলে এলে আমাদেরও ওখানে প্রায় চার বছর কাটাবার কোনো চিহ্ন রেখে এলাম না। তবে ততদিনে বাড়ির প্রত্যেকটি ফ্ল্যাট গম্‌গম্‌ করত। তার মধ্যে একতলার সামনের দিকের ফ্ল্যাটটিতে বসন্ত লাহিড়ী বলে জীবনের হাতে পোড়-খাওয়া একজন দুঃখী মানুষ, তাঁর গুটি পাঁচেক অনাদৃত ছেলে নিয়ে এসে উঠলেন। সবার ছোট জিতু লাহিড়ী তখনো স্কুলে পড়ে। আমার ছোটবোনের সমবয়সী। ন্যায়ভাবেই হোক, কি অন্যায় ভাবেই হোক, দণ্ডিত বাপের ছেলে। তা বংশ যত অভিজাতই হোক না কেন, এক কালে ধন-মান কিছুরই অভাব ছিল না। এখন সুনামটুকু পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়ে ভগ্নদেহে একতলার ঐ ফ্ল্যাটটিতে এসে উঠলেন। এঁরা আমার স্বামীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

আগের দিন বিকেলে আমার স্বামী বললেন, কাল দুপুরে বসন্ত-দাদের ছয়-সাত জনের মতো খাবার পাঠাতে পারবে ?' তখন তাঁর কাছে ওদের সব কথা শুনলাম।

দুঃখীকে আমার স্বামী কিছুতেই ছাড়তে পারেন না। সত্যিকার দুঃখী না হলেও নয়। এঁরা সব হারিয়ে এসেছেন। গিয়ে দেখলাম বাইরের ঘরে পুরনো একটা চেয়ারে বসে আছেন। ছেলেরা ঘর গুছোতে ব্যস্ত। দেখে মনে হলো ভগ্নদেহ বটে, কিন্তু ভগ্ন মন নয়। মুখ তুলে তাকালেন যখন, সিংহের কথা মনে হল। বললাম, 'আমি কিন্তু আপনাদের জন্য রান্না করেছি। বারোটার সময় পাঠিয়ে দেব।' দেখলাম চোখে জল। ভীষণ কষ্ট হল।

ছেলেগুলোকে ডাকলেন। সেই মুহূর্তে আমার ভালোবাসার মানুষের দল অনেকখানি বেড়ে গেল। জিতু বলে ঐ ছোটটি আমার পরম স্নেহের পাত্র হয়ে উঠল। আমার কাছে ইংরিজি, অংক পড়তে আসত। পরে বি এ, এম এ পাস্ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাধারণ সৈনিক হয়ে ঢুকে, যতদূর সম্ভব উন্নতি করেছিল। পৌরুষের প্রতিমূর্তি ছিল। অকালে ক্যান্সার রোগে চলে গেল। তবে

খুব কম. বয়সে যায়নি। বিয়ে করেছিল জাত ভেঙে, আমারই আশুতোষ কলেজের এক ছাত্রীকে। তার নাম ফুলরানী ঘোষ। সে-ও এম এ পাস্ করেছিল। আজ পর্যন্ত সমস্ত পরিবারটার জন্য আমার হৃদয়ে একটা কোমল উষ্ণ স্থান রয়েছে।

সাঁইত্রিশ সালে আমরা চার নম্বর রায় স্ট্রীটে উঠে এলাম। এসেই টের পেলাম এ-বাড়িকে কেউ প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে। দেড়-বিঘে জমির মধ্যে লাল রঙের বাড়ি। ছড়ানো, খোলামেলা, বড় বড় বারান্দা। আমার চেনা বাড়ি, অনেক দিনের পছন্দের বাড়ি। কলেজ জীবনে জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডের ভাড়া বাড়ির তিন তলা থেকে এ বাড়ির পূবের বারান্দা দেখতে পেতাম। সায়েব ভাড়াটেরা ওখানে ব্রেক্‌ফাস্ট খেত। সামনে বড় বড় পাম-গাছ। বড় ভালো লাগত। কখনো ভাবিনি ওখানে আমিও একদিন বসতে পাব।

শ্রীনাথ দত্ত সেকালের নামকরা ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বাগানটাকে নিজের হাতে গড়েছিলেন। শুনেছি ফার্ণগাছের, পাম-গাছের পাতায় ধুলো জমে বলে সপ্তাহে একবার করে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে নিজের হাতে মুছে দিতেন। গাছরা ভালবাসা বোঝে। কি সুন্দর আবহাওয়া ছিল ঐ বাড়ির আর বাগানের। বাছাই করা আমগাছ, বড় বড় জামরুল—তাদের বুকের ভিতরটা লাল। চমৎকার পেয়ারা-গাছ, রাঙা তেঁতুলের গাছ, নারকেল গাছ, কুরচি ফুলের গাছ, আর সবচেয়ে আশ্চর্য গাছ ছিল গাড়িবারান্দার দক্ষিণে দুটি দুর্মূল্য পান্থ পাদপের গাছ। ফটক দিয়ে ঢুকলেই গাছ দুটি সকলের চোখে পড়বেই।

দোতলায় শ্রীনাথ দত্তের বিধবা মেয়ে, সেকালের তেজী ব্যারিস্টার বসুধাকান্ত নাগের বিধবা স্ত্রী, তাঁর চারটি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতেন। মেয়ে দুটি আমার ছোটবোন লতিকার বাল্যবন্ধু। সবাই আমার আপনজন হয়ে গেল। একদিন লতিকা একটা ছোরা নিয়ে বলল, 'মজা দেখবে?' বলে ছোরাটা পান্থ-পাদপের সবুজ গায়ে বসিয়ে দিল। ছোরা টেনে বের করার সঙ্গে সঙ্গে টলটলে পরিষ্কার জলের স্রোত ঐ ক্ষত থেকে গলগল করে বেরিয়ে এল। সে জল দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি ভালো। মরুভূমির গাছ নাকি। ঐ মিষ্টি জল দিয়ে যাত্রীদের প্রাণ বাঁচায়।

এই বাড়িতে আমি নিজেকে আবার ফিরে পেলাম। এতদিন শুধু ছোটদের কয়েকটি গল্প আর নানা পত্র-পত্রিকায় প্রধানত সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনাই লিখেছি। মৌলিক কিছুতে হাত দিইনি। তবে এ কাজও বৃথা যায়নি। কলমে ক্রমে জোর পেয়েছি। আত্মপ্রত্যয় আরো বলিষ্ঠ হয়েছে।

একদিন অধ্যাপক নীরেন রায় পণ্ডিচেরীর দিলীপকুমার রায়ের একখানি উপন্যাস এনে দিয়ে বললেন, 'নাও, 'পরিচয়ে'র জন্য এটার সমালোচনা লিখে

দিতে হবে।' কোন বই ভালো করে মনে নেই, হয় 'মনের পরশ', কিম্বা 'রঙের পরশ'।

বইটি দিয়ে, নীরেনবাবু চুটিয়ে তার নিন্দে করলেন। একটু অবাক না হয়ে পারলাম না। দিলীপ আমার স্বামীর জ্যাঠতুতো দিদির ছেলে, সমবয়সী এবং অন্তরঙ্গ। নীরেনবাবুরো বাল্যবন্ধু। এতগুলো কড়া কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'আমি কিন্তু আমার নিজের মতামতটাই লিখব, আপনার গুলো নয়।' বললেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়, যার এতটুকু বুদ্ধি আছে সেই আমাকে সমর্থন করবে।' বই পড়ে বুঝলাম নীরেনবাবুর মতের সঙ্গে লেখকের মত মেলেনি বলে এতখানি উষ্মা। বইয়ের অনেক গুণ, যদিও পড়ে মনে হয়েছিল কয়েকটি বিশ্বাস এবং মতামত জোর করে পাঠকের ওপর চাপাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু দিলীপের লেখা যত বই পড়েছি সবগুলির সততা এবং নির্ভীকতা দেখে যেমন খুশি না হয়ে পারিনি, এতেও তাই। ফলে 'পরিচয়ে' ঐ সমালোচনা ছাপা হল না। সে সময়ে কে সম্পাদক ছিলেন মনে নেই, সমালোচনার বিভাগটি নীরেনবাবুর হাতে ছিল। ব্যাপারটাতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। সেই সময়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকার খুব নাম ডাক। তার সম্পাদক ডঃ সুশীল মিত্র আমার স্বামীর কাছে লেখাটি চাইলেন। 'পরিচয়' কিন্তু সরাসরি লেখা ফেরত দেয়নি, 'জায়গা নেই' ইত্যাদি বলে ছাপছিল না। আমি আমাদের প্রিয় বন্ধু সুশোভন সরকারকে বলে সমালোচনাটি আনিয়ে, সুশীলবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম। বিচিত্রা'য় ছেপে বেরুল।

সাধারণ পাঠকরা খুশি হলেও, নীরেনবাবু, কিম্বা দিলীপ নিজে, কেউই সন্তুষ্ট হননি। সত্যি বলতে কি, কদাচিৎ আমি নিজের থেকে সমালোচনার কাজে হাত দিয়েছি। সর্বদা অনুরোধে পড়ে করেছি। সেরকম সুখও পাইনি।

সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ সাল মনের সুখে ও শারীরিক অসুস্থতায় কেটেছিল। আটত্রিশের ফেব্রুয়ারিতে আমার মেয়ে কমলা জন্মাল, নভেম্বরে ডাঃ সুবোধ দত্ত আমার গল্-ব্লাডারটি তিনটি পাথরসুদ্ধ কেটে বাদ দিলেন। ক্রমে আমার শরীর সেরে উঠল। নতুন উদ্যমে একটা অন্যরকম কর্মময় জীবন শুরু করলাম। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে এক বছর বিদ্যাসাগর কলেজে রোজ এক ঘণ্টা ইংরিজি পড়িয়ে আসতাম। সেখানে চেনা লোক ছিল। আমার সেজ জ্যাঠার বড় ছেলে বিখ্যাত খেলোয়াড় শৈলজারঞ্জন গণিতের অধ্যাপক, আমার বাল্যবন্ধু মীরা দত্তগুপ্ত মহিলা বিভাগের অধ্যক্ষ। এঁদের সস্নেহ উৎসাহে এক বছর কাজ করলাম। একশো টাকা মাইনে। অত হাসবার কিছু নেই। সেই একশো এখনকার এক হাজারের বেশি। পারতাম না, নানা সাংসারিক বাধা পড়ত। প্রথম কনট্রাক্ট শেষ হলে আরেকটা করার আগ্রহ ওঁদের বা আমার কারো ছিল না। তারপর আর অধ্যাপনা করিনি।

এর আগের বছর পণ্ডিচেরীতে একাদিক্রমে দশ বছর বাস করার পর দিলীপ রায় কলকাতায় এসেছিলেন। এবার আবার এসে থিয়েটার রোডে মামার বাড়িতে উঠে তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি শ্রীঅরবিন্দর আশ্রমকে দানপত্র করে দিয়েছিলেন। মাঝখান থেকে আমিও একজন অসাধারণ মানুষকে অন্তরঙ্গভাবে দেখবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

রোজ ভোরে থিয়েটার রোড থেকে হেঁটে দিলীপ আমাদের বাড়িতে এসে 'ব্রেক্‌ফাস্ট' করতেন। আমিও এক নতুন জগতের আস্বাদ পেতাম। এতখানি জ্ঞান, বিদ্যা, প্রতিভা, ত্যাগ, মাধুর্য, উদারতা এবং অনুদারতার সংমিশ্রণ আর দেখিনি। অন্তত ভারতে কখনো জন্মেছে বলে মনে হয় না। আমার স্বামীর পরম ভালবাসার পাত্র ও কৈশোর যৌবনের প্রিয় সহচর বলে দিলীপের প্রাক্-পণ্ডিচেরী জীবনের কিছুটা জানতাম। দিলীপের স্মৃতি আমার স্মৃতিভাণ্ডারের ও হৃদয়ের বেশ খানিকটা জুড়ে আছে বলে তাঁকে বাদ দিয়ে এ বই লেখাও যায় না।

পরনে গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে চন্দন। তেইশ নং রায় স্ট্রীটে দিলীপের কেমব্রিজের বন্ধু গগনবিহারীলাল মেটা থাকতেন। একদিন তিনি কথায় কথায় আমার স্বামীকে বললেন, 'আই অফেন সী এ সাধু পাসিং দিস ওয়ে লুকিং লাইক দিলীপ রয়।' দিলীপকে এ কথা বলাতে হো-হো করে হেসে বললেন, 'ওকে বলো, নো, নো, ইট ইজ্ ওনলি দিলীপ রয় পাসিং দিস ওয়ে লুকিং লাইক এ সাধু।' এই রকম ফুর্তিবাজ ছিল তাঁর বাইরের রূপ। ভিতরের গভীরতার তল পাওয়া যেত না। শুধু এইটুকু বোঝা যেত বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো মূল্য নেই তাঁর কাছে। এক রকম সৌকুমার্য ছিল ওঁর স্বভাবে, যার জন্য লোকের মুখের কথা বড় বেশি বিশ্বাস করতেন। যাঁরা নিজেরা কখনো মিথ্যা বলেন না, তাঁদের মধ্যে এই দুর্বলতা প্রায়ই দেখি। অন্যরা যে মিথ্যা বলতে পারে, এঁরা তা ভাবতে পারেন না। পুরনো বন্ধু ও আত্মীয়ের সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করলেও, খুব বেশি ব্যক্তিগত টান ছিল বলে আমার মনে হতো না। তাতে অনেকে মনে কষ্ট পেতেন। আমি কিছু আশা করতাম না। আগেকার কোন দাবি ছিল না। আমার স্বামী দিলীপের কাছে অনেক স্নেহ, সাহচর্য, সহায়তা পেয়েছিলেন, তাতেই তাঁর মন কানায় কানায় ভরা ছিল। কাজেই তিনিও কিছু আশা করতেন না। তবে কখনো যদি কানে আসত, 'অমুক দিলীপকে তোমাদের বিষয়ে এই-এই বলেছে, তোমরা শ্রীঅরবিন্দের নিন্দা কর ইত্যাদি।' এবং তার ফলে দিলীপ কিছু দিন আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন না, তখন আমার স্বামী মুখে কিছু না বললেও, মনে দুঃখ পেতেন। আমি তা-ও পেতাম না। কিন্তু খানিকটা রাগ হতো যে এমন মহৎ মানুষ কেন অযোগ্য লোকের কথায় কান দেন। অমনি মনে পড়ে যেত রবীন্দ্রনাথও দিতেন। হয়তো একই কারণে। মিথ্যা কথাকে চিনতে পারতেন না

বলে। এক রকম বালসুলভ সরলতা ছিল দুজনার। ভারি রসবোধও ছিল।

ভারি গুণগ্রাহী ছিলেন দিলীপ। গুণ দেখলেই উচ্চকণ্ঠে গুণের ও তার অধিকারীর প্রশংসা করতেন এবং মাথায় তুলে নাচতেন। তারপর আরো গুণ না পেলে দুম করে মাথা থেকে ফেলে দিতেন। মনের মধ্যে দিলীপের কেমন একটা ঔদাসীন্য ছিল। ব্যক্তিগত বন্ধন তিনি স্বীকার করতেন না। যিনি সংসারত্যাগী, তিনি করবেনই-বা কেন ? তবে প্রকৃত বন্ধু আর অলীক বন্ধুর তফাৎ বুঝতেন না, এই যা দুঃখ। শিবের মধ্যে যে-সব গুণের ও দুর্বলতার কথা শোনা যায়, এ তো আর তার চেয়ে মন্দ নয়।

আমি দিলীপকে মহাপুরুষ বলি। যেমন গান-বাজনায়, কাব্য-রচনায়, জ্ঞান-বিদ্যায় তেমনি ভগবৎ প্রেমে তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে এতটা উপরে ছিলেন যে তাঁকে কম লোকই বুঝত। আমি তো নয়ই। যেটুকু দেখেছি তাতে যেমন মনে হয়েছে, তাই বললাম।

আমার স্বামীর কাছে দিলীপের শৈশবের কথা শুনেছি। অসাধারণ বাপ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একমাত্র ছেলে। শৈশবে মাকে হারিয়ে, পনেরো বছর বয়স অবধি বাপের আদরে মানুষ হয়েছিলেন। তারপর বাপও চোখ বুজলেন। দিলীপ আর তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোট বোন মায়া, মামার বাড়িতে দিদিমার কাছে অতিরিক্ত আদরে মানুষ হয়েছিলেন। দিলীপ কিন্তু সংসারের মাটিতে কোনো দিনই শিকড় গাড়েননি। ধনী বাপের গুণী ছেলে, দেখতে অপূর্ব সুন্দর, কুড়ি বছর বয়স থেকে ভালো ভালো বিয়ের সম্বন্ধ আসত। সব সম্বন্ধেই দিলীপ নারাজ। তবে তার মধ্যে বাছাই করা দুটো একটাকে আমার স্বামীর ঘাড়ে চাপাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। বলতেন, 'না কেন ? অনেক টাকা-কড়ি আর সুন্দরী মেয়ে পাবি !' আমার মতে সাংসারিক জীবনের জন্য তৈরি হননি দিলীপ। আমার অনেকবার মনে হয়েছে সংসারী লোকদের উনি একটু ঘৃণা করতেন। হয়তো ভুল বুঝতাম।

দিলীপের জন্য বহু গাইয়ে-বাজিয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল; অশেষ আনন্দ পেয়েছিলাম। দিলীপ কলকাতায় এলেই আমাদের বাড়িতে ভালো ভালো গাইয়ে এনে আসর করতেন। এইভাবে ভীষ্মদেব, পাহাড়ি সান্যাল, সায়গল, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখকে অতিথিরূপে পেয়েছিলাম। একবার আসরের আগের দিন বলে পাঠালেন, 'গানের পর পনেরোজন খাবে কিন্তু।' আমি খুশি হয়ে কুড়ি জনের মতো হাটবাজার করিয়ে রাঁধা-বাড়া শুরু করলাম। পাঁচ জন বাড়তি হবেই জানতাম। বাবুর্চির আবার জ্বর।

বেলা বারোটায় দিলীপের এক তরুণ ভক্ত এসে বলল, 'পনেরো নয়, মণ্টুদা বললেন, জনা পঁচিশ হবে।' আমার প্রায় ফিট্ হবার জোগাড়। তখন সে দয়া

করে বলল, 'তবে কিনা মামিমা, তুমি যদি আমাকে নেমন্তন্ন কর, তাহলে ঐ বাড়তি দশ জনের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিষ্টি করে খাওয়াটা রদ করি।' আমি বললাম, 'কি মিথ্যা কথা বলবে ?' সে জিব কেটে বলল, 'মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়, তোমার তো গল্‌স্টোন আছে, তুমি শেষ মুহূর্তে অতটা পারবে কেন ?' তাই হলো, কেউ কিছু মনে করল না। এমনকি দিলীপও অম্লান বদনে বললেন,'হ্যাঁ, তোমার শরীর ভালো না, অত লোককে শেষ মুহূর্তে বলতে চাওয়াটা ভারি অন্যায়। ও ঠিক করেছে।'

॥ ৩ ॥

বাড়ির তো আর প্রাণ থাকে না, কিন্তু যারা বেশিদিন এক বাড়িতে বাস করে, তারা হয়তো তাদের সুখ-দুঃখ ভাবনা-ভালোবাসার খানিকটা বাড়ির গায়ে রেখে যায়। শুনেছিলাম বাড়ির মালিক পার্বতীনাথ দাশের স্ত্রী একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে টবে সাজানো বেঁটে বেঁটে পামগাছগুলোর পাতা মুছে দিতেন। শেষ বয়সে দেখেও ছিলাম তাঁকে, থান পরা বিধবা, মুখে গভীর শান্তি। দুঃখও কম পাননি ; ছোট ছেলের হল কুষ্ঠ রোগ, এক মাত্র মেয়ে হলেন অল্প বয়সে বিধবা। এই সব ব্যথা-বেদনার সঙ্গে ঐ বাড়িতে যে একটা গভীর শান্তি রেখে গেছেন, সেটা আমি টের পেতাম। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি মারা গেছিলেন।

তখন ওঁদের অবস্থা পড়ে গেছিল, বাড়ি মেরামত হত না, জানলায় গরাদ ছিল না। এক তলায় থাকব, ভয় হল, তাই আমার কথায় শিক লাগানো হল। ওপরে বিধবা মেয়ে ঊষা মাসিমা আর তাঁর নাবালক ছেলেমেয়েরা। নিচে আমরা দুজন, আমাদের তিন বছরের ছেলে রঞ্জন আর আমার বিধবা ননদ। তিনি যেমনি গোঁড়া হিন্দু—মাজা বাসনে জল ছিটিয়ে ঘরে তোলেন—আবার তেমনি উদার মন। আমার মা বামুনের মেয়ে, বাপ কায়স্থ, নিজে ব্রাহ্ম, ঠাকুর পুজো করি না। তবু আমাকে তিনি একেবারে হৃদয়ে স্থান দিলেন। মেয়ের মতো করে যত রাজ্যের রান্নাবান্না কাঁথা সেলাই, আচার তৈরি শেখালেন। ছোড়দি বলে ডাকতাম। তাঁর কাছেই কুষ্টিয়ার চাপড়া বলে আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রামের এত অজস্র গল্প শুনেছি যে মনে হয় আমিও সেখানে বছরের পর বছর বাস করেছি।

এ বাড়িও আমার বাপের বাড়ির খুব কাছে, নিত্য যাওয়া আসা। তবে বাপের বাড়িতে আর কখনো রাত কাটাইনি। আমার মা-র সঙ্গে ছোড়দির স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাঁকে মা বলেই ডাকতেন, যদিও মা হয় তো মাত্র বছর পাঁচেকের বেশি বড় ছিলেন না। বাইবেলে আছে, 'দি লর্ড হ্যাথ সেট মাই পাথ্‌স্ ইন প্লেজাণ্ট প্লেসেস।'

আমারো ঠিক তাই হল। বাড়িটার অবস্থা আসলে খুব ভালো ছিল না, লাল

মেঝেতে ফাটল, শ্বেত পাথর নড়বড়ে, দেয়ালে নোনা, ছবি টানালে ছ্যাৎলা পড়ে, দেয়াল আলমারিতে ব্যাঙের ছাতা গজায়, সব জায়গায় একটু সোঁদা সোঁদা গন্ধ, বড় খাবার ঘরে, ভাঁড়ার ঘরে কখনো রোদ ঢোকে না, গুদামে হিন্দুস্থানী গয়লা বড় বড় গরু রাখে। সব জায়গায় মস্ত মস্ত মশা। এত বড় যে তাদের গায়ে ডোরা কাটা দেখতে পেতাম। বেশি কামড়ালে পেকে ওঠে। উষা মাসিমার গোটা পাঁচেক বিরাটাকার বিলিতী মুরগি আর একটা প্রায় পাঁঠার সমান বড় সাদা মোরগ। সকলেরি এত বয়স হয়েছে যে বাগানের নরম মাটিতে গর্ত খুঁড়ে সারা দিন রোদ পোয়াত, সন্ধ্যা হতেই একটা খালি গ্যারাজে ঘুমোত। একবার একটা কালো মুরগি উঠে যেতেই রঞ্জন তার গর্তে একটা লালচে বড় ডিম পেল। আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রায় খাড়া বেয়ারাদের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে, সেটি উষামাসিমাকে দিল। তিনিও ওকে আদর করে, ডিমটি ভেজে খাওয়ালেন।

ওতেই মুরগিদের কাল হল। তাদের আরামে রোদ পোয়ানো শিকেয় উঠল। তাদের বসতে দেখলেই ঠেলেঠুলে তুলে দিয়ে রঞ্জন ডিম খুঁজত! শেষটা বেচারিরা বেগতিক দেখে পাঁচিলে চড়ে, ডানায় মুখ গুঁজে ঘুমের চেষ্টা করত। খালি সাদা মোরগ জায়গা ছাড়েনি। মোরগে ডিম দেয় না শুনে রঞ্জন যেমনি অবাক তেমনি বিরক্ত। ঠুকরেও দিত মোরগটা। উষামাসিমার বাড়িতে ভালো কিছু রান্না হলে আমরা ভাগ পেতাম।

কি সুখে-শান্তিতে আমাদের দিন কাটত, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। এদিকে দুনিয়াকে অন্ধকার করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা ক্রমে পাকিয়ে উঠছিল। গয়লা তখনো টাকায় সাড়ে চার সের দুধ সামনে দুয়ে দেয়। কয়লাওয়ালা মাসে দেড় টাকা হারে যত লাগে কয়লা যোগায়। ডিমওয়ালা টাকায় ৩২টি ডিম দিয়ে যায়। বুড়ি তাঁতিনী জোরজার করে সুন্দর সুন্দর গঙ্গা যমুনা বা ভোমরা পাড়ের তাঁতের শাড়ি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে রেখে যায়। তার দাম সাড়ে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকার মধ্যে। রামকৃষ্ণ মিশনের ছেলেমানুষ ব্রহ্মচারীরা প্রতি রবিবার মুষ্টিভিক্ষা নিতে আসেন আর রঞ্জন তাদের দিয়ে মটর গাড়ির ছবি আঁকায়। ঘরে বসে কেক প্যাস্ট্রি কিনি, সূক্ষ্ম কারুকার্য করা চীনে টেবিলের চাদর কিনি। দক্ষিণভারত থেকে এক বুড়ো এসে জলের দরে নিখুঁৎ হাতে বোনা লেস্ বিক্রি করে যায়। ওদিকে আমার স্বামীর পেশায় সুনাম হচ্ছে। আমাব শরীরের ব্যথা-যন্ত্রণা, অপারেশনের কষ্ট ক্যালকাটা নার্সিং হোমের দেবতুল্য ডাক্তার ক্যাপ্টেন মিত্রের আর আর·জি·করের স্বনামধন্য ডাক্তার ডাঃ সুবোধ দত্তের যত্নে ও দক্ষতায় দূর হয়ে যায়। দীর্ঘ দিন বেদনার শয্যায় শুয়ে থেকে মনের মধ্যে একটা নতুন রকম মুক্তির আস্বাদ পাই। এক কথায় ঐ বাড়িতে যে চার বছর ছিলাম, ত। মধ্যে আমার নিজের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছিল। তাই বলে কেউ

যেন মনে না করেন যে স্বামীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে আমার দিন কাটত। মোটেই তা নয়। মাঝে মাঝে বেজায় মতভেদ ঝগড়াঝাঁটিও হত। তবে চ্যাঁচামেচি করা কারো অভ্যাস ছিল না। আমার ভালো ভালো যুক্তিগুলোকেও উনি কেমন স্বচ্ছন্দে ডিঙিয়ে যেতেন দেখে অবাক না হয়ে পারতাম না। অনেক দিনের অভিজ্ঞতার ফলে পরে বুঝেছিলাম সব পুরুষমানুষরাই একটু অদ্ভুত হয়। আমার স্বামীর তো কল্পনাশক্তির যেটুকু ঘাটতি ছিল যুক্তিযৌক্তিকতা আর পরিসংখ্যান দিয়ে তার শুধু পূরণ হত না, উপচে পড়ত। এই জাতের সঙ্গে কেউ তর্ক করতে বসে ?

সে যাই হোক, বোধ হয় ১৯৩৯-এ দিলীপ যখন আবার কলকাতায় এলেন, এক দিন হঠাৎ আমাকে বললেন, কই, তোমাদের বাড়িতে তো কখনো বুদ্ধদেব বোসকে দেখি না। ওকে কি তোমাদের ভালো লাগে না ? চোখেই দেখিনি তা ভালো লাগালাগির কথা ওঠে কি করে। ওর প্রবন্ধ, ওর কবিতা খুব ভালো লাগে।

ওর উপন্যাস নিয়ে নানা লোকে নানা সমালোচনা করতেন। কেউ কেউ অসামাজিক বিষয়ের গন্ধ পেতেন। শুনেছি বেচারির যখন একটা ভালো চাকরির নিতান্ত দরকার ছিল, তখন নাকি সবচেয়ে উপযুক্ত প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও সেই অধ্যাপনার কাজটি ওকে দেওয়া হয়নি। এসব কথা ভাবলেও এখন হাসি পায়। তাহলে তো ইংরিজি সাহিত্যের তিন চতুর্থাংশ এবং শেক্সপীয়রের দশ ভাগের সাত ভাগ বাতিল করতে হয়।

সে যাই হোক, দিলীপ যখন বললেন, আমার ইচ্ছা তুমি ওকে নেমন্তন্ন কর, গাড়ি পাঠিয়ে আনার ব্যবস্থা কর আর তোমার বাবুর্চিকে দিয়ে ভালো ভালো বিলিতী পদ রাঁধাও। মহা খুশি হয়ে সবই করা হল। মনে আছে, বাগান থেকে বাছাই করা ফুল তুলে ঘর সাজানো হল। 'ফ্যানি ফামার্স কুক' বুক দেখে চমৎকার ফলের পানীয় বানিয়ে, সুন্দর সুন্দর ডাঁটি দেওয়া গেলাসে পরিবেশন করা হল। নানা রকম সুস্বাদু খাবার ও শেষে একটা মোক্ষম পুডিং খাওয়ানো হল। দিলীপ আর আমরা মিলে যত দূর পারি আদর-আপ্যায়ন করে রাতে ওকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল।

ভালো লেগেছিল ওকে। আমার সমবয়সী, ছোট্টখাট্টো মানুষটির একটু যেন আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, আবার সেই সঙ্গে একটু উন্নাসিক ভাব মনে হয়েছিল। কিন্তু চমৎকার আলাপ, কোমল ব্যবহার ; একটু আন্তরিকতার স্বাদও যেন পেয়েছিলাম। মোট কথা খুশি মনে শুতে গেছিলাম। ভেবেছিলাম সব কষ্ট সার্থক হয়েছে, কারণ ওর ভালো লেগেছে। কাজেই যখন দিন দুই বাদে আমাদের আত্মীয় এবং বন্ধু শিশুসাহিত্যিক রবীন্দ্রলাল রায় এসে বলল, 'তোমরা

নাকি বুদ্ধদেবকে বাড়িতে ডেকে খুব চাল দিয়েছ,বড়মানুষি দেখিয়েছ ? সে খুব বিরক্ত হয়েছে।' তখন যে কি কষ্ট হয়েছিল সে আর কি বলব। মনে আছে সে রাতে আমার ঘুম হয়নি। একটু রাগও হচ্ছিল। পরে অবিশ্যি বুঝেছিলাম বুদ্ধদেব যে মন্তব্যই করে থাকুক বিরক্তও হয়নি এবং সম্ভবত আদরকে সে চাল বলে ভুলও করেনি। ভারি বুদ্ধিমান ছিল বুদ্ধদেব ; তাকে বন্ধু বলতে পেরে আমি গর্বিত। ওকে বুঝতে পেরেছিলাম যখন এর কিছু দিন পরেই ওর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম, তাতে লেখা ১লা বৈশাখ ও 'বৈশাখী' বলে একটা বার্ষিক প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছে, তার জন্য একটা গল্প লিখে দিতে হবে। বার্ষিকটি বড়দের জন্য।

চিঠি পড়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা ! সর্বনাশ, বড়দের জন্য সমালোচনা প্রবন্ধ লিখি বটে, কিন্তু গল্প লিখব আবার কি ! ও আমি পারব না। তা বুদ্ধদেবও কিছুতেই ছাড়বে না। ছোটদের জন্য লেখেন আর বড়দের জন্য পারবেন না, এ একটা কথা হল। ও আমি শুনব না। অমুক তারিখের মধ্যে চাই। আলোচনাটা মুখে হয়েছিল, না টেলিফোনে, না চিঠিতে কিছুই মনে নেই। খালি মনে আছে মনের মধ্যে কেমন করে জানি না একটা ছোট গল্প জন্ম নিল। ভূতের গল্প। তার নাম সোনালি রূপোলি। বুদ্ধদেব সেটা ছেপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বড়দের গল্পলেখক হয়ে গেলাম।

সম্পাদকমশাইরা কেবলি গল্প চাইতে লাগলেন। সেই থেকে আমিও আজ পর্যন্ত অজস্র বড়দের ছোট গল্প লিখেছি। তার মধ্যে নিজেই বিলিতী প্রভাব দেখতে পাই। কাটা ছাঁটা, একমুখী, সরস। তবে আমার কাছে ছোটদের গল্পেরি স্থান প্রথম। সেটা ভালো। বড়দের জন্য বহু ভালো লেখক আছেন, ছোটদের জন্য অনেক কম। তখন পর্যন্ত কিন্তু আমার ছোটদের গল্পের একখানিও বই বেরোয়নি। যা লিখেছি পত্রিকায় বেরিয়েছে। লোকে পড়েছে, ভালোমন্দ বলেছে, তাতেই আমি খুশি ছিলাম। পরিচয়ের বন্ধু গিরিজা ভট্টাচার্য নাকি একজনকে বলেছিলেন, ভদ্রমহিলাকে কাগজ নষ্ট করতে বারণ কর। আরেকজন বলেছিলেন, ছোটদের গল্প লেখার আগে ওর মস্তিষ্কের চিকিৎসা করানো উচিত। তাতেও ক্ষুব্ধ হইনি।

আমার তখন তিরিশ বছর বয়স। সমবয়সীদের মধ্যে বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত, চার বছরের বড় প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার—সকলেই বেশ নাম করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি তখনো তৈরিই হইনি। পড়ি, দেখি, শুনি, মন থেকে তাগাদা এলে একটা গল্প হয়তো লিখে ফেললাম। বই ছাপার কথা ভাবতেও পারি না। কুড়িয়ে বাড়িয়ে হয় তো একটা গল্পের বই, একটা রম্য-রচনা হতে পারে। ফূর্তি পাই না। ফুর্তি না পেলে কিছুই করতে পারি না। অনেকে বলতেন,

এত ভালো কেরিয়ার করলে, একটা ডক্টরেট নাও না কেন ? ঐ, ফুর্তি পাই না। অধ্যাপনা কেমন এক ঘেয়ে লাগে। সেদিক মাড়াই না।

চেনা-জানার দল বাড়ে। দিলীপ যাঁদের নিয়ে আসতেন, তাঁদের সঙ্গে তা না হলে আলাপই হত না। গাইয়ে-বাজিয়ে মানুষ সব। উদার ; হয় তো কিঞ্চিৎ অসামাজিক কেউ কেউ ; সাধু-ভক্ত-ও কেউ ; কেউ অভিনয় করেন, কেউ নাচেন। লীলা দেশাইকে একদিন গানের আসরে আনলেন। সে অপূর্ব নাচ দেখাল, রঞ্জন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে দেখল না বলে দুঃখ হচ্ছিল। সকালে সে বলল, 'খুব ভালো নাচল মাসি।' আরো এস, এমনি গল্প করতে। ভালো লাগত তাকে। কিছু কাল পর আর দেখা হয় না। এর প্রায় আঠারো বছর পর যখন আকাশবাণীতে প্রযোজক হয়েছিলাম তখন কারো কারো সঙ্গে আবার দেখা হল, আবার নতুন করে ভালো লাগল। বেঁচে থাকলে কি লাভের অংকটি খুব কম হয় ?

একবার পণ্ডিচেরী থেকে দিলীপ লিখে পাঠালেন, আমার এক ফরাসী বন্ধুকে পাঠাচ্ছি। তোমাদের বাড়িতে কিছু দিন অতিথি করে রেখো। এলেন জাঁ এরবের বলে চমৎকার একজন মানুষ।

ছয় ফুটের ওপর মাথায়, বয়স মনে হত বছর ৪০, যেমন আমুদে তেমনি গম্ভীর। পৃথিবীর নানা ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করছেন. বিবেকানন্দের ভক্ত। দিনের পর দিন সকাল থেকে বিকেল বেলুড়ে কাটান। নানান গভীর বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। একদিন ধুতি পাঞ্জাবী পরলেন। পাঞ্জাবীতে সুন্দর রূপোর বোতাম পরানো। জাঁ একটা আসন পেতে তাতে বসে, প্রসন্নমুখে আমাদের দিকে তাকালেন। আমাদের বিস্ময় দেখে বললেন, এই বোতাম আর এই আসন হল বিবেকানন্দের ব্যবহার করা জিনিস। প্যারিসে কোনো ধর্মীয় সংগ্রহ-শালায় রাখা হবে। মনে আছে, এমন জিনিস দেশ ছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছিল।

জাঁ অনেক দেশ ভ্রমণ করেছিলেন, চীন, তিব্বত ও নানা দুর্গম জায়গায়। তিব্বতের বিষয়ে একটা মজার গল্পও বলেছিলেন। সেখানকার কোনো বড় গুম্ফায় কাজকর্ম সেরে, ভারতে ফিরে আসার কথা ভাবছেন, এমন সময় ওঁর গাইড্ এবং দোভাষী বলল, তা হয় না। আমাদের নাইট্-লাইফ্ না দেখে ফিরে গেলে অন্যায় হবে।

অগত্যা গেলেন তার সঙ্গে। নাইট্-লাইফ্ মানে পানালয়ে সান্ধ্য সমাবেশ। মস্ত ঘর, ভদ্র আবহাওয়া, মেলা লোকজন নিচু গলায় গল্পগুজব করছে। গাইড্ বলল, 'সবাই পরিবার নিয়ে এসেছে দেখেছেন ?'

দেখেননি জাঁ ; দেখলেও কাউকে পরিবার বলে চিনতে পারেননি। সব এক

চেহারা, এক পোশাক। কে পুরুষ কে মেয়ে বুঝবার জো নেই। ক্রমে সন্ধ্যা বাড়তে লাগল ; যারা সপরিবারে এসেছিল তারা আস্তে আস্তে বিদায় নিল। তারা গেলেই আবহাওয়াটা একটু করে বদলাতে আরম্ভ করল। ক্রমে উঁচু গলা, কর্কশ স্বর, তর্কাতর্কি শোনা যেতে লাগল। আরো রাত বাড়ল। মাথা আরো গরম হয়ে উঠল। তারপর তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতিতে দাঁড়াতে বেশি দেরি হল না। তখন জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা যেতে লাগল। জ্যাঁও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু গাইড্ বলল, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, এখুনি সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপনাদের দেশে এই রকম হলে, ষণ্ডা চেহারার চাকারআউট্রা গোলমালকারীদের ধরে বের করে দেয়, এ আমি নিজে দেখে এসেছি। আমাদেরো চাকার-আউট্ আছে। ঐ দেখুন!'

বলতে বলতে ভীষণ ষণ্ডা একটা লোক ভেতর থেকে ছুটে এসে, যে-দুজন মারামারি করছিল, তাদের জোববার ঘাড ধরে, দেখতে দেখতে সামনের দরজা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে, হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ফিরে এল! পাশ দিয়ে যাবার সময় জ্যাঁ দেখলেন চাকার-আউট্ হলেও, কিঞ্চিৎ তফাৎ আছে। ইনি মহিলা! স্ত্রী-স্বাধীনতা আর কাকে বলে!

খুব ভাব হয়ে গেছিল এই মানুষটির সঙ্গে। নিরামিষ খেতেন। ঝাল না দিলে আমাদের দিশী বান্নাই পছন্দ করতেন।

একবার সঙ্গে ওঁর স্ত্রী লিজেল্‌ও এসেছিলেন। তাঁকেও ভালো লেগেছিল। তারপর কবে যে তাঁদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল কিছুই মনে নেই। এমনি করে কত অস্থায়ী সম্বন্ধ পাতা হল, আবার আপনি খসে পড়ল। তবু মনে হয় যা দেখা যায়, শোনা যায়, সে চলে গেলেও কিছু রেখে যায়। অর্থাৎ এইভাবে ক্রমে আমার মন তৈরি হতে লাগল।

সন তারিখ বলতে পারব না, বুদ্ধদেব ইতিমধ্যে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ সকলের অজানিতে শুরু করে দিল। সে কাজ বলতে কোনো আশ্চর্য রচনার কথা ভাবছি না। এ তার চেয়েও বড় কাজ। বুদ্ধদেব নানা ভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন করে দিয়ে গেছে। আমাকে বহু তরুণ কবি বলেছেন, বুদ্ধদেবের কাছেই তাঁরা প্রথম উৎসাহ এবং সহযোগিতা পেয়েছেন। এঁদের জন্যেই হয়তো লোকসান দিয়েও বুদ্ধদেব বহু কাল তার কবিতা পত্রিকা চালিয়েছিল। ক্রমে সেই সব অখ্যাত কবিরা পাঠকদের কাছে পরিচিত ও প্রিয় হয়ে উঠলেন। 'এক পয়সায় একটি'-র কথাও মনে পড়ে, সাল মনে নেই। হলদে হাতে তৈরি কাগজের মলাটের মধ্যেখানে পরিপাটি করে ছাপানো ষোলটি কবিতা। দাম চার আনা, সেকালের ষোল পয়সা। আমাকে দিয়েও দুটি বড়দের গল্প লিখিয়ে ঐভাবে ছেপেছিল। গল্প দুটির নাম 'মন্দাকিনীর প্রেম' আর

'বিপাশা'। আমি সর্বদাই বলি আমার লেখক হয়ে ওঠার মূলে আমার বন্ধু বুদ্ধদেবের হাতও আছে। কত জায়গায় সে আমার শিশুসাহিত্য সাধনা, আমার বাংলা ভাষা বিষয়ে সহানুভূতিশীল মন্তব্য করেছে, এ সব কথা ভুলবার নয়। এখন সে আমার আগেই চলে গেছে। এখন কেবলি মনে হয় এ কথাটা তাকে বলা হল না, সে কথাটা তাকে বলা হল না। তার সঙ্গে কখনো সে রকম অন্তরঙ্গতা হয়নি, দুজনার রুচি ও স্বভাব আলাদা, কিন্তু সাহিত্য জগতে তার মতো বন্ধুও কম পেয়েছি। আমি যখন বেশ দেরি করে লিখতে শুরু করলাম, তার আগেই আমার প্রথম গুরুদের অনেকেই চলে গেছেন। উপেন্দ্র কিশোর যখন যান, আমার ৭ বছর বয়স। সুকুমার যখন যান তখন ১৫। কিন্তু এঁরাই যে আমার পথনির্দেশ করে দিয়েছিলেন?

সে কথা আর কেউ না বুঝলেও আমি তো জানি। তবু কাজ করতে গিয়ে আরো বন্ধুর দরকার হয়। অন্ততঃ আমার হয়! যাদের কাছে মনের কথা বলা যায়, যাদের প্রকৃত মতামত শোনা যায়। ছোটবেলা থেকেই এমন বন্ধু অনেক পেয়েছিলাম। কারণ আমার ভাই-বোনরা ছিল বেজায় বুদ্ধিমান ও স্পষ্টবক্তা। শুধু প্রশংসা পাওয়াতে খুব সাহায্য হয় না। বরং তার উল্টো। আমাদের বন্ধু অধ্যাপক নীরেন রায় একটা বিষয়ে খুব তৎপর ছিলেন। আমার কোনো প্রবন্ধ বা গল্প প্রকাশিত হলে—হয়তো পাছে আমার বেশি আত্মপ্রসাদ গজায় তাই—খুব কড়া ভঙ্গিতে ভাব ও ভাষার তিক্ত সমালোচনা করতেন। আবার বলতেন, এসব শুধু আমার মত নয়, আমার মা-ও এ-কথা বলেন এবং আরো বহু বিদ্বান-বুদ্ধিমান যাঁরা আমার মতো স্পষ্টবক্তা নন। তবে এইটুকু বলে দিলাম লিন্ ইউটাং-এর মতো লিখতে না পারলে আমি আপনাকে লেখকই বলি না। এতে হতাশ হবার কোনো কারণও দেখতাম না। তাছাড়া মনে মনে জানতাম বড়দের জন্য লেখা আমার বিলাস, ছোটদের জন্য লেখা আমার জীবন। অবিশ্যি গোটা কতক মোক্ষম মোক্ষম প্রবন্ধ লেখার শখ আমার তখনো ছিল, এখনো আছে। কতখানি হয়ে উঠবে তা জানি না।

অন্যরকম সমালোচকও ছিল। শিশুসাহিত্যিক রবীন্দ্রলাল রায় আমার চেয়ে বছর ২-৩-এর বড়। এখন যাকে সকলে শিশু চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞ বলে জানে, সেই ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার এই রকম আরো কিছু। রবির সব লেখার আমি প্রথম সমালোচক। দুঃখের বিষয় আমার সব লেখা ওর বড্ড বেশি ভালো লাগত। তবে অজস্র লেখার সামগ্রী জোগাত। বুদ্ধিমান, উদার, কিঞ্চিৎ বাতিকগ্রস্ত। ননীগোপালের কথা আলাদা। আমার চেয়ে বছর তিন-চারের ছোট, আমার ছোট ভাইদের বন্ধু। ওর বাবা ছিলেন বালিগঞ্জ গবর্ণমেন্ট স্কুলের অধ্যক্ষ এবং খুব কড়া। তার ফলে ননীগোপাল খুব একটা খ্যাপাটে হয়ে উঠবার সুযোগ

পায়নি। সরস, কল্পনাপ্রবণ, ওদিকে ঘোড়ার রাশ শক্ত হাতে ধরা। ও যে দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প লিখবে তাতে আশ্চর্য কি ? ওর প্রথম বই 'রত্ননেশা' তার প্রমাণ। আরো অনেক ভালো বই লিখেছে। অনেক দিন ধরে শিশু সাহিত্য পরিষদের পরিচালনার একটা দায়িত্বপূর্ণ অংশ বহন করছে, শিশু-স্বাস্থ্যের বিশেষ পত্রিকার সম্পাদনা করে।

আমাদের আজীবনের বন্ধু ননীগোপালের রোজ-রোজ আমাদের বাড়িতে এসে সাহিত্যালোচনা করাকে কিন্তু নিষ্কাম সাহিত্য প্রেম মনে করলে ভুল হবে, এই রকম আমার একটা সন্দেহ আছে। আসল ব্যাপার হল যে আমার ননদ ওর প্রতি একটু বেশি মাত্রায় স্নেহাসক্ত থাকায়, রোজ যা কিছু বড়ি-বড়া-পায়েস-পিঠে তৈরি করতেন, তার একটা বড় অংশ ননীর জন্য গোপনে তুলে রাখতেন। সে সব খাদ্যদ্রব্য কোন কালে পরিপক্ব হয়ে ননীগোপালের চুলগুলোকে এই ঊনসত্তর বছর বয়স অবধি কুচকুচে কালো এবং শরীরের বয়স দশ বছর কম করে রাখলেও ওর ঐ পিঠে প্রবণতার পৈষ্টিকতার ফলটাতে শিশুসাহিত্য উপকৃত হয়েছে এতে সন্দেহ নেই।

এদিকে আস্তে আস্তে শরীর থেকে অপারেশনের দুর্বলতা দূর হয়ে যেতে লাগল। এপ্রিল মাসে দার্জিলিং-এ একটি ফ্ল্যাট নিয়ে আড়াই মাসে অনেকের মতে অতিরিক্ত স্বাস্থ্যবতী হয়ে ফিরে এসেই কাজে লেগে গেলাম। রবীন্দ্রলাল ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য নামে একজনকে ধরে নিয়ে এল। হাসি-খুশি, মাথায় খুব লম্বা নয়, কোথাও অধ্যাপনা করে ; বয়সে আমার চেয়ে এক বছরের ছোট ; বিজ্ঞান নিয়ে অনেক পড়াশুনো করেছে ; তার চেয়েও বড় কথা 'রামধনু' পত্রিকার সম্পাদক এবং সবচেয়ে বড় কথা ওদের একটি প্রকাশনালয় আছে, যেখান থেকে আমার একটি ছোটদের গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করা যেতে পারে। মনে আছে, এ-কথা শুনেই আমি গলে জল। সন্দেশে দু-চারটে অন্য কাগজে আমার নিজের আঁকা অপটু কিন্তু সরস ছবিসহ কটি গল্প বেরিয়েছিল, তাই দিয়ে ছোটখাটো একটি বই করা হবে ঠিক হল। তার মলাট আঁকবেন একজন অল্পখ্যাত শিল্পী, ক্ষিতীনেরি সমবয়সী। তাঁর নাম শৈল চক্রবর্তী। ব্যস্ কথাবার্তা হয়ে গেল, এর বেশি কিছুর দরকার আছে কারো মনে হল না। কিছুকাল পরে সত্যি-সত্যি বই বেরুল। ক্ষিতীন আমাকে পঁচিশ কপি দিয়ে গেল। গোলাপী মলাট, মলাটের ওপর পণ্ডিতমশাই সেই সাংঘাতিক পান খাচ্ছেন, যার প্রভাবে একটু পরেই বাঁদর বনে যাবেন। বইয়ের নাম 'বদ্যিনাথের বড়ি'। মলাট দেখে আমার নিজেরই গা শির-শির করতে লাগল। শৈলও এখন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সে যাই হোক। বইয়ের কোনো বিজ্ঞাপন বা সমালোচনা বেরুল না। অখ্যাত লেখক, অখ্যাত শিল্পী, অপরিণত প্রকাশক, যতদূর মনে হয় দাম ছিল আট

আনা। আমি কিছু টাকাকড়ি পাইনি। ক্ষিতীনেরো এক পয়সা লাভ হয়েছিল মনে হয় না। পয়সা না পেলেও, আমার লাভ হয়েছিল, আমার আত্মপ্রত্যয় দশগুণ বেড়ে গেছিল। ঐ পঁচিশটির বেশি বই-ও ক্ষিতীন দেয়নি। মনের আনন্দে যথেচ্ছ বিলিয়ে শেষ কপিটি খুইয়ে দেখতে দেখতে দেউলে হয়ে গেছিলাম। ক্ষিতীন আমাকে ওর প্রেস কপিটি দেবে বলেছে। সেই আশাতে আছি। ক্ষিতীনের বোধহয় মাঝে মাঝে বিবেক দংশন করত।

আমাকে বলত রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে একটা ভূমিকা লিখিয়ে আনলে বোধ হয় বই বাজারে বিকোবে। গল্পের জন্যে বিকোবে না, ভূমিকার জন্য বিকোবে, কথাটা আমার পছন্দ হয়নি তবু একবার বন্ধু অনিল চন্দের কাছে কথাটা পাড়লাম। সে তখন কবির সেক্রেটারির পদে ছিল। বছরটা ১৯৩৯ যতদূর মনে পড়ে। কবির শরীর ভেঙে পড়েছিল। চোখে ভালো দেখেন না, কানে ভালো শোনেন না, খালি মনের তেজ মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো জ্বলে।

অনিল রেগে গেল। কবির শরীরের এই অবস্থা এই কি ভূমিকা লিখে দেবার সময়? খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। ভূমিকা টুমিকা লেখা হয়নি, বইও বিক্রি হয়নি. লোকে ভুলেও যেতে শুরু করেছিল। খালি আমি নিজে হতাশ হইনি।

অনিল চন্দ—রানী চন্দকে বাদ দিলে চলে না। ওদের আমি বড়ই ভালোবাসি। ভাবি অনিল বেঁচে থাকলে পৃথিবীর যে কোনো টুকুতে আমরা বাস করি, সেটা আরো আনন্দময় হয়ে উঠত। ঐ চার নং রায় স্ট্রীটে বাস করার সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। এখন ভাবলে হাসি পায়। এটা আমার বই ছাপার কিছু আগের ঘটনা হবে। লোকে বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ ছিল। সমর্থনের জন্য পত্রিকায় ছাপা তাঁদের তর্কাতর্কির উল্লেখ করে। কিন্তু যাঁরা ভিতরের কথা জানেন, তাঁরা জানেন যে তর্ক থাকলেই বিরোধ ছিল, এ-কথা প্রমাণ হয় না। তর্ক হল মতের ব্যাপার, বিরোধ মনের। দ্বিজেন্দ্রলাল অকালে মারা যাওয়াতে দুজনের মধ্যে যে প্রীতি ও সৌহার্দ্য থাকতে পারত তা গড়ে ওঠেনি। আমি নিজেও লক্ষ্য করেছিলাম যে দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে কবির মনে একটা বেদনাবোধ ছিল। তাঁর বোধহয় বড় ইচ্ছা ছিল দিলীপের সঙ্গে একটা স্নেহের সম্বন্ধ গড়ে উঠুক। এই নিয়ে দুজনার মধ্যে কিছু চিঠি লেখালেখি হয়ে থাকবে। তবে সেটা আমি যখনকার কথা বলছি তার আগেই ঘটে গেছিল। দিলীপও খুশি হয়ে কবিকে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁর মনে কোনো ক্ষোভের কারণ ছিল না এ কথা তিনি নিজে আমাদের বলেছিলেন।

এখন মুস্কিল হল দিলীপের পরম ভক্তরাও তাঁর হস্তলিপির পাঠোদ্ধার করতে কষ্ট পেত। আর বুড়ো কবি তো আরো বেশি। এই বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করে থাকবেন। দিলীপের কানে কথাটা গেলে তিনি ধরে ধরে ভালো করে একটি

চিঠি লিখেন, শেষে এই মন্তব্য করেছিলেন, আশাকরি এটি পড়তে কবির আর আয়ুক্ষয় হবে না। নিতান্তই রসের কথা। অন্য কিছু মনে করে তিনি লেখেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশে পাশে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা এর অন্য মানে করে, অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ফলে প্রীতির সম্পর্কে ব্যাঘাত পড়েছিল। এ ব্যাপারের পরে কিছু দিন কেটে গেছিল। এতক্ষণ যা লিখলাম তা দিলীপের মুখেই শোনা।

সে যাই হোক, দিলীপ কলকাতায় এসেছেন শুনে কবি তাঁকে একখানি চিঠি লিখে, অনিলের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। অনিল আমাদের ফোন করে যখন শুনল দিলীপ রোজ সকালে ৮টায় আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খান, সে বলল সে-ও ঐ সময়ে আসবে। পর দিন দিলীপকে সে-কথা বলাতে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি উঠে চলে গেলেন, অনিল আসার আগেই। অনিল ভারি দুঃখিত হয়ে চিঠিখানি রেখে চলে গেল। পরদিন চিঠি পড়ে কিন্তু দিলীপের মন গলে জল। তারপর কি হয়েছিল তার আমি প্রত্যক্ষদর্শী নই বলে বলতে পারলাম না। অনিলকেও জিজ্ঞাসা করিনি।

১৯৩৯-৪০ থেকে আমার সামাজিক সেবাকর্ম বেড়ে গেল। সে যে কি হাস্যকর ও অন্তঃসারশূন্য ব্যাপার সে আর কি বলব। দেখতে দেখতে বেশ কটা সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। বেশ মজাও লাগত। বহু বছর ধরে কয়েকটার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারিনি, কতকটা জায়গায় আর সত্যি কথা বলতে কি তার চেয়েও বেশি, তাদের সঙ্গে পেরে উঠিনি বলে। সকলেরি উদ্দেশ্য মহৎ এবং হাতে গোনা কয়েকটি বাদে, সকলেরি প্রচেষ্টা বিফল। ছোট একটার কথা বলি। ঐ সময়ের ব্যাপার। ঠিক তারিখ মনে নেই। নাম ধাম যুক্তিযুক্ত কারণে বললাম না। তা এম-এ ক্লাসের ছাত্রীদের থাকার ভালো জায়গা নেই দেখে, কোনো বিশিষ্ট নারী প্রতিষ্ঠান রাসবিহারী এভেনিউয়ের কাছে একটা ভালো ভাড়া বাড়িতে একটি হস্টেল খুললেন। কর্ত্রীপক্ষের একজন আমাকে বললেন পরিচালক সমিতির সদস্যা হতে। খুব উৎসাহ না থাকলেও 'না' বলতে পারলাম না।

বেশ হস্টেলটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আধাবয়সী অধ্যক্ষার রূপ ফেটে পড়ছে, ভালো মানুষ চেহারা, দুঃখী ভাব। শুনলাম বড়লোকের মেয়ে, স্বামী বড় চাকরি করতেন, অকালে মারা গেছেন। এ-সব মহিলাদেরি সুযোগ দেওয়া উচিত, এটাই ছিল তার পক্ষে প্রবলতম যুক্তি। থান-পরা, ক্ষীণ চেহারা দেখে প্রথম দিন থেকেই মায়া হচ্ছিল।

মনে হল চমৎকার ব্যবস্থা। জনা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি বাসিন্দা, সবাই সাড়ে দশটা-এগারোটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে কলেজ চলে যায়, বিকেল সাড়ে চারটে-পাঁচটায় ফেরে। সমস্ত ব্যাপার সুষ্ঠু, যুক্তিসঙ্গত, স্বাস্থ্যসম্মত নিয়মে চলে।

খাওয়া দাওয়ার নিখুঁত এবং মস্ত একটা চার্ট খাবার-ঘরে ঝোলানো থাকে। তাতে সোম থেকে রবি কবে কখন কি রান্না হবে সব লেখা। কারো কিছু বলার নেই। অধ্যক্ষার ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদির কথাই উঠতে পারে না। দ্বিতীয় মিটিং-এ চার্ট নিয়েই হুলুস্থুল ব্যাপার। সমিতির সভানেত্রী আমাকে ফোন করলেন যে একটা গুরুতর পরিস্থিতি সংঘটিত, মিটিং-এ যেন অতি অবশ্য যাই। গিয়ে দেখলাম সদস্যরা সকলে গরম হয়ে আছেন। নাকি এভাবে হস্টেল চালানো যায় না। তার চেয়ে তুলে দেওয়া উচিত। এ হেন উদ্ধত ছাত্রীদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে কি করে কারবার করতে পারে ইত্যাদি।

কি ব্যাপার? না বেচারি মিসেস্ চৌধুরীকে ডাকা হোক। তিনি নিজের কানে শুনে যান এ রকম অপমান সম্বন্ধে আমাদের মতামত। এলেন তিনি। কেঁদে কেঁদে দুই চোখ লাল, চুল উস্কোখুস্কো, কথা বলতে ঠোঁট কাঁপছে। বগলে খাদ্য তালিকার চার্ট। আমি তো অবাক! কম্পিত হস্তে চার্টখানি টেবিলের উপর ফেলে চোখে রুমাল দিতেই, সভানেত্রী বললেন, 'দেখ একবার বাড়াবাড়ি দূরে যেতে পারে। অথচ এরা সব ভদ্রঘরের শিক্ষিত মেয়ে।'

চেয়ে দেখি বুধবার বিকেলের খাদ্য তালিকায় লেখা ছিল, 'মুড়ি নারকেল।' সেটি কেউ কলম দিয়ে কেটে পরিপাটি করে পাশে লিখে রেখেছ 'লুচি ডিমের-ডালনা।' শুধু তাই নয়, ছাত্রীদের এতদূর অধঃপতন ঘটেছে যে আগে থেকেই বলে রেখেছে মুড়ি-নারিকেল তারা খাবে না। মনে আছে বেজায় মজা লেগেছিল। সভানেত্রী মানুষটির কল্পনা শক্তি না থাকলেও, লোক খুবই ভালো ছিলেন। বাস্তবিক অবাক হয়ে বললেন, এর মানে কি? এ নিশ্চয় শুধু মিসেস্ চৌধুরীকে অপমান করার চেষ্টা। ওরা বি-এ পাস, উনি তা নন্, তাই।'

অপেক্ষাকৃত কমবয়সী আমরা বারবার ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলাম, মোটেই তা নয়। ওদের ঐ সময় সারাদিন ধকলের পর খিদে পায়, তা মুড়ি-নারকেলে বাগ মানানো যায় না। বড়দিদি বললেন, 'খিদে পায়? ওদের খিদে বুঝি না, আমাদের বাড়িতে রোজ মাংস হয়। এক পোয়া কেনা হয়। আমরা তিন জন বয়স্ক মানুষ খেয়ে চাকরটার জন্যও একটু থাকে। আর এরা বলে যে দিন মাংস হবে মাথা পিছু যেন আধপোয়া ধরা হয়। তার জন্যে যদি দুদিনের বদলে এক দিন মাংস হয়, সে-ও ভালো। এর কোনো মানে হয়?' কি আর বলি, আমাদের বাড়িতেও মাংস হলে বড়দের মাথা পিছু আধ পোয়া আর ছোটদের তিনজনে এক পোয়া হিসাব ধরা হত। সেকালে পাঁঠার মাংস আট আনায় আর ফার্স্ট ক্লাস্ মটন বারো আনায় এক সের পাওয়া যেত।

অমি সতীর্থদের শান্তিনিকেতনের একটা অবিকল এক রকম গল্প বলে, কিছুদিন পরে সদস্যপদ ত্যাগ করলাম।

শান্তিনিকেতনের গল্পটি আরেকবার বলি। বছরটা ১৯৩১, আমি সবে এম-এ পাস্ করে, বিশ্বভারতীতে ইংরেজির অধ্যাপক হয়ে গেছি। স্কুলে-কলেজে দুটোতেই পড়াই। একদিন সকালে উত্তরায়ণে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক সভা ডাকলেন। একতলার দক্ষিণ-দিকের বড় ঘরে সভা বসল। রবীন্দ্রনাথ আরাম চেয়ারে বসে, আমরা সকলে নিচে শতরঞ্চির ওপর।

রান্নাঘরের অধ্যক্ষার কিছু গুরুতর নালিশ ছিল। যা শুনে স্বয়ং গুরুদেব বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। তার আগের দিন বিকেলে খেলাধুলোর পর স্কুল-কলেজের ছেলেরা হাতমুখ ধুয়ে নিয়ম-মাফিক উপাসনায় বসেছিল। উপাসনার পর পড়ার ঘণ্টা পড়তে কয়েক মিনিট দেরি ছিল। সেই অবসরে সদ্য মুখে ভগবানের নাম নিয়ে, একদল দশম শ্রেণী ও ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরা রান্নাঘরে ঢুকে বামুনঠাকুরদের কোলপাঁজা করে বের করে দিয়ে, উনুনে বসানো ফুটন্ত কড়াই থেকে ৭২টা ডিম চুরি করে সবাই মিলে ভাগ করে খেয়েছিল। ফলে রাতের খাওয়ার ডিমের ডালনার বদলে আলুর ডালনা পরিবেশন হয়েছিল। এই হল সেই গুরুতর অপরাধ।

অবশ্যি কবি বুঝিয়ে বললেন, ডিম খাওয়াটা কিছু বড় অপরাধ নয়। অপরাধ হল কর্তব্যরত পরিজনের ওপর হামলা, অসংযম, অবাধ্যতা। ওর মধ্যে এই সব দোষের পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা তো কেউ অসভ্য অশিক্ষিত ছেলে নয়, অনেক দিন ধরে আমাদের বিদ্যালয়ের আদর্শে মানুষ হচ্ছে। তাহলে কেন এমন করল ?' দেখলাম তিনি সত্যিই ব্যথিত। আমার যা মনে হল তাই বললাম, 'ওদের খিদে পেয়েছিল বলে। দুপুর সাড়ে এগারোটায় ভাত খেয়েছিল, সাড়ে চারটায় ছোট এক বাটি শসা আর ফুটি, ব্যাস্ আর কিছু নয়। তারপর খেলাধুলো করেছে, রাতে খেতে দেরি আছে, খুব খিদে পেয়েছিল।' মনে আছে আমার কথায় রান্নাঘরের অধ্যক্ষা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কবি চিন্তিত ভাবে বলেছিলেন,'তাই যদি হয়, তাহলে তো সবটা ভেবে দেখতে হয়।' এর ফল কিছু আমি দেখে আসিনি। কিন্তু কিঞ্চিৎ বকাঝকা ছাড়া ছেলেদের কোনো সাজা দেওয়া হয়েছিল বলেও মনে পড়ছে না। বকাঝকাটি অবশ্য ওদের প্রাপ্য ছিল। ন্যায্য অভিযোগের অধিকার থাকলেও তো আর তাদের জোর খাটিয়ে কেড়ে খাবার অধিকার ছিল না।

আজ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে, কলকাতায়, সমস্ত দেশে দেখি ছাত্রদের আর অধ্যক্ষদের—অধ্যাপকদের মধ্যিখানে দুস্তর ব্যবধান। কেউ কারো ন্যায্য যুক্তিতে কানও দেন না। ছাত্ররাও না, গুরুরাও না। এর একমাত্র কারণ মনে হয় কল্পনা শক্তির অভাব। একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিটা মনে মনে কল্পনা করতেও অপরাগ এবং অনিচ্ছুক। যাক্গে, প্রসঙ্গক্রমে কিছু অবান্তর কথা বলে ফেললাম। তবে ঐ

কল্পনা শক্তিই এর একমাত্র ওষুধ।

এমনি করে আমার বিয়ের পর পাঁচ বছর কেটে গেছিল। মনের মধ্যে কত যে আশ্চর্য ঘটনার পুঁজি জমা হয়েছিল সে আর কি বলব। কতক চোখে দেখা, কতক শুধু কানে শোনা।

॥ ৪ ॥

আমার স্বামীর চেয়ে আমার ভাসুর প্রায় বারো বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু গল্প জমত আমার সঙ্গে। ব্রাহ্মদের ওপর উনি খুব একটা প্রসন্ন ছিলেন না। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ওঁদের কি রকম আত্মীয় হতেন। তাঁর ব্রাহ্মত্ব আমার ভাসুর বরদাস্ত করতে পারতেন না। নানা রকম সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য সরস গল্প বলে প্রমাণ করতে চাইতেন যে লোকটি পণ্ডিত হলেও অত্যন্ত হাস্যকর রকম সঙ্কীর্ণমনা। মনে মনে একটু চটতাম, তবে সন্দেহ হত সেটাই বোধ হয় ওঁর আসল উদ্দেশ্য। তাই রাগটা চেপে যেতাম। ভারি বুদ্ধিমান ছিলেন। একদিন বললেন, 'তুমি যে বল ব্রাহ্ম সমাজের কাছে বাঙালী সমাজ অনেকখানি ঋণী—স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতা, কিছু সামাজিক দুর্নীতি দূর করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে—বেশ, সবই আমি মেনে নিলাম। তা এখন সে সব চেষ্টা সফল হয়েছে তো? রামমোহন রায় যা যা চেয়েছিলেন এখনকার শিক্ষিত হিন্দু সমাজ তার প্রায় সবই মেনে নিয়েছে তো?' শুনে আমি মহা খুশি হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।' ভাসুর বললেন, 'তাহলে ব্রাহ্ম সমাজের টিকে থাকার আর কোনো দরকারই নেই বোঝা যাচ্ছে। এভাবে বাঙালী সমাজকে মিছিমিছি খণ্ডিত করে না রেখে, তুলে দেওয়া হচ্ছে না কেন?' আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম! তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হইনি। প্রত্যেক রবিবার সকালে এসে সারাদিন আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে যেতেন। কত যে সারা জীবনের দুঃখ ব্যর্থতা বিফলতার গল্প করতেন। বুঝতে পারতাম তাতে ওঁর মনটা একটু হাল্কা হত। ৬৮ বছর বয়সে, ১৯৫৫ সালে যখন মারা গেলেন, আমি একজন প্রকৃত বন্ধু হারালাম। আরেকজন অসাধারণ লোকের কথাও বলতে হয়। তাঁর নাম ছিল কেশব হাজারি। জামতাড়ার যে আবাসিক হাই স্কুল থেকে আমার স্বামী ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন, ইনি তার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক। এঁর অসাধারণ অনুপ্রেরণায় বাংলায় কত যে কৃতি-সন্তান তৈরি হয়েছিলেন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তাঁদের মধ্যে নামকরা ডাক্তার আছেন—ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী। আরো অনেকে ছিলেন, যেমন সরস্বতী প্রেসের শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় প্রমুখ। এঁরা সকলে মিলে স্থির করলেন কেশব হাজারির কাছে তাঁর হাতে তৈরি কৃতজ্ঞ ছাত্ররা যে কি গভীর ভাবে ঋণী এই সত্যটাকে রূপ দিতে হবে তাঁকে এক দিন

কলকাতায় এনে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

উৎসব অনুষ্ঠিত হল আমাদের বাড়ির বাগানে। শৈলেনবাবু বিনা খরচে সুন্দর স্মারক গ্রন্থ ছেপে দিলেন। তাতে নানান জনের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় তার কপিটি কোথায় হারিয়ে গেছে। জলযোগ হয়েছিল। সন্ধ্যা অবধি বাড়িতে একটা আনন্দের হাওয়া বইছিল। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আমি কখনো এমন শিক্ষক পাইনি যিনি আমার ব্যক্তিত্বের ওপর কোনো গভীর ছাপ রেখে গেছেন। ভালো মাস্টারমশাই, ভালো শিক্ষিকা পেয়েছি। কিন্তু গুরু পাইনি। আমার গুরু আমার দাদামশায়ের স্মৃতি আর আমার মা, বাবা, জ্যাঠামশাই ও দাদারা। এ-কথা আমি বারবার বলি। রবীন্দ্রনাথকে ও বিবেকানন্দ স্বামীকে যখন ভালো করে বুঝতে শিখলাম, তখন আমার কৈশোর কবে পার হয়ে গেছে।

কেশব হাজারি শুধু মাস্টারমশাই ছিলেন না, গুরুও ছিলেন। ছেলেদের শুধু ম্যাট্রিক পাশ করাতেন না, তাদের চরিত্রও তৈরি করে দিতেন। বলিষ্ঠ, সৎ, সৎকর্মে ব্রতী। তাঁর বিদ্যালয়টির কথা ভাবলে আশ্চর্য হই। সত্তর বছরের বেশি আগে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটার মধ্যে এক ধরনের চির-আধুনিকতা ছিল। এখন পর্যন্ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর দেশে-বিদেশে নানান বড় বড় আবাসিক বিদ্যালয় যে নিয়মে চলে, উনিও সেকালে অনেকটা সেই নিয়মেই স্কুলের পত্তন করেছিলেন। তার মধ্যে একটা স্বাবলম্বী ভাব ছিল। বিরাট অট্টালিকা ফাঁদার পয়সা ছিল না তাঁর। হয়তো অনেকটা সেই কারণেই একটা একটু বড় স্কুলবাড়িতে ক্লাস হত, কিন্তু ছেলেরা থাকত ছোট ছোট আলাদা ভাড়া বাড়িতে। একজন করে মাস্টারমশাই আর দু-একজন বড় ছেলের হেপাজতে প্রত্যেক বাড়ির আলাদা রান্নাঘর এদের যত্নে সুষ্ঠু ভাবে চলত। একেক ক্লাসের ছেলে একেকটা আলাদা বাড়িতে না থেকে, ছোট বড় ছেলেরা মিলেমিশে থাকত। বড়রা ছোটদের দেখাশুনো করতে পারত, যেমন নিজেদের পরিবারে সবাই করে থাকে। যে-সব ছেলেদের অবস্থা ভালো নয়, তাদের কাছ থেকে মাইনে নেওয়া হত না। তার বদলে তারা কিছু কিছু তদারকির কাজ করে দিত। খেলাধুলো ও শরীর গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হত। পড়াশুনোর উপর তো বটেই। কেশব হাজারি নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা দেখে আসতেন। গরম জায়গা, দুপুরে সবাই যাতে বিশ্রাম করে, শরীর খারাপ হলে যাতে তখুনি ওষুধ পায় ; এ-সব দিকে তাঁর চোখ ছিল। ঐ মস্ত প্রতিষ্ঠানকে তিনি বাপের মতো লালন করতেন। তার ফলও পেয়েছিলেন আশাতীত রকমের। অনেক সময় ভাবি মনুষ্যত্বই না থাকে যদি, তাহলে কতকগুলো দক্ষতা-বিদ্যা ইত্যাদি দিয়ে কতটুকুই বা এগোনো যায়। স্কুলটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে গেল।

আমার আরো অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আনন্দমেলা বলে কলকাতায় একটা সংস্থা ছিল। তাদের কাজই ছিল স্কুলের মেয়েদের মধ্যে খেলাধুলোর প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ও স্কুলে স্কুলে খেলার অভ্যাসকে উৎসাহ দেওয়া। সুবল মুখুজ্জে বলে একজন রোগা মানুষ ছিলেন এদের কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী। খেলাধুলো ছিল তাঁর প্রাণ। যদিও নিজে কিছু খেলোয়াড় ছিলেন না এবং সর্বদা পিছনে থেকে কাজ করতে চাইতেন, প্রাধান্য খুঁজতেন না। লোকের উপকার করতে পারলেই মহাখুশি। কার কোথায় তেল দরকার, চাল দরকার, চেঞ্জে যাবে বলে, ভাড়া বাড়ি দরকার কিম্বা সঙ্গী দরকার, বাড়ি বদল করবে বলে ট্রাক দরকার, কার ছেলেকে ফ্রি-তে হাসপাতালে বা স্কুলে ভরতি করতে হবে—সুবলকে বললেই হল। ওর বন্ধু ছিলেন নীহার মুখুজ্জে, চেহারাটি ঠিক উল্টো, অবস্থাও ভালো, কিন্তু ঐ রকম লোক-হিতৈষী। এ-সব মানুষের সঙ্গে পরিচয় হওয়াও লাভের বিষয়। বেজায় তর্কাতর্কি করত না যে তা-ও নয়, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক ছিল।

ঐ আনন্দমেলায় বহু মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, যাদের সঙ্গে দেখাশুনো হবার খুব কম সম্ভাবনা ছিল। সকলের ঐ এক চিন্তা। কি করে আমাদের মেয়েদের শক্ত-পোক্ত করে তোলা যায়। খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা যে একেবারেই হত না, তা-ও নয়। সেটা ছিল ব্রিটিশ রাজের যুগ। শিক্ষা বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা অনেকেই ছিলেন ইংরেজ। তাঁরাও সহযোগিতা করতেন, কিন্তু তাঁদের উৎসাহের মূল কোথায় সে বিষয়ে আমার খুবই সন্দেহ ছিল। অথচ তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কলকাতার বড় বড় মেয়েদের স্কুলের সহযোগিতা পাবার সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষ করে মিশনারি স্কুলগুলোর আর শিক্ষাবিভাগের অধীনের ফিরিঙ্গি স্কুলের। আনন্দমেলার পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য পদে কবে যে বসলাম তা-ও মনে নেই। ঐ সব মিটিং-এ শিক্ষা-বিভাগের আর শরীর-চর্চা বিভাগের মেম পরিচালিকার পৃষ্ঠপোষকসুলভ কৃপাদৃষ্টির কথা মনে করলে এখনো রাগ হয়। সে যাই হোক, তাঁদের দয়ায় মেয়েদের খেলাধুলোর আন্দোলন ক্রমে জোর পেতে লাগল, একথা সত্যি। শেষে কলকাতার প্রায় সব দেশী-বিলিতী স্কুলই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে লাগল। এবং সত্যি কথাই বলব, ফিরিঙ্গি মেয়েদের সঙ্গে কোনো দিক্ দিয়েই আমাদের মেয়েরা পারত না। দু-চারজন জবরদস্ত মেয়ে হয়তো কায়ক্লেশে তৃতীয় পুরস্কার পেয়ে যেত। তার বেশি নয়। শরীর চর্চার দিক দিয়ে বাঙালী মেয়েদের আজকের কুশলতার কাহিনী কিন্তু প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার ঐ সব ছোটখাটো প্রয়াস থেকেই শুরু। শুনে লোকের হাসি পাবে আনন্দমেলার সভাপতি ছিলেন একজন ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ। তাঁর নাম ছিল ব্রুস পীক। কলকাতার কোনো বড় বিলিতী

কোম্পানিতে ভালো কাজ করতেন। মনে হয় তখন তাঁর ষাটের ওপর বয়স। বাপের আমল থেকে এ দেশে বাস করলেও তিনি ছিলেন খাঁটি ইংরেজ। এবং সেই রকম জোরালো আর ন্যায়-পরায়ণ। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ফিরিঙ্গি। এক কালে নার্সিং করতেন যতদূর মনে হয়। তাঁর মতামতগুলোকে অতটা উদার মনে হত না। মেয়েদের খেলাধুলোর প্রগতির জন্য পীক-সাহেবের কাছেও ঋণ স্বীকার করতে হয়। মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের অন্ধতার বিরুদ্ধে তাঁকে জোর গলায় প্রতিবাদ করতেও শুনেছি। তিনি এখন নেই। তাঁর স্ত্রীও আছেন কি না জানি না। ছেলেরা অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। আমাদের দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একটা কায়েমী ফিরিঙ্গি সমাজের ভিত নড়ে গেছিল। সরকারের স্নেহদৃষ্টি ছাড়া তাদের এখানকার পরিবেশে বাস করা অসম্ভব হল। এখন আমরা যাঁদের ফিরিঙ্গি বলি, তাঁদের অধিকাংশই দেশী খ্রীশ্চান সমাজের সঙ্গে অনেকখানি মিশে গেছেন।

আনন্দমেলার প্রচেষ্টা যদি কলকাতার বড় বড় বাঙালী স্কুলের পরিচালকদের সমর্থন না পেত, তাহলে এত অল্প সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কড়ি পাওয়া আমাদের মেয়েদের সম্ভব হত না। মহিলাদের বহু সমাজসেবার প্রতিষ্ঠান যোগ দেওয়াতে ব্যাপারটা যোগ্য মর্যাদা পেয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে সব দিক দিয়ে উন্নতিও দেখা গেল। সেজন্য সরিষার রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী গণেশানন্দকে মনে করতে হয়। তিনি দেখলেন প্রতি বছর বাঙালী মেয়েরা প্রতিযোগিতায় ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে পারে না, অথচ বলিষ্ঠতায়, উৎসাহে, কর্মকুশলতায় কেউ কম যায় না। এর একমাত্র কারণ হল আমাদের মেয়েদের শৈশব পেরুতে না পেরুতেই শাড়ি-পরিয়ে মাঠে নামানো হয়। খাটো করে কাপড় পরে কোমরে আঁচল জড়িয়েও, হাঁটুর ওপরে স্পোর্টস্‌স্কার্ট, কি শট্‌ পরা মেয়েদের সঙ্গে তারা পারবে কেন?

অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষিকাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে গণেশানন্দ তাঁর স্কুলের মেয়েদের ছেলেদের মতো শার্ট আর হাফ্‌-প্যান্ট পরিয়ে ট্র্যাকে নামিয়ে দিলেন। মনে আছে সে বছর ঐ মেয়েরা অনেকগুলো প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করল! তার পরের বছর আর দেখতে হল না। সব বাঙালী স্কুলের মেয়েরা হাফ্‌ প্যান্ট পরে মাঠে এল এবং তাদের জয়-জয়কার!

অনেক সময় আমাদের ফুল গাছে ঘেরা ঘাসজমিতে আনন্দমেলার কর্মীরা মিটিং করতেন। তাঁদের একটা নীল-সাদা এনামেল করা বিশাল কেৎলি আমাদের ভাঁড়ার ঘরের তাকে ঠাঁই পেল। তাতে ৩২ পেয়ালা চা ধরত। অন্য সময় ৩২টা পেয়ালা তার মধ্যে ভরে রাখা হত। ৩২টা প্লেটে জলখাবার দেওয়া হত। খুব ভালো জলখাবার হত, খুব সস্তা দরে। ভালো দার্জিলিং চা কেনা হত

$১\frac{১}{২}$ টাকা পাউণ্ডে। কন্‌ডেন্সড্ মিল্ক বোধহয় সাত আনা টিন। চিনিও বোধহয় চার পাঁচ আনা সের!

নীহার মুখুজ্জের কাছে সামগ্রিক চা-তৈরি শিখলাম। আমাদের বড় ডেকচিতে জল ফুটিয়ে কেৎলিতে ঢালা হত। তাতে কন্‌ডেন্সড্ মিল্কের দুটো টিনের মুখ কেটে দুধ ঢালা হত। চিনি কম লাগত, মাপটা ভুলে গেছি। ন্যাকড়ায় বেঁধে এক পেয়ালা চা-পাতা দিয়ে ঢাকা চাপা দিয়ে রাখা হত। মিনিট ৫-৭ বাদে, চায়ের পুঁটলিটা তুলে ফেলতাম। ব্যস্, অতি উপাদেয় চা রেডি! যেদিন বেশি লোক হত, সেদিন ঐ নিয়মেই আরেকবার চা হত। তার আস্বাদ এখনো আমার মধুর স্মৃতিগুলোর সঙ্গে মুখে লেগে রয়েছে।

ঐ ঘাসজমিটুকুতে কত আনন্দের ব্যাপার ঘটেছিল তার ঠিক নেই। ঐখানে ছেলেমেয়ের জন্মদিন করা হয়েছে। জায়গা সাজাবার দরকারই ছিল না। ফুলের গাছে ফলের গাছে ঝলমল করত। ঘাসের ওপর আনন্দমেলার মস্ত শতরঞ্চি পেতে দিলেই হল। ঘরে লুচি আলুরদম চাটনি হত। ন্যাশনাল হোটেল বলে উত্তর কলকাতায় একটা পরীদের যোগ্য হোটেল ছিল, তাদের কাছ থেকে বিশাল বিশাল চপ কেনা হত। দ্বারিকের দোকান থেকে মিষ্টি আসত। ক্ষীরের বরফি, গুজিয়া। মনে হয় যেন সেদিনের কথা। দোতলা থেকে উষা মাসিমা ডেকে আমার মেয়ে কমলিকে বলতেন,—'কে আমার বাগান আলো করে বসে আছে?' আর কমলি খিলখিল করে হাসত, সে এখনো শুনতে পাই।

আমরা ঐ বাড়িতে থাকতেই রথীন্দ্রনাথের মেয়ে পুপের বিয়ে হল। কমলির প্রায় দু বছর বয়স, আমার শরীর আবার আগের মতো সুস্থ হয়েছে। গেলাম চলে শান্তিনিকেতনে নিশ্চিন্ত মনে। আমি জানতাম আয়াতে আর আমার ননদেতে চমৎকার চালিয়ে নেবেন। বিয়ের দিন সকালের গাড়িতে হাজার হাজার বিয়েবাড়ি-যাত্রীদের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম। কোন সময় মনে নেই, তবে চমৎকার দিন ছিল মনে আছে। তখনো বোলপুরে রিক্‌শর চল হয়নি। অনেকে গান গাইতে গাইতে হেঁটেই রওনা দিল। আমাদের বন্ধু অনিল চন্দ মহিলাদের কয়েকজনকে বিশ্বভারতীর গাড়িতে চাপিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলল। সেখানে সাহেদ সুরাওয়ার্দি, অনিলের দাদা অপূর্বকুমার চন্দ, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি মিলে চাঁদের হাট বসিয়েছিল। অনিল-রানীর মতো অতিথিপরায়ণ মানুষ আর দেখলাম না।

সকাল থেকেই বিয়ের উৎসব লেগে গেছিল। আমি নিজের হাতে নক্সা তুলে সামান্য একটা সুতির জামার কাপড় নিয়ে গেছিলাম। সেটিও দেখলাম যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আশ্রমের চেহারা বদলে গেছে। অতিথি আপ্যায়নের ঢালাও ব্যবস্থা। আশ্রমের রান্নাঘরে কুলোবে কেন? এখানে ওখানে বড় বড় তাঁবু

পড়েছে। তার নিচে শালপাতার পাতে সারি সারি বসে পদ-মান-নির্বিশেষে সবাই খাওয়াদাওয়া করছে। কি যে ভালো লেগেছিল সে আমি ভাষায় বোঝাতে পারব না।

সন্ধ্যায় উদয়ন বাড়ির পূবের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ নাতনির বিয়ে দিলেন। বর হল সিন্ধী, অতি ধনী পরিবারের ছেলে। বিয়ে কি মতে হল সে আমি বলতে পারব না। তবে যজ্ঞ হল। যজ্ঞের আগুনে কবির মুখের অপার্থিব সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। মানুষ এত সুন্দরও হয়!

দূর-দূরান্তের গ্রাম-গঞ্জ থেকেও অতিথি এসেছিলেন। সাদা-সিধে বেশবাস, মুখে বেশি কথা নেই। মনে আছে চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার মধ্যে 'গোরা' ছবিটি দেখেছিলাম। আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু গ্রামের লোকরা হাঁ করে বাইস্কোপ দেখেছিল। তাদের যে কত ভালো লাগছিল সে আর বলে দিতে হবে না।

বিয়ের পরদিন বিকেলের গাড়িতে বাড়ি ফিরে গেলাম। শুনেছি অপূর্ব চন্দ উৎসবের অনেক দৃশ্যের ছবি তাঁর সচল ক্যামেরায় তুলে রেখেছিলেন। সেগুলি এখনো রবীন্দ্র-ভবনে রাখা আছে। কেউ কেউ দেখে এসেছে। আমি দেখিনি। ও-সব ছবি আমার মনের পটেও সচল হয়ে রয়েছে। সেকালের জমিদারি আতিথেয়তার সুন্দর একখানি ছবি। যার মধ্যমণি বর-কন্যা নয়, তাদের মা-বাবাও নয়, প্রায় আশী বছরের পিতামহ। অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছেন, কানে কম শোনেন, চোখে কম দেখেন কিন্তু মনের দীপ্তিতে ধ্রুবতারার মতো জ্বলেন।

মনে আছে ফিরবার সময় বিকেলের ট্রেনে শরীরের ক্লান্তির জন্য আচ্ছন্নের মতো একই ভাবে সারা রাস্তা বসে ছিলাম। চার ঘন্টা কেটেছিল চার মিনিটের মতো। কেবলি মনে হচ্ছিল এইখানে একটা যুগের অবসান হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় তাই হচ্ছিলও, লোকে লক্ষ করেনি। এর অল্প দিন পরেই আমরা জিনিসপত্র বাক্সবন্দী করে, নীহার মুখুজ্জের ট্রাকে তারি তদারকিতে চার নং রায় স্ট্রীট ছেড়ে হাজরা রোডের দক্ষিণ মাথায় একটা রোদ-হাওয়া ভরা দোতলার ফ্ল্যাটে উঠে এলাম। এর আগে পর্যন্ত কোনো বাড়ি ছেড়ে আসতে আমার এত কষ্ট হয়নি। ভাবি, বাড়ি আবার কি? যেখানে প্রিয়জন নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করা যায়, সেটাই বাড়ি। তার অসুবিধাগুলো যতটা পারা যায় শুধরিয়ে নিতে হয়। তাহলেই হল। তাছাড়া পরের ছেলেকে ভালোবাসার যেমন অনেক দুঃখ, তেমনি পরের বাড়িকে ভালোবাসারও দুঃখ আছে। তবে কোনো জিনিস অধিকার করতে চাওয়াটার মধ্যেই দুঃখ, ভালোবাসায় দুঃখ নেই। ভালোবাসার জিনিস চিরকালের মতো চলে গেলেও, মনের গভীরে দেখি ভালোবাসাটুকুকে রেখে গেছে, চিরকালের পাথেয় করে।

শেষ পর্যন্ত প্রায় চার বছর পরে বাড়িটাকে যে ছাড়তে হয়েছিল তার একমাত্র কারণ বাড়িটি ভাগের মা, গঙ্গা পেত না। ক্রমে তার জীর্ণ দশা বাড়তে লাগল। অসমান মেঝেতে ফাটল ধরল, দেয়ালের নিচে থেকে একটা ভিজে ভাব উঠে, ওপর থেকে নেমে আসা আরেকটা ভিজে ভাবের সঙ্গে মিলে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। সব ঘরে একটা ব্যাঙের ছাতা প্যাটার্ণের গন্ধ পাওয়া যেত। নিভৃত আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতা গজাত পর্যন্ত। দেয়ালে ঝোলানো একটা তালগাছের অপূর্ব ছবিতে ছ্যাৎলা পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে আমার যে কি দুঃখ হয়েছিল সে আর কি বলব! ঐ ছবি আমাদের বিয়েতে শিল্পী নিশিকান্ত রায়চৌধুরী দিয়েছিল। জলরঙা ছবি। শান্তিনিকেতনের দৃশ্য। শুকনো লাল মাটিতে পাঁচ-ছয়টি ঘন সবুজ তালগাছ যেন তাদের বলিষ্ঠতার জয়গান গাইছে। নিশিকান্তর চেহারাটি যেমনি অসুন্দর ছিল, শিল্পীমনটি ছিল তেমনি অপূর্ব। গান রচনা করতে, সুর দিতে, কবিতা লিখতে আর ছবি আঁকতে অমন আর কাউকে দেখলাম না। শেষ জীবনটা পণ্ডিচেরীতে কেটেছিল। আমার সমবয়সী, খেতে ভালোবাসত, ভারি রসিক, সব রকম আমোদ প্রমোদে উৎসাহী, নাচে গানে নাটকে। রাঁধত, টোমাটো সস্ বানাত, বিলি করত। শান্তিনিকেতনে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, মনে হয়েছিল ফূর্তির প্রতিমূর্তি। কিন্তু ক্রমে যখন ওর সঙ্গে চেনাজানা হল, তখন মনে হত ওর মনের মধ্যে দুঃখের ঝরণাও আছে, হাসি দিয়ে চাপা দেওয়া। এ-সব কথা কৃত্রিম শোনালেও, ওর বেলায় সত্যি। সাধক-ও ছিল নিশ্চয়, তাই পণ্ডিচেরিতে একটুখানি জায়গা পেয়েছিল। সেখানে অসীম প্রতিভা নিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে অকালে মরেও গেল। ওর কথা খুব বেশি লোক জানতেও পারল না। দিলীপ ওকে ভালবাসতেন। আমাকে মাঝে মাঝে বলতেন 'ওর শরীর ভালো না, আদর-যত্ন দরকার। তোমার কাছে এনে মাস দুই রাখলে পার।' পারিনি রাখতে। তখন আমার নিজেরি শরীর ভালো না।

এর অনেক বছর পরে, ১৯৪৯ সালে আমার ছেলে ম্যাট্রিক দিল। তারপর ওকে নিয়ে দক্ষিণ ভারত ঘুরে এলাম। সব দেখে ফেরার পথে পণ্ডিচেরিতে দিলীপের বাড়িতে সাত দিন কাটিয়েছিলাম। তখন নিশিকান্তকে আবার দেখলাম। মোটাসোটা শরীর আধখানা হয়ে গেছে, কেমন যেন চাপা হয়ে গেছে, আগেকার সেই উচ্ছল মানুষটিকে খুঁজে পেলাম না। কিন্তু চোখের দীপ্তি অম্লান। আমার জন্য ওর ছবির প্রদর্শনী করল। আমি ওর ছবি ভালবাসতাম বলে। হেসে বলল, 'এ-সব আমি আশ্রমকে দিয়ে দিয়েছি, তাই তোকে কিছু দিতে পারলাম না।' ও সমবয়সী সবাইকে তুই-তোকারি করত। আর দেখিনি নিশিকান্তকে। তার কথা মনের মধ্যে জমা করে রেখেছি। ঐসব ছবিগুলোতে একটুও সবুজের ছোঁয়া ছিল না। সব ধূসর, গেরুয়া, ছাই, অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু

এ-জগতের নয়। তারপর এক দিন সত্যি সত্যি অন্য বাড়িতে সংসার পাতলাম। চেনা আসবাবগুলোকে অচেনা ঘরে সাজালাম। পুরনো পরদা অন্য দরজায় ঝুলোলাম। প্রিয় ছবি নতুন রং করা দেয়ালে শোভা পেতে লাগল।

আমার লেখার কি হল? কি আবার হবে? যখনি কিছু মনে হত, তখনি লিখে ফেলতাম না। মনের মধ্যে জমা করে রাখতাম। কোনো সম্পাদক না চাইলে আজ অবধি কাউকে লেখা দিইনি। প্রকাশকরা আগ্রহ দেখালে তবে বই দিই। আছে এরো ব্যতিক্রম, যেমন আমাদের নিজেদের সন্দেশ এবং দু-একজন প্রিয় প্রকাশক। কারণটা অহংকার নয়, বরং তার উল্টোটি। গোড়ায় ছিল বোধ হয় একটু আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। আমার প্রাণের জিনিসটি যদি 'হয়নি' বলে ফিরিয়ে দেয়! লেখকরা বড়ই স্পর্শকাতর হয়। আমিও তাই ছিলাম। পরে ওটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল।

আরেকটা কারণও ছিল। বেশি লেখা হয়ে উঠত না। আমার মতো মেয়েরা নানা রকম সাংসারিক দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ে। সেগুলোর অযত্ন করলে বিবেকও দংশন করে, আবার বাড়ির কেউ-ও খুশি হয় না। খানিকটা দায়মুক্ত না হলে মেয়েদের পক্ষে কোনো সৃজনশীল কাজ করার পথে অনেক বাধা। বহু সম্ভাব্য প্রতিভাকে নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছি। সব চাইতে দুঃখের কথা হল যাঁরা—মেয়েদের মধ্যে এত কম প্রতিভা দেখা যায়, কেন?—ইত্যাদি বলে আত্মতৃপ্ত আক্ষেপ করেন—তাঁদের সংসারের গিন্নিরাই যদি রান্নাঘরের যথেষ্ট তদারকি না করে ছবি আঁকতে, কি কবিতা লিখতে বসে তাহলে উক্ত মন্তব্যকারীরাই সবচেয়ে বেশি চটেন। এ-সব মেয়েলী দুঃখের কথা কাকে জানাই। তার ওপর আবার রান্নাঘরকে এবং ছেলেমেয়েদের আদর যত্নকে আমি সর্বদা গুরুত্ব দিই। আমার স্বামীর মন উদার এবং যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হলেও, ঘরের অযত্ন করে নিজের লেখার যত্ন কোনোদিনই করতে পারিনি। বিবেক দেয়নি।

এই জন্যেই সাধারণত মেয়েদের প্রতিভার পূর্ণ স্ফূরণ হয় একটু দেরিতে। ছেলেমেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় হলে পর। সেই সঙ্গে স্বামীর অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হলে তো কথাই নেই। আজকালকার সাহসী মেয়েরা সংসারের অকুলানো মেটাচ্ছে নিজেরা চাকরি করে। সেই একই মন্তব্যও শুনতে হচ্ছে। সংসারের খানিকটা সুবিধা হলেও, ছেলেমেয়ের অযত্ন হচ্ছে। হচ্ছে বৈ কি। এবং যতদিন না সংসার ব্যবস্থা বদলাবে, তাই হবেও। তবু বলি, নিন্দার ভাগী হয়ে বাণীদেবীর সাধনা করছে এমন মেয়ে এখনো বিরল। সংসারটা বাস্তবিক একটু ইয়ে!

মোট কথা আমার সমবয়সী পুরুষরা ১৯৪০ সালের মধ্যে বেশ নাম করে ফেলেছিলেন আর আমার ঐ একটি বিফল প্রকাশন। বিফলই বা বলি কি করে?

এখনো বুঝতে পারি না ঐ সামগ্রী দিয়েই (তারি সঙ্গে একই মানের আরো কিছু জুড়ে দিয়ে) আট বছর পরে যখন সিগনেট্ প্রেস্ 'দিন-দুপুরে' ছেপে বের করলেন, তখন সকলে কেন তাকে বলল সার্থক বই হয়েছে ! ঐ একটি বই দিয়েই চিরকালের মতো বাংলা সাহিত্যের বিপদ্‌সঙ্কুল পাথুরে পথে সেই যে একটুখানি দাঁড়াবার জায়গা পেয়ে গেলাম, তার থেকে আর নামিনি।

ভাবি কি দিয়ে বই হয় ? দিন দুপুরের ছবি এঁকেছিল আমার গুণী ভাইপো সত্যজিৎ। তখনো সে নিতান্ত ছেলেমানুষ। চেহারা দিয়েছিল অতুলনীয় প্রকাশক দিলীপ গুপ্ত। বিক্রি করেছিল সিগ্‌নেট প্রেস্ প্রকাশনালয়। তবে কি বই তৈরির ব্যাপারে পাঠ্যাংশ রচনার চেয়ে বাইরের এই সব জিনিসের গুরুত্ব বেশি ? এখন পর্যন্ত ভাবলে মনে মনে ব্যথিত হয়ে উঠি।

অনেকের কাছে হয়তো এ-সব অবান্তর কথা, কিন্তু আমার কাছে নয়। সারা জীবনে ঐ একটি সাধনাই করেছি, বই-পড়া, বই-লেখা, বিশেষ করে ছোটদের বই লেখা, ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনা করা, কি করলে ছোটদের বই পত্রিকা আরো ভালো হয়, কি করলে ছোটরা স্কুলপাঠ্যের বাইরে এ-সব বই থেকে সব চেয়ে বেশি আনন্দ ও শিক্ষা পায়—এই সব চিন্তা ছাড়া, বলতে গেলে কাজের কাজ কিছু করিনি। আর সব চিন্তা আমার কাছে গৌণ হয়ে গেছে। কিন্তু জীবনের ৩২-৩৩ বছর কেটে গেছিল নিজেকে তৈরি করতেই, নিজেকে জানতেই।

আগেও বলেছি বাংলায় আমি কাঁচা ছিলাম। বানান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তা ছিল, ব্যাকরণের দুর্বলতাহেতু। বুদ্ধদেব একবার বিরক্ত হয়ে কটু মন্তব্য করেছিল। সেই ইস্তক পড়ার টেবিলে, কি ডেস্কের মাথায় সারি সারি ইংরিজি বাংলা অভিধান রাখি। খট্‌কা লাগলেই দেখে নিই। আজ পর্যন্ত। ইতিমধ্যে (এই শব্দটা আমি এবং আরো হাজার হাজার লেখক নিত্যি ব্যবহার করলেও ব্যাকরণের সমর্থন নেই, এ-কথা কোনো পণ্ডিত আমাকে বলেছিলেন। আসলে ইতোমধ্যে হবে। তবে পছন্দ-অপছন্দ বলেও তো একটা জিনিস আছে !) সে যাই হোক—আমরা কায়েমী হয়ে হাজরা রোডের ফ্ল্যাটে বসেছি।

নিচের তলায় শিল্পী অতুল বসুর শ্বশুর-শাশুড়ি থাকেন। শ্বশুর মশাইটিকে সবাই যোত্‌দা বলে ডাকে। ভারি সুরসিক। শান্তিনিকেতনে থাকাকালে চারু দত্তের অশেষ স্নেহ পেয়েছিলাম। তিনি অপূর্ব চন্দর শ্বশুর, স্বদেশী আন্দোলনে সহানুভূতির কারণে আই-সি-এস থেকে অবসর নিতে হয়েছিল—এই রকম কানাঘুষো শুনেছিলাম। সুরসিক, সুসাহিত্যিক, চিন্তাশীল আর অসম্ভব আমুদে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে এসে অবধি তাঁর জন্য অনেক সময় মন কেমন করত। অবিশ্যি ততদিনে তিনিও চলে এসেছিলেন এবং তাঁর কলকাতার বাড়ি আমাদের এই নতুন পাড়াতেই। তিনি আবার যোত্‌দার পুরনো বন্ধু। যোত্‌দার ভালো নাম

বোধ হয় যতীন বসু কি ঐ রকম কিছু। হপ্তায় দু-তিন দিন চারুবাবু যোত্‌দার বাড়িতে সকালের দিকে গল্প করতে আসতেন, আমার ছেলে রঞ্জন এসে খবর দিল। সে-ও যোত্‌দার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠেছিল। চারুবাবুকে ফিরে পেয়ে কি যে আনন্দ হয়েছিল বলতে পারি না।

তাঁদের কথা শুনে বুদ্ধদেব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। তাহলে তো ওঁদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চেনা-জানা লেখকদের একদিন ডাকা উচিত। একদিন মানে একটা রবিবার বিকেলে। বুদ্ধদেব লোক ডাকার সব ভার নিল। আমাকে কিছুই করতে হল না। খাওয়া দাওয়ার কথা বলতে সে বলল, 'স্রেফ চা আর পান। ব্যস আর কিছু নয়। সবাই গল্প শুনতে আসবে, খেতে নয়।' তখনো আমি মনের সরলতা হারাইনি। সেই ব্যবস্থাই হল। আমাদের বসবার ঘরে যোত্‌দার সুন্দর মস্ত গালচে পাতা হল। অতিথিরা সবাই এল। ঘর আলো হয়ে গেল। অনেক রসের গল্প-ও হল। তবু একশো বার বলব ঐ আমার বাড়িতে প্রথম সাহিত্যিক সম্মেলন একটা 'মিজারেব্‌ল ফেলিওর' হল। তার একমাত্র কারণ ভালো জলখাবারের কোনো আয়োজন করিনি। একে-একে যখন অতিথিরা উঠে যাবার উপক্রম করছে, আমাদের প্রধান অতিথিদের একজন, অর্থাৎ যোত্‌দা উঠে গিয়ে পাঁচ মিনিট বাদে পায়ে ঘুঙুর পরে, হাতে একতারা নিয়ে ফিরে এলেন। যোত্‌দার বেয়ারা বাঁয়া-তবলা এনে হাজির করল। যোত্‌দা বাঈজী নাচ থেকে শুরু করে কি যে না দেখালেন, তার ঠিক নেই। প্রায় ন-টা পর্যন্ত কেউ উঠবার নাম করেনি। কবে চলে গেছেন যোত্‌দা, চারুবাবু, বুদ্ধদেব নিজেও নিতান্ত অকালে—কিন্তু ঐ সন্ধ্যাটি আমার মনে অক্ষয় অমর হয়ে আছে। চিরকালের আনন্দের সামগ্রী!

ও-বাড়ির সব স্মৃতি সমান মধুর নয়। ১৯৪১ সালের বর্ষাকাল। কিছু দিন থেকেই সবাই বলছে, কাগজেও দেখছি, রবীন্দ্রনাথ বড়ই অসুস্থ। কলকাতায় আসছেন অপারেশন করাতে। সব কাজ-কর্মের মধ্যে বারেবারে শান্তিনিকেতনের এক বছরের স্মৃতি ফিরে ফিরে আসছিল। আসলে মনটা তৈরি হয়েই ছিল। ছোট ছোট টুকরো স্মৃতি। কোথায় একদিন বসে ছিলেন, কাছে গেলে হেসে মুখ তুলে চেয়েছিলেন। কোন দিন উত্তরায়ণের বারান্দায় ছেলেমেয়েদের শেলির স্কাইলার্ক পড়িয়েছিলেন। উত্তরায়ণের আমবাগানে আম গাছের তলায় কবে চা খাওয়া হয়েছিল। কবে নাটকের মহড়া দিতে দিতে কোন কথা বলেছিলেন। তখন কোনো গুরুত্ব দিইনি, অন্য লোককে বলা ঐ সব কথাকে, আজ তারা অমূল্য হয়ে বারবার আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে লাগল।

আমার স্বামীকে সেদিন বাটানগর হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। এমন সময় জোড়াসাঁকো থেকে কে যেন ফোন্ করল, 'কবিকে যদি দেখতে চান এখনি

আসুন।' যাই কি করে ? গাড়ি তো বাটানগরে। ভাবলাম বিকেলে না হয় যাব। তাছাড়া এখন রোগক্লিষ্ট চেহারা দেখে কি হবে ? তাঁর অপরূপ রূপ তো আমার মানসপটেই আঁকা আছে। ভাবলাম যাব না। আরো কিছু পরে আমার বালবন্ধু পূর্ণিমা (যে আমার সঙ্গে ঐ এক বছর শান্তিনিকেতনেও ছিল, সুরেন ঠাকুরের পুত্রবধূ) সে ফোন করল, 'একবার এসে দেখে যা কি সুন্দর।' অমনি মনে হল আর না গিয়ে উপায় নেই! যোত্‌দার বাড়িতে গিয়ে যোত্‌দার স্ত্রী উমামাসিমাকে বললাম, 'গাড়ি কোথায় পাব ?' তখনি উঠে পড়ে বললেন, 'সরলাদিদির গাড়ি আছে, ড্রাইভার ওঁর বাড়িতে থাকে। সে গাড়ি পাওয়া যেতে পারে। চল আমার সঙ্গে।'

সরলাদিদি হলেন সরলা মিত্র, শিক্ষা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে অবসর নিয়েছেন। উমামাসিমার মাসতুতো বোন। বাল বিধবা। খ্রীশ্চান হয়েছিলেন। বিলিতী ডিগ্রি ছিল। শিক্ষিত মেয়েরা চাকরিবাকরি না করলে শিক্ষার অপচয় হয়, এ-কথা তাঁকে বলতে শুনেছিলাম। আমাকে বকতেন। বলতেন 'তোমার মতো যারা লেখাপড়া শিখে কাজকর্ম করে না, তাদের আমি স্বামীদের 'কেপ্‌ট্‌ উওম্যান' বলি! তবু আজ এক কথাতেই রাজি। খালি বললেন, 'কিন্তু তাহলে উমাকে আর আমাকেও নিয়ে যেতে হবে।'

তাই নিয়ে গেলাম। বললাম, আমি নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু সেখানে নিশ্চয় এতক্ষণে হুলস্থূল ব্যাপার আরম্ভ হয়ে গেছে। কাকে ভেতরে যেতে দেবে কাকে দেবে না কে জানে। ওঁরা তাতেই রাজি। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন বেলা বেড়ে গেছে। খবরটা চারদিকে ছড়ায়নি, ভিড় তখনো জমেনি। খালি আত্মীয়স্বজন ভক্ত বন্ধুরা আমাদেরি মতো ছুটে গেছেন, যদি একবার শেষ দেখা দেখতে পান।

মহর্ষি ভবনের যে ঘর আজ তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে সেখানে তিনি শুয়ে ছিলেন। ঘরের দু-দিকের দরজা বন্ধ। সামনের দিকের বারান্দায় কয়েকজন চেনাজানা লোক ছিলেন। কে যেন আমাদের তার পাশের ঘরে বসালেন। সে ঘরের আসবাব বের করে নেওয়া হয়েছিল। ঘর জোড়া শতরঞ্চি পাতা। তার ওপর হয়তো ৫০-৬০ জন মহিলা বসে। সকলের শোকার্ত মুখ, চেনা প্রায় সবাই। শান্তিনিকেতনের আর কলকাতার আত্মীয় বন্ধু। তাঁদের মধ্যে সুন্দরী রাণু মুখোপাধ্যায়কেও দেখলাম। চোখের নিচে গভীর কালি। কবি তাঁকে কত ভালবাসতেন। কারো মুখে কথা নেই।

সরলাদিদি আর উমামাসিমা চুপ করে বসে রইলেন। এরই মধ্যে কে যেন আমাকে ডেকে নিয়ে গেল, 'যদি শেষ দেখা দেখতে চাও তো এসো।' ভিতর দিকের বারান্দা দিয়ে পাশের ঘরে গেলাম। ঘরের মধ্যিখানে লম্বা নিচু একটা

খাটে রবীন্দ্রনাথ শুয়ে। চোখ বোঁজা, মুখে গভীর শান্তি, বেদনার কোনো চিহ্ন নেই, প্রাণেরও কোনো সাড়া নেই, শ্বেত-পাথরে খোদাই করা মূর্তি যেন। খালি বুকটা উঠছে পড়ছে। পাশে নিচু টুলে বসা ডাক্তারের এক হাতে অক্সিজেনের টিউব, অন্য হাত তাঁর নাড়ির ওপর।

আমি পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুখের দিকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলাম, কি সুন্দর, কি শান্ত। হঠাৎ ডাক্তার অক্সিজেনের নল নামিয়ে রেখে, নাড়ি থেকে হাত তুলে, দু-হাতে নিজের মুখ ঢাকলেন। চেয়ে দেখি বুকটা আর উঠছে-পড়ছে না। তিনি চলে গেছেন।

কেউ ঘরের দু দিকের দরজাগুলো খুলে দিল। আমি তখুনি এ-ঘরে চলে এসে উমামাসিমাকে বললাম, 'তিনি নেই। ভিড় হবার আগে দরজা দিয়ে একবার মুখখানি দেখে আসুন। এর পর গাড়ি চলাচল কষ্টকর হবে।' তাঁরা উঠে পড়লেন। তার অল্প পরেই আমরা নিচে নেমে দেখি ভেতরে যাবার লোহার গ্রিল্ টেনে দেওয়া হচ্ছে, নইলে ভিড় ঠেকানো যাবে না। নিঃশব্দে চলে এসেছিলাম। তারপর কৌতূহলী জনতা যে বেদনাময় ভূমিকা নিয়েছিল, তার কিছুই দেখতে হয়নি বলে আমি কৃতজ্ঞ।

এমনি করে একটা যুগের অবসান হয়েছিল। এবার যাঁরা দেশের চিন্তার হাল ধরলেন, তাঁরা প্রায় সবাই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার উত্তরাধিকারী, তাই যুগপরিবর্তনটা এত স্বাভাবিক ও সহজভাবে হয়েছিল যে বোঝাই যায়নি।

॥ ৫ ॥

এখন কথা হল স্মৃতিকথা লিখতে গেলে লেখক কি লিখবেন আর কি বাদ দেবেন। তাঁর কাছে যে সব তথ্যের গুরুত্ব আছে; বাইরের লোকে তার কি বুঝবে? তিনি যা দেখছেন, যা শুনছেন, যা পড়ছেন, যা ভাবছেন, তাই দিয়ে তাঁর মন তৈরি হচ্ছে। সেই মনের চোখ দিয়ে তিনি জীবন দেখছেন। ছোট ছোট সত্যি ঘটনা, নগণ্য সব সত্যিকার মানুষ, ভুলে-যাওয়া খুদে ঘটনা—এইসব দিয়ে তাঁর মনের পটভূমিকা তৈরি হচ্ছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জীবন দেখছেন; সেই দেখাটুকু দিয়েই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সেই দেখাটা হতে হবে সৎ, সততাপূর্ণ, উদার, ক্ষমাশীল। আর কোন নিয়ম মানতে চান না লেখক। কেবল ঐ জিনিসই তাঁর মনের ওপর রেখাপাত করে, অন্য সব কৃত্রিম সাফল্য ধুয়ে মুছে লুপ্ত হয়ে যায়। লেখক যেটাকে সত্যি বলে দেখছেন, সেটাই তাঁর কাছে সত্যি হয়ে উঠছে। জাত লেখকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হন না। কলমের আগায় যে কথা ঝরে পড়ে তার উৎস হল মনের গহনে। কোনো অদৃশ্য অন্তবাসী পুরুষের ছাড়পত্র পেয়ে, তবে সে লেখা বেরোয়। তবু ভুল হয়, ব্যতিক্রম হয়, কারণ

স্মৃতির আধার হল ভ্রান্তিশীল মস্তিষ্ক। আর যাঁরা হৃদয়ের তাগিদে না লিখে, অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে কৃত্রিম ভাবনা লেখেন, তাঁরা জাত লেখক নন। নিজের পক্ষে এইটুকুই আমার বলা দরকার। যদি কারো মনে আঘাত দিয়ে থাকি, সে আমার ইচ্ছাকৃত নয়। যেমন যেমন মনে পড়েছে, তেমনি লিখে গেছি। সব জায়গায় হয়তো মাত্রা ঠিক থাকেনি।

সে যাই হক, ১৯৪১সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সকলের অলক্ষে একটা মহান্ যুগ শেষ হয়ে গেছিল। তার পরেই যে অত বড় একটা যুদ্ধ বাধবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মাঝে মাঝেই সন্ত্রাসমনা বন্ধু-বান্ধবরা পৃথিবীর আসন্ন দুর্বিপাকের কথা বলে যেতেন । তাতে আমি একটুও ভয় পেতাম না। থেকে থেকেই তো নানা ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে এসেছি। আরেকটা মহাযুদ্ধও তো আমাদের শৈশবে সংঘটিত হয়েছে, সে যুদ্ধের এতটুকু আঁচও আমাদের গায়ে লাগেনি। আমার বয়স তখন ৬-৭। বেলজিয়ম থেকে সর্বহারা একজন কম-বয়সী শিক্ষিকা আমাদের শিলং-এর স্কুলে পড়াতে এলেন। কেউ একটু দুষ্টুমি করলে কেঁদে ফেলতেন। ১৯১৫ সাল থেকে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণে, প্রাইজের বদলে বড় বড় কার্ড দেওয়া হতে লাগল। তাতে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র। সেলাই ক্লাসে আমরা সবাই যুদ্ধরত সেপাইদের জন্য গলাবন্ধ বুনতে লাগলাম। শুনলাম তাদের 'টমি' বলতে হয়। তারপর ক-বছর পরে যুদ্ধ থেমেও গেল। যেদিন খবর এল, সেদিন আমাদের স্কুল মোমবাতি দিয়ে সাজানো হল। বছরের শেষে আবার পুরস্কার দেওয়া হল। এই রকম অভিজ্ঞতা নিয়ে, এবারো ঘাবড়াবার কোনো কারণ দেখলাম না।

কাগজে দেখতাম ইউরোপের দেশগুলো ঝগড়াঝাঁটি করতে করতে, ক্রমে দুটো দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে আমাদের কি ? আমরা যে পরাধীন সেই পরাধীন। আবার একদিন কাগজে একটা ছোট্ট খবর দেখলাম যে কাদের একটা জঙ্গী জাহাজ ব্যাংককের দিকে এগুচ্ছে। মনে হয় জাপানী জাহাজ। জাপানীরা শত্রুপক্ষের বন্ধু। তখনো ব্রিটিশদের বন্ধুদের ভারতের বন্ধু, আর শত্রুদের ভারতের শত্রু বলে মনে করার নিয়ম ছিল। তবে দেশে যে অন্যরকম মতের লোকও আছে তাও জানতাম।

এর দু'চার দিন পরে আমাদের প্রিয় বন্ধু অধ্যাপক সুশোভন সরকার এসে কথাচ্ছলে বললেন যে যুদ্ধ একটা বাধতে চলেছে এবং সেটা এই পূর্বদিকেও টের পাওয়া যাবে। শুনে অবাক হলাম। মানুষটি বিচক্ষণ ঐতিহাসিক। আরো বললেন যে দুটো ক্ষেত্রে যুদ্ধ হওয়ার কয়েকটা সুবিধা আছে। কলকাতায় যাদের কাজকর্ম নেই, এইরকম লোকদের অন্য কোথাও সরে যেতে বললেও আশ্চর্য হবার নেই। আলোক-নিয়ন্ত্রণ তো আরম্ভই হয়ে যাচ্ছে। তাই হলও অল্প সময়ের

মধ্যে। কয়েক হাজার লোক অস্থায়ী চাকরি আর উর্দি পেল। কয়েক নিযুত কালো কাগজের ঘেরাটোপের দরকার হল আলো নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য। অর্থাৎ যাতে বাইরে থেকে এক চিলতেও না দেখা যায়। খালি আলোর নিচে একটুখানি গোল জায়গায় আলো পড়ে। দরজা জানলায় কালো পরদা ঝুলনো হল। স্কাইলাইটে আঠা দিয়ে কালো কাগজ সাঁটা হল। গাড়ির হেডলাইট বে-আইনি হল। অন্য আলোর তিনভাগ কালো রঙের প্রলেপে ঢাকা পড়ল। সব নিয়ন বাতি, দোকানের হোটেলের সাইনবোর্ডের আলো নিবল। ক্রমে সমস্ত শহরটা একটা ভূতড়ে চেহারা নিল। অবিশ্যি অল্পে অল্পে সইয়ে সইয়ে।

দেশের পূর্বাঞ্চল দিয়ে শত্রু আসবে অতএব ঐদিকের শহরগুলোতেই যত কড়াক্কড়ি, পশ্চিম দিক আলোয় আলো। আমাদের এক আত্মীয় বললেন 'যত সব বাজে ব্যবস্থা। এরোপ্লেনে উঠে দেখলাম সব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।' বেশ মজাও হত মাঝে মাঝে। রাস্তা থেকে এ-আর-পির লোকরা হাঁক দিত, 'ও ১৭নম্বর মশাই, আলো নেবান, দেখতে পাচ্ছি।' ১৭নম্বরের মশাই রেগে-মেগে বলতেন, 'যেতেই পারে না। প্রত্যেক আলোতে দেড় টাকা দামের ঘেরাটোপ দিয়েছি না!' 'তাহলে নেমে এসে দেখুন, রান্নাঘরের আলো দেখা যাচ্ছে কি না।'

ক্রমে সত্যি সত্যি বাড়তি নাগরিকরা কলকাতা থেকে সরতে লাগল। যাদের মফঃস্বলে ছুটি কাটাবার আস্তানা ছিল, তারা ছেলেপুলে নিয়ে সেখানে গেল। অন্যরা যে যেখানে পারে থাকবার জায়গা দেখতে লাগল। এরি মধ্যে যুদ্ধের আবহাওয়া আরো জমতে লাগল, হয় তো ব্যবস্থাপনার ফলেই! কারণ কে শত্রু কোথায় শত্রু ব্রিটিশ সরকারের সতর্কতায় কাগজে ঘুণাক্ষরেও আসল কথা বেরুত না। সুভাষ বোস নিজেদের বাড়ি থেকে অদৃশ্য হলেন এ খবর চেপে রাখা যায় নি। কিন্তু তারপর কোথায় গেলেন, কি করলেন, সে বিষয় সম্পূর্ণ ব্ল্যাক আউট। অবিশ্যি কিছু খবর আসতই। লোকের মুখ কে বন্ধ করবে? ভারতীয় নেতারা ব্রিটিশদের সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন তবে সাধারণ লোকের তাতে কি!

তারপর হাজরা রোডের বাড়িটাকে সরকারি কাজের জন্য নেওয়া হল। বাড়ি ছেড়ে দিতে হল। জিনিসপত্র এর ওর বাড়িতে জমা করে দিয়ে, হয়তো মার্চ মাসের কোনো সময় ছেলেমেয়ে আর গোটা দুই লোক নিয়ে আমিও কৃষ্ণনগরে একটা ভাড়া বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। উনি রইলেন কলকাতায়, হাসপাতাল ইত্যাদিতে ডিউটি নিয়ে। ঐ আমার বাংলার ছোট শহরের প্রথম অভিজ্ঞতা। এখন মনে হয় মন্দ ছিল না শহরটি। চুপচাপ শান্তশিষ্ট শহরটি হঠাৎ অভাবিত সংখ্যায় কলকাতাবাসীর আগমনে চঞ্চল। ঘর-বাড়ি, গোয়াল, শেড, সব ভাড়া হয়ে গেল। মাথার ওপর একটা ছাদ পেলেই লোকে খুশি। কলকাতায় বোমা পড়বে, সবার মনে এই ভয়! চুরি-চামারিও অসম্ভব বেড়ে গেল। স্থানীয়

অধিবাসীরা বেশ বিরক্ত।

আমরা স্টেশনের বেশ কাছেই একটা একতলা বাড়ির আধখানা পেয়েছিলাম। কিছু ভারি ভারি সেকেলে তক্তাপোষ ছিল ঐ বাড়িতে। তাদের পায়াতে গায়েতে গুপ্ত খোপটোপ ছিল। বাড়ির মালিক গোপাল ঘোষকে বড় ভালো লাগত। তাঁর স্ত্রীটি মাটির মানুষ। জীবন কেটেছে বর্মায়, তাই সাধারণ বাঙালী ছোট শহরের বাসিন্দাদের চেয়ে একটু উদার দৃষ্টি। বর্মার গল্প বলতেন। সেখানে তাঁর ভাইয়ের পরিবার থেকে গেছিল। যুদ্ধের হাঙ্গামা বাধতেই বিধবা ভাইবৌ আর তাঁর মেয়েটি প্লেনে জায়গা পেয়ে চলে এসেছিলেন। ছেলেদের সে সময়ে প্লেনে জায়গা কুলোত না, তারা তিনচার জন, বড় দলের সঙ্গে হাঁটা পথে আসছিল। তাদের মা-বোন নানা রকম বিপদ আশঙ্কা করে কেঁদে কেটে একাকার হতেন।

কলকাতার হাঙ্গামা এড়াবার জন্য কৃষ্ণনগরে এসে বুঝলাম যুদ্ধের ঢেউ এইখানেই ভাঙছে। পরে অবিশ্যি খবর পেয়েছিলাম ছেলেরা সবাই নিরাপদে আছে। হাঁটা পথে যারা এসেছিল আর যারা থেকে গেছিল সবাই।

সব জায়গায় খালি যুদ্ধের সর্বনাশের গল্প। কলকাতা নাকি এবার বিধ্বস্ত হয়ে যাবে, আর উঠবে না। জানতাম সব বাজে কথা, তবু বড়ই মুষড়ে পড়তাম। জিনিসপত্রের ভারি সুবিধা ছিল। নদীর মিষ্টি মাছ, গয়লাবাড়ির খাঁটি গাওয়া-ঘি, ঘানি থেকে তেল, বাড়িতে দিয়ে যেত সরপুরিয়া, সরভাজা। কিচ্ছু ভালো লাগত না। তিন মাস ছিলাম, এক লাইনও লিখিনি মনে হচ্ছে। ডিকেন্সের রচনাবলী ২৪খণ্ড নিয়ে গেছিলাম। আগাগোড়া মন দিয়ে পড়তাম। সেগুলো আমার সারা জীবনের পাথেয় হয়ে আছে।

ভারি নিঃসঙ্গ বোধ করতাম, যদিও চেনা-জানা বন্ধু কেউ কেউ ছিলেন। সুরেন ঠাকুরের বড় জামাই ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমার স্বামীর ছাত্রজীবনের বন্ধু। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি স্পষ্ট বক্তা। ভারি ভালো লাগত। ভারি কৌতূহলও হত তাঁর বিষয়ে, কারণ তাঁর মা ছিলেন বিদ্যাসাগরের দৌহিত্রী আর বাবা ছিলেন রামমোহন রায়ের বংশের ছেলে, আবার বিয়ে করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতির মেয়েকে, এক রকম বলিষ্ঠতা আর উদারতা আর কোমলে কঠোরে মিশ্রণ ছাড়া। তাই বা কম কিসের।

আমার স্বামীর আরো কিছু বন্ধুবান্ধব ছিলেন। আমার কেউ ছিল না, যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। এরি মধ্যে হঠাৎ রবীন্দ্রলাল রায় শান্তিপুর থেকে এসে গল্পগুজব ক্যারিকেচিওর করে বাড়ি মাতিয়ে দিয়ে গেল। আমার ছেলেমেয়ে আর বাড়িওয়ালার বাড়ির সবাই মুগ্ধ।

কেষ্টনগরের দোলতলার মেলা দেখেছিলাম। রাজবাড়ির সামনে দোলের

সময় থেকে এক মাস ধরে ঐ মেলা বসে। কত রকম স্থানীয় জিনিস, অপূর্ব সব মাটির পুতুল আর বাংলার শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন, ঐখানে সবাই কিনে নিয়ে যেতে লাগল। সার্কাস হত। একদিন মেলায় মাঠে একটা বদমেজাজি উট আমাদের তাড়াও করেছিল। ধরতে পারলে নিশ্চয় খেয়েই ফেলত, অন্তত মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছিল। আমরা পালিয়ে বাঁচলাম।

তারপর ছেলেমেয়ের জ্বরজারি হতে লাগল, শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং-এ দিদির কাছে যাওয়াই স্থির হল। আমার সুন্দর-জ্যাঠামশাই কেষ্টনগরে বাড়ি খুঁজছিলেন, ওঁদের কাছে ঘরদোর এবং অধিকাংশ জিনিসপত্র ছেড়ে আমরা কলকাতা চলে এলাম। ততদিনে হাজরা রোডের বাস উঠে গেছে। চৌরঙ্গীতে আমার স্বামীর চেম্বারের অন্য ডাক্তারটি চলে গেছিলেন, আমরা সেই খালি ঘরে উঠলাম। এসেই বুঝলাম কাজটা স্বার্থপরের মতো হল। মাসে দু-একবার আমার স্বামী কেষ্টনগরে যেতেন, দার্জিলিংএ হয়তো দুমাসে একবার হলেই ঢের। সত্যি কথা বলতে কি জীবনের ঐ তিনটি মাস আমি নষ্ট করেছিলাম। নিজের মনের অসন্তোষ নিয়ে ডুবে থেকে ভুলেই গেছিলাম এই সেই কৃষ্ণনগর, বাংলা সংস্কৃতির একটি লালনভূমি। দেখতেও বড় সুন্দর। গোপালবাবু একদিন রাজবাড়ির চারপাশের আমবাগানের মাঝে মাঝে বড় বড় ঘন কালো পুকুর আর বাঁধানো ঘাট দেখিয়ে বলেছিলেন, ঐ সব হল সেকালের রাজাদের জামাই-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। পুকুরে বড় বড় মাছ ঘাই দেয়, আম-শাখা ফলের ভারে নুইয়ে পড়ে। কিন্তু জামাইরা আর নেই। সব অযত্নে পড়ে আছে। মনে আছে মনটা ভারি হয়ে উঠেছিল। আমার মাঝে মাঝে ঐ রকম হয়। মনটা নিষ্ফলা মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। কিছু লিখতে পারি না। লিখতে হলে আমার মনের মুক্তির দরকার হয়। অন্যান্য সাংসারিক ভাবনা চিন্তা ঝেড়ে ফেলার ক্ষমতা বিধাতা খানিকটা দিয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টির কাজ করতে যে অনাবিল স্বতঃস্ফূর্ত রসের উৎস দরকার, কৃষ্ণনগরে সে উৎসের মুখ চাপা পড়ে গেছিল, বোধ হয় বড় বেশি নিজেকে নিয়ে নিবিষ্ট থাকায়।

বাড়িতে উঠোনে একটা দোতলার সমান উঁচু গন্ধরাজ গাছ ফুলে ফুলে আলো হয়ে থাকত। রাস্তা থেকে লোকে তার সুগন্ধ পেত। পাঁচিলের বাইরে একটা বকফুলের গাছ ছিল। বকফুল যে এত সুন্দর হয় আগে জানতাম না। তখন এ-সব চোখে পড়ত না, এখন মনে পড়ে। কলেজ পাড়া, নদীর ধার যে কত সুন্দর পরে যখন গেছি তখন লক্ষ করেছি। ঐ গোপাল বাবুর পরিবার ছাড়া কেষ্টনগরের সাধারণ লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃভূমি ; কুমুদনাথ চৌধুরী আর তাঁর ভাই প্রমথ চৌধুরী এখানকার গল্প করতেন ; যতদূর জানি এই শহর তাঁদের বাবার কর্মস্থল ছিল। এ সব কানে

শুনেছিলাম, মনকে নাড়া দেয়নি। কেষ্টনগরের প্রতি মনে কোনো দুর্বলতা জন্মায়নি, তাই লিখবার জোর পাইনি।

মনকে নাড়া দিয়েছিল এর অনেক বছর পরে, হয়তো ১৯৬০ হতে পারে। দেশ কবে স্বাধীন হয়েছে, আমি কয়েক বছর হল কলকাতার বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। কোনো এক সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষে, একদিন দুপুর বেলায় মহিলা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। আমি প্রধান অতিথি হয়ে সেই উৎসবে যোগ দিয়েছিলাম।

আমার ভাষণ শেষ হলে মঞ্চের পিছন দিকের কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি এক সারি ৬০-৭০ বছরের প্রৌঢ়া মাথায় কাপড় দিয়ে, আমার জন্য অপেক্ষ' করছেন। আমি বললাম,'বলুন, আমি কি করতে পারি।' তাঁদের মধ্যে যাঁর বয়স সবচেয়ে বেশি তিনি আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'কিছু না মা, খালি তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখতে চাই। তোমার গায়ে একটু হাত দিলেই আমাদের মন ভরে যাবে। লেখায় আর বেতারে আমাদের মনের কথা তো বলেইছ।'

মনে হল আমারো মন কানায় কানায় ভরে গেল। এই মানুষদের আগে জানতে পারিনি বলে লজ্জা হল।

কলকাতায় ফিরে দেখলাম চৌরঙ্গী পাড়াটা বদলে গেছে। রেড্ রোড অঞ্চল স্রেফ একটি সামরিক বিমান ঘাঁটি। চার দিকে মার্কিন সেপাইরা গিজগিজ করছে। আমাদের বাড়িতে ঢুকবার পথে মার্কিন সেপাই ডিউটি দিচ্ছে! আমাদের মধ্যে আর আমরা নেই। সত্যি কথা বলতে কি দার্জিলিং-এ গিয়েও বিশেষ কিছু লিখিনি। তবে মেলা বন্ধুবান্ধব পাওয়াতে সময়টা আনন্দে কেটেছিল। দিদি তখন মহারানী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। এম· এ· পাস করে এই অর্কিড-লী বাড়িতে আমি এসে মাসতিনেক বাস করে, এই স্কুলেই পড়াতাম। সেই বাড়ির এক তলায় দিদির আরামের কোয়ার্টার। বাগানে তেমনি বিলিতি ফুল ফোটে, কিন্তু পাহাড়ের গা আঁকড়ে প্রকাণ্ড তিন তলা স্কুলবাড়ি হয়েছে। আর সেই ছোট-ছোট নীল পাখিরা লাল টিনের ছাদের তলাকার তাদের পুরনো আবাস ছেড়ে কোথায় চলে গেছে।

আমার মা-বাবাও ঐ সময় ছোট একটা বাড়ি ভাড়া করে দার্জিলিং-এ ছিলেন। আমার ছোট বোনও এম· এ·বি-টি পাস করে মহারানী স্কুলে পড়াচ্ছিল। বরফের পাহাড় তেমনি সুন্দর। নিত্য আমরা এখানে ওখানে বেড়াতে যেতাম, চড়িভাতি করতাম। সেই মুহূর্তে পৃথিবীর অধিবাসীদের একটা বড় অংশ পরস্পরকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছিল। সুভাষ বসু রহস্যময় ভাবে অদৃশ্য হয়েছিলেন। দার্জিলিং-এ ভারতে উপস্থিত জার্মানদের ও তাদের বন্ধুদের আটক করে রাখা হয়েছিল। তবে বোধ হয় খুব কড়াকড়ি ছিল না। এখানে ওখানে

তাদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। আবার মার্কিনরাও হাওয়া বদল করতে এসে ফল পাকুড়ের দাম বাড়িয়ে দিত। সবাই ভারি বিরক্ত।

নভেম্বর মাসের শেষে আমরা সবাই সমতলে নেমে এলাম। ততদিনে যুদ্ধের আবহাওয়ায় সবাই অভ্যস্ত হয়ে গেছিল। তখনো সুভাষ বোসের বাহিনীর কীর্তিসমূহ বেতারে আর সব কাগজে এমনি বেমালুম চেপে রাখা হয়েছিল যে মাঝে মাঝে গুজব শুনলেও কেউ বিশ্বাস করত না। হরদম সাইরেন বাজত, গড়ের মাঠের কিনারা থেকে খুদে ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে উড়ে পড়ত। কট্-কট্ গুলি চলত। ভারি একটা হুটোপাটির ধুম পড়ে যেত, যেই সাইরেন বাজত। রাতে হলে 'আলো নিবাওরে', দিনে রাতে 'দরজা জানলা বন্ধ কররে, পরদা টানরে!' পুরনো বাড়ি, তার বিশাল বিশাল দরজা-জানলা, নড়বড়ে হুড়কো ছিটকিনি। তা সে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌টের শব্দেই সড়সড় করে নেমে পড়ে, জানলা হাট হয়ে খুলে যায়। তাই বোমার ভয়ে নয়, এ-আর-পির ভয়ে দড়ি দিয়ে জানলা বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করলাম। আমাদের মাঝের ঘরে সবাই মিলে জড়ো হতাম। এ-আর-পি থেকে বলে গেছিল ঐটেই সবচেয়ে নিরাপদ। ছেলেমেয়ের হাতে কমলালেবু ধরিয়ে দিতাম। তিনতলা চারতলার সাহেব মেম ভাড়াটেরা নেমে আসত। তাদের মুখ গম্ভীর।

আমরা তখনো মেনে নিতে পারিনি যে দোরগোড়ায় যুদ্ধ এসে এই পৌঁছল বলে। এমন সময় মধ্য ইউরোপ থেকে দু তিনটি জু ডাক্তার সর্বস্ব খুইয়ে সপরিবারে এসে তিনতলা চারতলার ভাড়াটেদের বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। এঁরা সকলেই মধ্য ইউরোপীয় জু ডাক্তার। যে যার নিজের ক্ষেত্রে খ্যাতিমান। এঁদের দেখে বুকটা ধড়াস্ করে উঠেছিল। বিমর্ষতার মূর্তিমান প্রতীক।

আরো পরে একদিন বোধ হয় দিনের আলোয় অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌টের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ধুম্‌ধাম গম্ভীর আওয়াজ হল। বাড়িটাড়ি কেঁপে একাকার। মেমরা চোখ ঢেকে ভগবানকে ডাকতে লাগল। বোমার শব্দের সঙ্গে ওদের বেদনাময় পরিচয় আগেই হয়ে গেছে। তারপরে সাইরেনে অল্‌ক্লিয়ার। জানলা খুলে দেখি সব যেমনকে তেমন, কিছুই বদলায়নি। পরে শুনেছিলাম কিছু লোক মারা গেছে।

এই রকম দু চার দিন হল। চাঁদনি রাতকে সবাই ডরাত, বলাবলি করত চাঁদের আলোয় আসবে জাপানী বোমারুরা! এখন দিনের আলোয় বোমা পড়ার ফলে সে ভয় দূর হয়ে গেল। মেমরা আমাকে বলত, 'দেশে কত দুঃখ কষ্ট পাবার পর এখানে এসে মনে হয়েছিল ভগবান আছেন তাহলে। সর্বস্ব গেছে, কিন্তু প্রাণটা আছে, দুটো হাত আছে আবার খেটে খাব। এখানেও বোমা পড়ছে দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় তবে কি তিনি সত্যি নেই? আবার অল্‌-ক্লিয়ারের পর

জানলা দিয়ে তাকিয়ে নিচের দিকে দেখি তোমাদের ছাদে কুকুর নিয়ে তোমার ছেলেমেয়ে খেলা করছে। অমনি সব বিশ্বাস ফিরে আসে। আমরা নিজেরা হিংসাহিংসি করি আর তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাই! ছিঃ।'

তারপর চল্লিশ বছর কেটে গেছে, এখনো কোনো জঘন্য হিংসাত্মক ঘটনার কথা শুনলে ঐ পোলিশ মহিলার কথা মনে পড়ে। যুদ্ধের শেষে তারা সকলে নিরাপদে ফিরে গেছিলেন। কেউ স্বদেশে, কেউ অতিথিপরায়ণ আমেরিকায়।

ঐ তিন চার দিন ছাড়া বোমাও পড়েছিল বলে মনে পড়ে না। শুনি বাঙালীরা নাকি বেজায় ভীতু। যুদ্ধের নাম শুনেই যে ভাবে সরে পড়েছিল, তাতে সেরকম মনে হতেও পারে। কিন্তু সত্যি যখন যুদ্ধের হাওয়া ঘনিয়ে এল—অবিশ্যি পৌঁছায়নি শেষ পর্যন্ত—তখন দেখলাম অল্‌ক্লিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলতে লাগল। জিনিসপত্রের দাম খানিকটা বেড়েছিল, কিন্তু এখন যেমন চোখের পলক না ফেলতে অকারণে ডবল হয়ে যায়, সে তুলনায় কিছু নয়। তার ওপর রাশিরাশি বিদেশী খাবার দাবার বাসনপত্র কাপড় চোপড় জলের দরে বিক্রি হতে লাগল। আমাদের আয়া একবার একটাকা দিয়ে আটটিন মার্কিনী টুনাফিশ্‌ কিনে নিয়ে এল। খাকি রং মাখানো টিন, যেমন মিলিটারি মালের নিয়ম ছিল—যদিও ফুটপাতে বিক্রি হচ্ছিল— আমি তো বারবার খেতে মানা করলাম, ভাবলাম নিশ্চয় 'তারিখ-অতিবাহিত' জিনিস। তা সে শুনল না। চমৎকার একটা উত্তর দিল—'তা হতে পারে, মা। খেলে হয়তো মরে যায়। তবে আমরা গরীব মানুষ, আমাদের অত বড়মানুষি করলে চলে না।' দিব্যি খেয়ে দেয়ে বহাল তবিয়তে রইল সবাই।

মাঝে মাঝে মনেই থাকত না যে একটা যুদ্ধের কাছাকাছি রয়েছি। এমন সময় আমাদের বড়ই স্নেহের পাত্র এক সমবয়সী জামাই বর্মার যুদ্ধক্ষেত্রে তার নিজের একজন অফিসারকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিল। হঠাৎ যুদ্ধটা বড্ড কাছাকছি এসে গেল। তার জন্য এখনো মন কেমন করে।

এর কিছুদিন পরেই যুদ্ধটা যেন গড়িয়ে গড়িয়ে থেমে গেল। সত্যি বলছি সাক্ষাৎ টের পেতে কিছু সময় লেগেছিল, যেমন শুরুর সময়ও লেগেছিল। এই যুদ্ধের ব্যর্থতা নৈরাশ্যের কথা বাদ দিয়ে, অনেক মজার ঘটনা ঘটত। আমার এক আত্মীয় যুদ্ধ থামার সময় বর্মায় ছিল। তাকে হুকুম দেওয়া হল কলকাতায় গিয়ে নতুন পোস্টিং পেতে হবে। কলকাতায় এসে শুনল পাকা অর্ডার আনতে দিল্লী যেতে হবে। গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত শরীরে সেখানে কিছুদিন এ-অপিস্‌ সে-অপিস্‌ করবার পর, পাকা অর্ডার পেল, 'তোমার যে কলকাতায় পোস্টিং হবে সে তো জানা কথা।' মাঝখান থেকে সময় ও টাকা খরচ আর হয়রানির এক শেষ।

সে যাই হক আস্তে আস্তে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে এল আর আমাদের দেশের

দুঃখের দিনও ঘনিয়ে এল, তা শুনে যতই না অদ্ভুত লাগুক। স্বাধীনতা অবধারিত, কিন্তু বিনা পয়সায় তো আর কিছু হবার নয়। অতীতে কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয়, দেশপ্রেমিক শহীদ নিজেদের জীবন দিয়েছিলেন বটে; ষড়যন্ত্রকারীরা ছন্নছাড়া জীবন কাটিয়েছিলেন; অপূর্ব সব দেশপ্রেমের গান লেখা হয়েছিল; রামমোহন থেকে শুরু করে বহু মহান্ নেতা বারবার দেশোদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আমাদের ছাত্রজীবনে কংগ্রেস কর্মীরা দলে দলে জেলে যেতেন। সে জেলে যাওয়ায় সে রকম কষ্ট ছিল না, দু-চারটি ক্ষেত্রে ছাড়া। কিন্তু স্বাধীনতার ঠিক আগেই বাংলায় যে নির্মম দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার বেদনার সঙ্গে হয়তো শুধু বঙ্কিম বর্ণিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের তুলনা করা যায়। এ-কষ্ট সাধারণ লোকের সবচেয়ে বেশি লেগেছিল।

শুনেছিলাম কোনো খরা বা বন্যা বা মহামারী দুর্ভিক্ষ এ নয়। একেবারে মানুষ-ঘটিত ব্যাপার। বিদায় নেবার মুখে ব্রিটিশরা তাদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাপনা তুলে নেওয়াই ছিল এর প্রধান কারণ। কারণ যাই হোক, লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষ না খেতে পেয়ে মরে গেল। যারা মরল না তারাও অমানুষ হয়ে গেল। শহরের ব্যবস্থাপনা বেশি ভালো, এই সরল বিশ্বাসে লক্ষ লক্ষ গ্রামের লোক কলকাতায় এসে খাবারের দোকানের সামনে মরে রইল। লুটপাট করে খাবার মনুষ্যত্বটুকুও ততদিনে তাদের শেষ হয়ে গেছিল।

দলে দলে ভদ্রঘরের মা-বাবারা ছেলেমেয়ের হাত ধরে ভিক্ষে করছে দেখে, এই প্রথম দেখলাম অবস্থাপন্ন বাঙালী মেয়েরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এ আমার সেই ফ্যাশানেব্‌ল সমাজসেবা নয়। এ হল মরা-বাঁচার কথা। এই সময় আমি প্রথম কমিউনিস্টদের জনসেবার দৃষ্টান্ত দেখলাম। আমাদের কমিউনিস্ট বন্ধু নীরেন রায়ের উৎসাহে বই তো অনেক পড়েছিলাম। সে সব হল গিয়ে নীতির ব্যাপার। আর এ হল ঐ যে বললাম—মরা-বাঁচার কথা।

মেয়েদের একটা সেবা-সমিতি। নাম মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। তারা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। বন্ধুরা কেউ কেউ বললেন, 'ওসব ওদের দল বাড়াবার চেষ্টা। জনসেবার নাম করে লোকের দুর্বলতার সুবিধে নেয়।' যাঁরা বলতেন, বলাবাহুল্য, তাঁরা কেউ জনসেবার ধার ধারতেন না। ও-কথা শুনে বেজায় চটে যেতাম। তাঁদের কাছ থেকে যেমন করে পারি চাঁদা আদায় করতাম। কিন্তু ঐ কমিউনিস্ট মেয়েদের স্বার্থশূন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, ওদের নিয়মানুবর্তিতা, ওদের নিখুঁত অর্গানাইজেশন—সংগঠন নীতি বললে যেন যথেষ্ট বলা হয় না—দেখে আমি স্তম্ভিত এবং মুগ্ধ। একদিনও ওরা রাজনীতির কথা বলেনি, বা দলে টানবার চেষ্টা করেনি। আমি চিরকাল সব রাজনীতির দল এড়িয়ে চলেছি, এখনো তাই। কিন্তু ঐ মেয়েদের দেখে আমি বুঝলাম নারীত্বের

কি অসীম শক্তি। কোনো ন্যাকামি, বাড়াবাড়ি নেই, কোনো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নেই। এই কাজগুলো করা দরকার, তাই করতে হবে। আর কি অপূর্ব কর্মক্ষমতা। মেয়েগুলো আমার আজীবনের বন্ধু হয়ে গেল। এখন বেশি দেখা হয় না, নানান নতুন রাজনীতির দল হয়েছে, তাতে কেউ কেউ যোগ দিয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি মানুষের স্বকীয়তা বদলায় না, খালি অভ্যাস বদলায়। কয়েকজনের নাম না করে পারছি না যেমন—মণিকুন্তলা সেন, কমলা চট্টোপাধ্যায়, অনিলা দেবী, আর সেই আরেকজন যার নাম করলে চটে যাবে, ছোট্ট-খাট্টো মানুষটি, ধরন-ধারণ বেজায় বেরসিক। কিন্তু ওর স্বামীর অন্য রকম মত। এদের সংস্পর্শে এসে আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। যদিও ধন্যটন্য শব্দ ওরা পছন্দ করবে না জানি। আমার লেখার এখানে ওখানে আমি নিজেই ওদের প্রভাব দেখতে পাই।

এতটুকু আবেগের উচ্ছ্বাস দেখিনি, কিন্তু কাজের কি মহিমা! ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ কটা দিন। কমিউনিস্টরা জনপ্রিয় ছিল না; কাজ দেখে আমার মতো আরো অনেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম। মনে হয় ২০-২৫টা লঙ্গরখানা চালাত ওরা। কয়েকটাতে গিয়ে বুভুক্ষু মানুষের ন্যাড়া চেহারা দেখে শিখলাম যে আগে দেহের প্রয়োজনগুলো মেটাতে হয়, তবে না সে মনের বিকাশ হয়। একজন মাকে দেখেছিলাম ছোট্ট ছেলেমেয়েদের বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে রেখে ডান হাতে নিজে খিচুড়ি খেয়ে নিচ্ছে। কি কষ্ট হয়েছিল।

তবে লঙ্গরখানাগুলো সরকারি সাহায্যও পেত। ভারতীয় ফুড কমিটি বলে একটা সমিতি হয়েছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমিও গেছিলাম। দেখলাম কাজের কাজ অনেক হলেও, কর্তাব্যক্তিদের অনেকেরি একটু বেশি পরিপুষ্ট চেহারা। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় কেমন যেন দৃষ্টিকটু মনে হত। স্টেট্‌স্‌ম্যানের অ্যালেক্ রীডকে বললাম, 'আমাদের দেখে কে বলবে দেশে দুর্ভিক্ষ চলেছে!' কাষ্ঠ হেসে রীড্ বলেছিল, 'কিম্বা হয়তো দেখে ভাববে এইব্যর দুর্ভিক্ষের আসল কারণটা পাওয়া গেছে!' এমনি করে ১৯৪২, ১৯৪৩ কেটেছিল। পথঘাট আবার আগের মতো আলোকিত হলেও, মানুষের মন অবধি সে আলো পৌঁছতে ঢের দেরি। সামাজিক মূল্যবোধ কোথাও এতটুকু নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পুরনো প্রতিষ্ঠিত মানগুলো ভেঙে গেলেও, তার জায়গায় নতুন কিছু গড়ে ওঠেনি। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলের তেজ নিবে গেছিল, কিন্তু সে-যুগের সামাজিক মূল্যগুলোকে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করত।

করতে গিয়ে বিষম বৈষম্য দেখা দিচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথ নেই। তবু জ্ঞানীগুণীর অভাব ছিল না। তাঁরা নীতিগত ভাবে ভারি উদার মতামত পোষণ ও প্রকাশ

করতেন। কিন্তু কাজ অবধি সেগুলোকে পৌঁছতে দেবার কথা উঠলে ঘাবড়ে যেতেন। নমুনা স্বরূপ দুটো একটা নাম দিতে পারলে আরো ভালো হত সন্দেহ নেই, কিন্তু সে না দিলেই বুদ্ধির কাজ হবে।

মোট কথা অ্যালেক রীডকে আমরা বেজায় ভালবাসতাম। স্নেহশীল, উদারচেতা, বুদ্ধিমান মানুষটি। সে আবার বাঙালী মেয়ে বিয়ে করেছিল। ঐ মেয়েও আমাদের সমবয়সী বন্ধু। তার আগের বিয়ে নানা কারণে আইনের সাহায্যে ভেঙে গেছিল। সে বছর আমরা এক সঙ্গে দার্জিলিং গেছিলাম। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিল আমার বন্ধু, তার মায়ের সঙ্গে। ফিরে এসে মা রেগেমেগে বললেন, 'অমুকের স্ত্রী পাছে আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়, তাই মুখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি একটা দোকানে গিয়ে ঢুকল।'

মনে আছে সেখানে অধ্যাপক সুরাওয়ার্দি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ইউরোপে কাটিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, 'তাতে অত গরম হবার কি আছে বুঝলাম না। ওঁদের মতে যারা অসামাজিক কাজ করেছে, ওঁদের সমাজ তাদের সঙ্গে মেশে না! তাতে কি দোষটা হল বুঝলাম না।'

তারপর যাকে বলে চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠল। আমার সঙ্গে দেখা হতেই ঐ সামাজিক বন্ধুরা বললেন, এমন জায়গায় আছে যে যাবারো জো নেই। আমি বললাম, 'তোমরা তো অমুকের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গেছিলে। তিনি বিয়ে ভাঙ্গেননি বটে, কিন্তু আরেক জনের সঙ্গে ঘর করেন শুনেছি!' কিছুটা তর্কাতর্কির পর তাঁরা মানলেন এ ব্যবহারটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার প্রমাণ হয়ে যায়। সবাই মিলে পরদিন বিকেলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন ঠিক হল। ভাবলাম,বাঃ, এই তো বেশ! কেমন যুক্তি দিয়ে মন ফেরানো গেল। দুঃখের বিষয়, পরদিন দূর থেকে তাঁদের আসতে দেখে, সাহেব হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে যারা মেশে না, আমিও তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে মিশি না।' এই বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল! সমতলে তখন দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমে এলেও মানুষের যথেষ্ট দুঃসময় চলেছিল, তখন পাহাড়ে অভিজাত হাওয়া-বদল করনেওয়ালারা এই সব সূক্ষ্ম সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে তর্ক করতেন। অথচ তাঁরাও যে জনসেবা করতেন না, তা নয়।

আসলে আজ অবধি দুর্নীতি সুনীতি, সামাজিক-অসামাজিকের মধ্যিখানের দেওয়ালটা কোথায় বুঝতে পারি না। যা নিষ্ঠুর, যা অন্যের ক্ষতিকারক, যা কুরুচিপূর্ণ ও জঘন্য, সে সবই পরিত্যাজ্য এই রকম ভাবি। আবার দেখি সামাজিক মানুষরা অসামাজিক চরিত্রের গল্প—তা সত্যই হোক, কি বানানোই হোক—ভারি উপভোগ করেন এবং বন্ধুদের কানে কানে পরিবেশন করেন। অথচ সত্যিকার মানুষের এতটুকু স্খলন-পতন-ত্রুটি দেখলে মারমুখো হয়ে

ওঠেন। অবিশ্যি ঐ সব ঘটনা এখন আর সম্ভব নয়। শুনেছি নাকি কলকাতার সব অপেক্ষমান বিয়ে ভাঙা কেসের শুনানি নিতেই আড়াই বছরের বেশি সময় লাগবে।

সেবার দার্জিলিং-এ মাসখানেকের বেশি থাকিনি। আর কখনো দার্জিলিং-এ একটানা এক মাস থাকিওনি। যতদূর মনে হয় ঐ বছরেই লক্ষ্ণৌতে আমার মেসোমশাই সুরেন মৈত্র হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়ে, ৬৭ বছর বয়সে মারা গেলেন। মেসোমশাইয়ের সঙ্গে আমার ভারি সুন্দর একটা স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। বাবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর, জ্যাঠামশাইয়ের আর মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে সর্বদা যে গভীর স্নেহ পেয়েছিলাম তার তুলনা হয় না। তার ওপর মেসোমশাই সাহিত্য ভালোবাসতেন। চমৎকার কবিতা লিখতেন সুরেশ্বর শর্মা নামে। ভাবতাম ছদ্মনাম কেন? কিছু বলতেন না। সুন্দর অনুবাদ করতেন। তাঁর ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা আর জাপানী ঝিনুক (নগুচির কবিতা) বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। কবিতা পড়ে শোনাতে ভালোবাসতেন। পড়তে পড়তে হয়তো হঠাৎ পড়া বন্ধ করে বললেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চোখ দুটো একদম গেছে!' আমি ওঁর নাক থেকে চশমা তুলে আঁচলে মুছিয়ে, আবার নাকে বসিয়ে বলতাম, 'এবার পড়।' হয়তো সাধারণ ছোট একটা স্মৃতিকণা, কিন্তু আমার কাছে মূল্য আছে। এমনি সব ছোট ছোট সাধারণ ঘটনা দিয়ে আমার স্মৃতির খাতা ভরে আছে। দুঃখের সময় সেগুলি ভেবে সান্ত্বনা পাই, নিরাশার সময় বল পাই।

বোঝাই যাচ্ছে নানান্ পত্রিকাতে ছোটদের, বড়দের জন্য গল্প প্রবন্ধ লেখা ছাড়া এতাবৎ কোনো বড় কাজে হাত দিইনি। ক্রমে মনটা তৈরি হয়ে আসছিল! ১৯৪৩ সালে আমার ৩৫ বছর বয়স। লেখক বন্ধুরা তত দিনে স্বনামধন্য হয়ে উঠেছেন। আমার খালি মনে হত যখন বলবার মতো কিছু আমার মনের মধ্যে ফুটবে, তখনি আমি লেখিকা হয়ে উঠব। জোর করে কিছু হবার নয়।

॥ ৬ ॥

নিজের জীবনের কথা লেখার চেয়ে অন্যের জীবন-কথা লেখা অনেক বেশি সহজ। পরের কথা বলতে গেলে বাইরে যেটুকু প্রকাশ পায় শুধু সেইটুকুই লেখা হয়, মানুষটা কি বলল, কি করল, কোথায় ছিল, কোথায় গেল, কাকে কি চিঠিপত্র লিখল, ডাইরিতেই বা কি গোপন কথা লিখে রাখল, অন্য লোকে তার বিষয়ে কি বলেছিল, কি সন্দেহ করেছিল ইত্যাদি। যথেষ্ট খ্যাতনামা হলে তার উইল, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, দৈনিক খরচপত্রের হিসাব—এ পাঠও বাদ পড়ে না। মধ্যিখান থেকে আসল মানুষটা—যার সমস্তটা কথায়, বা কাজে বন্দী হবার নয়—সেই খসে পড়ে। অবাঙমনসগোচরের কি আর চলচ্চিত্র হয়?

নিজের বেলা সব অন্যরকম। মনের গহনের সমস্ত অস্ফুট চিন্তা পর্যন্ত আগের থেকেই জানা হয়ে থাকে, কোনো নিচ অযোগ্য ইচ্ছা বা চিন্তাও নিজের কাছে গোপন থাকে না। সমস্ত বিফলতা ব্যর্থতা হতাশা বেদনা নিয়ে নিজেই পদে-পদে নিজের মুখ চেপে ধরতে হয়, লজ্জা ঢাকতে হয়। নিজের অন্তরের মতো নির্মম সমালোচক জাত-লেখক আর কোথায় পাবেন ? জাতীয় পুরস্কারের ছটায়, নিজের কাছে নিজের অযোগ্যতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। ভাগ্যিস্ বাইরের কেউ দেখতে পায় না।

এ-সব আমার মন-গড়া কথা নয়, সব শিল্পীই সব সৃষ্টিকার-ই এ-কথা জানেন। জেনেও যদি সত্য থেকে বিচ্যুত না হবার চেষ্টা করি, যদি ভালোকে ভালো আর মন্দকে মন্দ বলবার সৎসাহস না পাই, তাহলে আমার অযোগ্যতাই প্রমাণ হয়ে যাবে। সাহিত্য-লোকে কাপুরুষের জায়গা নেই। কোনো রকম মানসিক ব্যভিচারেরও জায়গা নেই, কারণ সে-ও দুর্বল কাপুরুষতা, কিন্তু তা-ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠতে পারে, এ-ও আমি বিশ্বাস করি।

এমনিধারা চিন্তা একদিনে তৈরি হয়নি, জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছিল নিজেকে জানতে। ছাত্রাবস্থায় আমার প্রধান অনুশীলনের বিষয় ছিল ইংরিজি সাহিত্য। কতবার মনে হয়েছে ঐজন্যেই বাংলা লিখবার জোর পেয়েছি। ইংরিজি ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে ভারি একটা বলিষ্ঠ ধরনের উদারতা আছে। তাকে আয়ত্ত করতে পারলে যে-কোনো ভাষায় লেখা অনেক সহজ আর জোরালো হয়ে ওঠে। ইংরিজিতে লিখব বলে আমি ইংরিজি পড়িনি, এমন শিক্ষণ আর কোথাও পাব না জেনেই ইংরিজি সাহিত্য বেছে নিয়েছিলাম। ঐরকম মৌলিক, নির্ভীক, স্বকীয়তাপূর্ণ, জোরালো ভাবে আমাদেরও লিখতে হবে। অনেক বাংলা লেখায় পরিচ্ছন্নতার অভাব দেখি। এক কথায় যা লেখা যায়, আমরা তাকে দশ কথায় লিখি।

যেমন ছোট গল্পই ধরা যাক। ওদের সেরা লেখকরা এক পদক্ষেপে গল্পের মধ্যিখানে চলে যান। তারপর আর এক মুহূর্তের জন্যে পাঠকের মনকে রেহাই দেন না। আমরা অনেকেই পাতার পর পাতা ইনিয়ে বিনিয়ে, হাজার রকম কৈফিয়ৎ আর ব্যাখ্যানা দিয়ে তবে গল্প শুরু করি। যেন একটা অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছি। অথচ কত ভালো ভালো বাঙালী ছোট-গল্প লেখক দেখতে পাই। ছোট গল্পের মধ্যিখানে আমরা মনোবিশ্লেষণ করতে গিয়ে, সব মাটি করে দিই। ভালো ভালো প্লটের জোর কমিয়ে দিই।

এ-সমস্তই আমার নিতান্ত নিজের মতামত। ১৯৪৩-৪৪ পর্যন্ত এই সব ভেবেছি, বেশির ভাগ ইংরিজি বই-ই পড়েছি, পত্র-পত্রিকায়, গল্প প্রবন্ধের সমালোচনা লিখেছি। সমালোচকদের কাছে নিজেকে খুব একটা ধরা দিইনি।

বলেছি তো অধ্যাপক নীরেন রায় কেবলি বলতেন—'কিচ্ছু করতে পারনি ! তোমার বয়সে লিন-য়ুটাং কি করেছিলেন মনে হয় না কখনো ?'

১৯৪৪ সালে আমাদের পারিবারিক জীবনের স্বচ্ছ স্রোত বিঘ্নিত হল ! আমার মাতৃসমা ননদের একমাত্র মেয়ে বিধবা হয়ে তার তিনটি অনূঢ়া কন্যা নিয়ে আমাদের বাড়িতে এল। বন্ধুরা অনেক বারণ করেছিলেন, বলেছিলেন, বিপন্ন আত্মীয়-বন্ধুদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হয়, ঘরে আনতে হয় না। আনলে তোমাদের সমস্ত জীবন-ধারা পাল্টে যাবে। কথাটা মেনে নিতে পারিনি। সে যাই হক ১৯৪৪ সালের শীতকালে তারা সকলে এল। পাড়াগাঁয়ে জন্ম, সেখানে মানুষ। কথায়বার্তায় সাজসজ্জায়, মতামতে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষার আর কুসংস্কারের ছাপ। আবার তার সঙ্গে কেমন একটা স্বচ্ছ সরলতা, যা আমার মনে ধরে গেল। সেখানেও বড় মেয়েরা গ্রামের স্কুলে পড়ত। এখানে এনেই কোথায় দেব তাই নিয়ে সমস্যা।

সে সময়ে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, মধুপুরে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থাপনাতেই ছিল। সেখানে ভরতি করে দিলাম। পরের বছর ঐ স্কুল কলকাতার পুরনো আবাসে ফিরে এলে, যাতায়াতের অসুবিধার কথা ভেবে মেয়ে তিনটিকে দক্ষিণ কলকাতার কমলা গার্লস্ স্কুলে ভরতি করে দিলাম। কবি বিষ্ণু দের বুদ্ধিমতী স্ত্রী প্রণতি ঐ স্কুলের অধ্যক্ষা ছিলেন। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ভাড়া বাড়িতে অনাড়ম্বর ভাবে চললেও, বিদ্যালয়টি বড় ভালো ছিল। ততদিনে আমার ভাগ্নীর মেয়েদের দেহ মন থেকে পাড়াগাঁয়ে ভাবটি মুছে গিয়ে, তাদের এখন কলকাতার আর পাঁচটি কায়দাদুরস্ত চালাক-চতুর মেয়ে থেকে আলাদা করে চেনা যেত না। বাড়িতেও আমার এক ছেলে এক মেয়ের জায়গায় এক ছেলে চার মেয়ে মানুষ হতে লাগল। বলা বাহুল্য কোণ-ঠাসা হয়ে ছেলেটা দিনের বেশির ভাগ সময় কোণের ঘরে কাটাত। বয়সে সে ভাগ্নীর বড় মেয়ের চেয়ে দেড় বছরের ছোট আর পাকামিতে তার হাঁটুর কাছেও পৌঁছয়নি। মাঝ মাঝে মনে হত বাড়িতে বুঝি প্রমীলা রাজ্যের পত্তন হয়েছে।

আরেকটু আগে পেলে মনের মিলটা আরো গভীর হত আমার হয়তো, কিন্তু আসল সমস্যা তাদের নিয়েও নয়, আমার দুঃখিনী, বুদ্ধিমতী, প্রায় নিরক্ষরা বুড়ি ননদকে নিয়েও নয়। তিনি তাঁর পুজো-আচ্চা, রান্নাবান্না, কাঁথা সেলাই, আচার-বড়ি-আমসত্ত্ব তৈরি আর সংযত ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে দিনের অর্ধেকটা সময় কাটাতেন, বাকিটা সময় আমার চার দিকে বিরাজ করতেন। আমি যেখানে যেতাম সেখানে যেতে চাইতেন, যা করতাম করতে চাইতেন, সকলের সঙ্গে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন। আমার গিন্নিপনার অর্ধেকটা আমি তাঁর কাছে শিখেছি আর কত যে স্নেহ পেয়েছি, সারা জীবন ধরে বলে

বলেও তার যথেষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

সমস্যা আমার মুখ্যু ভাগ্নীকে নিয়ে। মুখ্যু হলে কি হবে, অতি আশ্চর্য তার আত্মসম্মান। নিজের ঘরে একদা রানীর মতো বিরাজ করেছিল, তারপব বিধির বিধানে সে রাজ্য গেল। দূরদর্শিতার অভাবে তার স্বামী কিছু রেখে যায়নি। মানুষটা যদিও দেবতার মতো ছিল। উলিপুরের সংসার তুলে দিয়ে, জিনিসপত্র অর্ধেক জলের দরে বেচে দিয়ে, অর্ধেক দান বিলি করে, যৎসামান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আমার সামনে যখন দাঁড়াল, আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবলাম এ তো একটা সম্পূর্ণ মানুষ নয়, এর আধখানাকে সেখানে রেখে এসেছে।

বছর বত্রিশ বয়স, লম্বা, সুশ্রী, অসহিষ্ণু, কিন্তু চোখের দৃষ্টি অম্লান। হঠাৎ দেখলে মনে হত খিট্‌খিটে, আসলে তা নয়। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে শেখেনি, বাধ্য হয়ে তিনটে মেয়ে নিয়ে মামার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে যতই আদর পাক, স্বাধীন মানুষকে অপরের দায়িত্ব হতে হচ্ছে, এই তিক্ত সত্য তার আত্মসম্মান বরদাস্ত করতে পারছিল না। তার নাম সুরমা। আমার মায়ের নামও ছিল সুরমা। আমার মা তিন বছর বয়সে অনাথা হয়ে, পরের ঘরে মানুষ হয়েছিলেন। সেই প্রথম দিন থেকে সুরমাকে অন্তরে স্থান দিয়েছিলাম। আদর দিয়ে, শাসন দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, যত্ন দিয়ে কিশোরী কন্যা মানুষ করা তেমন কঠিন কাজ নয়। তিনজনেই লেখা পড়া শিখে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে ধন-সম্পদ কিছু না পেলেও, তার চেয়েও ভালো জিনিস পেয়েছিল। সে হল এক রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বড় হবার প্রবল বাসনা। সেইটেই তাদের জীবনের মূলধন ছিল। আমি তাদের পথ করে দিয়েছিলাম, এই মাত্র।

আমার আসল গর্ব সুরমাকে নিয়ে। ফ্ল্যাটে বস্তুতঃ এতগুলো লোকের জায়গা ছিল না। কিন্তু আমাদের দেশে জায়গা নেই বলে কোনো কথাও নেই। ডাক্তারের চেম্বারের সঙ্গে লাগানো তিনটি বড় বড় ঘর। তাতে আমরা নয়জন মানুষ। বড় টেবিলে দু ব্যাচে খাওয়া হয়। রাতে মাটিতে ঢালা বিছানা হয়। নিজেরাই পাতে, নিজেরাই তোলে। আমাদের বুড়ি আয়া আমোদিনী নিজে দুঃখী হলেও, অন্য দুঃখী এসে এ-বাড়ির আদর যত্নে ভাগ বসাবে, এ-কথা ভাবলেও তার পিত্তি জ্বলে যেত। মস্ত রান্নাঘরে আমিষ নিরামিষ আলাদা সেক্‌শন হয়ে গেল।

রোজ সন্ধ্যায়, আমাদের বড় শোবার ঘরটি একটা নারী-শিক্ষা-কেন্দ্র হয়ে যেত। আমি তার একচ্ছত্র মাস্টারনী। ছাত্রীদের বয়স ৭ থেকে ৩২। বলা বাহুল্য ছেলেটা আমাদের ছোট শোবার ঘরে বুদ্ধিমান জীবের মতো গা-ঢাকা দিয়ে থাকত। তার-ও সামান্য মাস্টারি করতে হত। সমিতি-টমিতি ছাড়লাম। বন্ধুরা বললেন—হয়ে গেল তোমার সাহিত্য সাধনা, এবার সংসারের চাকার

তলায় তলিয়ে যাবে!

তা অবিশ্যি হয়নি। কে না জানে কাজের লোকদের হাতে সব চেয়ে বেশি কাজের সময় থাকে। আমার মনের মধ্যে একটা দরজা খুলে গেল, আমার অন্তরবাসী সেই সত্তাটি আমাকে ঘাড় ধরে শেখাতে লাগল। অনেক রাতে, পড়ুয়ারা শুয়ে পড়লে পরে এবং আমার স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও। লেখাটা নিজের থেকেই আসত। খাটতাম সুরমার জন্য। যে দিন থেকে কাগজে পড়েছিলাম সোভিয়েট ইউনিয়নে পাঁচ বছরে নিরক্ষরতা ঘুচে গেছিল, সে দিন থেকে এ-বিষয়ে বেজায় কৌতূহল ছিল। সুরমা আমার সে কৌতূহল মেটাল। বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। গ্রামের স্কুলে যেটুকু শিখেছিল কোন্ কালে ভুলে গেছে। ঠিক করলাম তাকে তৈরি করে নিজের পায়ে দাঁড় করাব। যাতে আর কোনো কালে পরের কাছে সাহায্য চেয়ে তার ঐ অপূর্ব আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়।

ওর মা, আমার ছোড়দির মহা আপত্তি। 'এ বয়সে আবার লেখা-পড়া হয় নাকি! একটা ভাগ্নীকে দু-মুঠো খেতে দিতে পারবি না?' তাঁকে বোঝালাম যাতে ঐ দু-মুঠোর জন্য কারো কাছে হাত পাততে না হয়, তাই করে দিতে চাই। আমার স্বামীর কোনো আপত্তি না থাকলেও, খুব একটা ভরসাও ছিল না।

শুনলাম বিদ্যাসাগর বাণীভবনে বৈধব্যের সব নিয়ম পালন করতে হয়, থান পরা, নিরামিষ খাওয়া, একাদশী ইত্যাদি। তাতে আমি খুশি নই। শেষ পর্যন্ত সরোজনলিনীতে ভরতি করলাম। বাড়ি থেকে যাওয়া আসা করত। সাধারণ লেখা পড়া, দরজির কাজ, কারুকার্য, তাঁত, উল-বোনা, ক্রুশ বোনা, সব কিছুতে চার বছরে দক্ষ হয়ে উঠল সুরমা। বাড়িতে ওর মাস্টারি করে করে আমিও তাঁত ছাড়া সব কিছুতে এমনি দক্ষ হয়ে উঠলাম যে আমার মেয়ের বিয়ের সময় পর্যন্ত দরজি ডাকতে হল না!

চার বছরে সুরমা পাস্ করে পাকা দরজি হয়ে বেরোল। সেই ইস্তক নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বা আর কারো কাছ থেকে কখনো একটা পয়সা চায়নি, এমনি তার আত্মপ্রত্যয়। মনে হয় ঐটেই সব। প্রথমে আমার বন্ধুবান্ধবের চেষ্টায় দুটো একটা মহিলা-সমিতিতে সেলাই শেখানোর কাজ। তারপর সেই কাজের গুণ দেখে আরো প্রসার। শেষে বহু বছর বাটানগরের বালিকা বিদ্যালয়ে সেলাইয়ের টিচার। এখন সম্মানের সঙ্গে অবসর নিয়েছে। ঐ আত্মপ্রত্যয়টাই সব। মনে হত ওটি এক রকম অহংকার। জাঁক নয়, দেমাক নয়, নিজের গুণ গেয়ে বেড়ানো নয়, স্রেফ্ নিজের উপর বিশ্বাস, বিধাতার মঙ্গল-বিধানে অব্যক্ত আস্থা। যত দেখি তত আশ্চর্য হই। এখন নিজের চেষ্টায় আর মেয়ের কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্যে ছোট একটি সরকারি ফ্ল্যাট্ কিনেছে। সেখানে কয়েকটি মেয়েকে সেলাই শিখিয়ে অবসর জীবনকে কর্মময় করে তুলবে।

এর একটা অন্য দিক্‌-ও আছে। উপকারীর প্রতি প্রায় সব মানুষেরি মনে ক্ষোভ জমে থাকে। যে মানুষটা আমার দুর্বলতম মুহূর্তের সাক্ষী, তাকে ক্ষমা করা খুব সহজ নয়। তবু সুরমাকে আর তার. মেয়েদের নিয়ে আমার অনেক গর্ব। ওদের কাছে পেয়ে আমার মনের একটা বিশেষ জায়গা সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠেছিল। আমার প্রায় সব বড়দের উপন্যাসেই অনাথা, গৃহহারা অথচ লড়াই-করা মেয়েদের নিয়ে কারবার। ভঙ্গুর দুঃখিনীদেরো শেষ পর্যন্ত পায়ে বল জুগিয়েছে। একটা গোটা অনাথ পরিবারকে বলিষ্ঠ সুন্দর হয়ে উঠতে দেখে এ সব গল্প অংকুরিত হয়েছিল। বাস্তবের মধ্যে এদের প্রাণ। আমার গল্পে, হতাশা ব্যর্থতার স্থান নেই, তাদের নির্মূল করার ইঙ্গিত আছে।

সে যাই হক সাংসারিক কাজ যেমন বেড়ে গেল, তেমনি অনেকগুলি উৎসাহী সাহায্যকারিণীও পেয়ে গেলাম। যা কিছু বাস্তব বিদ্যে ছিল আমার, সব ওদের শেখাতে চেষ্টা করতাম। ওরা বুঝে নিয়েছিল সংসারের কোনো কাজ-ই ঘৃণ্য নয়, নোংরা দূর করা নোংরামি নয়। একবার ধাঙ্গড়দের ধর্মঘট হল। জমাদাররা ক-দিন এল না। সব বাড়িতে অভিযোগ, আমাদের ব্যড়িতে ছাড়া। এই সমস্তই আমার পুরস্কার। চারটে মেয়েই কাজ-কর্মে দক্ষ। দু-জন বিদেশে ঘরকন্না করছে।

এইসমস্ত দিয়ে মনের একটা পটভূমিকা তৈরি হল। এবার আমার মনের মধ্যে নিজেও একটা দিকদর্শন যন্ত্রের সন্ধান পেলাম। কিন্তু সচেতনভাবে অমুক বিষয়ে কিছু লেখা দরকার বলে কখনো লিখতে বসিনি। বড়দের যে অজস্র ছোট গল্প কলমের আগায় আসত, সবই রসের ব্যাপার। ছোটদের জন্য যা লিখেছি শুরু থেকেই তাও রসেরি ব্যাপার। ভাবি সাহিত্যরচনার প্রধান উপজীব্যই রস। উপজীব্য হলেও রস জমানো তার প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সে উদ্দেশ্য হল সত্যের উন্মোচন।

ক্রমে বয়স হতে চলল চল্লিশ, কিন্তু সেই অকালমৃত বদ্যিনাথের বড়ির পর কোনো বই প্রকাশ করবার চেষ্টাও করলাম না। ইংরিজিতে বাংলায় গল্প প্রবন্ধ ছাপা হত। গল্প সব বাংলায়। ছোটদের জন্য বড়ই পক্ষপাতিত্ব। পি-ই-এনের সদস্যা। শুনেছি সাহিত্যিক আড্ডায় নামকরা লেখকদের ছায়ায় গিয়ে বসলেও লেখার হাত খোলে। আমার সে-সব সুযোগ হয়নি। তবে বাপ-জ্যাঠাদের যে সুনিবিড় ছায়াতে শৈশব কেটেছিল, সেইটে কেমন করে আমার মনের মধ্যে এমন একটা চন্দ্রাতপ তৈরি করে রেখেছিল যে আর কিছুর আমার দরকার হয়নি।

আমার ভাগ্নী সুরমা একটা বড় ভালো কথা বলে, 'মুখ্যুরা সবচেয়ে ভালো শেখাতে পারে। আমি মুখ্যু ছিলাম বলে আমি ঠিক বুঝতে পারি আমার অল্পশিক্ষিত ছাত্রীদের কোথায় কোনটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে।' মনটা শুনে নেচে

উঠেছিল, ঠিক বলেছে সুরমা। অনেক জ্ঞান না থাকলে যে জিনিস বোঝা মুশকিল, মুখ্যুদের সেটা কি করে বোঝানো যায় ? যারা নিজেরা মুখ্যু ছিল, তারাই জানে কি করে বোঝানো যায়।

ভাবি আমার লেখার বেলাও তাই। কাজ চলার মতো মোটামুটি বাংলা ব্যাকরণ শিখে নিয়েছিলাম। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস শখ করে পড়েছি। সংস্কৃত আদৌ পড়িনি। কনভেন্টে ইংরিজি শিখেছি খুব ভালো করে, ইংরিজি সাহিত্য গুলে খেয়েছি—এখনি অত হিংসা, অত যৌন-কথা থাকে যে অখাদ্য লাগে। অবশ্যি ভালো বইও অনেক বেরোয়। বাংলাকে আমি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা মনে করি ; সংস্কৃতের ঠেকো না দিলেও চলে মনে করি ; যতখানি ঠেকো দরকার, খুঁজলে তাকে বাংলা ব্যাকরণেই পাব মনে করি। কিন্তু সাধারণ পাঠকরা যদি মানে বুঝতে না পারে তাহলে আমার সে লেখার কতটুকু সার্থকতা ! আমি তো পণ্ডিত নই, পণ্ডিতদের জন্যে লিখিও না, আমার সাধারণ দেশবাসীদের জন্যে লিখি। ভাষা যদি স্বচ্ছ হয়, তাহলে সব কথাই তাদের বোধগম্য হবে। এই মনে করে লিখি। ইচ্ছা করে সরল করি না, সহজ ভাষাতেই মনের মধ্যে চিন্তাগুলো আসে। সত্য বড় সরল হয়। জটিলতার সঙ্গে কুটিলতার সম্পর্ক থাকতে পারে বলে ভয় পাই। জল স্বচ্ছ, আলো স্বচ্ছ, আমাদের পূর্ব-পুরুষদের প্রার্থনাগুলোও তারি মতো স্বচ্ছ—অসতো মা সৎ গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়। ওর বেশি আমার কাম্য নয়। পণ্ডিতের বংশে জন্মেছি, পাণ্ডিত্যকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সাধারণের জন্য লিখি। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের জনসাধারণ লিখতে পড়তে জানে না, সে অন্য কাহিনী।

বলেইছি তো সাল তারিখ মনে পড়ে না। তবে এর কয়েক বছর আগে আমার মেজদি পুণ্যলতা চক্রবর্তীর বড় মেয়ে কল্যাণী হঠাৎ এক দুঃসাহসিক অভিযান করে বসেছিল। নিজের খরচে 'মেয়েদের কথা' বলে একটি মেয়েদের মাসিক পত্র প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিল। মন্দ ছিল না কাগজটি, যতদূব মনে হয় বেশির ভাগ মেয়েদের লেখাই বেরুত। তবে হয়তো বড্ড বেশি গম্ভীর বিষয় থাকত. খুব সরসতা করত না কেউ। যদিও কল্যাণী নিজে ভারি সরস ছিল। পরে সারা জীবন দুঃস্থ মেয়েদের উন্নতির জন্যে কাজ করেছিল, এখনো করে। কাগজে দু-একটা গল্প ইত্যাদি লিখেছিলাম। দুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে কাগজটি উঠে গেল। মেয়েদের কাগজের কথা খুব একটা না ভাবলেও, ছোটদের পত্রিকার কথা অনেক সময় মনে হত। ছোটদের পত্রিকা সম্পাদনা করব এ-কথা নয়, একটা মনের মতো কাগজ পেলে তাতে লিখি এই রকম ভাবতাম।

ছিল কিছু ভালো ছোটদের মাসিক পত্রিকা, তার মধ্যে মৌচাক, রামধনু এবং

আরো কিছু। আসল কথা হল এমন একটা কাগজ খুঁজছিলাম যার উপর নিজে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পারব। নিতান্তই দুরাশা, কি-ই বা আমার কৃতিত্ব যে এতখানি প্রতিপত্তি হবে! শৈশব থেকে সন্দেশ পড়ে মানুষ হয়েছি, ছোটদের কাগজ বিষয়ে কতকগুলো ধারণা মনের মধ্যে গড়ে উঠেছে, তা সে-সব কাজে লাগাবার সুযোগ পাচ্ছি কোথায়! বলা বাহুল্য বয়স্কদের বইপত্র সম্বন্ধে এমন কোনো উচ্চাশা পোষণ করাকে তখন ধৃষ্টতা মনে করতাম। ভালো করেই জানতাম বয়স্কদের প্রকাশক সম্পাদকরা প্রায় কেউই মনের দরজা খোলা রাখেন না। তখনো রাখতেন না, এখনো রাখেন কি না সন্দেহ।

ছোটদের বইপত্রের জগৎ আলাদা। ১৯৪৩, ৪৪, ৪৫ এর মধ্যে বেশ কিছু অতিশয় গুণী শিশু সাহিত্যিক দেখা দিলেও, উপেন্দ্রকিশোর বা যোগীন সরকারের পর কেউ সে রকম নতুন কিছু সংযোজন করেন নি। হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, দুঃসাহসিক অভিযানের চমৎকার সব মৌলিক ও ছায়া অবলম্বনে গল্প লিখলেও, ছোটদের পত্রিকার উপর বিশেষ কোনো নীতিগত পরিবর্তন আনেননি। একটা বিষয়ে উন্নতি হয়েছিল। সেটি হল পাঠকদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে। খুব কাজ হয়েছিল মনে হয় না। এই রকম আমার ধারণা ছিল। সবে তার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু সে-ও অনেকখানি বলতে হবে।

এমন সময় এক দিন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হল। সেই সুকুমার সুমুজ্জ্বল কামাক্ষীর বর্ণনা দেওয়া শক্ত। আমার চেয়ে হয়তো আট দশ বছরের ছোট, পাৎলা, ফরসা মানুষটি, চোখে সরল দৃষ্টি। এমন মিষ্টি মানুষ আমি কম দেখেছিলাম। ওর বাবা পরম জ্ঞানী আর ধার্মিক ছিলেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীটে ওদের বাড়িতে মাঝে মাঝেই ধর্মালোচনা হত। অন্য বিষয়েও আলোচনা হত। ওদের সকলকে ভারি উদারচেতা বলে মনে হত। কামাক্ষীর ছোটভাই দেবীকে ভালো লাগত। অল্প কথা বলত, বুদ্ধিমান। মনে আছে একবার ওদের বাড়িতে যামিনী রায় এসেছিলেন, শিল্প সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছু বলবেন। কামাক্ষী আমাকেও যেতে বলল।

গিয়ে দেখি চাঁদের হাট, বুদ্ধদেব, অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী, এবং বহু সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব। আমাকে অমিয়বাবুর পাশে বসাল। তখনো সভার কাজ আরম্ভ হয়নি। অমিয়বাবুর সঙ্গে সেই আমার শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার সময় থেকে প্রীতির সম্বন্ধ। এখনো তাই। ভাবলাম এই সুযোগে বুদ্ধদেবের বৈশাখীতে সদ্য প্রকাশিত অমিয়দার আধুনিক কবিতাটির মানে জেনে নিই। আমি আবার মানে না বুঝলে রস উপভোগ করতে পারি না, নিজেও পারি না আবার বন্ধুবান্ধবরা পারে বলেও বিশ্বাস করিও না।

কবিতাটির শুধু গোড়াটুকু মনে আছে,

"বিশুদ্ধ একজন নলিনীচন্দ্র পাকড়াশী,
মাছ, বা ল্যাংড়া আম—ইত্যাদি "

সত্যি বলছি আজ পর্যন্ত ওর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না। তা অমিয়দাকে মানে জিজ্ঞাসা করাতে, উনি কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। জীবনে কখনো ওঁকে কটু বা রূঢ় কথা বলতে শুনিনি। তখনো বলেননি। খালি বললেন, 'কবিতা লিখলেই কি তার মানে বলতে হয়ই ?' আমিও অবাচীনের মতো বললাম, 'লিখলেই বলতে হয় না। কিন্তু ছাপবার পর কেউ জানতে চাইলে নিশ্চয় বলবেন।'

শান্ত কোমল মানুষটি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, উঠে গেলেন। তারপর বুদ্ধদেবকে কি যেন বললেন। তারপর তাঁকে আর দেখতে পেলাম না। কবিতাটির মানেও জানা হল না। কিছুক্ষণ বাদে বুদ্ধদেব এসে ভারি বিরক্ত হয়ে বলল, 'খুব ভালো কাজ করা হল। কবিরা কত স্পর্শকাতর, তা ভুলে গেলে চলবে কেন ? উনি বাড়ি চলে গেলেন, বলছেন শরীর ভাল লাগছে না। এখন যামিনীবাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটা কাকে দিয়ে করাই ভেবে পাচ্ছি না।' যাই হক শেষ পর্যন্ত কাউকে পাওয়া গেছিল নিশ্চয়। আর কেউ এই খুদে নাটিকাটি লক্ষ করেছিল কিনা জানি না। অমিয়দার বহু সুন্দর কবিতা পড়ে যে গভীর আনন্দ পেয়েছি, তার কথা মনে করে আমার চুপ করে থাকা উচিত ছিল।

তা কামাক্ষী সেদিন এসে বলল, 'রংমশালের ভার নিয়েছি। একটা কিশোর উপন্যাস চাই।' এ আবার কেমন কথা ? উপন্যাস লিখেছি নাকি কখনো ? সে বলল, 'না লিখে থাকলে, এখন লেখবার সময় হয়েছে।' কিছুতেই ছাড়ল না। ধারাবাহিকভাবে বেরোবে। ওর কথা শুনে কেমন একটা শখ চেপে গেল। লিখেই ফেলা যাক। মুশকিল হল যে মাথায় আপনা থেকে গল্প না গজালে গল্প লিখতে পারি না। রাতে সেই কথা ভাবতে ভাবতে ঝপ করে একটা গল্প গজাল। সকালের আগে ডালপালা বিস্তার করে মনের মধ্যে একটা গাছ হয়ে গেল।

কামাক্ষী বলেছিল এই কাগজে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হট্টমালার দেশের তিনটি অধ্যায় বেরিয়ে বন্ধ হয়ে গেছিল। তাই ভয় ভয় করছিল। ওঁর গল্পের পর কি আমারটি জমবে ? এইখানে বলে রাখি এর ১৪/১৫ বছর পরে আমরা যখন বেতার বিভাগে কাজ করি, তখন প্রেমেন বাবু ঐ গল্প শেষ করতে সাহায্য করার সম্মান আমাকে দিয়েছিলেন। সম্প্রতি তার নতুন মুদ্রণ হচ্ছে।

সে যাই হক, কামাক্ষীর কথায় 'পদী পিসির বর্মী বাক্স' লেখা হয়েছিল। পাঠকরা মহাখুশি। পরের বছর 'ভয় যাদের পিছু নিয়েছে' ধারাবাহিক ভাবে

বেরুল। আরো পরে যখন বই হল, নাম হল তার 'গুপির গুপ্ত খাতা'। গুপি নাম আমি বড় ভালোবাসি। নাতিকেও ডাকি গুপি। কি ভালো নাম রংমশাল। তা-ও টিকল না। বছর ২/৩ এর মধ্যে উঠে গেল। আবার কেউ রংমশাল নাম দিয়ে একটা জোরালো ছোটদের পত্রিকা বের করলে পারে।

কামাক্ষীদের পাড়ায় শ্রীযুক্তা মীরা চৌধুরী বলে আমাদের এক পুরনো বন্ধু থাকতেন। আমার মেসোমশাই সুরেন মৈত্রের ভাইঝি। আমার চাইতে কয়েক বছরের বড়। নানা রকম সমাজসেবার কাজে জড়িয়ে থাকতেন। তাঁর ডাকনাম বাবলি। বাবলিদি এখনো আমার প্রিয় বন্ধু। এক দিন কামাক্ষীর ভাই দেবী এসে আমাকে বলল, বাবলিদি শ্রীমতী নাম দিয়ে একটা মেয়েদের মাসিক পত্রিকা বের করছেন, আপনার সহযোগিতা চাইছেন।'

'মেয়েদের কথা'র স্বল্পায়ুতা দেখেও আমার শিক্ষা হয়নি। শ্রীমতীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। বাবলিদি বললেন, 'একটা আধুনিক কালের মেয়েদের নিয়ে ধারাবাহিক গল্প দাও। তার প্রধান চরিত্ররা হবে মেয়ে এবং শেষটা হবে সুখের।' এখন আর আমি উপন্যাস-টুপন্যাস দেখে ঘাবড়াই না। 'শ্রীমতী' বলে আমার বয়স্কদের জন্য প্রথম উপন্যাস লেখা হল। তারপর 'জোনাকি' লেখা হল। সবই আজকালকার (মানে ৩৫ বছর আগেকার) মেয়েদের নানা সমস্যা নিয়ে, গল্পের শেষে ভালো ভালো পাত্রের সঙ্গে সকলের বিয়ে দিয়ে দিলাম। সবাই খুব খুশি। মাঝেমাঝে সম্পাদিকার অনুপস্থিতিতে দেবীতে আমাতে সম্পাদনার কাজও সারতাম। বলা বাহুল্য কিছুদিন পরে বাবলিদির শখও মিটে গেল, অন্য কাজেও বিব্রত হয়ে পড়লেন, কাগজও উঠে গেল। ততদিনে বয়স্কদের জন্য উপন্যাস লেখায় সাহস জমেছে বুকে। সেই সঙ্গে মনে মনে এও বুঝেছি বড়দের চাইতে ছোটদের জন্য লেখায় আনন্দ বেশি। সার্থকতাও। এ-কথা জেনেও আরো অনেকগুলো বড়দের উপন্যাস লিখে ফেললাম।

তা লিখলে কি হবে! ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত আমার আর কোন বই ছাপা হয়নি, কোন প্রকাশক আমার কাছে আসেননি, আমিও কোন প্রকাশকের কাছে যাইনি। ওদিকে বাড়ি ভরা পড়ুয়ার দল ক্রমে বড় হচ্ছে, আমার এতটুকু ফুরসৎ থাকছে না। একদিকে প্রাইভেট টিউটর আর অন্য দিকে বাড়ির দরজি। বাইরের কাজ যতই কমিয়ে আনি, ঘরের কাজ ততই বাড়ে। ঘরের কাজও যতই বাড়ে মনের ভিতরকার গল্পগুলো ডানা ঝাপটিয়ে, পালক উড়িয়ে, দম বন্ধ করে আনে। রাত এগারোটা অবধি লেখা ধরলাম। সব গল্পের প্রথম শ্রোতা বাড়ির সাতজন নানা বয়স্ক বাসিন্দা। ভারি তরতাজা তাদের কাঁচা কাঁচা অনভিজ্ঞ মতামত। অমনি আন্দাজ করে নিতাম পাঠকরাও কি বলবে। মাঝে মাঝে একটু-আধটু বদলাতাম। ছোটবেলায় আমার ভাই-বোনদের কাছে যা পেতাম, মাঝবয়সে

এদের কাছেও সেই সরল স্পষ্টবক্তার মন্তব্য শুনতাম।

এর মধ্যে একটা শনিবার মেট্রোতে তিনটের ছবি দেখে বেরোতেই আমার ভাইপো মানিক, অর্থাৎ সত্যজিৎ বলল, 'তোমার সব ছোটদের গল্প আমাকে দেবে ? বই হবে।' বললাম, 'কে বই করবে ?' ও বলল, 'এ-দেশের সবচেয়ে ভালো প্রকাশক।' বললাম, 'কে সে ?' সে বলল, 'সিগনেট প্রেস'। আমি বললাম, 'তুই তার সঙ্গে জড়িত আছিস ?' মানিক বলল, 'আছি !' অমনি রাজি হয়ে গেলাম। পরে বদ্যিনাথের বড়ির সব গল্প এবং আরো কতগুলি বাছাই করা গল্প নিয়ে গেল মানিক। বলে গেল ও-ই ছবি আঁকবে।

১৯৪৮ সালে 'দিন-দুপুরে' বেরোল। এবং দিলীপ গুপ্ত বলে একজন অবিস্মরণীয় মানুষের সঙ্গে আমার চেনাজানা হল। আর আমি ফিরে চাইনি। সাহিত্যের দুর্গম পাহাড়ের একটি ধাপে দিলীপ আমাকে পা রাখার জায়গা করে দিল। যদিও সে আমার চেয়ে ১০ বছরের ছোট ছিল। তার কথা পরে বলা যাবে। তার আগে ভারতের স্বাধীনতা-লাভের কথা না বললে লোকে আমার নিন্দা করবে। যদিও সত্যি সত্যি কতখানি স্বাধীনতা হয়েছে, সে বিষয়ে এখনো খট্‌কা লাগে।

ভাবি স্বাধীনতা আবার কাকে বলে ? প্রথম মহাযুদ্ধের পর শিলং-এ কখনো স্বাধীনতার কথা শুনিনি। খালি কয়েকজন বলিষ্ঠ নির্ভীক যুবককে একবার একটা বড় জলপ্রপাতের মুখ বেয়ে বেয়ে উঠতে দেখেছিলাম। বড়রা বলেছিলেন, 'ওরা বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্কুলের ছাত্র। ওদের প্রাণে ভয়-ডর নেই।' কেন জানি না স্বাধীনতার কথা বললেই তাদের চেহারা মনে পড়ত। বারো তেরো বছরে কলকাতায় এসে অবধি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহস, ত্যাগ, আদর্শবাদ ইত্যাদির কথা শুনে এসেছিলাম। সুভাষ, চিত্তরঞ্জন, গান্ধী ইত্যাদির কথা জানলাম। সন্ত্রাসবাদীদের কথাও জানলাম। কিন্তু কারো কাছে স্বাধীনতার নগ্ন চেহারাটা কেমন হবে শুনলাম না।

ভাবতাম ব্রিটিশরাই আমাদের শত্রু। ওদের তাড়াতে পারলেই দেশটা সঙ্গে সঙ্গে একটা মহান শক্তিতে পরিণত হবে ইত্যাদি। হল যখন স্বাধীন, প্রথমটা অত টেরই পাওয়া গেল না। সবই আগের মতো, তবে আগের চেয়ে কাজে একটু ঢিল দিয়ে চলতে লাগল। দিল্লিতে ইংরেজ বড়লাট রইলেন। তিনি নাকি আমাদের স্বাধীন হবার পথ খোলতাই করে দেবেন। বেকুব বনে গেলাম। কে বন্ধু কে শত্রু গুলিয়ে গেল।

ব্যাপকভাবে দাঙ্গা হল। কত লোকের যে কত ক্ষতি হল তা বলবার নয়। দলে দলে উদ্বাস্তু এল। ত্রাণ শিবির হল। বেথুন-কলেজের পেছনে একটা কেন্দ্র হল। সেখানে বছর দেড়-দুই বয়স্ক শিক্ষা মক্স করলাম। হ্যাঁ, বলতে ভুলেই

যাচ্ছিলাম আমাদের নিজেদের জাতীয় সঙ্গীত হল, দেশ দু-ভাগ হল, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে স্বাধীনতা উৎসব হল। লোকের বাড়িতে বাড়িতে ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ সালে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি হল। মনে আছে আমাদের তামিল বন্ধু ডাক্তার কৃষ্ণনের বাড়িতে ভোজসভা হল। খাওয়া-দাওয়ার পর, রাত বারোটায় বেতার-কেন্দ্র থেকে বিশেষ স্বাধীনতা অনুষ্ঠান হল। তাতে অমল হোম, কালিদাস নাগ এবং আরো অনেকে পরাধীন যুগে লেখা নানা রকম স্বাধীনতার কবিতা, গান, প্রশংসাবাণী পাঠ করলেন, চমৎকার সব দেশপ্রেমের গান হল। রাত বারোটার পর অনুষ্ঠানের শেষে ঘোষণা করা হল এত কষ্টের পর দেশ এবার স্বাধীন হয়েছে। তোমরা জয়ধ্বনি দাও।

তাজ্জব বনে গেলাম। স্বাধীনতা লাভ করার পর তো কেউ আর স্বাধীনতার গান লেখে না, প্রশংসা করে না। দেশকেও বোধহয় এখন আর কেউ ভালোবাসে না। খালি নিন্দে করে আর সুবিধে পেলেই বিদেশে গিয়ে রাশি রাশি টাকা কামায় আর যারা যেতে পারেনি তাদের ঈর্ষার কারণ হয়। কেবলি শুনি ও-সব দেশের জীবনযাত্রা কত আরামের, কত ভালো, এই পোড়া দেশে কেউ থাকে নাকি। কই কেউ তো আর বলে না এই দেশ আমার মা। মায়ের মতো কেউ নেই আমার। আমার গভীর দুঃখী মায়ের চোখের জল আমি মুছিয়ে দেব। প্রাণ-পাত করে দেশকে বড় করতে চেষ্টা করব। আমরা সৎ হব, সৎসাহসী হব, পরিশ্রমী হব, বিশ্বাসযোগ্য হব, বলিষ্ঠ হব, জোরাল হব, ভালোকে ভালো বলব, মন্দকে মন্দ বলব। আমরা ছাড়া কে আমাদের মায়ের দুঃখ ঘুচোবে!

আর তো কেউ এ-সব বলে না।

তবে ১৯৪৭ সালে ঠিক করলাম দেশটা এখন স্বাধীন হয়েছে, এবার ছোটবেলাকার সেই আমার স্বপ্নের শহরটাকে দেখে আসি। সেখানকার কনভেন্টের ফিরিঙ্গিরা আমাদের নেটিভ বলত। এখন সে জায়গা কেমন হল দেখে আসি। ঐ বছর পুজোর সময় আমার ছোট বোন লতিকা, আমার ছেলে, মেয়ে আর আমি শিলং গেলাম। সুরমা, তার মা আর মেয়েদের সঙ্গে কাশী গেল। অক্টোবরের কাশীও নাকি বড়ই উপভোগ্য।

॥ ৭ ॥

১৯৪৭ সালের পুজোর ঠিক আগে শিলং গেলাম। সেখানে নেহাৎ জলে পড়ব না। সেখানে মোটর কোম্পানিতে আমার বড়পিসিমার নাতি অশোক কাজ করে। লাইমখ্‌রাতে সপরিবারে থাকে। অশোকের মা আমার বৌদিও থাকেন। অশোক আমার মা-বাবার কাছে ৮/৯ বছর বয়স থেকে মানুষ, আমার সহোদর ভাইদের চেয়ে কোনোদিক দিয়ে আলাদা নয়। আমার চেয়ে দুই বছরের ছোট।

সে গৌহাটি এসে তার স্টেশনওয়াগনে করে আমাদের নিয়ে যাবে। প্রায় এক মাস তার কাছে থাকব।

২৭ বছর পরে শিলং যাচ্ছি। বারো বছর বয়সে শেষ দেখা শিলঙের প্রতিটি নীল সবুজ পাহাড়ের চুড়ো আমার মুখস্থ, শহরের পথ-ঘাট, গাছপালা, বাড়ি-ঘর, খেলার মাঠ, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, গল্ফ-গ্রীন, চোখ বুজলেই দেখতে পাই। মনে করলেই সরল গাছের বনের মধ্যে বাতাস বইবার নিরন্তর শোঁ-শোঁ শব্দ শুনতে পাই। শিলং আমার মনের মধ্যে গাঁথা ছিল ; তার কিছু ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব। অনেকগুলো খাসিয়া কথাও হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মাছকে বলে ভখা, অ-খাসিয়ারা উদ্‌খার, ভগবান উবনোই। মেয়েদের নামের আগে কা থাকবে, পুরুষদের নামের আগে উ। সেই সব স্নেহময়ী দাসীদের চেহারা মনে পড়ল, যারা আমাদের সব সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী ছিল ; যাদের কোল ঘেঁষে বসে ছোটবেলা থেকে কত ভয়াবহ গল্প শুনে শিউরে উঠে তাদেরি গায়ে পিঠ মুখ ঘষতাম ; যাদের থলি থেকে পানের বোঁটা খাবার বাসনা কিছুতেই দমন করতে পারতাম না। ভাবলাম সবাই নিশ্চয় মরে যায়নি। অনেকের বাড়ি আমার চেনা ছিল, সেখানে যাবার পথ জানা ছিল। বলা বাহুল্য তাদের কাউকে খুঁজে পাইনি। স্বপ্ন ভেঙে গেলে আর কি তাকে ফিরে পাওয়া যায় ? মনে আছে পূজা কন্‌সেশন পাওয়া গেল। কিছু কম দামে সেকেণ্ড ক্লাসে বার্থ রিজার্ভ করা হল। সেকালে চারটে ক্লাস ছিল। আমরা সাধারণত সেকেণ্ড ক্লাসেই যেতাম। খুব আরামের ব্যবস্থা থাকত। দুঃখের বিষয়, সেটি ছিল মহালয়ার আগের দিন। শিয়ালদায় আমাদের করিডর ট্রেন অপেক্ষা করছিল। আমাদের খুদে কম্পার্টমেণ্টে আমরা পাঁচজন্—লতিকা,আমার ছেলেমেয়ে, আমি এবং কল্যাণী, সে কবি জীবনানন্দ দাশের আত্মীয়া।

ভেবেছিলাম বেশ আরামেই যাওয়া যাবে, সবাই মিলে গল্প করতে করতে সান্তাহার অবধি যাওয়া যাবে। সেখানে গাড়ি বদল করে মিটার গেজে উঠতে হবে। বার্থ রিজার্ভ করা থাকবে। সেই সুযোগে নতুন দেশ পূর্ব পাকিস্তানটাকে দিব্যি দেখে নেওয়া যাবে। সঙ্গে যথেষ্ট খাবার-দাবার নেওয়া হয়েছে। সেকালে রেল-ভ্রমণ একটা আনন্দের ও আরামের ব্যাপার ছিল।

শিয়ালদায় গাড়ি ছাড়বার আগেই স্বাধীনতার প্রথম আস্বাদটুকু মুখে লাগল। দলে দলে ইণ্টার আর থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা (নিশ্চয়ই ঐ সব ক্লাসে জায়গা না পেয়ে) আমাদের গাড়িতে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে বাইরের গলি পথটাতে নড়বার জায়গা রইল না। তখন তারা আমাদের খোপটুকুতে আসবার চেষ্টা করতে লাগল। আমরা দরজা খুলিনি। আর শুধু শিয়ালদায় নয়, যেখানেই গাড়ি থামে, সেখানে দলে দলে হাসিমুখে লোক ওঠে। দেশ স্বাধীন হবার পর

এই তারা প্রথম 'বাড়ি' যাচ্ছে। 'বাড়ি' যে এক মুলুকে আর তাদের আবাস যে অন্য মুলুকে, সেই তিক্ত অভিজ্ঞতা তখনো তাদের হয়নি। মহা খুশি হয়ে তারা পূর্ব পাকিস্তানে 'বাড়ি' যাচ্ছে। তখনো পাসপোর্ট বা ভিসার নাম শোনেনি কেউ। সুখের বিষয় সান্তাহারে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, গাড়িও খালি হয়ে গেল। পূর্ব-পাকিস্তানের অতি ভদ্র কর্মচারিরা (যারা ৬ মাস আগেও আমাদের ভাই-ব্রাদার ছিল) আমাদের নতুন ট্রেনে জায়গা খুঁজে দিলেন। সেকালে ৫টা বার্থ নিলেই সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ি রিজার্ভ করা যেত।

গাড়িতেই আমাদের জন্য গরম খাবার এল। সেকালে রেলের রেস্তোরাঁর খাবারের মতো সস্তা ও সুস্বাদু খাবার অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। আমরা তখনো স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হবার সময় পাইনি বলে পরাধীন জীবনের নিয়মগুলোই চলে আসছিল।

যথা সময়ে গাড়ি ছাড়ল। তার আগে গার্ড এসে বলে গেলেন দরজা-জানলা ভেতর থেকে যেন বন্ধ করে রাখি এবং গাড়ি চলা-কালে কোনো মতেই যেন না খুলি। তা বাইরে থেকে যে যাই বলুক। রিজার্ভ গাড়িতে অন্য যাত্রী উঠতে পারে না।

গাড়ি ছাড়বার ১০ মিনিটের মধ্যে বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কাধাক্কি—'ও দিদি, দরজা খুলুন, নইলে পড়ে মরব। তাড়াতাড়ি অন্য গাড়িতে না উঠে ভুলে এখানে উঠেছি। পরের স্টপেই নেমে যাব।' বলা বাহুল্য আমরা কান দিইনি। ভাগ্যিস গার্ড সাবধান করে দিয়েছিলেন। নইলে ওর ঐ কাতর—'এই পড়ে গেলাম, এই মরে গেলাম' শুনে কি হত কে জানে। তার ওপর ছেলেকে জ্বর গায়ে নিয়ে যাচ্ছি। এক সময় দুত্তোর বলে সম্ভাব্য ডাকাতটি খসে পড়ল, আমরাও বাকি রাতটা অঘোরে ঘুমোলাম।

সকালে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে আমিনগাঁও ঘাটে গাড়ি পৌঁছল। তখনো রেলের পুল তৈরি হয়নি, নদী পারাপার হতে হয় স্টীমারের সঙ্গে জোড়া 'ফ্ল্যাট'-এ চেপে। ফ্ল্যাটের দোতলা চারদিক খোলা চমৎকার একটা বৈঠকখানাঘরের মতো। খাবার ঘর, ছোট ছোট ক্যাবিন, গোসলখানাও ছিল। আমি অত লক্ষ্য করিনি গোড়ায়। এই সেই ব্রহ্মপুত্র। এই নদীই মৈমনসিংহে আমার পিতৃপুরুষদের নিবাস, সেই গালগল্পে মুখর কিশোরগঞ্জের পাশ দিয়ে বয়ে যায়। এরি তীরে আমাদের গ্রাম মসূয়া। ছোটবেলায় শুনেছিলাম ছয় মাইল খাতের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদ কেবলি দিক বদলায়। কখনো বাঁ তীর, কখনো বা ডান তীর ঘেঁষে চলে। যদিও হিমালয় ভেদ করে আসার সময়কার রূপের সঙ্গে এই নদীর তুলনা হয় না, তবু বর্ষায় তার সংহারিণী সৌন্দর্য দেখলে বুক কাঁপে, হৃদয় মুগ্ধ হয়।

আমরা তার কিছুই দেখলাম না, তবু মনে হল এমন সুন্দর নদী আর হয় না। চওড়া, গভীর, দূরে সকালের আলোয় একটা অপূর্ব সুন্দর দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। কে যেন বলল ঐ উমানন্দ, ওখানে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি জল আছে, কত তীর্থযাত্রী ডুবে মরেছে। মনে পড়ল যখন এম· এ· পড়তাম গৌরাঙ্গবাবু বলে আমাদের গ্রন্থাগারিক সপরিবারে ওখানে প্রাণ হারিয়েছিলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আজ দেখলাম শুশুক মাছ সকালের রোদে ডিগবাজি খাচ্ছে, গা থেকে জল ঝরছে।

দেখতে দেখতে পাণ্ডুঘাটে জাহাজ লাগল। অশোক সেখানে গাড়ি নিয়ে এসেছিল। সেখান থেকে গৌহাটি গেলাম। পথে কামাখ্যা পাহাড় দেখতে পেলাম। এ-সবই আমার চেনা নাম। তবে শেষ দেখা ২৮ বছর আগে। চেহারাগুলো কেমন ভুলে ভুলে গেছিলাম। আবার দেখে প্রাণ জুড়ল। গৌহাটি তখনো আসামের রাজধানী। দেশ সদ্য স্বাধীন, বিশেষ কোনো অদল-বদল হয়নি, নতুন ব্যবস্থা খুব বেশি মালুম দেয় না। দৈনন্দিন জীবন তো নয়ই।

দুপুরে এক জায়গা খাওয়া-দাওয়া করে, অশোকের ল্যাণ্ডরোভার চড়ে বিকেলের মধ্যে রওনা হলাম। যতই পাহাড়ের দিকে এগোই ততই আমার শৈশবটা আমার নাড়ি ধরে, স্নায়ু ধরে টানাটানি করে। তখনো বড়পানি—নদীতে বাঁধ দিয়ে বিজলী-সরবরাহের উদ্দেশ্যে বিশাল জলাধার হয়নি। সেই চেনা সুন্দরী বড়পানিকে দেখতে পেলাম। আমার কথা বন্ধ হয়ে গেছিল, মনে হচ্ছিল এই ২৮ বছরে কিছুই বদলায়নি। প্রকৃতি বদলায় না, মানুষের হাত না পড়লে। সেই পাহাড়, সেই আঁকাবাঁকা পাহাড়ে পথ, সেই একদিকের খাদের নিচে বড়পানি নদী তার জলের সম্ভার নিয়ে পাথরের ওপর দিয়ে ফেনা ছিটিয়ে ছুটে চলেছে। সেই নংপোর ঘর-বাড়ি, চায়ের দোকান। কুয়াশার সেই সুগন্ধ। মাঝখানের এই ২৮ বছরের সুখই বা কি আর দুঃখই বা কি? মনের মধ্যে সব গুলিয়ে যেতে লাগল। আমার ছাড়া আর কারো শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে এ-সব পথ জড়িয়ে নেই। আহা, ঐ তো বাঁ হাতের স্রোতস্বিনীর ওপর সেই ময়দা পেশার কলের মস্ত চাকা তেমনি ঘুরছে! শেষ যখন দেখেছিলাম ওরি সামনে পথের ধারে গরুর গাড়ির গরু খুলে দিয়ে, কাঠের জ্বালে কালো হাঁড়িতে গাড়োয়ানরা রান্না চাপিয়েছিল। আজো তাই দেখলাম। বুকের মধ্যে অতীতকে নিয়ে চললে পদে পদে তার দেখা পাওয়া যায়।

মনে পড়ছিল ডান হাতে বিশপ-বিডন ফল্‌স্ দেখার পথ। তাকে চিনতে পারলাম না। এত বাড়িঘর তো ছিল না! টিলার ওপর বাজার বসত। মনে হচ্ছিল খুব উঁচু টিলা, কতবার চড়েছি। তার ধাপে ধাপে আর পায়ের কাছে কি সুন্দর করে ফল তরকারি সাজিয়ে বসত মেয়েরা। এইখানেই কোথাও ছেলেদের

হাইস্কুল যাবার পথ। দাদা, কল্যাণ সেখানে পড়ত। মনে পড়ল স্কুলের গোল পিতলের ঘণ্টা একটা উঁচু ঝাউগাছে ঝুলত। তার ওপর দু-বার বাজ পড়েছিল। আমরা বাঁ দিক দিয়ে লাইমোখরা যাবার পথ ধরলাম। ও-সব পুরনো চিহ্ন খুঁজে পেলাম না।

এই দিকেই তো পুলিস-বাজার। সেখানে ২৮ বছর আগেও বিপিনবাবুর দোকান থেকে পরস্পরের জন্মদিনের উপহার কিনতাম। চার ছয় আনায় কি ভালো ভালো জিনিস পাওয়া যেত। দিদি আমাকে একটা আঙুর-পাতার মতো মিনে করা ব্রুচ্ দিয়েছিল আমার ১০ বছরের জন্মদিনে। সেটা কবে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি বলে বেজায় দুঃখ হতে লাগল। দিদি ছয় আনা দিয়ে ব্রুচটা হয়তো কিনেছিল, কিন্তু এখন আমার কাছে তার দাম আমার সমস্ত শৈশবের সমান। এক সময় অশোকের বাড়িতে পৌঁছলাম। সেণ্ট এড্মাণ্ডস্ স্কুলের পেছনে এই বসতির বদলে তখন ছিল সরল বন। তার তলায় তলায়, বুনো ভায়োলেট ফুল ফুটত। মাঝে মাঝে বসন্তকালে প্রকৃতির শোভা উপভোগ করতে শেখাবার জন্য আমাদের এখানে নিয়ে আসা হত। আমরা গোছা গোছা ফুল কুড়োতাম। গাছের ডালে বেগনির ওপর ছিট ছিট অর্কিড্ ফুটতে দেখেছিলাম। আমার মধুর শৈশবের সঙ্গে তারাও কোথায় বিদায় নিয়েছে। রেখে গেছে বাঁধানো সড়ক, তার দুধারে ছোট ছোট বাগান-যুক্ত সারি সারি টিনের চাল দেওয়া ছোট ছোট বাড়ি।

দু-দিন মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ল। ছেলেটার জ্বরও ছাড়েনি। তারপর প্রথম যেদিন রোদ উঠল, আমার ছোটবেলার জায়গাগুলো সবাইকে দেখাতে নিয়ে গেলাম। সেণ্ট এড্মাণ্ডসের সামনের টিলার মাথায় লোরেটো কন্ভেণ্ট আর তার পাশে চমৎকার গির্জা। নিচের সড়ক থেকে পাকদণ্ডীর মতো পথ উঠে গেছে। ওপরটাকে সমান করে ঘর বাড়ি, বাগান করা হয়েছে।

সে-সব খুঁজে পেলাম না। শুনেছিলাম আগুন লেগে স্কুলের কাঠের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছিল দু-দু বার। এবার অনেকটা নিচে, পাহাড়ের গা কেটে স্কুলবাড়ি হয়েছে। সে গির্জাও নেই। তার বদলে ভারি আভিজাত্যময় ধনী চেহারার এক চমৎকার গির্জা। নাকি বিদেশের ভক্তদের চাঁদায় তৈরি হয়েছে। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেখে আসব। গির্জার ভেতরটা এখনো সেই রকম সুন্দর গম্ভীর কিনা দেখে আসব। সব উৎসাহ চলে গেল। বুঝতে পারলাম এ সবের সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নেই।

হাই – উইন্ড্স্ নামে যে লম্বা বাড়িটির স্মৃতি আমার মনের একটি কোমল উষ্ণ কোণ জুড়ে বিরাজ করত, মন খারাপ হলে তার এক সারি আলোকিত

জানলা দিয়ে আমাকে আদর করে ডেকে নিত, সে-ও দেখলাম অন্যরকম দেখতে হয়েছে।

পশ্চিম দিকের মস্ত ঝাউগাছটি নেই। তার পায়ের কাছটি ঘিরে মা ভায়োলেট ফুলের গাছ লাগিয়েছিলেন। কাছে গেলেই তার মিষ্টি গন্ধ নাকে আসত। বাড়ির সামনের যে ন্যাসপাতি গাছে আমি গাছে-চড়া শিখেছিলাম, যার মিষ্টি ফলের স্বাদ এখনো আমার মুখে লেগে আছে, তাকেও দেখতে পেলাম-না। পূর্বদিকে তিনটি মস্ত মস্ত গন্ধরাজ লেবুর গাছ ছিল। সেখানে আমাদের সুইট-পী ফুটত। তার জায়গায় একটা বড় গন্ধরাজ।

বলা বাহুল্য বাড়ির তখনকার বাসিন্দারাও আমাদের প্রতি কোনো আগ্রহ দেখাননি। তবু আজ পর্যন্ত শিলং বললেই আমার সেই ছোটবেলাকার শিলং-এর চেহারাই মনে পড়ে। কালের জবর-দখলীদের আমার মন মানতে চায় না। দেখলাম যেখানে যেখানে মানুষের হাত পড়েনি সেখানেই আমার ছোটবেলাটি আঁকড়ে রয়েছে। নদীর জল কমে গেছে, বন পাতলা হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ নতুন বাড়ি। কিন্তু পাহাড়ের আকৃতি তেমনি আছে, তেমনি নীল নভোতলে রূপোলী তুলি দিয়ে আঁকা ছবির মতো বহুদূরের হিমালয় দেখতে পেলাম। সেই সব ছোটবেলাকার প্রিয় পাহাড়ি ফল আরেকবার চেখে দেখলাম। টক লাগল। তবে সে সময়ও মা বলতেন—বড্ড টক, কি করে খাস?

সব পুরনো জায়গাগুলো একবার করে ঘুরে দেখে এলাম। মনের মধ্যে কয়েক বছর ধরে ঐ বিশেষ জায়গাটির জন্য যে আঁকু-পাঁকু ভাব জমেছিল, সেটি শান্ত হল। আসলে আমার ছোটবেলাকার শিলং ছিল ভারি পরিচ্ছন্ন কোমল সাহেবী ভাবাপন্ন ; অতি সুন্দর প্রকৃতির মাঝখানে বসানো, অতি আরামের একটি ছোট শহর। গল্ফ খেলা, টেনিস খেলা, ঘোড়দৌড়, ফুটবল, মিলিটারি কুচকাওয়াজ, পিকনিক ইত্যাদির কোনোটাকেই এদেশে উদ্ভাবন বলা চলে না। কিন্তু এখানে তাদের চেহারায় আগ্রহ ছিল, উগ্রতা ছিল না, রেষারেষি ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না। কেমন যেন মিলেমিশে সকলে সুখে বাস করত। সাহেবরা 'নেটিভ' শব্দ ব্যবহার করত, স্কুলে মাঝে মাঝে 'নেটিভ' মেয়েদের ওপর অবিচার হত। কিন্তু যখন দেখা গেল ক্লাসে তারাই বেশি নম্বর পায়, এমন কি ইংরিজিতেও, তখন সবাই মেনে নিত। আমাদের স্কুলের খাঁটি মেম শিক্ষিকারা দিশি মেয়েদের ওপর কখনো অন্যায় করতেন না। ফিরিঙ্গিদের কথা আলাদা।

হয়তো চা-বাগানের সাহেবরা, গল্ফ-উৎসাহীরা, মিলিটারি সাহেবরা, আই-সি-এসরা, জায়গাটার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতেন। মোট কথা, বড় ভালো জায়গা ছিল, যেমন সুন্দর তেমনি আরামের ; খুব শীতও না, খুব গরমও না। সেই পুরনো শহরে আমার মন বাস করে, এখনকার শহরে নয়। তারপর আরো

৩৫ বছর কেটে গেছে। শুনেছি এখন মশারির তলায় শুতে হয়, শীতকালেও বড় একটা জল জমে বরফ হয় না। দলাদলি আছে। এ জায়গায় আমার বাস ছিল না। একদিন-ও ঘুঘু পাখির ডাক শুনিনি।

খুব ঘটা করে দুর্গাপুজো হল। কালীপুজো হল। তারপর আমার স্বামী একদিন এসে আমাদের নিয়ে এলেন। অশোকের মা, স্ত্রী ছেলেমেয়েদের মিষ্টি ব্যবহারে সুখে কেটেছিল সময়।

এর আগে রাতে ঘুমিয়ে মাঝেমাঝেই স্বপ্ন দেখতাম শিলং-এ ফিরে গেছি। মনটা উদ্বেল হয়ে উঠত। ফিরে এসে আজ পর্যন্ত আর কখনো আমি শিলং-এর স্বপ্ন দেখিনি।

ফিরে এলাম ১৯৪৭ সালের শেষের দিকে। ততদিনে মানিক সত্যি সত্যি আমার বইয়ের কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছিল। দিলীপ গুপ্ত বলে একজন অসাধারণ মানুষকে একদিন সে সঙ্গে করে নিয়ে এল। দিলীপের মামা মামী মা বোন আমার অচেনা হলেও, আমার স্বামীর অচেনা নয়। দিলীপ আমার চেয়ে ১০ বছরের ছোট ছিল, মানিক ১৩ বছরের ছোট। আমার ৩৯ শেষ হয়ে এসেছে, ওদের ২৯ আর ২৬। খুব একটা অভিজ্ঞ বলা চলে না। দুজনেরি দু-রকমের জন্মগত প্রতিভা। দিলীপকে আমি একটি অসাধারণ চরিত্র বলে মনে করি। আমার সারা জীবনে এমন আরেকজন প্রকাশক দেখলাম না। দিলীপ তার লেখকদের লেখা সবচেয়ে আকর্ষণীয় ভাবে ছেপে ও প্রকাশ করে, সবচেয়ে বেশী লাভ ও খ্যাতি পাবার কথা চিন্তাও করত না। সে অন্য ধাতুতে গড়া ছিল।

আমার বারে বারে মনে হয়েছে দিলীপ তার লেখকদের মধ্যে থেকে তাদের শ্রেষ্ঠ সম্ভাব্য সৃষ্টি প্রস্ফুটিত করিয়ে নিতে জানত। কার দৌড় কতখানি এক নিমেষে বুঝে নিতে তার খুব অসুবিধা হত না। আমার লেখা যদি ভালো হত, আমার বই যদি লোকের ভালো লাগত, দিলীপ বোধ হয় আমার চেয়েও বেশি খুশি হত। কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস তার হাত থেকে বেরোত না। সব দিকে তার চোখ ছিল, কাগজ ভালো, কালি ভালো, মলাট ভালো, ব্লক ভালো, ছবি ভালো, লেখক ভালো। সম্ভাব্য লেখককে কেমন করে তার স্বকীয়তা নষ্ট না করে দিয়ে, প্রথম শ্রেণীর লেখকে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়, দিলীপ তা জানত। প্রতিভা খুঁজে বেড়াত সে, তার মাথায় একটা গাইগার কাউন্টার ছিল গুণ খুঁজে বের করার। অজেয় রায় বলে আমাদের এক অপেক্ষাকৃত কম-বয়সী লেখক বন্ধু আছেন। তিনি একটা বড় ভালো কথা বলেন। তিনিই হলেন উত্তম প্রকাশক যিনি সাহিত্যরসিক, সাহিত্যপ্রেমিক, সাহিত্যজ্ঞ, কিন্তু যাঁর নিজে বিখ্যাত সাহিত্যিক হবার বাসনা নেই। তবেই তিনি নিজেকে নিয়ে নিবিষ্ট না থেকে, অন্য সৃষ্টিকারদের তৈরি করতে পারবেন। শ্রেষ্ঠ প্রকাশক শুধু তৈরি করা বই ছেপে

বিক্রি করেন না। তিনি সম্ভাবনাময় লেখক চিনে, তাকে দিয়ে উত্তম সাহিত্য রচনা করান। এ একটি বিধিদত্ত গুণ, হীরের চেয়েও মূল্যবান, হীরের চেয়েও বিরল। এত অল্প সময়ের মধ্যে দিলীপের প্রকাশক জীবন যে শেষ হয়ে গিয়েছিল সেটা বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য।

কত কথাই মনে পড়ে। আদর করে পাণ্ডুলিপি প্রায় মাথায় তুলে নিয়ে গেল। ছবি আঁকবে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিভা যার। সে সত্যজিৎ। অতি আড়ম্বর দিলীপ সইতে পারত না, আনাড়ি কাজ, ভুল ত্রুটি বরদাস্ত করত না। তারপর একদিন এক প্যাকেট বই, এক বাক্স সন্দেশ, এক গোছা ফুল, আর এক গাল হাসি নিয়ে দিলীপ এসে হাজির হল। আমি কৃতার্থ হয়ে গেলাম। বইয়ের নাম দিন-দুপুরে, ওর মধ্যেকার একটি গল্পের নামে। তাছাড়া সাবালিকা হয়ে ঐ আমার প্রথম গল্প। বড়দার মৃত্যুর পর সন্দেশ বেশ ক-বছর বন্ধ ছিল। তারপর বড়দার ছোট মণিদার (সুবিনয়ের) সম্পাদনায় আবার যখন বেরোতে আরম্ভ করল, আমি তখনো কলেজে পড়ি। হয়তো ১৯২৮ সাল। তারিখ গুলিয়ে যায়, ডাইরি রাখিনি কখনো। এখনি সমস্ত ভুলে যাই বলে ছোট ছোট উপহার পাওয়া নোট বইতে টুকে রাখি। তাও কোথায় টুকে রাখি তার ঠিক নেই, দরকারের সময় খুঁজে খুঁজে হদ্দ হই।

দিন-দুপুরের কাহিনী সেই অতিশয় ব্যবহৃত স্বপ্ন—প্লট হলেও, স্রেফ রসের জোরে উৎরে গেল। মণিদা দু-এক মাস বাদে-বাদেই গল্প চেয়ে নিতেন। বইখানি পাঠকদের মনে ধরে গেল, তা সে যত না লেখার গুণে, তার চেয়ে ঢের বেশি নিখুঁত প্রকাশনা আর উপস্থাপনার জোরে। এ-বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ এক রকম বলতে গেলে আমার প্রথম সফল বইয়ের মতো সর্বাঙ্গসুন্দর বই আর আমার নেই, অমন আত্মনিবেদিত প্রকাশকও আর দেখিনি। ওর পরে আমার যে প্রায় নব্বুইটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তার কতকগুলিতে আমার অর্থলাভ হয়েছে অনেক বেশি, প্রতিষ্ঠা পেয়েছি যথেষ্ট, কিন্তু প্রকাশনার দিক থেকে ওর ধারে কাছেও কেউ যায় না। লোককে জানিয়ে দিত দিলীপ, এই সব বই পড়ে দেখ তোমরা, মনে হয় ভালো লাগবে। খুদে এক নোট বই বের করত মাঝে মাঝে, তার নাম ছিল 'টুকরো কথা', তাতে সংক্ষিপ্তাকারে সিগনেটের বইয়ের পরিচয় দেওয়া থাকত। অনেক সময় বই থেকে ছবি নিয়ে, তাও দেওয়া হত। কোনো রংচঙে, চটকদার, যাকে বলা যায় চিল্লানো—চিত্র নয়। সাদাকালোয় বইয়ের ইলাস্ট্রেশন তুলে দেওয়া হত। প্রত্যেকটি বইয়ের স্বকীয়তা ফুটে উঠত।

আজকালকার মতো বহুল প্রচারের চেষ্টা করত না দিলীপ। যতদূর মনে পড়ে বড়জোর ৩,৩০০ কপি ছাপত একেক বারে। দিন-দুপুরেও বোধ হয় তাই

ছেপেছিল। তারপর 'পদী-পিসির বর্মী বাক্স' সাহস করে ৫,৫০০ ছাপল। আমার কি ভয়। শেষটা ওদের ক্ষতির কারণ হব না তো! কিন্তু দিলীপের ব্যবসা—বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ। আমার যতদূর বিশ্বাস কেবল মাত্র বার্নার্ড শ – র অনুবাদের ব্যাপারে ওকে নিরাশ হতে হয়েছিল। দিলীপের কথা বলে বলে আমি শেষ করতে পারি না। তার কর্মকুশলতার জুড়ি নেই, তার উদার গুণগ্রাহিতার তুলনা নেই। গ্রন্থলোকে সে একটা ঐতিহ্যের মতো। তাকে অনুসরণ করে বহু প্রকাশকের উত্তরণ হয়েছে। একমাত্র সে-ই বাংলায় ভালো বই প্রকাশ করেছে এ কথা বললে অন্যায় এবং অবিচার হবে। তাছাড়া ওর আগেও উপেন্দ্রকিশোর বলতে চেষ্টা করেছিলেন যে বইকে হতে হবে নির্ভুল, নিখুঁত। পাঠ্যাংশ, প্রকাশন, উপস্থাপনা সব হবে যতদূর ভালো করা যায়। ছাপার ভুল পারতপক্ষে থাকবে না। সেকালের সন্দেশ পত্রিকা এই আদর্শের নিদর্শন। ভুল ছাপা খুঁজতে হয়। ছবির, কাগজের বাঁধাইয়ের তুলনা হয় না। পাঠ্যাংশের কথা তো বাদই দিলাম।

এখানে সমসাময়িক ছোটদের (এবং বড়দের) পত্রিকার পক্ষ নিয়ে দুটি কথা বলতে হয়। আমার জ্যাঠামশাই তাঁর সন্দেশকে কখনো তার অমন গুণ-সম্ভার নিয়েও নিজের পায়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেননি। চিরকাল পকেট থেকে তার খরচ দিয়েছেন। দাম ছিল বোধ হয় তিন আনা। লেখকরাও বিনি পয়সায় লেখা দিতেন, ছবির বেশির ভাগই নিজে ও নিজের ছেলে – মেয়ে (সুকুমার—সুখলতা) আঁকতেন। উৎকৃষ্ট কাগজ এখনকার তুলনায় জলের দরে এবং অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত। তবু পত্রিকার পেছনে টাকা ঢালতে হত। ছোটদের বই সস্তায় হয় না। পৃথিবীর কোনো দেশেই হয় না। কিন্তু পকেট থেকে পয়সা ঢাললে ব্যবসা হয় না। কাজেই হাজার হাজার বই হাজার হাজার সংখ্যায় বের করা হয়। লেখক এবং শিল্পী যতই ভালো হক না কেন, দিলীপের, সেই পারফেক্‌শনিস্টের, মানের ধারে কাছে পৌঁছয় না। বই সে-রকম না হলেও, পাঠ্যাংশের মান এতটুকু খর্ব হয়েছে, এ-কথা বলা ঠিক নয়। মান বিচার করতে হলে অযোগ্য লেখা বাদ দিয়ে, শুধু শ্রেষ্ঠ রচনার কথাই ধরতে হবে। এত নতুন নতুন বিষয়ে এত অতি ভালো বই এর আগে প্রকাশিত হবার সম্ভাবনাই ছিল না। যাঁরা আজকালকার শিশু সাহিত্যের নিন্দা করেন, তাঁদের অনুরোধ করি, প্রতি বছর ছোটদের জন্যে যে-সব ভালো ভালো বই বেরোয় সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে পড়ে দেখবেন। বইয়ের কথা উঠলে আমি নেশাখোরের মতো হয়ে যাই, আপনারা আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন।

সিগনেট প্রেসের কথা বললে আমার বহুদিনের প্রিয় বন্ধু নীলিমাদেবী (গুহ-ঠাকুরতা)-কে বাদ দেওয়া যায় না। একজন প্রতিভাবান মানুষের কাছাকাছি আরো কয়েকজন গুণী বন্ধু ও সাহায্যকারী না থাকলে, পৃথিবীর প্রায়

কোনো স্বপ্নই বাস্তবে পরিণত হয় না। উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা আমার ছোট জ্যাঠামশাই কুলদারঞ্জন ও আরো বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তেমনি দিলীপের শাশুড়ি নীলিমাদেবী যদি সব সময় সহযোগিতা না করতেন, সিগনেট্ প্রেস মাটির পৃথিবীতে ঠাঁই পেত কিনা বলতে পারি না। অতিশয় বুদ্ধিমতী, নানা বিষয়ে জ্ঞানী, অক্লান্তকর্মী এই মানুষটি কোনোদিনই যথার্থ স্বীকৃতি পাননি। নিজেও গুণী লেখিকা, শিল্পীও বটে। প্রকাশনালয়ের কোনো কাজকেই তিনি হেয় মনে করেন না। সিগনেট প্রেসের নিতান্ত দুঃসময়ে, নীলিমাদেবীর কাছ থেকে আমার দু-তিনটি পাণ্ডুলিপি এনেছিলাম। নিখুঁত হস্তাক্ষরে নিজের হাতে কপি করে রেখেছিলেন। সেই পাণ্ডুলিপি অন্য প্রকাশককে আরো কয়েক বছর পরে দেবার সময় আমার বড়ই কষ্ট হয়েছিল।

সে যাই হোক, ১৯৪৮ সালে দিন-দুপুরে প্রকাশিত হল বটে, কিন্তু আমি এমন একজনকে হারালাম যিনি আশৈশব আমার সকল সুখের সুখী, সকল দুখের দুখী। তিনি আমার ছোট জ্যাঠামশাই, কুলদারঞ্জন। ইউ-রায়-এণ্ড-সন্সের ছায়ায় তাঁর জীবন কেটেছিল। মৌলিক কিছু না লিখলেও, বেতালপঞ্চবিংশতি, কথাসরিৎসাগর, পুরানের গল্প, ওডিসিয়ুস, ইলিয়াড, রবিনহুড, জুল ভার্ন ও কন্যান ডয়েলের নানা গল্প সহজ করে কিংবা অনুবাদ করে তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। তারপর প্রায় ৭০ বছর কেটে গেছে; সে ভাষাও সেকেলে হয়ে গেছে, লোকে তাঁকে ভুলতে বসেছে। কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ ও সহযোগিতা পেয়েছি, তা ভুলবার নয়। ঐ বছর ৭৩ বছর বয়সে হৃদরোগে তিনি মারা গেলেন। কথা বলতে বলতে স্বর্গে গেলেন। পরে দেখলাম পায়ের তলায় একটু ধুলো লেগে আছে। শিল্পীও ছিলেন ছোট জ্যাঠা, ফটোগ্রাফ এনলার্জ করে প্রায় প্রমাণ মানুষের মাপ দিয়ে, হাতে করে এমন সুন্দর রং করতেন যে হঠাৎ দেখলে মনে হত জলজ্যান্ত মানুষটিকেই দেখছি। আছে হয়তো এখনো এর-ওর বাড়িতে সে-সব ছবি। মাছ ধরতে পাগল। গান গাইতেন ভালো। বাবা আর ছোটজ্যাঠামশাই দু-বছরের ছোট বড়। চেহারায় বা স্বভাবে দুজনার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য ছিল না, কিন্তু পিঠোপিঠি দুই ভাই একেবারে হরিহরাত্মা। বাবা বছরখানেক হল চলৎশক্তি হারিয়ে, ক্রমে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে যাচ্ছিলেন। এখন তাঁর ধন-দার মৃত্যু সংবাদ তাঁকে দেবার সাহস কারো হল না।

ততদিনে আমার বাপের বাড়ির সকলের বয়স আরো কয়েক বছর বেড়ে গেছে। মেজভাই কল্যাণ বিয়ে করেনি, অন্য ভাইরা করেছে। দিদি আর ছোটবোন লতিকা অধ্যাপনা করে। দিদি গোখ্‌লে কলেজে, লতিকা স্কুলে। সবাই এক যৌথ পরিবারের মতো এক বাড়িতে থাকে। সমবায়ের নিয়মে ব্যবস্থাপনার

পারিপাট্যে খুশি না হয়ে পারতাম না। লোকে দেখে আশ্চর্য হত। আজকালকার দিনেও কেমন উপযুক্ত ও রোজগেরে ভাইবোন বুড়ো মা-বাপের সঙ্গে একান্নবর্তী হয়ে বাস করছে। বাবার মৃত্যুর পর যৌথ পরিবার ভেঙে গেছিল।

বাড়ির মাস্টারি কিন্তু আমার সমানে চলেছিল। তাতে নিজেরও অনেক লাভ হয়েছিল। বহু ভুলে যাওয়া তথ্য আবার নতুন করে জানা হয়ে গেল। ১৯৪৯ সালে আমার ছেলে রঞ্জন আর আমার ভাগ্নীর বড় মেয়ে হাসি, দুজনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল। তার আগের কয়েক মাস হঠাৎ দেখলে বোঝা যেত না কে পরীক্ষা দিচ্ছে, ওরা না আমি? পরীক্ষা ছাড়া অন্য ভাবনা-চিন্তাও ছিল।

এর কিছুদিন আগে আমার স্বামী একবার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। হৃদ্‌যন্ত্র আর কখনো আগের মতো জোরালো হল না। সেরকম হলে এতগুলো পোষ্য নিয়ে আমি কি করব, তাই কত ভাবনা। আমি বলতাম মজুমদার টেলারিং বলে দোকান খুলে রাশি রাশি টাকা রোজগার করব। বলা বাহুল্য করিনি কখনো রাশি রাশি টাকা রোজগার, দরকারও হয়নি। ওরা যখন ম্যাট্রিক দিল, তার অনেক আগেই সুস্থ হয়ে উনি স্বাভাবিক কাজকর্ম করছেন।

খুব একটা নিজের দেশ দেখবার সময় পাইনি এতদিন। দক্ষিণ ভারত দেখার বড় শখ। এই প্রস্তাবে পণ্ডিচেরী থেকে দিলীপ আর মাদ্রাজ থেকে আমার শান্তিনিকেতনের পুরনো বন্ধু, অন্ধ্র পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক শম্ভুপ্রসাদ উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখলেন। শম্ভু আমার ভ্রমণ-ক্রম তৈরি করে ফেলল। মাদ্রাজে গিয়ে তার বাড়িতে উঠে ভ্রমণ-সূচিটি পাকা করা হবে। কমলা তো কেঁদেই আকুল, তাকেও নিয়ে যেতে হবে। সবাই মিলে অনেক বোঝানো হল এখন স্কুল খোলা, কি করে যাবে, সে-ও ম্যাট্রিক দিলে, তাকেও দেশ দেখাতে নিয়ে যাব। নিজেও বিশেষ কিছু দেখিনি, আমারো দেখা হবে।

মনে আছে ৭ই এপ্রিল রঞ্জনের পরীক্ষা শেষ হল। ৮ই এপ্রিল মাদ্রাজ মেলের সেকেণ্ড ক্লাস্ কামরায় দুটি বার্থ রিজার্ভ করে রওনা দিলাম। এখন ভেবে আশ্চর্য হই আমার কতটুকু বাস্তববুদ্ধি ছিল! সঙ্গে কোনো ওষুধপত্র নিইনি। ভেবেছিলাম দুজনের এমন অটুট স্বাস্থ্য, তবু যদি নিতান্তই ওষুধপত্র দরকার হয়, বহু ওষুধের দোকান আছে, কিনে নেওয়া যাবে। এ আমাদের এক রকম তীর্থযাত্রা। লট-বহর সঙ্গে যত কম থাকে ততই ভালো। একটি হোল্ডলে পাৎলা বিছানা, একটি স্যুটকেসে কাপড় চোপড়। একটি টিফিন ক্যারিয়ার, একটি জলের বোতল। যাত্রীদের আবার এর বেশি কি লাগতে পারে। কিছু টাকাকড়ি। আবার শম্ভুর কাছে চেক্ ভাঙানো যাবে। শম্ভুর কথাও কিছু বলতে হয়। তেলেগু ব্রাহ্মণ, লম্বা, জোরালো শরীর, পরিষ্কার রং, দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল, সবাই ওকে সমীহ করে চলত। সর্বদা সাদা খদ্দর পরত,

খালি মাথা, বাঙালীদের মতোই কাছা দিয়ে কাপড় পরত, নিরামিষ খেত, কম কথা বলত। বিশ্বভারতীর কলেজের মামুলী ক্লাস করত না। বিদ্যাভবনে বিধুশেখর শাস্ত্রীমশায়ের আর ক্ষিতিমোহনবাবুর কাছে ভাষা শিক্ষা করত। আমার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ইংরিজি অনার্স ক্লাসের খাতায় ওর নাম লেখা ছিল। কিন্তু একদিনও ক্লাসে আসেনি। আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট।

একবার কেউ ওকে আমার কাছে এনেছিল, তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'ক্লাসে আস না কেন?' বলেছিল, 'মেয়েদের কাছে কিছু শিখতে আমার লজ্জা করে।' বলে এমন সরলভাবে হেসেছিল যে দেখতে দেখতে ওর সঙ্গে ভারি একটা স্নেহের সম্পর্ক হয়ে গেছিল।

ভারি বিনয়ী মানুষটি। নিজের কথা, কিম্বা বাড়ির কথা কিছু বলত না। সাদাসিধা পোশাক, পায়ে মোটা চপ্পল, যে কোনো গেরস্ত বাড়ির ছেলের মতো দেখাত। ও নিজে মাদ্রাজের স্টেশনে অপেক্ষা করছিল। আমরা দুজনে ক্লান্তিতে অবসন্ন। দু-দিন দু-রাতের যাত্রা। সঙ্গের খাবার ফুরিয়ে গেলে, রেলের বেয়ারারা খাবার দেয় না। বলে 'আগের জংশনে মীল-টিকিট কিনেছেন?' সে আবার কি জিনিস? একজন বাঙালী সহযাত্রী তখন শুধু যে রহস্য বুঝিয়ে দিলেন তা নয়, তারপর থেকে সব জংশন স্টেশনে নিজের সঙ্গে আমাদেরও মীল-টিকিট কিনে আনলেন। আমরা দাম দিয়েই খালাস। দামও খুব কম। এই রকম যেখানে যখন গেছি, প্রায় সর্বদা এত সদয় বন্ধু পেয়েছি যে বলবার নয়। একমাত্র বেহারের কোনো কোনো জায়গায়, সে সৌভাগ্য হয়নি। মোট কথা ক্লান্ত কলেবরে সেকণ্ড ক্লাস গাড়ি থেকে আমাদের নামিয়ে শম্ভু কোমল কণ্ঠে বলল, 'এখনকার সেকেণ্ড ক্লাস হল আগের ইণ্টার। কষ্ট তো হবেই।' এই বলে আমাদের তার ক্যাডিলাক গাড়িতে তুলল!

॥ ৮ ॥

১৯৪৯ সালের বছর গুণলে মাত্র ৩৩ বছর আগেকার কথা। কিন্তু এই ৩৩ বছরেই শুধু আমাদের দেশেই নয়, গোটা পৃথিবীর হালচাল বদলে গেছে। আমরা যে সব গুণকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছিলাম, এখন দেখি সে-সব অচল। সেই পুরনো চোখেই আমাদের ভ্রমণের জায়গাগুলো দেখেছিলাম, এখনকার যাত্রীরা হয়তো অন্য চেহারা দেখেন। তাছাড়া যদি ৩০ বছরকে এক পুরুষ বলে গোণা হয়, তাহলে এখন হল নতুন এক পুরুষের কথা। সে যাক গে, শম্ভু আমাদের তার বাগান ঘেরা সুন্দর দোতলা বাড়িতে নিয়ে তুলল। ওর স্ত্রীর নাম কামাক্ষী, সবাই ডাকে কামাক্ষী-আম্মা, দেখে মনে হল বুঝি বাঙালী। সাদাসিধে, লাজুক মেয়ে। তাদের গুটি পাঁচেক ছেলেমেয়ে, স্কুল কলেজে পড়ে। শাশুড়িও আছেন, ধবধবে

ফর্সা, পরমাসুন্দরী। ভারি অতিথিপরায়ণ সবাই। আমাদের কোথায় রাখবে, কি খাওয়াবে ভেবে পায় না। তেলেগু ব্রাহ্মণের রান্নাঘরে নিরামিষ ব্যবস্থা। ভাবে আমাদের কষ্ট হবে। আমরা সত্যি যে ইড্লি, দোসা, নারকেলের চাট্নি, গাওয়া ঘি, সাম্বার, রসম্ খেয়ে সুখে আছি, বিশ্বাস করতে চায় না, তবে টক দইয়ের সঙ্গে যখন বাটা চিনি এনে দিল, তখন খুশি না হয়ে পারলাম না। টক দই একটু ইয়ে।

গাড়ি করে সমস্ত মাদ্রাজ ও তার চারদিকের বহু দ্রষ্টব্য জায়গা দেখিয়ে দিল. মহাবলিপুরম, কাঞ্চিপুর ইত্যাদি। একজন চালাক-চতুর ছোকরা এসে আমাদের দক্ষিণ ভারত যাত্রাসূচী তৈরি করে দিল। কোন গাড়িতে কটার সময়ে কোন জায়গায় যাব, সেখানে কি কি দ্রষ্টব্য, থাকার কি ব্যবস্থা, এমন কি যানবাহনের কি সুবিধা, সমস্ত নিখুঁৎ ভাবে লিখে দিল। আমরাও সেটি শিরোধার্য করে আরামে দক্ষিণ ভারত দেখলাম। ওর কথা বুঝতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল কারণ, হাঁ বলতে মুণ্ডুটাকে এ-পাশ ও-পাশ নাড়ছিল আর না বলতে ওপর নিচ করছিল। আমরা করি ঠিক তার উল্টো! শম্ভুরা আসলে অবস্থাপন্ন লোক। অমৃতাঞ্জনের মালিক, ও নিজে অন্ধ্রপত্রিকার সম্পাদক। এমন বিনয়ী স্নেহশীল মানুষ কম দেখেছি। বছর দশেক হল পরলোকে গেছে।

ঐ তালিকা অনুসারে দেশ দেখলাম। এটা ভ্রমণ কাহিনী নয় বলে বিস্তারিত বিবরণ বাদ দিলাম। তেত্রিশ বছর আগের কথা, তবু ঐ সব জায়গার কথা মনে হলে মনটা তৃপ্তিতে ভরে যায়। ত্রিবান্দ্রামের অ্যাকোয়েরিয়ম,পদ্মনাভের মন্দির দেখলাম। কন্যাকুমারী দেখলাম। কি পরিষ্কার ঝরঝরে সব দেবস্থান। আমাদের দেশের মতো জল স্যাঁৎসেঁতে, রান্নাবান্না এবং বাসি খাবারের গন্ধামোদিত নয়। ভোগ দেওয়া হল ফল ফুল নারকেল। দেখলেও চোখ জুড়োয়। কন্যাকুমারী যাবার পথে সমুদ্রতটের বাস্-পথটি যেমন সুন্দর, মাদ্রাজ থেকে ত্রিবান্দ্রাম যাবার বনপথ আর সাগরবেলার পথও তেমনি। মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম।

কন্যাকুমারীতে একজন স্থানীয় লোক বলেছিল, 'আমরা হিন্দু বলে এই মন্দিরকে ভক্তি করি; আসলে কিন্তু খ্রীশ্চান গির্জার মেরি-আম্মা আরো বেশি দয়াময়ী!' কন্যাকুমারীতে রাজার হোটেলে ছিলাম। সেখান থেকে পাহাড় ঘেরা সুন্দর পথ পার হয়ে মাদুরার ট্রেন ধরলাম। মাদুরার মীনাক্ষীর মন্দির মেরামত হচ্ছিল, দেখা হল না। একটা হোটেলে কষ্ট করে থাকলাম। নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ফূর্তির চোটে সঙ্গে ওষুধপত্রও নিইনি। অসুস্থ শরীরেই রামেশ্বর দেখলাম। পুরনো জায়গায় গেলেই মনটা কেমন করে। বিশেষ করে যদি মন্দির হয়। তবে ঐখানে ৩৩ কোটি দেবতার মূর্তি আছে শুনে সন্দেহ প্রকাশ করাতে, পাণ্ডা চটে গিয়ে বলল, 'বিশ্বাস না হয়, গুণে দেখতে পারেন।' পাম্বান পুলের তলায় দেখলাম টলটলে সমুদ্রের জল, খুব গভীরও নয় হয়তো। স্পষ্ট চোখে

পড়ল পুলের দুধারে যতদূর চোখ যায় মস্ত মস্ত চারকোণা চ্যাপ্টা পাথর, প্রত্যেকটির মধ্যিখানে একটি গোল ছ্যাঁদা। পাণ্ডা বলেছিল ওগুলো হল রামের সেতুর ধ্বংসাবশেষ! বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল।

যখন তিরুচিরপল্লী পৌঁছলাম আমার শরীর আবার সুস্থ। রক্ ফোর্টের চুড়োয় উঠলাম। এখন ভাবলেও মাথা ঘোরে। সেখানে গণেশমূর্তির পুজো সবে শেষ হয়েছে। আমরা দুজন দুটি টাকা দিলাম। পুরোহিত গণেশের মাথায় জড়ানো সুগন্ধী ফুলের একটি গোড়ে মালা আমাকে দিলেন। তাই দেখে আমাদের ট্যাক্সি ড্রাইভার অবাক হল, 'ওঁরা তো বাইরের লোককে দেবতার মালা দেন না।'

সেখান থেকে পণ্ডিচেরি। দিলীপ রায়ের বাড়িতে উঠব, সাতদিন থাকব। মন বড় খুশি। কৌতূহলও যথেষ্ট ছিল, বহু বছর ধরে নানা রকম বিপরীত বিবরণী পেয়েছি। দিলীপকে আমরা বড়ই ভালোবাসি। তাছাড়া আমার ভাগ্নে কল্যাণ চৌধুরীও সেখানে। কল্যাণ আমার বন্ধু অলকার ছোট ভাই, বাঘ-শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরীর বড় ছেলে। আমার সমবয়সী বন্ধুও বটে। আর ছিল শান্তিনিকেতনের শিল্পীকবি নিশিকান্ত রায়চৌধুরী। এরা দুজন সেখানে কেমন ঠাঁই পেয়েছে, কতখানি মানিয়ে নিল জানবার বড় ইচ্ছা। আসলে পণ্ডিচেরি আশ্রমে আমার অনেক পরিচিত ও প্রিয় মানুষ ছিলেন। পিতৃতুল্য চারু দত্তও সেখানে শেষ জীবন কাটাচ্ছেন।

রাতদুপুরে। বোধ হয় বিরুধনগর বলে একটা স্টেশনে গাড়ি বদল করতে হল। পণ্ডিচেরির ছোট গাড়ি অপেক্ষা করছিল, কিন্তু আমাদের কুপেতে দেখি অন্য একটা লোক শুয়ে আছে। ঘরময় কিসের গন্ধ। আর কোথাও জায়গা নেই। গার্ডকেও পাওয়া গেল অনেক পরে। ঐ লোকটিকে কিছু বলতে একেবারে অনিচ্ছুক। বলে কিনা 'আপনি ঐ কুপেতেই যান। আপনার ছেলে স্থানাভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাক।' মহা রেগেমেগে গেলাম। বললাম, 'পণ্ডিচেরি গিয়ে এর একটা বিহিত করব, আমার রিলেটিভ্ দিলীপ রায়কে বলেটলে।' বলবামাত্র গার্ডের মুখে একটা চমক খেলে গেল, 'দিলীপ রায়! তিনি আপনাদের আত্মীয়! তাঁর বাড়িতে উঠবেন! আগে বলেননি কেন? মহা অপরাধ করে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন।' এই বলে পায়ে ধরে আর কি! আমিও অবাক। দিলীপের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এসব লোকের ওপরেও মন্ত্রের মতো কাজ করবে আমি ভাবতেও পারিনি। আনন্দে মন ভরে গেল।

গার্ড তখুনি কুপেতে ঢুকে ঘুমন্ত লোকটিকে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনল। মনে হল ফিরিঙ্গি এবং ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। বগলে এক বোতল হুইস্কি। যদিও পণ্ডিচেরির বাইরে ও-সব নিষিদ্ধ। টলতে টলতে সে লোকটাও বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'ফরগিভ, ফরগিভ! রেসপেক্টস্ টু দিলীপ রায়!' তারপর

গার্ড আমাদের জন্য কি করবে ভেবে পায় না। কফি আনি ? চা আনি ? কোল্ড ড্রিংকস্ আনি ? পাখার হাওয়া পাচ্ছেন তো ? বাথরুমটা ঠিক আছে তো ইত্যাদি। মোদো লোকটা বোতল নিয়ে পাশের গাড়িতে গিয়ে উঠল।

ট্রেন ছাড়বার আগে দুহাত জোড় করে গার্ড বলল, 'একটা বিনীত প্রেয়ার, ম্যাডাম, দাদাজির কাছে আর আমার অপরাধের কথা তুলবেন না!' তাকে আশ্বস্ত করে আমরা রওনা হয়ে গেলাম।

ভোরে পণ্ডিচেরিতে নেমে দেখি সকালের সাদা আলোয় কি প্রশান্ত সুন্দর শহর। তখনো সকলের ঘুম ভাঙেনি। বহু যাত্রী নামল। দু-দিন পরেই শ্রীঅরবিন্দের দর্শন। ভক্ত তো তাঁর কম ছিল না। তার চেয়েও বেশি সংখ্যক কৌতূহলী জনতা। যতদূর মনে হয় ঝটকা বলে একরকম ঠিকে গাড়ি পেলাম। দিলীপ বলেই ছিলেন ওঁর নাম করলেই সোজা ওঁর বাড়ি নিয়ে যাবে। কোনো অসুবিধা হবে না। প্রায় কুড়ি বছর ধরে ওখানে বাস। আশ্রমের সবচাইতে নাম করা অধিবাসী। সেখানে অসংখ্য উঁচুদরের জ্ঞানীগুণীরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও দিলীপের ব্যক্তিত্ব জ্বলজ্বল করত।

পৌঁছবার কথা ছিল তাঞ্জোর দেখে, পরের দিনই। দেখলাম যারা আসলে সংসারী নয়, তাদের বাড়ির সুবিধা-অসুবিধাগুলোও ঢিলেঢালা মতো। ভোরে ওঠা দিলীপের অভ্যাস। ছাদে গিয়ে গলা সাধতেন। সাধুই হন, ভক্তই হন, কণ্ঠশিল্পীর নিয়মনিষ্ঠা থেকে এতটুকু ভ্রষ্ট হতেন না। মোটা মানুষ, আমাদের সাড়া পেয়ে থপথপ করে দৌড়ে নেমে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, দুজনকে একসঙ্গে। বক্ষটিও তেমনি উদার ছিল। সে সহাস্য অভ্যর্থনা এ জন্মে ভুলবার নয়। দোরগোড়া থেকে আদর করে আমাদের জন্য গুছিয়ে রাখা ছোট শোবার ঘরটিতে নিয়ে গেলেন। স্নানের ঘর আলাদা।

পুরনো ফরাসী প্যাটার্নের বাড়ি। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সদর দরজাটি বিশাল এবং অতি সুন্দর দেখতে এক ফুট লম্বা পেতলের চাবি দিয়ে খুলতে হয়। ভেতরে ফুলগাছ, ফুলে ভরা লতা, টবে ফার্ন গাছ, পাতাবাহার, তকতক ঝকঝক করছে। ৩৩ বছর পরে খুব খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে পারব না। তবে একটা খোলামেলা ঝরঝরে ভাব সর্বত্র। যা আসবাব ও সাজসজ্জা ছিল সব সুন্দর, কিন্তু অনাড়ম্বর। আইবুড়োর বাড়িঘর কি করে এত পরিচ্ছন্ন, ঘরকন্নাই বা এত গোছালো কি করে হতে পারে, প্রথমটা ভেবে পাচ্ছিলাম না। পরে আমাদের কুটুম্বিনী রানীদিকে দক্ষ হাতে উৎকৃষ্ট সুজির মোহনভোগ করতে দেখলাম। শুনলাম দিলীপের ঘরকন্নার দেখাশুনো করার ভার শ্রীমা ওঁকে দিয়েছিলেন। ঘড়ি ধরে ডিউটি করতেন। ভোরে এসে জলখাবারের ব্যবস্থা। দুপুরে আশ্রমের রান্নাঘর থেকে, ওখানকার যেমন নিয়ম, এক তরকারি ভাত দই আর কলা

আসত। রানীদি হয়ত একটু আলুর দম করে দিলেন। এ-বাড়ির খাওয়াদাওয়া চুকলে,নিজের বাসায় ফিরে স্নানাহার সেরে আবার হয়তো তিনটের থেকে রাতের খাওয়াদাওয়া অবধি দেখলেন। নিজের ব্যবস্থা অন্যত্র। এর আগে সুগায়িকা সাহানাদির ওপর এই ভার ছিল। ঐ সময় তাঁর শরীর খারাপ হয়েছিল।

সাত দিন ছিলাম ওখানে। অন্য রকম এক জীবনযাত্রার আস্বাদ পেলাম। একে একে সব চেনাজানার বাড়ি গেলাম। মনে হল শ্রীঅরবিন্দের চেয়েও এঁদের ওপর শ্রীমায়ের প্রভাব বেশি। তাই হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীঅরবিন্দ মৌনী এবং অদর্শন। সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। শুধু যাঁরা তাঁর সাধনার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন তাঁদের সঙ্গে তাঁর মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ থাকত। তাও যা কিছু জিজ্ঞাস্য সংক্ষেপে তা লিখে পাঠাতে হত। তিনি আরো সংক্ষেপে উত্তর লিখে দিতেন। নিত্য কথা বলতেন নাকি শুধু তাঁর ডাক্তারের সঙ্গে, মাদারের সঙ্গে আর বিশেষ প্রয়োজনে দু-একজনের সঙ্গে।

কিন্তু মাদারের প্রভাব দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারলাম না। যে কাজে মা এতটুকু অসন্তুষ্ট হবেন সে-কাজ মরে গেলেও আশ্রমবাসীরা করবে না। যাকে যে কাজ দিয়েছেন প্রাণপাত করে তা পালন করবে। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কোনো কাজে এতটুকু অযত্ন বা গাফিলতি নেই। দু'জন সাধক রোজ আশ্রমের বাড়িগুলির ঝুল কালি ঝেড়ে মুছে, মাটি থেকে কুটোটুকু তুলে নিয়ে যেতো। দুজন বাগান ঝাঁট দিয়ে, শুকনো পাতা উড়িয়ে, ঝোপঝাড়ের ঝুলো পাতা তুলে ধরে তার নিচে ঝাঁট দিয়ে, সব একেবারে তকতকে করে রাখত। দুপুরের খাওয়ার পর বৈশাখ মাসের ঐ চড়চড়ে রোদে খানিকটা দূরস্থিত ছাপাখানায় যাদের ডিউটি, তারা কাজ করতে যেত। তাদের মধ্যে আমার একটি শান্তিনিকেতনের আয়েসী ছাত্রও ছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, 'বাঃ মন দিয়ে কাজ করব না? না করলে মা যে অসন্তুষ্ট হবেন।' সে অবাক হয়ে গেল, 'সাজাও দেবেন না, ভালো করে করলে পুরস্কারও দেবেন না। তাতে কি?' ভাবলাম আমাদের দেশে এই রকম দু-চারজন গুরু থাকলে ভবিষ্যতের জন্য ভাবনা থাকত না। কাজের মতো সাধনা আছে! এখানে কাজের উঁচু নিচু নেই, সব কাজের সমান মর্যাদা।

যতদূর সম্ভব সাদাসিধা নিরামিষ খাওয়া। একদিনের দুপুরের খাওয়ার কথা বলি, উচ্ছে আর টোমাটো দিয়ে কাঁচা কলাইয়ের ডাল, ভাত, দই, কলা। আড়চোখে ছেলের দিকে চাইলাম। আরেকটু হলে পড়েই যেতাম! সোনাহেন মুখ করে পুত্র ঐগুলো খাচ্ছেন এমনি স্থান-মাহাত্ম্য! বাড়িতে হলে—থাক্‌গে।

বেকারিতে গিয়ে দেখলাম দুজন পণ্ডিত লেক পাঁউরুটি তৈরি করছেন। একজন ঠাসা ময়দাকে একেক কোপে একেক পাউণ্ড মাপে কাটছেন।

আরেকজন সেটি ওজন করে দেখছেন প্রায় প্রত্যেকবার মাপ নির্ভুল। আরো একজন টিনে করে ওগুলোকে বেক হতে নিয়ে যাচ্ছেন। কি খুশি সবাই। বাইরে এক চিলতে জমি। তার মধ্যিখানে মখমলের গালচের মতো খুদে ঘাসজমি। ঘাসজমির চারদিকে ফুলের বাহার। মানুষগুলি যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা সকলে পরম বিদ্বান, অনেকে এক সময়ে বড় বড় পদ অলংকৃত করেছেন।

খালি মনে হত আমাদের দুনিয়া দেখার ভঙ্গিতে গলদ আছে। মূল্যবোধ ঠিক নয়। সন্ধ্যেবেলায় দিলীপের বাড়িতে জ্ঞানীগুণী আর সাধারণ লোকরা আসতেন। আলোচনা হত, গান হত, কত গভীর কথা হত। সব সময়ে মতে মিলত না। কিন্তু ফেলে দেবার মতো কোনো কথাই নয়। সংসার-ত্যাগী আর সংসারীর কি এক রকম চোখ হতে পারে কখনো।

ঐখানে MONOD বলে এক আধাবয়সী ফরাসীর সঙ্গে আলাপ হল। ফরাসী দূতাবাসে কোনো কাজ করতেন, শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত, দিলীপের বন্ধু। আমার সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে গেল। পরে দেশে ফিরেও চিঠিপত্র লিখতেন, কলকাতায় এসে দেখা করতেন। বেশ কিছু বছর আর উত্তর পাই না। ভাবি তাঁর সময় হয়েছিল, চলে গেছেন।

এখানে ভয়ে ভয়ে শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্বন্ধে আমার মোটামুটি যে ধারণা হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু না বললে এ বিবরণী অসম্পূর্ণ থাকবে। তবে একটা কথা বলে রাখি, আমি নিতান্ত বাইরে থেকে আগন্তুক, সংসারধর্মী, পড়াশুনো ভালবাসি। কিঞ্চিৎ আদর্শবাদীও, তাই যেমন যেমন বুঝেছিলাম, তাই বলছি। হয়তো আমার বোঝার ভুল-ও হতে পারে। আমার ভাগ্নে কল্যাণকে দেখলাম, নিশিকান্তকেও দেখলাম। কেমন যেন সাবধানী হয়ে গেছে। আগেকার সেই প্রাণখোলা ভাবটি আর নেই, যদিও স্নেহের কোনো অভাব দেখিনি। দিলীপের অনুপস্থিতিতে ওখানকার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে শ্রীঅরবিন্দ এক সুকঠিন ও জটিল সাধনা করছেন। উনি যোগবলে ওপর থেকে শক্তি নামিয়ে মানুষের আত্মা ও প্রকৃতি উন্নত করবেন। আপাততঃ আশ্রমবাসীদের দিয়ে কাজ শুরু হবে। তবে সেই প্রক্রিয়াটা যে কি তা কেউ বলতে পারলেন না এবং কৌতূহলীদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতেও আগ্রহী মনে হল না

মুশকিল হল, আমি আবার অন্য রকম ভাবি। আমি মনে করি এসবের মধ্যে জটিলতার বা কঠিন কিছুর স্থান নেই। ওপর থেকে শক্তি নামানো কি, তাও বুঝলাম না। বরং মনে হত মানুষের নিজের মধ্যেই সুপ্ত শক্তি আছে, সেটিকে জাগ্রত করতে পারলেই কাজ হবে। কোনো অনুশীলন বা চর্চা না করে এই রকম মনে হত। ভাবতাম শ্রীঅরবিন্দকে নিশ্চয় এরা ভুল বোঝে। অনেকে তো

ঐখানে ১৫-২০ বছর আছে। তাদের আত্মার তো বিশেষ উন্নতি দেখি না। আশ্রমে বসে বসেই যে-রকম পরনিন্দা পরচর্চা শুনতাম; তাতে অবাক হতাম। তার ওপর রেষারেষি এবং ঈর্ষা। টাকাকড়ি বা মান-সম্মানের জন্যও নয়। ঐ বুঝি কোনো অযোগ্য ব্যক্তি মায়ের কাছ থেকে বেশি আদর পেয়ে গেল। এই রকম একজন বয়স্কা বাঙালী মহিলা বললেন, 'এদের জ্বালায় কিছু করার জো নেই। আগে শ্রীভগবানের জন্য আমরা কজনা রাঁধতাম, তিনি একটু ভালোমন্দ খেতে পেতেন। তা হিংসুটেদের সইবে কেন, দিল আমাদের ভাগিয়ে। তা কি এমন ভালো খাওয়াদাওয়া হচ্ছে এখন শুনি!' ভাগ্যিস্ কোনো উত্তরের অপেক্ষায় থাকেননি, তাই বেঁচে গেলাম।

পরে দিলীপের কাছে গল্প করতে তিনি বললেন, 'বাস্তবিকই তাই। ওঁরা চমৎকার বাংলা রান্না করতেন। শ্রীঅরবিন্দ সত্যিই খুশি ছিলেন। কিন্তু অন্যরা আপত্তি করাতে, উনিই সে ব্যবস্থা তুলে দিলেন। তারপর একদিন আমাকে লিখলেন, "now that the food is equally unpalatable to all, I hope everybody is satisfied!" যতদূর মনে হয়, ভারি রসিক লোক ছিলেন অরবিন্দ।'

বলা বাহুল্য মানুষটির কাছে ঐ দর্শনের দু মিনিট ছাড়া—যাবার সুযোগ পাইনি। ওঁর লেখা সাবিত্রী ইত্যাদি আর চিঠিপত্র পড়ে এটুকু বুঝেছি যে উনি একজন অসাধারণ মনীষী ছিলেন। ওঁর সেই সুগভীর চিন্তা আর জটিল তর্কজাল ভেদ করার ক্ষমতা আমার তো নেই-ই, বিশেষ ভাবে নিজেকে প্রস্তুত না করলে অন্য কারো আছে কিনা তা-ও সন্দেহ। তবে দিলীপের ছিল। আরো কয়েকজন মনীষী ওখানে জীবনের অনেক বছর কাটিয়েছেন, তাঁদেরো ছিল। এ-ও মনে হয় যে সে প্রস্তুতির জন্য ওখানে যে যেতেই হবে, তাই বা কেন? বলেছি তো আমি বাইরের লোক এবং এ-সব আমার নিতান্ত নিজের মতামত। অনুশীলন করলে বদলাবে কিনা বলতে পারি না।

সাধারণ আশ্রমবাসীদের আমার আর পাঁচজন চেনা বন্ধুদের মতোই মনে হল। তাঁদের সঙ্গে শ্রীমায়েরি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শ্রীঅরবিন্দ ধরাছোঁয়ার বাইরে এক অপূর্ব আদর্শের মতো। কিন্তু মা-কে তাঁরা কাছে পেতেন, নিজেদের মনের কথা বলতে পারতেন, উপদেশ পেতেন, উপায় পেতেন। রোজ দেখতাম সকালে ধ্যানের পর সকলে যখন মাকে প্রণাম করতেন, অনেকে তাঁকে ফল, ফুল বা অন্য শ্রদ্ধার্ঘ দিতেন। আর মাও ঐসব ফুল ফল থেকে বেছে বেছে কিছু নিয়ে, পাশে দাঁড়ানো সাধকদের কাউকে বলে দিতেন কার শরীর খারাপ, কার মন খারাপ, তাদের এসব দিলে ভালো হবে। এই দেখে আমার মনটা কেমন করে উঠেছিল। মায়ের মতোই উনি সব সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পিছনে ছিলেন। বলা যায় আশ্রমের

প্রতিদিনের জীবনযাত্রার আর প্রত্যেক আশ্রমবাসীর অনুপ্রেরণা ছিলেন মা। তার বদলে অবিশ্যি একান্ত এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ আশা করতেন। সাধকের জীবন এমনি হবেই। খুব সহজ নয়।

বলেছি তো আমার যাবার ২/১ দিন পরেই ২৪ এপ্রিল। সেদিন শ্রীঅরবিন্দ আর মা একসঙ্গে দর্শন দিতেন। না হলে শ্রীঅরবিন্দর দেখা পাওয়াই দায় হত। মাকে অবিশ্যি রোজ ভোরে তাঁর বাসস্থানের দো-তলার ঝোলা বারান্দায় দেখা যেত! নিচের রাস্তায় ভক্তের ভিড় জমে যেত। অনেকে হাত জোড় করে ঐ এক মুহূর্তের দেখার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতেন। এক দণ্ডের দর্শন থেকে সারাদিনের পাথেয় সংগ্রহ করে নিতেন! তারপর যে যার কাজে চলে যেতেন। নীরবে এসব সম্পন্ন হত। ঐ ভক্তদের মধ্যে আমার শান্তিনিকেতনে প্রথম দেখা পিতৃপ্রতিম চারু দত্তও ছিলেন। এখানে তাঁকে অন্যরকম মনে হয়েছিল।

যেমন মনে হয়েছিল তেমনি লিখলাম। আমি ওঁদের শিষ্যত্ব নিইনি, কিন্তু মহৎকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। সে যাই হক, ২৪ এপ্রিলের দর্শন অন্যরকম। আশ্রমে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। এমনিতেই সমুদ্রের ধার আর খেলার মাঠ আর বাড়িগুলির চারদিকে দেয়াল ঘেরা খুদে হাতা ছাড়া খোলা জায়গা চোখে পড়েনি আজ সে সব জায়গাতেও লোকজন গিজগিজ করছে। এঁরা সাধারণ তীর্থযাত্রীদের মতো কেনাকাটা হৈ-হুল্লোড় করতে আসেননি। যার যার মনের তাগিদে, কিম্বা মনের প্রশ্নের জ্বালায় এসে জড়ো হয়েছেন। কোথাও হট্টগোল নেই, একটা গম্ভীর প্রতীক্ষার ভাব।

দিলীপের বাড়ি থেকে আমরা দশ-বারোজন অতিথি অভ্যাগত এক সঙ্গে গিয়ে সারি বেঁধে একটা সিঁড়ির নিচে দাঁড়ালাম। শুনলাম ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ওপরের পুলে বসা শ্রীঅরবিন্দ আর শ্রীমাকে দেখে, ওপাশের আরেকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হবে। বারবার বলা হল যেন পা ছুঁয়ে প্রণাম করার চেষ্টা না করি, বা দাঁড়িয়ে ভক্তি নিবেদন করার চেষ্টা করা না হয়।

লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, দিলীপের আরেক অতিথি বললেন, মামিমা, খালি হাতে দেব-দর্শনে যেতে নেই। আমি নিরাকারে বিশ্বাসী। খালি মনে যেতে হয় না ভাবি, খালি হাতের কথা মনে হয়নি। তিনি আমার ছেলে আর আমার হাতে একটি করে পাতার আর একটি করে ফুলের মালা দিয়ে বললেন, 'পাতাটি শ্রীঅরবিন্দের, ফুলেরটি মায়ের।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠে তাই দিলাম। যেন দুটি নিখুঁৎ আঁকা মূর্তি, কোনো প্রাণের স্পন্দন দেখতে পেলাম না। এত সুন্দর সাজানোর মধ্যে দৃষ্টিকটু শুধু তিনটি কাঠের প্যাকিং-কেস, ওঁদের পায়ের কাছে বিরাজ করছে। শ্রীঅরবিন্দ বসেছেন কৌচে, মা সিংহাসনে। ফুলের মালা আর তোড়া ফেলা হচ্ছে দুটি ছোট

প্যাকিং-কেসে আর বড়টিতে টাকাকড়ি, গয়নাগাটি, কাপড়চোপড় এবং অন্য শৌখীন উপহার। মনে যে সুর বাজছিল, তার তাল কেটে গেল। এইরকমই মনে পড়ছে। লিখে তো রাখিনি, কিছু কিছু ভুলেও গিয়ে থাকতে পারি। আমি ঐ দর্শনে অভিভূত হয়নি। অন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সকলের সঙ্গে দিলীপের বাড়ি ফিরে একসঙ্গে জলযোগ করলাম। ভক্তরাও কত মামুলী বিষয়ে আলোচনা করছে দেখে আশ্চর্য হলাম। খালি দিলীপকে দেখলাম না, হয়তো নিজের ঘরে চলে গেছিলেন। কোনো বিষয়ে উনি সাধারণ লোকের মতো ছিলেন না।

সেদিন আমরা সকলে বাড়িতে বসে আশ্রমের খাবার না খেয়ে, দুপুরে রান্নাঘরে গিয়ে সকলের সঙ্গে খেয়েছিলাম মনে আছে। বিকেল থেকেই ভিড় কমতে আরম্ভ করল। সন্ধ্যায় দিলীপ ভজন গাইলেন। গান তো নয়, দেবপূজা। ভজন যেমন হওয়া উচিত। গানের শেষে কারো সঙ্গে কথা না বলে অভিভূতের মতো নিজের ঘরে গিয়ে দোর দিলেন।

পর দিন সকাল থেকে আবার সব নিত্যনৈমিত্তিকের নিয়মে চলতে লাগল। আমরা আরো ক-দিন থাকলাম। তার মধ্যে একদিন শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেলাম। বড়ই স্নেহের সে দেখা। আমি আশ্রমের জন্য একটা সামান্য চেক্ নিয়ে গেছিলাম। মা একটা অসামান্য বই দিয়ে আমাদের দু-জনকে আশীর্বাদ করলেন।

দেখতে দেখতে ফেরার দিন এসে গেল। তার মধ্যে একদিন আমার অনুরোধে নিশিকান্ত তার আঁকা ছবির প্রদর্শনী করল। অপূর্ব সব বৃক্ষহীন দৃশ্য, পাহাড়, সাগর, মন্দিরের মতো মূর্তি। কোথাও আগেকার সেই প্রাণের উচ্ছলতা খুঁজে পেলাম না। কান্না পাচ্ছিল।

সাহানাদি একদিন গান শোনালেন। বড় ভালো লেগেছিল। কত পুরনো গান। দিলীপ যাননি। বাড়ি ফিরতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন লাগল?' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলাম। দিলীপ বললেন, 'একটু বেসুরো মনে হয়নি?' রেগে গেলাম, 'না, হয়নি। সুর-বেসুরো তোমার মতো অত টের পাই না। আমি বড় সুখী।' দিলীপের হাসি এখনো যেন শুনতে পাই।

ভোরে চলে আসব, বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেছে। নতুন ফরাসী বন্ধু মনো সাহেব এসেছেন, আরো অনেকে এসেছেন। দিলীপ বললেন, 'কি কি ভালো লেগেছে সে তো অনেক শুনলাম। মন্দ লাগেনি কিছু?'

মুশকিল হল আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি সাধ্যমতো তার উত্তর দিই। এবারো দিলাম। অনেকে বিরক্ত, অনেকে স্তম্ভিত। দিলীপ ভালোভাবে নিয়ে, যথাসাধ্য উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। আমি বললাম, 'আশ্রমবাসীদের বড়ই অসহিষ্ণু মনে হল। অন্যের দোষ-দুর্বলতা বিষয়ে বড় বেশি সচেতন।

এখানে এসে শুনেছি আমরা সংসারের কীট। আমরা কিন্তু জানি যে নিজেদের দোষের আর অন্ত নেই। তাই অন্যের বিষয়ে উদার হওয়া শক্ত হয় না। আরো বলেছিলাম এখানে সাধনার জীবন, তাহলে এতসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এত নিন্দা পরচর্চা কেন। দিলীপ বলেছিলেন, 'এরা এখানে আসার আগেও যেমন ছিল, এখনো তাই। বরং আরো আত্মকেন্দ্রিক হবার বেশি সুযোগ পায়।' বলতে শুরু করেছিলাম, তাই আরো বললাম, 'শ্রীঅরবিন্দ আর শ্রীমাকে যত দেখলাম শুনলাম, তত শ্রদ্ধা হল। কিন্তু আশ্রমের সাধিকারা পরে সাদা কাপড়, গায়ে গয়না নেই। তাহলে মার এত সিল্ক সাটিন হীরে মানিক্য, চোখে রং, মুখে রং কেন?' এবার দিলীপ ভালো উত্তর দিতে পারলেন না। বললেন, 'এসবে ওঁর কোনো লোভ নেই, উনি এর উপরে। ভক্তরা দেয়। না পরলে মনে কষ্ট পাবে, তাই পরেন। প্রসাধনও ঐজন্যেই। ভক্তেরা দেখতে চায় তাদের মায়ের কত রূপ, তাই সাজেন। নইলে সাজসজ্জার ওঁর কি-ই বা দরকার?' এই মর্মে, যদিও অন্য ভাষায় দিলীপ উত্তর দিয়েছিলেন। আমার মন ওঠেনি।

পরদিন বিদায় নিয়ে সন্ধ্যার গাড়ি ধরলাম। সেটি ছিল রবিবার। মদ্যপিপাসুরা চারদিকের শুকনো প্রদেশ থেকে এসে শনি রবি সরসভাবে কাটিয়ে, অল্পবিস্তর অপ্রকৃতিস্থ কিন্তু পুরোপুরি খোশমেজাজে, ভিড় করে গাড়ি চাপল। দেখলাম আরেক দল নারী পুরুষ, নিজেদের গায়ে, দু-তিনটি করে রেশমি কাপড় জড়িয়ে, শুল্ক এড়িয়ে, মাদ্রাজ চলেছেন। একজন ইন্সপেক্টর হাসি হাসি মুখে, সামান্য টলতে টলতে আমাদের কামরায় ঢুকে বলল, 'সব চেক করব, খুলে দেখান।' আমি সুটকেস খুলে দিয়ে, তারপর বেডিং দেখিয়ে বললাম, 'ওটা খুললে তোমাকে ফের বেঁধে দিতে হবে।'

লোকটা হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, 'আমার দিকে তাকিয়ে বলুন আমার কি তেমন অবস্থা আছে? ঠিক আছে। ধরে নিলাম আপত্তিকর কিছু নেই।'

আমাদের সঙ্গে মাদ্রাজ অবধি আমাদের এক কুটুম্ব এলেন। সে দিনটা শম্ভুর বাড়িতে থেকে, সন্ধ্যায় কলকাতা রওনা হলেন। আমরা আরেক দিন থাকলাম। শম্ভুরা যে কি আদর যত্ন করল সে আর কি বলব। যা যা দেখা বাকি ছিল, সব দেখিয়ে দিল। সন্ধ্যাবেলায় যাত্রা করার আগে, শম্ভুর স্ত্রী আমাকে রেশমী শাড়ি, ফুলের মালা, কুমকুম দিয়ে সাজিয়ে, ওদের নিয়ম অনুসারে রওনা করে দিল। শম্ভু গাড়িতে তুলে দিল। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। কত সৌভাগ্য করে অযোগ্যরা এত আদর পায়।

শম্ভুর কাকা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কেমন লাগল আমাদের দেশের লোকদের?' বলেছিলাম, 'পথে বেরিয়ে এতজন ভালো লোকের দেখা পাব আশা করিনি।' তিনি বললেন, 'আমাদের একটা প্রবাদ আছে, ভালো লোকরা

পথে বেরুলে ভালো লোকের দেখা পায় আর মন্দরা মন্দ লোকের দেখা পায়।'

ফিরে এলাম ১লা মে, ১৯৪৯। স্টেশনে ওঁর সঙ্গে দেখলাম দিদি আর ছোট বোন আর আমার কন্যা এসেছে। বাড়ি পৌঁছে স্নানটান সেরে, দিদিদের দেব বলে মাদ্রাজী শাড়ি বের করতেই, দিদি কেঁদে বলল, 'বাবা কাল সকালে মারা গেছেন।'

॥ ৯ ॥

মনে হয় যতদিন মানুষের মা-বাবা বেঁচে থাকে, ততদিন তাদের সম্পূর্ণ সাবালকত্ব লাভ করার পথে একটা বাধা থাকে। সে বাধাটা অবিশ্যি সম্পূর্ণ মানসিক এবং এক তরফা। বয়স্ক এবং শক্ত-সমর্থ স্বাধীন ছেলে-মেয়েদের জীবনে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ, সামর্থ্য কিংবা ইচ্ছা কজন বুড়ো মা-বাপেরই বা থাকে? বরং দেখা যায় কোনো এক অজ্ঞাত মুহূর্তে দুই পক্ষের ভূমিকা পাল্টেছে এবং ছেলেমেয়েরাই অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছে, বা করবার চেষ্টা করছে। আর ছেলেমেয়ের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হলে তো কথাই নেই। তবু মনে হয় বাপ-মা নিতান্ত জরাগ্রস্ত না হলে,. সন্তানদের মানসিক নাবালকত্বর একটুখানি থেকে যায়। অন্ততঃ এ-কথা মনে হয় যে আমার কার্য-কলাপের জন্যও এঁদের কাছে যেন জবাব দিতে পারি এবং এঁরাও আমার কাজের জন্য কিছুটা দায়ী। আসলে এসব কিছুই নয়। মা-বাবা গেলেই হঠাৎ যেন বয়সটা অনেকখানি বেড়ে যায়। মাথার ওপর থেকে একটা চন্দ্রাতপকে তুলে নেয়। নিজেদের কেমন অসহায় মনে হয়। আমার বাবার সঙ্গে আমার ২৫ বছর বয়সের পর থেকে কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমার ওপর অভিভাবকত্ব ছাড়তে চাননি বলেই তাঁর সঙ্গে আমার বিরোধ। তার পর ১৬ বছর কেটে গেছিল, বাবাকে বাদ দিয়ে জীবন কাটাতে আমি অভ্যস্থ হয়ে গেছিলাম। ভাই-বোনেদের যত কষ্ট হয়েছিল, আমার তার কিছুই হয়নি। শুনতে হৃদয়হীন লাগলেও এই হল সত্য। এ বিবাদ যে বাবার দিক থেকে কোনো দিনও মিটবার নয়, এ-ও আমি জানতাম। অথচ তিনি নিজেই সর্বদা আমাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে আর নিজের কর্মফল নিজে বহন করতে বলতেন।

আক্ষেপের স্থান না থাকলেও, যখন দেখলাম চোখের সামনে ও-বাড়ির জীবনযাত্রার ছন্দটা বদলে গেল, তখন যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিল। শেষ দু বছর বাবা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পঙ্গু হয়ে এসেছিলেন। কোনো রকম দাবিও ছিল না। মনে হত কথা বলতে অনিচ্ছুক, পরে শক্তিও কমে গেল। তবু তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমস্ত বাড়ির উপর বিরাজ করত। চার ছেলের বিয়ে হয়েছে, একটি দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে, তবু সব কিছু চলছিল আগেকার নির্দিষ্ট

নিয়মে। সে নিয়মটি ছিল যুক্তিযুক্ত, সুস্থ, শান্তিপূর্ণ। মুস্কিল হল যে স্বাধীন মতামত বলতে বাবা তাঁর নিজের বিচারের বাইরে কিছু পছন্দ করতেন না। বাবা যখন সব কিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন, তখনো নিয়মটি নিজের বলিষ্ঠতার জোরে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া পাল্টে গেল। ঐ সংসারের সুন্দর ঐক্যে ক্রমে চিড় ধরে গেল। দিদি মহারানী স্কুলের অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে গোখেল কলেজে অধ্যাপনা করতে লাগল। সংসারে কোনো অশান্তি দেখা যেত না। চতুর্থ ভাই সরোজের সুব্যবস্থায় কো-অপারেটিভের নীতিতে সুন্দরভাবে গৃহস্থালী চলত। আজ পর্যন্ত আমার মনে হয় বর্তমানে বাসস্থান, চাকর বাকর বাড়ির মাস্টার ছোটদের তদারকি ইত্যাদি সাংসারিক বিষয়ে সহজেই নিষ্পত্তি হতে পারে সরোজের সেই "গার্হস্থ্য সমবায়ের" নীতির সাহায্যে। এই নিয়ে একটা গল্পও লিখেছি।

তবে মা সংসার পরিচালনা থেকে সরে না দাঁড়ালে এমন ভালো নিয়মটা হয়তো উদ্ভাবিতই হত না। সবাই মাথাপিছু সমান হারে টাকা জমা দিল ; যে যার ক্ষমতা বুঝে একেক জন একেকটা ডিপার্টমেন্টের ভার নিল। ব্যস্ মেশিনের মত গেরস্থালী চলতে লাগল। তবে বেশিদিনের জন্য নয়। ছোট ভাই যতি আলাদা ফ্ল্যাট নিল। ছোট বোন লতিকা কার্সিয়ং-এ ডাও হিল্ স্কুলের ইতিহাস বিভগের ভার নিয়ে, সেখানে যাবার তোড়জোড় করতে লাগল।

এদিকে মা-কে খুব সুখী মনে হত না। সারা জীবন যে মানুষ একা হাতে নীরবে, নির্বিবাদে একটা বড় সংসার পরিচালনা করে এসেছে, হঠাৎ তাকে ছুটি দিলে, তার কি বাকি থাকে ? বই পড়ে, উল বুনে, জ্যাম জেলি করে, কোনো কাজের মেয়ের মন ওঠে না, তা তার যত বয়সই হক না কেন। মা-র তখন ৬৫ বছর বয়স। আমি ভাবতাম আরো ১০ বছর মা এইভাবে কাটিয়ে যাবেন। কিন্তু মন যে খারাপ, তার কি হবে ?

লতিকা মাকে বলল, 'ওসব চলবে না। ডাও হিলে আমি কটেজ পাব। তার দেখাশুনা কে করবে ? ও আমার আসে না। তুমি না গেলে আমার বড্ড কষ্ট হবে।' ব্যস্, আর কথা নেই। কোনো দিনও মা-কে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কিছু করতে দেখিনি। আবার অন্য লোকের কষ্ট দেখলে কোনো কাজে পিছপা হতেও দেখিনি। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে গেল লতিকার সঙ্গে মা যাবেন, ওদের পুরনো কাজের লোক বিষ্ণু যাবে। লতিকা একরকম তার কোলে-পিঠে মানুষ, সুতরাং তার কর্তাগিরির সীমা নেই। এ ছাড়া ছুটি-কাটাতে আমরা সবাই পালা করে তো যাবই।

কাঠের বাক্সে বাসনপত্র প্যাক হল। জিনিসের তো আর অভাব ছিল না।

গরম কাপড়-চোপড় কেনা হল, বোনা হল। মা পাহাড় ভালোবাসেন, তার ওপর ওখানকার ঘর সংসার দেখতে হবে। আবার তাঁর মুখে হাসি ফুটল! যতদূর মনে হয় ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে, বাবা যাবার এক বছর পরে ট্রেনে করে মা, লতিকা, বিষ্ণু রওনা হলেন। সঙ্গে দু-একজন গেল, কারা তা মনে নেই। আসলে মা-র জন্য এই প্রথম আমাদের মনে ভাবনা ঢুকেছিল। বাবা থাকতে থাকতেই মা-র ব্লাড-সুগার ধরা পড়েছিল। ক্রমে রোগা হয়ে যাচ্ছিলেন, খাওয়া-দাওয়ার বড় বেশি ধরকাট, ভাত বন্ধ, মিষ্টি বন্ধ। মিষ্টি বন্ধে আপত্তি ছিল না, কিন্তু দুপুরে এক মুঠো ঝোল-ভাত না খেলে মা-র কষ্ট হত। মুখে কিছু বলতেন না। মা-মরা মেয়ে, পরের বাড়িতে মানুষ, সেখানে অনেক স্নেহ পেলেও, মুখ ফুটে কোনোদিনও কিছু দাবি করতেন না। ঐ দাবি না করাটাই স্বভাব হয়ে গেছিল। দু-তিনবার কথা নেই বার্তা নেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছিলেন। ডাক্তার বললেন বেশি ইন্‌সুলিন পড়েছে। ইদানীং কিন্তু বেশ ভালোই ছিলেন আর সেখানকার পরিষ্কার ঠাণ্ডা হাওয়ায় যে দেখতে দেখতে শরীরের উন্নতি হবে, তাতে কারো মনে সন্দেহ ছিল না।

আমার ৪২ বছর বয়স। 'দিন দুপুরের' পর 'পদীপিসির বর্মি বাক্স' বেরোল। সিগনেটের প্রকাশনা, মানিকের মলাট, অহিভূষণ মালিকের আঁকা ছবি। দিলীপ গুপ্তের পরিকল্পনা, সে কথা বলাই বাহুল্য। 'শ্রীমতী' মাসিকপত্রে প্রকাশিত বড়দের উপন্যাস 'শ্রীমতী' আর 'জোনাকি'ও বেরোল। ছিমছাম সুন্দর চেহারা নিয়ে। তারপর হয়তো আমার আরো ৮০টা বই বেরিয়েছে, কিন্তু এমন সুন্দর একটিও নয়। সন তারিখ গুলিয়ে গেছে। আনন্দবাজারের রবিবাসরে, যুগান্তরে, গল্প ভারতীতে, সচিত্র ভারতে রসের গল্প লিখি। সমবয়সী লেখকদের তুলনায় কিছুই করিনি। সমস্ত মন পড়ে থাকে ছোটদের জন্য লেখার দিকে। জানি ও পথে কেউ নাম পায় না, কড়ি পায় না, পুরস্কার পায় না। তবে এ-ও জানি তাতে কিছু এসে যায় না। ঐখানেই আমার আসল কাজ। তবু নানা রকম রসের কথা মনে জমা হয়; সম্পাদকরা গল্প চান; লিখতে বেশ মজাও লাগে। তাছাড়া কতকগুলো কথা গল্পের ভেতর দিয়ে পাচার না করলে হয়তো বলবার আর সুযোগই পাব না, কিম্বা বললেও কেউ শুনবে না, কিম্বা চটে যাবে। তাই লিখতেই হয়। কিন্তু সত্যি কথাই বলব আমার হৃদয় মথিত করে, দম বন্ধ করে দিয়ে 'আর কোনোখানে আর আরো দু তিনটে গল্প বাদে, বড়দের জন্যে লেখা আমার কোনো গল্পের জন্ম আমার হৃদয়ের মর্মমূলে নয়, বরং আমার মস্তিষ্কের উষ্ণ অসহিষ্ণু কোষে কোষে।' সত্যিকার সাহিত্যের জন্ম সেখানে নয়। 'হলদে পাখির পালক' লেখার আগে হয়তো দু মাস আমার মুখে অন্ন রোচেনি, রাতে চোখে ঘুম নামেনি। সত্যিকার সাহিত্য কেউ স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করতে পারে না। সে

আপনি জন্ম নেয়। কিসের তাগাদায়, কার আশীর্বাদে, তা জানি না। শুধু জানি সে আমার অন্তরবাসী কেউ, তার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। এই আমার বিশ্বাস আর নিজের অভিজ্ঞতা। অন্যদের কথা জানি না।

আমার স্বামী মাঝে মাঝে আমাকে মনে করিয়ে দিতেন 'এত রকম কাজে জড়িয়ে পড়লে লিখবার সময় কি করে পাবে?' বোঝাতে চেষ্টা করতাম সময়ের জন্য লেখা বসে থাকে না। সময় হলে সে নিজেই সব বাধা সরিয়ে, দরজা ভেঙে দেখা দেবে। আমি শুধু যেখানে যা ভালো জিনিস দেখি—শিশিরের উপর সূর্যের ঝিকিমিকি, নীল আকাশের বকের সারি, ছোট ছেলের গালে টোল, বাতাসের মুখে শুকনো পাতার ঘূর্ণি. উনুনের আঁচে দাবানল, সব জমা করি। যত শব্দ শুনি টিনের চালে বৃষ্টি পড়া, গাছের পাতায় বাতাস বওয়া, মাথার ওপর বুনো হাঁসের আঁক-আঁক শব্দ, বালির পাড়ে ঢেউ ভাঙা, দুরন্ত ছেলের নাম ধরে মায়ের ডাক—তাও জমা করে রাখি। যেখানে যত সুগন্ধ আমার নাকে এসেছে, লম্বা লম্বা কাহিনীসুদ্ধু আমার মনে জমা আছে। যত ভালো কথা শুনেছি, ভালো দৃশ্য দেখেছি, ভালো জিনিস ভেবেছি—সব রেখে দিয়েছি। সারা জীবন ধরে তারা আমাকে রাজ্যেশ্বরী করে রেখেছে। এখন যদি তাদের বিলিয়ে না দিই, তাহলে তাদের রাখব কোথায়? চলে যাব তো খালি হাতে, রাজ্যের আনন্দ নিশ্চিন্তে ফেলে রেখে।

ছেলে প্রি-মেডিকেল পড়ে, মেয়ের বারো বছর বয়স। তাদের নিয়ে গেলাম কার্সিয়ং-এর ডাও হিলে। দার্জিলিং যাওয়া আসা করতে, সিঞ্চল লেকে পিকনিক করতে, কার্সিয়ং রেলস্টেশন আমার খুব চেনা। এক দিকে তাকালে নিচের সমতলভূমি দেখা যায়—নদীনালা, গাছ-পালা, ধানক্ষেত। আরো কাছে চা-বাগানের লাল টিনের চালের বাড়িঘর। কিন্তু শহরটা একেবারে রসহীন। গাড়ি চলাচলের একটা চওড়া রাস্তা। সেই রাস্তা থেকে নিচের দিকে গুটি কতক পথ নেমে গেছে আর ওপর দিকে ডাও হিলের খাড়া পথ বারো শো ফুট উঠে গেছে। ঐ পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি মিশনারি প্রতিষ্ঠান; একটা বড় গির্জা, কতকগুলো ফিরিঙ্গি বোর্ডিং স্কুল। অনেক উপরে, আঁকাবাঁকা পাঁচ মাইল পথ চড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত ডাও হিল স্কুল, একটা ছেলেদের স্কুল, বনবিভাগের একটা শিক্ষাকেন্দ্র, যক্ষ্মারোগের আরোগ্য নিকেতন ইত্যাদি আছে বলে শুনতাম। নিচে দিয়ে এর আগে কতবার যাওয়া আসা করেছি, ডাও হিল পাহাড়ের অপূর্ব সৌন্দর্যের বিষয়ে সন্দেহও করিনি।

সমতলের দিকে মুখ করে, বরফের পাহাড়কে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে ডাও হিল্। তার মাথার উপর দিয়ে পুরনো মিলিটারি রাস্তা একেবারে দার্জিলিং অবধি চলে গেছে। তবে সাধারণ লোককে সেটা ব্যবহার করতে বড় একটা দেখা

যেত না। পাহাড়ের মাথায় চড়লে হিমালয় নিজে এসে ধরা দেয়।

কার্সিয়ং অবধি রেলের লাইনের প্রতিটিবাঁক ছিল বড় পরিচিত। এরোপ্লেনে বাগডোগরায় নেমে, ট্যাক্সি নিয়ে কার্সিয়াং স্টেশনে আসা। আগে ভাবতাম দার্জিলিং যাবার পথে নগণ্য একটা স্টেশন। কিছু দোকান-পাট, হোটেল রেস্তোরাঁ থাকলেও, চোখে লাগার মতো কিছু নেই। কয়েকটা দু-তিন তলা বাড়ির মধ্যিখান দিয়ে পথ উঠে গেছে। জীপ কিম্বা সরকারী বন-বিভাগের শক্তিশালী ট্রাক ছাড়া এক ছোট মোটর গাড়ি ঐ পথে ওঠে। আমাদের জন্য ছোট গাড়ি ঠিক করা ছিল। দেখি পাকদণ্ডী পথের ধারে ধারে সুন্দর সুন্দর বাড়ি, বাগান। এ সব বাড়ি কলকাতার বাড়ির মতো নয়। লাল টিনের চাল দেওয়া, ছোটবেলায় শিলং-এ দেখা বাংলো বাড়ির মতো। সেই রকম কাঠের ওপর লাল বা ব্রাউন রং করা গেট। গেটের ওপর লতানে গোলাপ। মনটা অন্য রকম হয়ে গেল। শিলং-এর স্মৃতি মন জুড়ে বসল। শিলং মানেই মা। মাকে বাদ দিয়ে কলকাতায় দিব্যি বছরের পর বছর কাটিয়েছি, বয়স হয়েছে ৪২, তবু হঠাৎ মার জন্য মন কেমন করে উঠল।

ডাও হিলের পথের শেষটুকু বড্ড খাড়া। শেষের বাঁকটাতে খানিকটা পেছিয়ে এসে দম নিয়ে তবে গাড়িটা কায়দা করতে পারল। তার উপরে স্কুলের বড় বাড়ি, বোর্ডিং, শিক্ষিকাদের ছোট ছোট বাংলো, ঝাউগাছের সারি, পাহাড়ি ফুল। সেখানকার জমি যেন র‍্যাঁদা দিয়ে সমান করে চেঁচে বেড়াবার জায়গা, বড় খেলার মাঠ তৈরি করা হয়েছে। স্কুলের অধ্যক্ষা বিলেত থেকে পাশ করা, খাঁটি বিলিতি মেম, শিক্ষিকারাও দুজন ছাড়া সবাই ফিরিঙ্গি, কেউ ফর্সা কেউ মেশানো। তখনো ফরসা ফিরিঙ্গিরা এদেশে ছিল। লেখাপড়া, খেলাধূলা, হাতের কাজ, রান্নাবান্না ইত্যাদি শেখার চমৎকার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু ছাত্রী সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম এবং হয়তো ৯০ শতাংশ কালো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। তাদের জিজ্ঞাসা করলে বলত বড় হয়ে তারা হেয়ার-ড্রেসিং সেলুনে কাজ করতে চায়। শুনে শুনে হতাশ হতাম। এর জন্য এমন এলাহি ব্যবস্থা! তবে বিলিতি কোম্পানিরা অনেক আগেই বড় বড় অনুদান দিয়ে রেখেছিল ঐ সমাজের ছেলে-মেয়েদের খৃষ্টীয় নীতিতে শিক্ষা দেবার জন্য। সরকার হঠাৎ হস্তক্ষেপ করে নিয়ম পাল্টাবার পথে অনেক বাধা ছিল। তারপর ৩০ বছরের বেশি কেটে গেছে, এখন শুনি ব্যবস্থাপনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমার মনে হয় স্বাস্থ্যকর জায়গায়, সুনিয়ন্ত্রিত আবাসিক বিদ্যালয়ের খুবই প্রয়োজন আছে। ভালো বোর্ডিং খুব বেশি নেই আমাদের। প্রাইভেট স্কুলের বড় বেশি খরচ, অথচ যাঁদের বদলির চাকরি তাঁরা ছেলেমেয়েকে বোর্ডিং-এ রাখতেই বাধ্য হন। ভাষা সমস্যা অবস্থাটিকে আরো সঙ্গীন করে তোলে। ঐ ডাও হিলে চমৎকার এবং

বিশাল দুটি আবাসিক বিদ্যালয় হতে পারে, যেখানে ভবিষ্যতের নাগরিকরা মানুষের মতো বড় হয়ে উঠবার সুযোগ পাবে। এখনও স্কুলের অবস্থা কেমন তা অবিশ্যি জানি না।

এত কথা ঐ প্রথম দেখাতেই অবিশ্যি মনে হয়নি। বলেছি তো আমার এই বৃত্তান্তের সময়কালের গোলমাল আছে। তাতে মনে পড়ছে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না, একথা ভুল। যুদ্ধ বাধে ১৯৩৯ সালে, কবির মৃত্যু হয় ১৯৪১ সালে, অর্থাৎ দু বছর পরে। তবে ভুলও ঠিক নয়। অমি বলতে চেয়েছিলাম যে পৃথিবীর অন্যান্য মাটিতে যুদ্ধ লাগলেও, তার ঢেউ এসে ভারতের জীবনযাত্রায় এবং চিন্তাধারায় প্রতিহত হতে হতে কবির জীবন শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি বড় জোর ব্ল্যাক্ আউট দেখে গেছিলেন। যুদ্ধের কালো ছায়া তখনো ভালো করে নেমে আসেনি।

আমি ভালো করেই জানি এসব খুঁটিনাটি কথা আসলে অবান্তর, এতে আমার প্রিয়জনদের ছাড়া কারো কোনো কৌতূহল না থাকাই স্বাভাবিক, তবু তারা এসে বারে বারে বিঘ্ন ঘটায়। মনে মনে বলি আমি লেখিকা না হলে আমার স্মৃতিকথা কেউ পড়তে চাইত না। তবু একটা সবুজ শ্যামল মাটিতে কেমন করে ঠাঁই পেয়ে যাই, যেখানে আমি লেখিকাও নই, আমার স্মৃতিকথার এক কানাকড়িও দাম নেই। সেখানে শত শত অখ্যাত অনাবশ্যক চেনা-অচেনা মুখ এসে ভিড় করে আর আমার মনে হয় আমার জীবন সার্থক হয়ে গেল।

ডাও হিলের ওপর্কার প্রথম ধাপেই একটানা একটা বাংলো বাড়ি। সেখানে শিক্ষিকাদের আবাস। প্র্ত্যেকের গুটি তিনেক ঘর, স্নানের ঘর, রান্নাঘর। সব বিলিতি ধাঁচে সাজানো। কেমন একটা পরিপাটি ভাব। হয়তো প্রথম দেখায় প্রাণহীন, কিন্তু দরজা জানলায় পরদা দিলে, কৌচে দুটো রঙীন কুশন ফেলে রাখলে, দেয়ালের কোণার তিন ঠেঙো খুদে টেবিলে চোঙার মতো ফুলদানিতে তিনছড়া গ্ল্যাডিওলি সাজিয়ে রাখলে, চিমনির ওপরকার সরু তাকে একটা বড় মতো ঘড়ি বসালে—যার টিকটিক শব্দ কালের পদধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠে অনন্তের জানান দেয়—অমনি বাড়িখানি একটি কোমল স্নেহের নীড় হয়ে যায়। সেখানে আমার মা আছেন। মনের পাখি ডানা গুটিয়ে বসে। জীবনের সব ভুলচুক, অবুঝ অন্যায় এক মুহূর্তে ক্ষমা পেয়ে যায়। গিয়ে দেখলাম আমার ছোট বোন লতিকার কার্সিয়ং-এর বাড়ি সেই রকম একটি মনের আবাস।

খুব একটা বড় চাকরি করত না লতিকা। কলকাতার ইতিহাসে এম-এ, বি-টি, ভালো ইংরাজি জানে বলে, ডাও হিল্ স্কুলের ইতিহাস বিভাগের নম্বর ওয়ান। চারিদিকে খুব একটা জ্ঞানসাধনার আবহাওয়াও দেখলাম না। কিন্তু সব কিছু পরিচ্ছন্ন, নিয়মানুবর্তী ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। একেবারে নিষ্প্রাণও নয়। অনেক-

গুলি "বে-সংসারী" নানা বয়সের মহিলাকে দিনের পর দিন এভাবে স্বর্গে রেখে দিলেও কি মাঝে মাঝে হাওয়া গরম হয়ে উঠবে না ? আমার মতো দর্শকের কাছে ব্যাপারটা ভারি উপভোগ্য। আর শুধু আমার কেন, মা-ও দেখলাম নৈর্ব্যক্তিক ভাবে লতিকার সহকর্মিণীদের খিটিমিটি দেখে মজা পান ! ওখানে আমি অনেক গল্পের খোরাক পেয়েছিলাম আর পাহাড়ে প্রকৃতি দেখে রোজ নতুন করে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম।

এর মধ্যে আমার ভাই সরোজ তার ছোট মেয়েকে রেখে ফিরে গেল। ক-দিন পরেই সে যে কি নিদারুণ ঝড়ঝাপ্টা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ! মনে হত সাইক্লোনের মুখে পাহাড়চুড়ো উড়ে যাবে। বিজলির তার ছিঁড়ে গেল, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল, হাট-বাজার বন্ধ হল। তবু নিশ্চিন্তে মা-র কাছে রইলাম। খবরের কাগজ আসে না, চিঠিপত্র বন্ধ, রেডিওতে যা খবর পাওয়া যায়। মা এতটুকু ঘাবড়ালেন না, চাল ডাল তেল নুন আলু চা চিনি ময়দা বাড়িতে মজুত আছে, তবে আবার ভাবনা কিসের ! এমন ধীরস্থির মানুষ আর জন্মে দেখলাম না।

লতিকা কাজকর্ম করে, মা সংসার দেখেন। যখন যে রকম পরিস্থিতি হয়, তার সেই রকম ব্যবস্থা করেন। ফলে বাড়ির আর সকলেও এতটুকু ঘাবড়ায় না। তারপর ঝড়ের দাপট কমে গেল। প্রকৃতি ঠাণ্ডা হল। ভাঙাচোরা পাহাড়ে রাস্তায় আবার জোড়াতালি লাগল। মোটর চলল। রেলগাড়ির লাইন ধ্বসে গেছে, মেরামত হচ্ছে। তারি মধ্যে ছুটি ফুরোল। সরোজ সাবধানে আবার এসে কদিন থেকে, মেয়েকে নিয়ে গেল। আমরাও বাগডোগরা অভিমুখে রওনা দিলাম। ভাবি জীবনটা কি আশ্চর্য, ভবিষ্যৎ কত গোপনীয়। অনিশ্চিত। সরোজ যে বাসে কার্সিয়ং-এসেছিল, তার সামনে সামনে একটা ছোট মোটর যাচ্ছিল। হঠাৎ সেই গাড়িশুদ্ধ একশো ফুট রাস্তা ভেঙে নিচের খাদে পড়ল। শুনে সকলের চক্ষুস্থির। তবে দিন-সাতেকের মধ্যে মাটি আবার শক্ত হল। আমরা ফেরার পথে তাণ্ডবের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া ভয়াবহ কিছু দেখিনি। অন্ধকারময় কার্সিয়ংএ মা আর লতিকাকে রেখে আসবার সময় মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছিল।

কলকাতায় পৌঁছে দেখি মনের মধ্যে একটা দরজা খুলে গেছে। ক্রমে লেখার কাজ একটু একটু করে জায়গা দখল করে নিতে লাগল। নিজের বিলম্বের কথা মনে করে নিজেই আশ্চর্য হই। ছোটদের বড়দের পত্রিকায় লেখা বেরোত, মৌচাকে, রামধনুতে, সচিত্র ভারতে, গল্প ভারতীতে, যুগান্তরে, আনন্দবাজার পত্রিকায়, কিন্তু সে আর কতটুকু। ছড়ানো ছিটনো জিনিস ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। অর্ধেক তো হারিয়েই যায়। কপি জমা করে রাখার কথাও মনে হত না।

বড়দের ক্ষণস্থায়ী 'শ্রীমতী' পত্রিকায় আমার ধারাবাহিক'শ্রীমতী' বেরিয়েছিল, একথা আগে বলেছি। সম্পাদিকা মীরা চৌধুরীর নিয়ম ছিল গল্প হবে

নারী-কেন্দ্রিক আর সমাপ্তি হবে সুখের। সেই নিয়মেই 'শ্রীমতী' লেখা হয়েছিল, তবে তার আসল বক্তব্যটি মনের মধ্যে অনেক দিন ধরে ঘুরেছিল। এমন কি প্রথম অধ্যায়ের প্রথম দৃশ্যটি বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া। কাগজে বেরুনো এক, বই হয়ে বেরুনো আর। সেদিকে আমার যত্ন ছিল না। ভাবতাম তার জন্য ঢের সময় পড়ে আছে। হাতটা আরো পাকুক। কাগজে লেখার বেশ একটা নিশ্চিন্ত অ-স্থায়িত্বের ভাব আছে। তাতে খানিকটা নিরাপত্তা থাকে। কিন্তু সেই লেখাই বই হয়ে দেখা দিলে সর্বজনের সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। লেখা বলতে তখনো বড়দের জন্য লেখার কথাই বেশি ভেবেছি। তার জন্য প্রয়াস করতে হবে জানতাম। আমার চাইতে দক্ষ অভিজ্ঞ খ্যাতনামাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। ছোটদের জন্য লেখা আপনা থেকে মনের মধ্যে জমা হতে থাকে, এতটুকু কষ্ট করতে হয় না। কষ্ট শুধু তখন, যখন আমার মন যা বলে, হাত তা লিখতে পারে না। যথার্থই বলছি ছোটদের জন্য লেখাগুলোয় আমার তেমন কৃতিত্ব নেই। সেগুলি আমি অন্য কোনো জায়গা থেকে পাই, আর আমার সেই হৃদয়বাসী অদৃশ্য পুরুষের তাগাদায় লিখি।

ক্রমে ক্রমে ছোটদের লেখা সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণাও আমার মনে দানা বাঁধতে লাগল। সঙের খেলা দেখালে হবে না। ছোটদের সাহিত্যর উপজীব্য হল সরসতা আর সততা। শুধু এমন জিনিস লিখতে হবে যা পড়লে ছোটদের মনে সব সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি আর শ্রদ্ধা আসে। সৃষ্টিকর্তার মঙ্গল বিধানে আস্থা থাকে। তাহলেই লেখার মধ্যে আনন্দ ফুটে উঠবে। সে এমন আনন্দ যা দুঃখের গল্পেও হারিয়ে যাবে না। এই সব ভাবি। মুখে বিশেষ কিছু বলি না। ভাবি কি সুন্দর বিশ্বজগত ; বেঁচে থাকায় কত মজা। এ-ও ভাবি যে যা কিছু মন্দ, তার সঙ্গে কখনো বোঝাপড়া হয় না। মাস্টারনীর মতো শোনায়। ভাবি তা তো বটেই। ছোটদের জন্য যারা গল্প কবিতা লেখে, তারাই মাস্টারদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। যদিও ছোট বেলায় শুনতাম টেরি কাটা, হাত-ঘড়ি পরা, নবেল পড়া হল গিয়ে অধঃপাতে যাবার ধাপের পর ধাপ!

এখন টের পাই ঐ-সব চিন্তা কিছু আমার মনগড়া নয়, অক্ষর চিনে অবধি সন্দেশের পাতায় জ্যাঠামশাইদের আর তাঁদের বন্ধুর লেখার ছত্রে ছত্রে পরোক্ষভাবে এই শিক্ষাই পেয়েছি। মনটা ঐ ভাবেই তৈরি হয়ে এসেছে। ভাবতাম বড়দের জন্য লেখা হবে আমার কাজ ; ছোটদের জন্য লেখা আমার অবকাশ যাপনের নেশা। ১৯৫২ সালে সিগনেট প্রেস্ থেকে 'শ্রীমতী' প্রকাশিত হবামাত্র, বাংলার যত স্কুল-কলেজের ছাত্রী ও তাদের শিক্ষিকারা তাকে লুফে নিলেন। ঐ একই নীতিতে ১৯৫৬ সালে 'জোনাকি'-ও প্রকাশ হল সিগনেট থেকে। তার আগেই রংমশালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'পদি-পিসির বর্মী

বাক্স'-ও বই হয়ে বেরিয়েছিল। আমার পড়ুয়া-ভাগ্য বড় ভালো। যাদের জন্য বই লিখি তারা খুব খুশি হয়। বলা বাহুল্য তারা যতটা হয়, পণ্ডিতরা ততটা হন না। আমি বাপের দিকে, মায়ের দিকে পণ্ডিত বংশের মেয়ে, পাণ্ডিত্যকে বড় শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার নিজের বাংলা ভাষার ব্যাকরণের দিকটাতে, বা সংস্কৃতে কোনো দখল নেই। আমার কাজ অন্য ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্র সকলের সহানুভূতি পায় না। কোনো কোনো বন্ধু এ-ও বলেছেন যে এত লেখাপড়া শিখে এ-ভাবে ছোটদের জন্য লিখে সমস্ত আহৃত জ্ঞান নষ্ট করা অন্যায়। সেই ১৮৯৩ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর অবিস্মরণীয় 'হাসি ও খেলা' সম্পাদনা করে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা পাবার যে দাবি এদেশে প্রথম পেশ করেছিলেন, তারপর প্রায় ৬০ বছর কেটে গেলেও এখন পর্যন্ত শিশু সাহিত্য তার নায্য অধিকার পায়নি। সাহিত্যের ইতিহাসে বা মূল্যায়নে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যায়। সাহিত্যিকদের তালিকা থেকে শিশু-সাহিত্যিকরাও বাদ পড়েন, যদি না অন্য কোনো বয়স্কদের ক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকে। এবং যদিও ইয়োরোপের নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের মধ্যে একাধিক শিশু-সাহিত্যিকের নাম দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশের রবীন্দ্র পুরস্কার বরং দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর বয়স্ক লেখকদের দেওয়া হয়, তবু কোনো প্রতিভাবান শিশু-সাহিত্যিকের কথা চিন্তা করা হয় না। এমন কি অতুলনীয় 'শতবর্ষের বাংলা শিশুসাহিত্য' বইটির প্রণেতা খগেন মিত্রের নাম সে সময় কেউ করেছিলেন বলে শুনিনি। অবশ্য আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছি বর্তমান বাংলা সরকার গত তিন বছর ধরে শিশু-সাহিত্যের জন্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার দিয়ে, সেই অবিচারের কিছুটা ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। তাঁদের পরিকল্পিত ও প্রকাশিত 'আলোর ফুলকি' নামক সংকলন গ্রন্থেও উনিশ শতকের প্রথম অর্ধের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধের কবি সুনির্মল চক্রবর্তীর নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমার কেবলই মনে হয়েছে এইখানে কাজ করবার বিশাল ক্ষেত্র পড়ে আছে। সেই ক্ষেত্র কেবলই আমার মনকে টানে। তাই বয়স্কদের জন্য সাহিত্য রচনায় যতখানি একাগ্রতা আর নিষ্ঠা দরকার, তা আমি দিতে পারি না।

ছোটদের সাহিত্যকে এতখানি গুরুত্ব দেবার অন্য কারণও আছে। শুধু অনুরাগ আর অনুপ্রেরণা ছাড়াও, যুক্তির দিক থেকে বলা যায় মানবজাতির ভবিষ্যৎ গঠনে বড়দের সাহিত্য থেকে শিশুসাহিত্যের ভূমিকা অনক বড়। শিশুসাহিত্য দিয়েই মানুষের ছেলেমেয়েদের চিন্তাধারা তৈরি হয়। তাদের মনে বলিষ্ঠ আদর্শবাদ অঙ্কুরিত করার এই হল সময়। মূল্যবোধও এই সময় অনেকখানি তৈরি হয়ে যায়। পরে পড়শুনা করে মানুষ আনন্দ পায়, প্রয়োজনীয়

তথ্য পায়, সময় কাটে, তর্কের বিষয়বস্তু থাকে, নিজেকে সংস্কৃতিবান বলে প্রমাণ করার সুবিধা হয়, কিন্তু কৈশোরে তৈরি মনটি ক্বচিৎ বদলায়। যতই এসব ভাবি মন ততই ছোটদের জন্য লেখার দিকে ঝোঁকে। অবশ্য আসল কারণটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। একটা সময় দ্রুত এসে গেল যখন শুধু যে নিজেরও আর বড়দের জন্য লিখতে তেমন ভালো লাগত না তা নয়। তার ওপর বহু নাম করা বড়দের সাহিত্যিকদের পুরস্কারপ্রাপ্ত বই পড়েও যথেষ্ট আন্তরিকতা, সততা, বলিষ্ঠতা খুঁজে পেতাম না। কয়েকজন দেশ-কালোত্তর মহাপুরুষ ও মহানারীকে এই তালিকা থেকে বাদ দিচ্ছি। দুঃখের বিষয়, যথেষ্ট সৎসাহসের অভাবে কারো নাম না করাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে হচ্ছে। এই শেষের তালিকায় বেশ কিছু বয়ঃ-কনিষ্ঠও আছেন।

কেন যে আমি ছোটদের জন্য লিখি সে বিষয়ে যথেষ্ট কেন, হয়তো কিঞ্চিৎ বেশিই বলা হল। শিশু বলতে আমি ৫-৬ বছরের শিশু থেকে ১৬-১৭ বছরের কিশোর ও তরুণদের কথাও মনে করি।

আমার বাড়ির লোকেরা আমার সাহিত্যকর্মের বহর দেখে যে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। খানকতক বড়দের আর ছোটদের বই, বহু পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ, কিছু অনুবাদ। ব্যস্, ঐ অবধি। ওকে কিছু সাহিত্যকর্ম বলা যায় না। সমবয়সীরা অনেকে ততদিনে তাঁদের যা যা দেবার ছিল, তা প্রায় নিঃশেষ করে এনেছেন। অমি তখনো সংসারে প্রায় ডুবে আছি। বাড়িটাকে একটা ছোটখাট আবাসিক বিদ্যালয়ও বলা চলত। কয়েকটা সমাজসেবী সংগঠন থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। কবিবন্ধু শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁর স্ত্রীর প্ররোচনায় একটু একটু করে পি-ই-এনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছি। নিজের মধ্যে খানিকটা উৎসাহের অভাবও টের পেতাম। বোধ হয় কোনো সংস্থার বা সংগঠনের পদ্ধতি অনুসরণ করার সঙ্গে বেড়াজালের সাদৃশ্য দেখতে পেতাম বলে চিরকাল কোনো কিছুতে আত্মসমর্পণ করতে ঘাবড়াই। এমন কি আমার দীর্ঘকালের এই সুখ-শান্তির সংসারের মধ্যিখানেও টের পাই আমার সত্তার অন্তঃস্তলে একটা জায়গা আছে যেখানে আমি একান্ত একলা। সেখানে আমি কারো মেয়ে নই, বোন নই, স্ত্রী নই, মা নই, বন্ধু নই। সেখানে আমার আমিত্বের সঙ্গে বোঝাপড়া করতেই জীবন গেল। কিন্তু তাতে আমার জীবনের স্বাভাবিক আনন্দগুলো উপভোগ করাতে কোনো অসুবিধাও হয়নি! তবে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে ঐসবের নীচে তলিয়ে গিয়ে শেষটা জীবনের আসল কাজটাই বাকি থেকে যাবে না তো?

১৯৫২ সালের গরমের ছুটিতে আরেকবার লতিকার কাছে কার্সিয়ং-এ গেলাম। সে তখন ডাও হিল্ স্কুলের অধ্যক্ষা হয়েছে। পাহাড় চুড়োর সুন্দর

বাংলোয় অবস্থান। বলা-বাহুল্য বিদায়ী মেম অধ্যক্ষার আয়ের অর্ধেকও আয় নেই! মা তখনো তার বাড়ির কর্ত্রী, পুরনো লোক বিষ্টু রান্নাবান্না করে এবং লতিকার পদমর্যাদা উপেক্ষা করে ধমকধামক করে। একবার বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে তখনকার রাজ্যপাল—শিক্ষাবিদ্ ডঃ হরেন মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক ডাও হিলে এলেন। স্ত্রীটি আবার মায়ের সেকালের বেথুন কলেজের বন্ধু। কাজ হয়ে গেলে, বসবার ঘরে চা এবং স্কুলের রান্নাঘরে তৈরি উৎকৃষ্ট কেক বিস্কুটের সদ্ব্যবহার হচ্ছে। এমন সময় পরদার আড়াল থেকে বিষ্টু আঙুল নেড়ে লতিকাকে ডাকল। সে দরজার কাছে যেতেই বলল, 'কি, পেয়েছ কি! সকালের দুধ খাওনি কেন?' জানি না বিশিষ্ট অতিথিরা শুনতে পেয়েছিলেন কি না, আমি কিন্তু পেয়েছিলাম!

আমরা ফিরে এলাম ছুটির শেষে। তারপর আগস্ট মাসের গোড়ায় এক দুঃখের শেষরাতে ট্রাঙ্ককল পেলাম, মা আর নেই। ৬৮ বছর বয়স হয়েছিল। ২০ মিনিটের হৃদরোগের ফলে পাট তুলে গেলেন চলে।

॥ ১০ ॥

তারপর ত্রিশ বছর দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, ভাবলেও অবাক হই। সেদিন ভোরে উঠে বালিগঞ্জে ভাইবোনদের বাড়িতে দরজা পিটিয়ে তাদের তুলে ঐ সংবাদ দেবার কথা ভোলা যায় না। ঘুম-জড়ানো চোখে ওরা যেন ঠিক বুঝতেই পারছিল না। ততদিনে চতুর্থ ভাই সরোজ বিলেতে গুছিয়ে বসেছে, লতিকা তো ডাও হিলের অধ্যক্ষা, ছোট ভাই যতির আলাদা সংসার, বাকি সব তখনো ৬৮বি যতীন দাশ রোডে পরস্পরকে অবলম্বন করে রয়েছে।

সকাল আটটার প্লেনে দাদা, দিদি, আমি রওনা হয়ে গেলাম। আর সকলের স্কুল, কলেজ, চাকরি বাকরি। দাদা দিদিও চাকুরে মানুষ, কি সব ব্যবস্থা করে রওনা হল। প্লেন থেকে চারদিকে চেয়ে দেখি আকাশে তেমনি রোদ আর মেঘের খেলা, নিচে তেমনি ধানক্ষেতের ওপর আলোছায়ার কাঁথা পাতা। উড়োজাহাজে সেকালে চমৎকার প্রাতরাশ দিত। দাদা, দিদি হতাশ ভাবে চেয়ে রইল। কেমন যেন মনে জোর পেলাম। কাছাকাছি বয়সী আমরা তিনজন। বললাম 'খাও, যা পার, সেখানে পৌঁছে শরীর মনের শক্তির দরকার হবে।'

বাগডোগরা থেকে ছোট মোটর আমাদের কার্সিয়ং-এ নামিয়ে দিল। লতিকা ওরি মধ্যে ফোন করে গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিল। সেই চেনা কার্সিয়ং স্টেশন। সেখানে ডাও হিল্ স্কুলের বড় দারোয়ান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার হাতে ধূপ কাঠি, ফুলের মালা, এইসব। কেমন যেন গলায় একটু ব্যথা করে উঠেছিল। সে-রকম কান্নাটান্না আসে না আমার। সেই চেনা পথে,

পাহাড়ের মাথায় একটু পিছু হটে আবার স্পীড দিয়ে খাড়াইটুকু উঠে, অধ্যক্ষার সুন্দর বাড়ির সামনে পৌঁছলাম।

ভাবছিলাম লতিকা এই দুঃসময়ে একেবারে একা। দেখলাম সে ভাবনা অমূলক। বাড়ি ভরা সমব্যথী নরনারী। ফিরিঙ্গি, বাঙ্গালী, নেপালী : কারা সব অনাত্মীয় পরম আপন জনরা ফুল দিয়ে মাকে চমৎকার করে সাজিয়ে দিয়েছে। মার ভগবানে গভীর বিশ্বাস ছিল, উপাসনা ভালোবাসতেন। বলতেন আত্মার সদ্গতি হয় কি না বলা যায় না, ভগবানও খোশামুদিকে ভোলেন না, কিন্তু মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আজ মা চলে যাবার আগে কে ভগবানের নাম করবে? দাদা, দিদি বোবা। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। তখন নিচের রোমান ক্যাথলিক মঠের অল্পবয়সী সাধু ফাদার চার্লস্ বললেন, 'আমি ভগবানের নাম করলে হবে না? তিনি তো একজনই।' লতিকা হাতে চাঁদ পেল। হাঁটু গেড়ে বসে ফাদার চার্লস্ মধুর ভাষায় সেই এক ভগবানকেই ডাকলেন। দেখি সকলের চোখে জল।

সারা দিন বৃষ্টি পড়েছিল। বেলা তিনটেয় শ্মশানযাত্রীরা রওনা হল। তখনো টিপটিপ পড়ছে, কিন্তু আর দেরি করলে রাত হয়ে যাবে। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। দাদা গেল। আমরা তিন বোন বাড়ির সামনের চাতালে দাঁড়িয়ে দেখলাম পাহাড়ি পথ দিয়ে এঁকে বেঁকে গম্ভীর এক শোভাযাত্রা চলেছে। ফুল নিয়ে চলেছে কত লোক, মঠ থেকে পাঠানো সাদা অর্কিড ফুলের মস্ত ক্রুসটিও ছিল সেই শোভাযাত্রায়। সবার পিছনে হয় তো পঞ্চাশ ষাটজন স্থানীয় পাহাড়ি অধিবাসী, প্রত্যেকের কাঁধে ছোট এক বোঁচকা কাঠ। জিজ্ঞাসা করাতে বলল, 'এমন দয়ালু মানুষের চিতায় কাঠ জোগালে পুণ্য হয়।' কেন জানি মনটা একটু ভালো হয়ে গেল।

ভালোভাবে কাজ সম্পন্ন করে সন্ধ্যার সময় দাদা ফিরে এল। গরম জলে স্নান করে, চোখ মুছতে মুছতে বিষ্ণু এসে বলল, 'রাতেও না খেলে মা কি বলতেন? যা হয় করি।' তা-ও করতে হল না। স্কুলের সুন্দরী অঙ্কের শিক্ষিকা নিজে ভাতেভাত রেঁধে পাঠালেন। ওখানে উনিই একমাত্র বাঙ্গালী টিচার ছিলেন। এমনি করে সে দিনটা কেটে গেল। এ-সব কোনো না কোনো সময়ে সকলের পরিবারেই হয়ে থাকে, নিজেদের বেলায় মন জুড়ে বসে। মনে আছে তার পরের রবিবার ওখানকার প্রটেস্টান্ট গির্জায় মার নামে বিশেষ উপাসনা হল। উপাসনা-ঘরে লোকে লোকারণ্য। খৃষ্টীয় পদ্ধতি এমনি উদার যে ঐ প্রার্থনাগুলি হল যে কোনো ধর্মাবলম্বীরই মনের মতো কথা। আলাদা করে কোথাও যীশুর নাম করা নেই। বড় ভালো লেগেছিল। তারপর দিন দাদা দিদির ছুটি ফুরিয়ে গেল, তারা নেমে গেল। আমি বেকার-যুবক, আমার ছুটির দরখাস্ত করতে হয়

না। মার সংসার যথাসম্ভব তুলে দিয়ে লতিকার সঙ্গে দিন সাতেক পরে ফিরলাম। লতিকাকে আবার গিয়ে শীতের ছুটি অবধি কর্মভার তুলে নিতে হবে। তারপর তার বিলেত যাওয়া সব ঠিক। খালি জানুয়ারির ঘোর শীতে একবার গিয়ে চার্জ বুঝিয়ে দিতে হবে।

এরপর ত্রিশ বছর কেটে গেছে, আর ডাও হিল্ যাইনি, কার্সিয়ং যাইনি। এখন নাকি সব বদলে গেছে। ঐ রোমান ক্যাথলিক মঠটিও আর নেই। স্কুলে ফিরিঙ্গিদের প্রাধান্যও নেই। পঃ বাংলা সরকার পরিচালিত, ইংরিজি মাধ্যমের মোটামুটি ভালো একটি স্কুলমাত্র।

১৯৫২-তে বয়স আমার চুয়াল্লিশ ; জীবনের অর্ধেকের বেশি কেটে গেছে ; বই বেরিয়েছে পাঁচটি ; ছোটদের বড়দের গল্প প্রবন্ধ বেরিয়েছে বেশ কিছু ; রেডিওতে গল্প বলি, রম্যরচনা পড়ি ; লক্ষ্য করি লোকে বড় সরস জিনিস ভালোবাসে, যদিও দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রায় সবই দুঃখকে অবলম্বন করে থাকে। ভাবি দৈনন্দিন জীবনের বেদনা-ব্যর্থতা-হতাশায় ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষরা একটু আনন্দের, একটু হাসির খোরাক চায়। তাই বলে জোর করে লোক হাসাতে বসি না, সরস কথাগুলো আপনি আসে কলমের আগায়। আগে ভাবতাম বড়দের জন্যেই বেশি লিখব। ক্রমে মনটা ছোটদের দিকে ঝুঁকতে লাগল। আসলে দুঃখকে আমি অস্বীকার করি না, দুঃখে বড় বেশি বেদনা বোধ করি, তাই ভাবি এদের মনের মধ্যে এমন কিছু আনন্দের খোরাক থাক, যার জোরে দুঃখেরো সম্মুখীন হবার বল পাবে। নিভৃত নিশীথের জন্য কান্নাগুলো থাক।

ক্রমে বেতারের সঙ্গে সম্বন্ধটি আরো ঘনিষ্ঠ হল। কিছু দিন মহিলাদের ও ছোটদের বিভাগ পরিচালনাও করেছিলাম। সে সময় একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। বেশি শিক্ষিত বা কম শিক্ষিত প্রায় সব মহিলাই ঘরকন্নার বুকে বাস করেন বটে, কিন্তু ঘরকন্নার ওপর হাড়ে চটা। মনে একটা বাসনা ছিল এই সব আলোকপ্রাপ্তা নারীদের দিয়ে যদি শিশুপালন, রান্নাবান্না, সেলাইবোনা, ঘর-সাজানোর কথা বলাই, তাহলে বিষয়গুলি বেশি কার্যকরী এবং চিত্তাকর্ষক হবে। কাজেই দেখলাম দু-চারজন অসাধারণ মেয়ে ছাড়া—(যেমন ডঃ রমা চৌধুরী, বা নলিনী দাশ, বা কল্যাণী কার্লেকর, যাঁদের বিশেষ কৃতিত্ব সংসারের বাইরে!!)—অন্য শিক্ষিত মহিলারা দুটো প্রোগ্রাম করবার পর অভিমান করে বলেন, 'কেন আমরা কি "বঙ্কিমচন্দ্রের নারী চরিত্র", কিম্বা "রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা," বা ঐ রকম কোনো বিষয়ে বলবার যোগ্য নই ? কিছুতেই তাঁদের বোঝাতে পারিনি বইয়ের চরিত্রের চেয়ে ঘরের গিন্নিদের ভূমিকার অনেক বেশি গুরুত্ব। তাদের কথা ভালো করে বলবার লোক পাওয়া যায় না। তা কে শোনে !

পরে যখন বেতারের প্রযোজক হয়েছিলাম, তখনো এই ব্যর্থতার দিকটা লক্ষ্য করেছিলাম। এর একটা মজার দিক-ও আছে। ঐ যে-সব উচ্চশিক্ষিতা অসাধারণ মেয়েদের কথা বললাম তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা চিকিৎসকও ছিলেন, তাঁরা কিন্তু আনন্দের সঙ্গে এবং অতি দক্ষভাবে শিশু-পালন, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বলতেন। এখন মনে হয়, সেই কথিকাগুলো সংগ্রহ করে বেতার বিভাগ চমৎকার এক বই করতে পারতেন। কারণ চুক্তিপত্রে লেখা থাকত রচনাগুলি বেতারের সম্পত্তি হয়ে গেল। যে রকম আজেবাজে ব্যাপারে বেতার দিস্তা দিস্তা নোট, স্মরণিকা ইত্যাদি প্রকাশ করেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হতভাগ্য লেখক আর প্রকাশকদের মতো কাজের জন্য তাঁদের হা-পিত্যেশ করতে হয় না। আর কেন্দ্রীয় সরকারের যে যা-খুশি তাই ছেপে বের করবার খুব সুবিধা আছে সে তো দেখাই যাচ্ছে। অর্থাৎ সামান্য খরচে বেতার একটা লাভজনক সুযোগ হেলায় হারাচ্ছে।

এতে আরেকটা মজার কথা মনে পড়ল। তার সাল তারিখ মনে নেই। বেতার থেকে আমাকে অনুরোধ করা হল যে হপ্তায় এক দিন করে ধারাবাহিকভাবে একটি করে ৯ মিনিটের ভাষণ দিতে হবে। দুপুরে মহিলামহলে। বিষয়বস্তু হল একজন মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়েকে ১১/১২ বছর বয়স থেকে বিয়ে হওয়া পর্যন্ত সাধারণতঃ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, কি ভাবে তার মোকাবিলা করা যেতে পারে। শুনে আমি মহা খুশি। দুপুরের মহিলামহলে ভাষণ দিতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না। অবিশ্যি আমার প্রিয় বান্ধবী মৈত্রেয়ী দেবী একবার মহিলামহলে ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ পত্রটি ফিরিয়ে দেবার সময়ে খাশা এক চিঠিও লিখেছিলেন, সে কথা না বলে পারছি না। তিনি বলেছিলেন আধা-ঘুমন্ত শ্রোত্রীদের কাছে বক্তৃতা করবার তাঁর কোনো সাধ নেই। কথাটা অনেকখানি সত্যি হলেও, বক্তব্যটি প্রযোজ্য শুধুমাত্র উচ্চমধ্যবিত্ত মেয়েদের প্রতি। আমার মনে হয় বেতারের মহিলামহল মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্তদের বেশি কাজে লাগে। তাঁদের কাছ থেকে কত উৎসাহ, কত কৌতূহল ভরা চিঠি পরে আমি পেয়েছি তার ঠিক নেই।

সে যাই হক 'ঠাকুমার চিঠি' ধারাবাহিক ভাবে মহিলামহলে প্রচারিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তার সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়াও দেখলাম। বাংলাদেশ থেকে পর্যন্ত শ্রোতারা চিঠি লিখলেন। ঠাকুমার নাতনিটিকে ১১ বছর বয়স থেকে আগলে আগলে, একেবারে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে ছাড়লাম। অমনি প্রকাশকরা ছেঁকে ধরলেন। চুক্তিপত্রের পিঠের দিকে ছিল বেতারের অনুমতি ছাড়া ছাপা যাবে না। বন্ধুরা এবং বেতারের সহানুভূতিশীল কর্মীরা বললেন, ওটা একটা ফর্ম্যালিটি মাত্র, এ-সব ভাষণ দিয়ে বেতার কি করবে ? দিলাম পরামর্শমতো কলকাতার

স্টেশন ডিরেকটরের প্রযত্নে সরাসরি দিল্লীর হেড্অপিসে ডিরেক্টর জেনারেল মশাইকে ছাপার অনুমতি চেয়ে একটা দরখাস্ত ঠুকে। তারপর আর কোনো কথাবার্তা নেই। আমি নিজেও প্রায় ভুলেই গেলাম ব্যাপারটা। প্রকাশক মাঝেমাঝে তাগাদা দেন, শ্রোতাদের মনে থাকতে থাকতে বইটি বেরুলে বিক্রির সুবিধা হত। কিন্তু বেতার আপিস থেকে আমার কোনো স্মারকলিপির জবাব আসে না। এই রকম এক তরফা পত্রালাপের মাঝেমাঝে কিন্তু মাসে একবার ছোটদের আসরে, মহিলামহলে, সাহিত্যবাসরে নিয়মিত ভাষণ দিয়ে কুড়ি টাকা করে মুনাফা পেয়ে আসছি। সেটা যে কিছু কম তাও আমার মনে হত না। এই ভাবে কয়েক মাস ছেড়ে কয়েক বছর কেটে গেল। তার মধ্যে খবর পেলাম আমার দরখাস্তটিকে সুব্যবস্থার জন্য স্থানীয় মহিলা-মহলের কর্মাধিকারীকে দেওয়া হয়েছে। তিনি যে কিছু দিনের মতো বিলেতে গেছেন সে-কথা আর কেউ বলল না।

তারপর ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লি থেকে স্বয়ং ডিরেকটর জেনারেল আমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করে প্রস্তাব করলেন আমি যেন বেতারের একজন প্রযোজক হই। অনেক দোমনা করে, তর্কাতর্কি করে, শেষটা এপ্রিল মাসে কাজে যোগ দিয়েই আমার সেই দরখাস্তর তদন্ত করলাম। তখন ঐ ফাইল অন্য লোকের হাতে, স্টেশন ডিরেকটরের সহযোগিতায় আবিষ্কার হল দরখাস্তটি সযত্নে ফাইল করেই সেই ব্যক্তি বিলেত গেছিলেন। অনতিবিলম্বে ফিরে এসে যা যা করণীয় সব করেও ফেললেন। আমি ও আমার প্রকাশক স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। প্রকাশক আমার সঙ্গে চুক্তিপত্র ও অগ্রিম কিছু টাকাকড়ি দিয়ে ছাপার তোড়জোড় শুরু করলেন। বারবার বলে দিলাম অনুমতিপত্র না পৌঁছনো অবধি যেন ছাপার কাজ শুরু না হয়।

এবার অল্প সময়ের মধ্যেই কেন্দ্র থেকে দরখাস্তর উত্তর এল। স্টেশন ডিরেকটরের নামে চিঠি, আমাকে কপি। তার মর্ম হল যে পাণ্ডুলিপিকে যখন গল্প উপন্যাস বলা যায় না, তখন তার মালিক লেখক নয়, স্বয়ং আকাশবাণী। অতএব ঐ পাণ্ডুলিপি নিলামের ব্যবস্থা হয় এবং যে প্রকাশক সব চেয়ে বেশি হারে রয়েল্টি দেবেন, তাঁকেই ছাপতে দেওয়া হক। তিনি যদি দয়া করে ঐ রয়েল্টির ওপর আরো কিছু লেখককে দিতে চান, তাহলে অবিশ্যি বেতারের আপত্তি নেই। আমি তো তাজ্জব বনে গেলাম! বিপদে-আপদে প্রযোজকদের পরামর্শদাতা প্রেমেন্দ্র মিত্রও সময় বুঝে জ্বরে পড়েছেন! অগত্যা যে পদাধিকারীর হাতে ঐ ফাইল, শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই যেতে হল।

তাঁর নাম ছিল বিমল চক্রবর্তী, বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড় হবেন। কালো, লম্বা এবং আমার ধারণা ছিল প্রযোজকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব

আছে। তাই এই ক-মাস তাঁকে এড়িয়েই চলেছিলাম। এবার দেখলাম আমার সে ধারণা একেবারে ভুল। বিমলদার পরিস্থিতিটা ভালো করেই জানা ছিল। বললেন, 'এ ব্যবস্থায় আপনি কি খুব সন্তুষ্ট?' আমি চুপ করে রইলাম। বিমলদা বললেন, 'কিন্তু বইটা বোধ হয় ছাপাবার ইচ্ছাও আছে?' আমি বললাম, 'হুঁ।' বিমলদা বললেন, 'আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই সাত তাড়াতাড়ি বড়কর্তাদের কাছে অনুমতি চেয়ে বসার কি মানে?' বললাম ৪১/২ বছর আগে চেয়েছিলাম।

তিনি মুচকি হাসলেন। তাঁকে আর কিছু বলে দিতে হল না। বললেন, 'কলম আছে?' কলম ছিল। একটা সাদা কাগজ দিয়ে বললেন, 'যেমন বলছি লিখুন।' কাকে লিখতে হবে, কি ভাবে বিনয় করে লিখতে হবে, সব শুনে আমি বড়কর্তাকে চিঠি লিখলাম যে ৫ বছর আগে দরখাস্ত করার পর আমার মত বদলেছে। ওভাবে ঐ পাণ্ডুলিপি ছাপার আমার আর আগ্রহ নেই। এ বিষয়ে এত কষ্ট দিলাম বলে আমি দুঃখিত। ইতি।

তারপর বিমলদা আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন, 'যান, এবার কষ্ট করে লেখা সুন্দর পাণ্ডুলিপির টেক্সট্ একটু বদলে, নাম বদলে ছাপুন গিয়ে। অবিকল এই টেক্সট দেবেন না। আমিও ফাইলটা বন্ধ করে দিই। বাঁচা গেল। নিলাম করতে হলে তো আমার ঘাড়েই পড়ত।' তারপর আরেকটু হেসে বললেন, 'সবচেয়ে মজা কি জানেন, ঐ পাণ্ডুলিপি একমাত্র আপনার কাছেই আছে। আমাদের কপি সম্ভবত কোনকালে সেরদরে বিক্রি হয়ে গেছে, নইলে অত পুরনো পাণ্ডুলিপি জমা রাখবার জায়গা কোথায়?' মনে আছে ঘরসুদ্ধ সকলে খুব হেসেছিলাম আর ক্যান্টিন থেকে চা আনিয়ে খেয়েছিলাম। তার চেয়েও বড় লাভ হল বিমলদার কাঠখোট্টা বাইরেটা ভিতরে স্নেহশীল অন্তরটা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ৭ বছর রেডিওতে ছিলাম, তাঁর স্নেহের বহু নিদর্শন পেয়েছিলাম। এই স্বীকৃতিটুকু তাঁকে না দিলে আমার অন্যায় হবে। তিনি বোধ হয় আর ইহলোকে নেই। তাছাড়া বেতার সেরেস্তার মেজাজমর্জি বিষয়ও খানিকটা সরস জ্ঞান লাভ করলাম।

ঐ পাণ্ডুলিপিই কিঞ্চিৎ শোধন করে 'মণিমালা' নামে এশিয়া পাবলিশিং ছেপেছিলেন। চারটে সংস্করণও হয়েছে।

এ-সমস্ত হল পরের কথা। তার আগে শান্তিনিকেতনে আমাদের আবাসনের কথা বলতে হয়। হয়তো ১৯৫৩ সালে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন শান্তিনিকেতনের পূর্বাঞ্চলে সহৃদয় বন্ধু ও সহানুভূতিশীল বিশ্বভারতীর আজীবন সভ্যদের নামমাত্র দামে দু-বিঘা করে জমি দেবার প্রস্তাব হয়েছে, বাড়ি করার উদ্দেশ্যে। আমাদের যদি আগ্রহ থাকে ইত্যাদি। আগ্রহ আমার যথেষ্টই ছিল। অনেকবার মামরা ভেবেছি শহরের কোলাহলের বাইরে একটা আস্তানা থাকলে

বেশ হয়। তার পক্ষে শান্তিনিকেতনই সবচেয়ে প্রশস্ত। আমার স্বামী বললেন, 'অবিশ্যি ঐ পরিকল্পনার ৯৯ বছরের লীজ্ না নিয়ে, আলাদা একটা জমি বরাবরের মতো কিনে ফেললেই তো হয়।' তাই করা হল। উত্তরায়ণের উত্তরে শ্যামবাটির লাগোয়া জমি কেনা হল। আমার উৎসাহ দেখে কে! নিজে বাড়ির প্ল্যান করলাম। তাকে নিখুঁৎ বলা কোনো মতেই চলে না। কারণ ভিৎ করলাম দোতলার, কিন্তু ওপরে ওঠার সিঁড়ির জায়গা রাখলাম না! বাড়ির কেউ, কিম্বা কনট্র্যাকটররাও কিছু বলল না। কন্‌ট্র্যাকটর মানে পণ্ডিত জগদানন্দ রায়ের দুই নাতি, অনু আর রেন্টু তাদের ডাকনাম। এককালে ওরা আমার ছাত্র ছিল, কম শাসন-ও করিনি। খুব লক্ষ্মী ছেলে ছিল না। তারাই এখন আমাদের বাড়ি করল। এবং প্রাণ দিয়ে করল বললেও কম বলা হবে। সেই ১৯৫৪ সাল থেকে, আজীবন তারা আমাদের শান্তিনিকেতনের আবাসের এবং সংসারের যাবতীয় ঝামেলা হাসিমুখে বহন করেছিল। তিন বছর আগে রেন্টু গেল, গত বছর অনুও গেল। আমার আগে ওরা যাবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। অনু বিয়ে করেনি। রেন্টুর স্ত্রী লিলি হাসি মুখে আর বুকভরা সাহস নিয়ে তিন ছেলে মেয়েকে মানুষ করছে। বড় মেয়ের বিয়েও দিয়েছে। তারা আমাদের নিতান্ত আপনজন। এসব সম্পর্ককে আমি জীবনপথের বাড়তি মুনাফা বলে মনে করি।

সপ্তাহে একবার করে সকালের গাড়িতে এসে বাড়ি তৈরি বিষয়ে ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে, অনেক সময় সেই দিনই বিকেলের গাড়িতে বা পরদিন সকালের গাড়িতে কলকাতা ফিরতাম। এমন দক্ষ এবং সৎ কনট্র্যাকটর কি করে হতে পারে ভাবতে পারি না। বাড়ির নক্সা হল, ঠিক যে ক-টি টাকায় রফা হল, তার চেয়ে এক পয়সা বেশি নিল না। ৬ মাসের বদলে শেষ করতে ৮ মাস লাগল, তাই আমার স্বামীর কাছে বকুনিও খেল। তবু এতটুকু ক্ষোভ নেই। এই মানুষ দুটি চিরদিনের মতো আমার ছোট ভাইয়ের স্থান নিয়েফেলল। শুনেছি শত্রুকে যদি মন্দ করতে চাও, তাহলে তাকে একটা বাড়ি করতে লাগিয়ে দিও। তার চেয়ে ভালো সাজা আর হয় না। আমি কিন্তু আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়ি তৈরির ব্যাপারটা ভারি উপভোগ করেছি।

প্রায় হপ্তায় হপ্তায় যেতাম, আমার বন্ধু বুবুর বাড়িতে উঠতাম। সে ততদিনে অমন দেবতুল্য স্বামীটিকে হারিয়ে, আশ্চর্য সাহস দেখিয়ে পাঠভবনে অধ্যাপনা করে ছেলেমেয়ে মানুষ করছে। ওদের বাড়ির মাথা হলেন ওর পিসি শাশুড়ি ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, সকলের বিবিদি। পিসিশাশুড়িও যেমন, তেমনি আপন জেঠিও বটে। দুজনে মিলে চারটি ছেলেমেয়েকে সুন্দর ভাবে মানুষ করেছেন। তখন সকলে স্কুলে পড়ে, বিবিদির তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি তৈরি হয়, আলাপিনী নামক মহিলাসমিতির মিটিং বসে। এক কথায় বাড়িতে নরক

গুলজার। তার মধ্যে আমার মতো একটা বাড়তি মানুষ খবর না দিয়ে, যখন তখন উপস্থিত হলে ওদের কোনো অসুবিধে হলেও, আমি টের পেতাম না। এ সব ব্যাপার ঘটছে ১৯৫৪ সালে। আমি তখনো রেডিওতে যোগ দিইনি।

মজার মজার ঘটনা ঘটত। একদিনের কথা অনেক জায়গায় বলেছি। সে দিন সন্ধ্যার ট্রেন লেট করাতে বুবুদের বাড়িতে যখন পৌঁছেছি, ওরা তখন খেতে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বাড়তি জায়গা হয়ে গেল। হাত মুখ ধুয়ে হাসিমুখে টেবিলে বসেই, পরিস্থিতির থমথমে ভাবটা চোখে পড়ল। আমাকে স্বাগত জানিয়ে ক্ষণিক বিরতির পর বুবু তার বড় ছেলেকে বলল, 'আমি তোমার মা হতে পারি, তার জন্য আমার সব কর্তব্য পালনেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাই বলে তোমার জন্যে হাতে হাতকড়া পরে থানায় যেতে রাজি নই।'

এ কথা শুনে সুন্দর মুখটা লালটাল করে ছেলে বলল, 'আমি বন্দুক দিয়ে পাখি মারলে তোমাকে থানায় যেতে হবে ?' বুবু বলল, 'পাখি না, মানুষ মারলে। অমুক সময় অমুকের ছেলে কি করেছিল ভুলে গেছ ?' ছেলে গরম হয়ে বলল, 'আমার ওপর কি তোমার এতটুকু আস্থাও নেই ?' বুবু বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বলল, 'না, নেই।' অমনি ছেলে হড়হড় করে চেয়ার ঠেলে নিজের ঘরে দোর দিল। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম হাত পর্যন্ত ধুল না। বুবুও তার চেয়ার ঠেলে শয্যা নিল। অবিশ্যি হাতমুখ ধুয়ে।

তখন বাকিরা উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'কাছে এসো লীলামাসি, আমরা খাওয়াদাওয়া করি।' এতক্ষণ যে মানুষটি সংলাপে যোগ দেবার কোনো চেষ্টা না করে পেয়ালায় সূপের বড়ি ঘুঁটছিলেন, তিনি এবার মুখ তুলে তাকালেন। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ঐ বন্দুকটা তবে কার ?' বিবিদি বললেন, 'আমার। মানে আমার স্বামীর ছিল, এখন হয় তো আমার।' বললাম, 'ওর লাইসেন্স নেই বুঝি ?' বিবিদি সূপ ঘুঁটতে ঘুঁটতে বললেন, 'তা থাকতেও পারে। ঠিক বলতে পারছি না। ওটা কিনা পূর্ব পাকিস্তানেই আছে, আনাবার কোনো সম্ভাবনাও নেই।' এই বলে একবার মুচকি হেসে, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া সূপটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেন। আরেকদিন আরেক মজা। আমাদের বাড়ি শুরু করার সময় আমাদেরি এক বিদেশী বান্ধবীর বাড়ি অনুরেন্টুরা প্রায় শেষ করে আনছিল। সামান্যও ইদিক উদিক বাকি ছিল। আমাদের ভিৎ গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো হচ্ছিল। এর মধ্যে একদিন চিন্তিত মুখে রেন্টু এসে বলল, 'আপনার বান্ধবী এক কি অদ্ভুত ফরমায়েস করে পাঠিয়েছেন, আমি তো মানেই বুঝতে পারছি না। এতে খরচও তো অনেক পড়ে যাবে।'

কি ব্যাপার ? না, তিনি বলে পাঠিয়েছেন তাঁর প্রত্যেক ঘরে দুটো করে ফিরিঙ্গি বসিয়ে দিতে হবে। অনুদের মহা ভাবনা, এত ফিরিঙ্গিই বা এখানে

কোথায় পাবে আর তারা বসতে রাজিই বা হবে কেন ? পরে বোঝা গেল ফিরিঙ্গি নয়, দিদিমণি জাফ্রি দেওয়া ঘুলঘুলি চান, যাতে ঘরে আলো-হাওয়া ঢোকে। জাফ্রি বলতে কাফ্রি মনে হয় আর কাফ্রি বলতে ফিরিঙ্গি ! দিদিমণি তাই ভুলে ফিরিঙ্গি চেয়ে বসেছিলেন !

ছোট ছোট মজার স্মৃতি, কিন্তু তাই দিয়েই জীবনের রসের পাত্র ভরে থাকে। এর আগে একদিন বুবুর ছোট মেয়ে ঈশিতাকে কবি কান্তি ঘোষ চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। তা মেয়ে গিয়ে তার মাকে বলল 'আমাকে একটা ভালো ফ্রক্ পরিয়ে দাও, মা।' মা বললেন 'কেন রে ?' মেয়ে বলল, 'বাঃ, আমি যে কান্তিদাদুর এলিফ্যান্ট !' শুনে সবাই অবাক ! শেষটা বোঝা গেল কান্তিদাদু ওকে বলেন ওঁর 'গার্ল-ফ্রেণ্ড'। সেই থেকেই এলিফ্যান্ট ! এ-সব ঘটনার পর ত্রিশ বছর কেটে গেছে। কান্তি ঘোষ, তাঁর বিদেশী স্ত্রী এটা ঘোষ কবে স্বর্গে গেছেন। ঐ বাড়িতে অন্য লোকে বাস করে। ঈশিতা কলকাতায় গিন্নিবান্নি হয়ে অধ্যাপনা করে। কিন্তু আজও আমাদের বাড়ির ঠিক উত্তর দিকে ঐ বাড়ির দিকে তাকালে আমার মাঝে মাঝে কান্তিদাদুর এলিফ্যান্টের কথা মনে পড়ে আর মনটা ভালো হয়ে যায়।

সে যাই হক, ক্রমে বাড়ির কাজ এগুতে লাগল। আমার সাহিত্য-সেবা শিকেয় তোলা রইল। সামনের ১০ ফুট চওড়া বারান্দাব নক্সা বদলে, নন্দলালের ২০ ফুট চওড়া দক্ষিণের বারান্দার নকলে বারান্দ' হল। সে বারান্দায় প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আমরা কত যে আনন্দানুষ্ঠান, কত যে প্রীতির মিলন, নিভৃত আলাপন, উপভোগ করেছি তার ঠিক নেই। মাস্টার মশায়ের ওয়ারিশরা তাদের বারান্দাটি গ্রিল দিয়ে ঘিরে ঘরের মতো করে ফেলেছে। কিন্তু আমাদেরটার মাথার ওপর আমরা বুগনভিলিয়া লতা তুলে দিয়েছি। তার ফুলের বাহার আমার অবিস্মরণীয়, অসাধারণ মাস্টার মশায়ের কথা বহন করছে। এ বছরও তাঁর জন্মের শতবর্ষপূর্তি উৎসবে গাছ ভরে শাদা লাল ফুল ফুটেছে। রেশমী কাপড় ছিঁড়ে যায়, গয়নাগাঁটি চোরে নেয়, কিন্তু এ-সব এমন জিনিস যা কেউ নিতে পারে না।

বাড়ি শেষ হয়ে এল, বসবার ঘরের জানলায় নক্সাকাটা গ্রিল্ লাগানো হবে। সে সব তখন কলকাতা থেকে করিয়ে আনতে হত। এক দিন দানাপুর প্যাসেঞ্জারে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর (অর্থাৎ সেকালের দ্বিতীয় শ্রেণীর। এখনকার প্রথম শ্রেণীর চেয়েও ঢের ভালো !) কামরায় আমার ছোট স্যুটকেসের সঙ্গে ঐ ৫ ফুট × ৩ ফুট গ্রিলের চারটি অংশ আমার স্বামী তুলে দিলেন। পাছে আমার ঝামেলা হয়, তাই সেগুলো ওজন করে, পয়সা দিয়ে, টিকিট লাগিয়ে, তবে তোলা হল। তবু একজন কর্মচারি আপত্তি করছিলেন, কম্পার্টমেন্টে কি নেওয়া উচিত ? এখানে শুধু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস নেবার কথা। বাকি সব যাবে

ব্রেকে। আমার স্বামী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'এগুলো তো আমার গিন্নির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য।' কর্মচারি আশ্বস্ত হলেন, 'ও, তাই নাকি ? তাহলে ঠিক আছে।'

জিনিস নিয়ে তো রওনা হলাম। সমস্যা হল বোলপুরে গাড়ি থামে চার মিনিট, আমি একা এ-সব নামাব কি করে ? এমন সময় তিনটি ১৭/১৮ বছরের ছেলে গাড়িতে উঠল। আমি তো মহাখুশি। 'দেখ ভাই, এগুলো একা কি করে নামাব তাই ভাবছি।' তারা বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, দিদি। আমরা নামিয়ে দেব।'

দুঃখের বিষয়, বর্ধমানে একজন জবরদস্ত চেকার উঠে যেই দেখলেন ওদের থার্ড ক্লাসের টিকিট, পত্রপাঠ নামিয়ে দিলেন। আমি আবার সমস্যায় পড়লাম। কিন্তু বোলপুর স্টেশনে গাড়ি থামবামাত্র ছেলে তিনটি এসে আমার গ্রিল্‌গুলো নামিয়ে দিয়ে, এক গাল হেসে বলল, 'বলেছিলাম নামিয়ে দেব।' এ-কথা মনে করলেও মন ভালো হয়ে যায়।

বাড়ি তৈরি হল। ১৯৫৪ সালের ৬ই আগস্ট গৃহ প্রবেশ করা হল। বন্ধুবান্ধবেরা আনন্দ করে খেয়ে গেলেন। কলকাতা থেকেও অনেকে এসেছিলেন। লতিকা ততদিনে লণ্ডনে এম-এ ইন্‌ এডুকেশনের জন্য তৈরি হচ্ছে। পরদিন অতিথিরা কলকাতায় ফিরে গেলে সন্ধ্যাবেলায় খালি বাড়িতে বসে শুনতে পাচ্ছিলাম দূরে কোথায়, সাঁওতাল গ্রামে দ্রিমি-দ্রিমি করে মাদল বাজছে। এখন চারদিকের খোলা মাঠে বসতি গড়ে উঠেছে, তবু মাঝেমাঝে নিস্তব্ধ রাতে দূর থেকে শুনতে পাই দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজছে। ভাবি কিছুই তো হারায়নি, এই ত্রিশ বছরে যত প্রিয় মানুষ চলে গেছে, প্রিয় জিনিস ফুরিয়ে গেছে, যত শখ-সাধ মাটি হয়েছে—কিছুই হারায়নি, একটা ফুলের গন্ধে, মাদলের শব্দে অমনি সব ফিরে এসে ধরা দেয়। বাড়ি হল, বিশ্বভারতীর বিশেষজ্ঞ রামবাবুর নির্দেশমতো গাছপালা লাগানো হল। প্রায় দু বিঘে জমির ধারে উত্তর দিকে এক সারি শ্বেত করবীর গাছ আর দক্ষিণ সীমানায় চারটি তালগাছ। একজন সেগুলিকে দেখে বললেন এগুলোতে কখনো ফল ধরবে না। ধরেও নি। কিন্তু কেমন রূপ তাদের। আর ঠিক যেখানটিতে কুয়ো খুঁড়ল রেন্টু, সেখানে একটি জামগাছ। আধাবুনো। কি সুন্দর দেখতে, কি মিষ্টি ফল। কিন্তু সেই মিষ্টি ফলগুলো কুয়োতে পড়ে সব জল নষ্ট করে দিত বলে, একবার এসে দেখি রেন্টু সেটি কাটিয়ে দিয়েছে। রামমালি বলে যে দক্ষ মালিকে রামবাবু দিয়েছিলেন, দেখলাম এ ব্যাপারে খুব সমর্থন আছে।

বাড়ির চারদিকে গাছ লাগানো হল। আম, কাঁঠাল, আতা, পেয়ারা, লেবু, বাতাবি। কুলগাছটি আপনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আমলকি মুচুকুন্দ,

একেশিয়া, জারুল, বকুল, সোনাঝুরি, কাঠচাঁপা, পলাশ, অগ্নিশিখা—এরা বাঁচল না। মাদ্রাজ থেকে শম্ভু নাগলিঙ্গমের চারা পাঠাল। শম্ভু চলে গেছে, নাগলিঙ্গমের ফুল ফোটে, পড়লেই ঝরে যায়। ফুল ফোটে, ফুল ঝরে, ফল ধরে, ফল পাকে, ফল শেষ হয়, পাতা ঝরে, নতুন পাতা হয়। এমনি করে বছরের পর বছর ঘুরে আসে।

তাই বলে ১৯৫৪ সালে কিছুই কি আর লিখিনি। 'মণিকুন্তলা' বলে একটা কোমল বেদনার উপন্যাস লিখেছিলাম, বড়দের জন্য। কিসে যেন বেরিয়েছিল ভুলে গেছি। কবি বন্ধু অজিত দত্তর 'দিগন্ত' বলে একটি প্রকাশনালয় ছিল। সেখান থেকে বই হয়েও বেরিয়েছিল হয়তো ১৯৫৫ সালে। খানতকত কপি দিয়েছিল। তারপর আর ছাপা হয়নি। আমার বড় সাধের গল্প। একজন গায়িকা গলার স্বর হারিয়ে কি করে নিজেকে খুঁজে পেল, তার গল্প। একেক সময় আবার ছাপাতে ইচ্ছা করে। বাংলা নানান্ দৈনিক আর মাসিক পত্রে সরস ছোট গল্প লিখতাম। ভাবতাম সরস গল্প আরো লেখা হয় না কেন? কত মজার কথা বলে বাঙ্গালী বন্ধুবান্ধবেরা, লিখতে গেলেই খালি হতাশা ব্যর্থতার বিফলতার কথা। প্রেমের গল্পেও ফুর্তি নেই, খালি একটা বিশ্রী জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে শেষ। ছিঃ! এ কি রকম অকৃতজ্ঞতা।

যতদূর মনে করতে পারি এই রকম সময় কটকে অখিল ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশন হয়। বয়সে ছোট বন্ধু শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে গেলাম শেষ পর্যন্ত। মহিলা শাখায় ভাষণ দিতে বলেছিলেন ওঁরা। কদাচিৎ আমি সাহিত্যের বাইরে কোনো বিষয়ে বিশেষ কিছু বলি। কিন্তু ঐ সভায় বলেছিলাম, হঠাৎ অন্তঃপুরের বাইরে বিক্ষিপ্ত উদ্বাস্তু মেয়েদের সঙ্গে কিছু মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম, সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করবার অবকাশও পেয়েছিলাম। সে-সব চিন্তার কথা বলেছিলাম। বন্ধুরা খুশি হয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিরা সেই ভাষণ পরে যখন কাগজে বেরিয়েছিল, সেটি পড়ে আমাকে কি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন। বলেছিলেন বিবেকানন্দ স্বামী এই ভাবে চিন্তা করতেন। আমি তাঁকে চিরকাল বড়ই শ্রদ্ধা করে এসেছি, স্বামীজিদের কথা শুনে বড় ভালো লেগেছিল। ঐ ভাষণ, বা বড়দের জন্য লেখা আমার কোনো প্রবন্ধই পুস্তকাকারে বেরোয়নি। অনেকগুলি হারিয়েও গেছে।

কটকের ঐ সাহিত্য সম্মেলন খুবই উপভোগ করেছিলাম। মূল সভাপতি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ঐ তাঁকে কাছে পাওয়ার আমার শেষ সুযোগ। মনে আছে দুপুরে একদিন সবাই মিলে সারি সারি পাত পেড়ে খেয়ে ছিলাম। অন্যরা রোজই খেতেন, কিন্তু আমি আমার বড়দি সুখলতা রাওএর

বাড়িতে ওঠাতে বাদ পড়ে যেতাম। সেদিন ওঁরাও গেছিলেন। বড়দির কথা আরো বলা দরকার।

॥১১॥

এবার অন্য কথা বলি। কলকাতাকেই ঘাঁটি করে ফেলেছিলাম, তবে শান্তিনিকেতনের আকর্ষণও কম ছিল না। আমার কাছে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের বাড়িঘর পথঘাট গাছপালা কত কোমল স্মৃতিতে ভরা, দিনে দিনে টের পেতে লাগলাম। এখন যে সব জায়গায় ছোট বড় কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে, অধ্যাপকদের ও কর্মীদের আবাসনের জন্য, ১৯৩১ সালে সেখানে খোলা মাঠ ছিল। তাতে হয়তো কয়েকটা শালগাছ, খেজুর গাছ, মনসা গাছ। থেকে থেকে ভাঙা ভাঙা, তাকে বলে খোয়াই। মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে খোয়াই তৈরি হয়। এখন আর খোয়াই বড় একটা চোখে পড়ে না। লোকে সেখানে বাড়ি করেছে, ঘাস লাগিয়েছে, পাঁচিল গেঁথেছে। জমি উদ্ধার হয়েছে, বৃষ্টি পড়া বেড়েছে, গ্রীষ্মের অসহ্য দহন কমে গেছে, চারদিক সবুজ হয়েছে। কিন্তু রূপ গেছে চলে। ভাবি মানুষের সুবিধার জন্যেই কি প্রকৃতির সম্পদ ? ইন্টার ক্লাসে আসা যাওয়া করি। যতদূর মনে হয়, ভাড়া ছিল সাড়ে তিন টাকা, কি আরো কম।

মধ্যবিত্ত যাত্রীতে ঠাসা থাকত গাড়ি। ভারি ভদ্র তারা, ভারি রসিক। কোথায় গেল তারা ভেবে পাই না। পৌষ উৎসবের সময়, মনে আছে যে যেখানে পারে বসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। সবার মুখে এক গাল হাসি। তখন শুনতাম ৯৯ মাইলের পথ, পরে সেটা ৯৫ হল ! ঐ ৯৯ মাইল ৯৯ রকম রসে ভরা থাকত। কত যে মজার মজার গল্প শুনতাম। যে যার সঙ্গে আনা খাবার, দুপাশের চেনা-অচেনা সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খেত। যাদের সঙ্গে কিছু নেই, তারাও দু-চার আনার চিনাবাদাম কিনে খাওয়াত। বড় মধুর ছিল বাঙালী জীবন। সাজপোশাকের বালাই ছিল না। চুল ছোট কবে কাটা, দাড়ি চাঁচা, মিলের ধুতি পরনে। শার্ট বা লংক্লথের পাঞ্জাবীর ওপর পৌষের শীত ঠেকাবার জন্য একটা সস্তা কিন্তু খাঁটি পশমের আলোয়ান জড়ানো। বোলপুর স্টেশনে গাড়ি খালি হয়ে যেত, সবাই পৌষমেলার যাত্রী।

পৌষমেলার কথা বলতে আজকাল, অনেকেই বলেন, 'সে মেলা আর নেই, এখন সব শহুরে হয়ে গেছে ! তার চেয়ে, ঐ সময় কলকাতা অনেক বেশি উপভোগ্যও, ক্রিকেট খেলা, ঘোড়দৌড়, নতুন বছরের কত পার্টি, প্রদর্শনী।' বলা বাহুল্য এরা কেউ আমার মতো আ-যৌবন শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একটা অদৃশ্য সুতো দিয়ে বাঁধা নয়। আমোদ আহ্লাদের নিয়মই তাই। অর্ধেকটা থাকে অকুস্থলে আর অর্ধেকটা নিজেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হয়। এই যেমন আমি

৫০ বছর ধরে পৌষ মেলা যেমন দেখে আসছি, এখনো তার খুব বেশি তফাৎ দেখি না। হয়তো মনের মধ্যে আগে যা দেখেছি আর এখন যা দেখছি, সব মিলেমিশে আছে। পাথরের বাসন ভারি ভেঙে যায়, লোকে কম ব্যবহার করে। তাই পাথরের দোকান কমে গেছে। প্ল্যাস্টিকের চাহিদা বেড়েছে। তাতে কি ? বইয়ের দোকান থাকত না, এখন থাকে। অনেক বেশি খাবারের দোকান থাকত না, এখন থাকে। অনেক বেশি খাবারের দোকান, কিন্তু শিউড়ির মোরব্বা খুঁজতে হয়। আমি বলি এসব তুচ্ছ জিনিস, আলাদা আলাদা দোকান দিয়ে তো আর মেলা হয় না। মেলার একটা নিজস্ব প্রাণ আছে। সেই প্রাণটি আমি উপভোগ করি। সেটাই হল মানুষের মেলার আবহাওয়া। হাত বাড়ালেই আজ-ও তাকে ধরা যায়। তবে ঐ যা, মনের মধ্যে করে কিছু সামগ্রী নিয়ে যাওয়া চাই।

তাই বলে এই ৫০ বছরের প্রত্যেক পৌষ মেলা দেখিনি। মাঝেমাঝে বাধা পড়েছে। অসুখবিসুখ, অন্য কাজ। একবার, মনে হয় ১৯৫৪ সালে জানুয়ারিতে দিল্লি গেলাম সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজরি বোর্ড অফ এডুকেশনের বার্ষিক অধিবেশন করতে। আসলে ওটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ঠিক হয়নি। যাঁদের সঙ্গে এবং যে কর্মধারার সঙ্গে সারা বছর কোনো যোগ থাকবে না, বৎসরান্তে তাঁদের সঙ্গে কি নিয়ে পরামর্শ করব ? হুমায়ুন কবীর তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক এই রকম মনে পড়ছে। আমার ছাত্রজীবন থেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ। এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ছিল বলেই প্রধানত রাজি হয়েছিলাম। বহু গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, মনে আছে, কিন্তু কোনো কার্যকরী সিদ্ধান্তে এসেছিলাম বলে মনে পড়ে না।

যতদূর মনে হয় ঐ ছিল আমার প্রথম দিল্লি যাওয়া। সঙ্গে ছিল আমার কন্যা কমলা, সে সেবার ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিল। ওর সঙ্গে পুরনো একটা চুক্তির কারণে উত্তর ভারত দেখাতে নিয়ে গেলাম। আগে গেলাম ডুন এক্সপ্রেস্ চেপে দেরাদুনে। সেখানে বন বিভাগীয় কলেজে আমাদের এক কুটুম্ব কাজ করতেন, তাঁকে আমরা নালু বাগ্চি বলতাম। তাঁর স্ত্রী আমার কলেজের বন্ধু, সুমতি বলে একজন মারাঠি মেয়ে। মারাঠিদের যত দেখেছি তত আপনজন বলে মনে হয়েছে। সেবারো স্বামী স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে আমাদের যারপরনাই আদর যত্ন করলেন। নালুদাকে বৃক্ষ বিশারদ বলা চলে। বাহির বাগান ও নানা রকম সুন্দর গাছের লালনভূমি। চড়াইয়ের ওপর বাড়ি, নিচের রাস্তা থেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধাপে ধাপে গাছ লাগিয়েছেন দেখলাম। এত দিনে না জানি তাদের কত বাহার হয়েছে। নালু বাগচিও আর নেই। খিটখিটে, স্নেহশীল, সুদর্শন মানুষটিকে আর দেখতে পাব না।

মনে আছে কলকাতায় ফেরার পথে কমলি বলেছিল, 'এই বেড়ানোর

প্রত্যেকটি মুহূর্ত উপভোগ করেছি।' ট্রেন থেকে দূরে আকাশের গায়ে তাজমহল দেখা যায়। কমলি যেন স্বপ্নরাজ্য দেখল। সকালে দেরাদুন পৌঁছলাম। নিচু প্ল্যাটফর্মে নালু বাগচি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর পাশেই রাশি রাশি গোলাপের কলম। বললেন, ওগুলো রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর আনিয়েছেন। মুসুরি পাহাড়ের পায়ের কাছে রাজপুর। সেখানে একটা বাংলো ভাড়া করে রথিবাবু আছেন। সামনেই তাঁর নিজের সুন্দর বাংলো তৈরি হচ্ছে। ব্যক্তিগত কারণে আত্মীয় পরিজন ছেড়ে ৭০ বছর বয়সের রথিবাবু সুদূর দেরাদুনে শেষ বয়সটা কাটাবেন স্থির করেছিলেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠ যাঁর যোগ্য পটভূমি, এখানে তিনি কেমন করে মন বসাবেন ভেবে পেলাম না। তাঁর বিষয়ে নানা কটু মন্তব্য শুনে এসেছিলাম। মনে হয়েছিল কোন গভীর বেদনা, অতৃপ্তি, হতাশা থেকে, মানুষ হঠাৎ অপ্রত্যাশিত এবং হয়তো অপ্রিয় আচরণ করে, বাইরে থেকে তার কখনো বিচার করা যায় না। আমি বহু বছর ধরে রথিদাকে দেখেছি প্রায় আমার মা-মাসির বয়সী। খুব একটা অন্তরঙ্গতা হয়নি কখনো। তবু শান্তিনিকেতনে যখনি সৌজন্যের প্রতিমূর্তি শ্যামল সুন্দর মানুষটিকে দেখেছি, তাঁর মুখে একটা বেদনার ভাব দেখেছি। আশ্চর্য শিল্পবোধ ছিল। হাতের কাজ কি সূক্ষ্ম, পরিকল্পনা কি স্বপ্নময়, অথচ কি কার্যকরী। এখনো আমাদের শান্তিনিকেতনের এই বাড়িতে পাঁচখানি রথিদার পরিকল্পিত এবং শ্রীনিকেতনে তৈরি ফোল্ডিং চেয়ার আমরা অষ্ট প্রহর ব্যবহার করে থাকি। আমার কাছে রথিদার তৈরি দুটি চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগ আছে, তার ওপর এমন সুন্দর নক্সা করা যে যখনি দেখি, এই ৪০—৫০ বছর পরেও আশ্চর্য হই। আমার মনে হয় অসাধারণ শিল্পী বলে তাঁর যে স্বীকৃতি পাওয়া উচিত ছিল, রথিদা তা পাননি। লোকে তাঁকে craftsman ভাবে, আসলে তিনি ছিলেন artist।

সে যাই হক প্রায় ত্রিশ বছর আগে, নালুদা বললেন, 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমরা বিকেলে রথিদার সঙ্গে দেখা করে আসব। তাঁর বড় ইচ্ছা।' খুশি হয়ে গেলাম সেখানে। রথিদাও কি যে খুশি হলেন। ঘুরে ঘুরে তাঁর অসমাপ্ত বাড়ি দেখালেন। ইয়োরোপে আমেরিকায় যেমন করে, বাড়ি তৈরির সঙ্গে সঙ্গে বাগানের লে-আউট তৈরি হচ্ছে। সেই গোলাপের কলম কোথায় কোথায় লাগান হবে তাও দেখালেন।

সে-দিন হাতে বেশি সময় ছিল না। পরদিন রাতে কমলিকে আর আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। বললেন আনা-নেওয়ার জন্য ওঁর গাড়ি থাকবে। পরদিন গিয়েছিলাম আমরা। ওদিকে শীতকালে বৃষ্টি পড়লে বেজায় ঠাণ্ডা পড়ে। গাড়ির জানলা তুলে পৌঁছলাম। ঘরে আগুন জ্বালা হয়েছিল। উত্তরায়ণে দেখা সুন্দর সুন্দর কিছু আসবাব দেখে মন কেমন করতে লাগল। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের

আঁকা অনেকগুলি ছবি। কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের লেখা আর আঁকা হল জাতীয় সম্পদ। রথিবাবুর তা নিয়ে যাবার কোনো অধিকার নেই। মনে হয়েছিল বিশ্বকবির ছেলে হয়ে জন্মানোর জন্যে বড় বেশি দাম দিতে হচ্ছে। গরীব ঘরের ছেলেরাও বাপের জিনিস উত্তরাধিকার সূত্রে পায়। এমনিতেই বাপের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল প্রতিভার জন্যে, ছেলের অসাধারণ গুণগুলি অনেকেরি চোখে পড়ে না। যদি সাধারণ ঘরে জন্মাতেন রথিদা, আরো খ্যাতি পেতেন। মনে হচ্ছে শীঘ্রই একদিন তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হবে। দেশের লোক তখন তাঁকে মনে করবে কি না কে জানে।

শুনেছিলাম শান্তিনিকেতনের ওপর রথিদার আর কোনো টান নেই। কেন জানি বলে বসলাম, 'শান্তিনিকেতনের জন্য মন কেমন করে না, রথিদা ?' এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন। দেখলাম চোখে জল জমছে। খালি বললেন, 'তোমার কি মনে হয় ?' নিজের মূঢ়তার জন্যে নিজেই লজ্জা পেলাম। এর পর আর একবারই তাঁকে দেখেছিলাম। শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন বিষয় ব্যাপার নিয়ে কোনো কাজে। তার অল্প দিন পরেই তিনি মারা যান। আজও রথিদার কথা মনে হলেই আমার বড় কষ্ট হয়।

তার পর দিন আমরা হরিদ্বার গেলাম। কনখলে দু-দিন থাকব। মাখন-মহারাজ স্টেশনে এসেছিলেন। কনখলেও দুদিন ছিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে আমাদের বড়ই ভালোবাসার সম্বন্ধ। আঁরা সকলে আমার স্বামীর পেশেন্ট ছিলেন। এখনো আমার ছেলে তাঁদের অসাধারণ হাসপাতালে রুগীদের দাঁতের চিকিৎসা করে। ধর্ম বলতে আমি কোনো সময়ই ক্রিয়াকলাপ বুঝি না। শুনেছি রামকৃষ্ণ বলতেন ধর্ম মানে ভগবানে বিশ্বাস, জীবে দয়া আর মাঝেমাঝে সাধুসঙ্গ। এই হল আমারো মনের মতো কথা। আমাদের দিক থেকেও যেমন তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, তেমনি তাঁদের দিক থেকেও অযাচিত স্নেহ পেয়েছি আমরা। মাখন-মহারাজ বলতে গেলে কনখলের প্রধান ছিলেন। অথচ কোনো ছেলেমানুষ সাধুকে না পাঠিয়ে নিজেই আমাদের নিতে এলেন। যেন আমরা তাঁদের কতই না গণ্যমান্য অতিথি। সত্যি বলব, তাঁকে দেখেই গলে গেলাম আমরা।

আশ্রমসুদ্ধ সকলের আদরযত্নে দুটো দিন কেটেছিল। ওঁদের ছোট হাসপাতালটি এতদিনে নিশ্চয় অনেক বড় হয়েছে। একজন গেরুয়াপরা বৃদ্ধ ইউরোপিয়ান সাধুকে দেখেছিলাম। দীর্ঘকাল ওখানে সাধনা করেছিলেন। আশ্রমের নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ি করে হরিদ্বারের বিখ্যাত স্নানের ঘাট, কিছু পুরনো মন্দির, দক্ষরাজার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলাম। শেষেরটার বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করাতে গাড়ির চালক খুব বিরক্ত হল। ঐ তো খুদে খুদে ইঁটের তৈরি

চারতলার সমান উঁচু দেয়াল দেখছেন না কি। ঐ উপরে ছোট একটা ঝুলোনো বারান্দা। খরস্রোতা গঙ্গার ওপর প্রাচীন কালের ঘাট, চাতাল, বারবাড়ি সব ভেঙে পড়েছে। তাদের বড় বড় চাঙড় এখনো দেখা যাচ্ছে। এর বেশি প্রমাণের কি দরকার মানুষটি ভেবে পেল না। পরের দিন হৃষিকেশ লছমনঝোলা দেখে এলাম। মাখন মহারাজ একটা ভাড়ার মোটর ঠিক করে দিলেন। ভোরে বেরোতে হবে। সঙ্গে জলযোগের জন্য ফল মিষ্টি দিলেন। যেন মা হয়েছেন। খুব শীত, কন্‌কনে বাতাস বইছে। বললেন এখানকার বাতাস কখনো বন্ধ হয় না। শীতকালে কন্‌কনে ঠাণ্ডা আর গ্রীষ্মকালে আগুনের হল্কা। রাতে শোবার আগে একজন ছেলেমানুষ সাধুর হাতে মহারাজ দুটি বড় বড় কাঁচের গেলাস ভরে সুগন্ধী লালচে দুধ পাঠালেন। চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া। কমলি তারটা চোঁ চোঁ করে শেষ করে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। আমি পাতলা দুধ পছন্দ করি না। গেলাসটা ঢাকা দিয়ে রেখে দিলাম; ভোরে উঠে মোমবাতি জ্বেলে তৈরি হচ্ছি, দেখি কমলি গেলাসটা তুলে অবাক হয়ে দেখছে। ওপরটা শাদা, তার নিচে খানিকটা ঘি রঙের, তারো নিচে আরো গাঢ় ঘি রঙের। এক চুমুক খেয়ে বলল, 'আইসক্রীম!' তক্ষুণি গেলাস নিয়ে বড় এক ঢোক অবিকল উঁচু দরের আইস্‌ক্রীম খেলাম। আশ্রমের চিনি দিয়ে জ্বাল দেওয়া খাঁটি দুধ, রাতারাতি স্বাভাবিক আইসক্রীম হয়ে গেছে। মনে হল এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখা দরকার। পড়লেই মন ভালো হয়ে যাবে।

অনেকেই গেছেন হৃষিকেশ লছমনঝোলা। কিন্তু আমাদের মনে হল সশরীরে স্বর্গে এসেছি। এ পারে মোটর থেকে নেমে একটু হেঁটে ঝোলা পুলের ওপর উঠলাম। ছাগল ভেড়া পুল পার হচ্ছিল। সাঁকো দুলছিল। নিচে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নুড়ির মতো গোল পাথরের মধ্যিখান দিয়ে এক অচেনা গঙ্গা পাহাড় থেকে নেমে ছুটে চলেছে। ওপারে রাম আর লক্ষ্মণের মন্দির। একজন সাধু বললেন খুবই প্রাচীন। বাইরে থেকে দেখলাম। তারপর বনভূমির মধ্যে দিয়ে পথ। নাকি স্বর্গদ্বারে পৌঁছে নৌকো করে ওপারে যেতে হবে। সে বনভূমির তুলনা হয় না। বড় বড় গাছ। গাছতলায় মাটির কুটির। কুটিরের সামনে সন্ন্যাসীরা বসে আছেন। এই দেখেই কি বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, 'এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিনী তীরবর্তী বনরাজি।' কে জানে। হাঁটতে হাঁটতে যখন হদ্দ হয়ে কমলিকে বলছি, আর তো পারা গেল না! পেছন থেকে একজন সাধু বলে উঠলেন, 'তা বললে তো চলবে না, মা। স্বর্গে পৌঁছবেন অথচ একটুও কষ্ট করবেন না।' দ্বিগুণ উৎসাহে দেখতে দেখতে বাকিটুকুও হেঁটে ফেললাম।

স্বর্গদ্বারের ঘাটে নৌকো অপেক্ষা করছিল। হয়তো বিনি-পয়সার নয় তো যৎকিঞ্চিৎ পারানী। নদীর উদ্দাম স্রোতে বিশাল বিশাল মহাশির জাতের মাছ

কিলবিল করছে। একজন লোক নৌকোয় বসে আটার গুলি জলে ফেলছে। মাছরা ঠেলাঠেলি করে খাচ্ছে। কখনো বা নৌকোয় ধাক্কা লাগছে, নৌকো টলমল করছে। সব যেন স্বপ্নের মতো। এক সময় ওপারে পৌঁছলাম। সেখানে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। হৃষিকেশে একবার নেমে ঘুরে দেখলাম। গঙ্গার স্রোত এরি মধ্যে কমে এসেছে মনে হল। বালির তীর থেকে ছোট ছোট নুড়ি কুড়িয়ে নিলাম। তারপর ত্রিশ বছর কেটে গেছে, সে নুড়ি কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু লছমনঝোলার স্মৃতি আজও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে।

পরদিন মাখন মহারাজ আমাদের লাক্সারি বাসে তুলে দিলেন। সে কি চমৎকার ব্যবস্থা। থেকে থেকে পাঁচ-দশ মিনিট করে থামে, চা খাবার, বাথরুমে যাবার জন্য। আমরা এরকম ভাবতে পারি না। যতগুলি বসবার জায়গা তার বেশি লোক তুলল না। এখনো ঐ রকম আছে কি না জানি না। পথে দেখলাম ব্রিটিশ আমলে কাটা বড় বড় খাল, তাতে সারি সারি শস্য বোঝাই নৌকো চলেছে। এই ভাবে ঐ সব খরার দেশে খাদ্য-জলের সমস্যা মেটায়। ভালোও লাগল, মনটা একটু খারাপও হয়ে গেল। আবার মনে হল মা বাংলাকে কেউ ভালোবাসে না, বাঙালীরা তো নয়ই।

বিকেল পাঁচটায় দিল্লি পৌঁছলাম। কোন একটা বড় গেটের পাশে বাসস্ট্যাণ্ড। ভেবেছিলাম কেউ নিতে আসবে। এই প্রথম দিল্লি আসা, পথঘাট চিনি না। শেষটা ট্যাক্সি করে নিজেরাই ৫নং হনুমান রোডে পৌঁছলাম। রমেন খুব বকাবকি করল, নাকি পাকা চিঠি পায়নি। তাই বলে আদরের অভাব দেখলাম না। রমেনের বুড়ো বাবা সম্পর্কে আমাদের নাতজামাই হতেন। রমেন আমার চেয়ে সামান্য বড় কিন্তু সম্পর্কে পুতি! দোতলার ওপর ওদের সুন্দর ফ্ল্যাট। কাছেই হনুমানজির মন্দির, তাই পথ কখনো নির্জন হয় না। একতলায় এক বুড়ো মজুমদার মশাই থাকতেন। এক সময় তিনি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন। নিয়মিত দিল্লি – শিমলা করতে হত। সে আরেক যুগের কথা। পরে আমাদের 'সন্দেশ' পত্রিকা যখন ১৯৬১ সাল থেকে সত্যজিতের চেষ্টায়, উৎসাহে এবং প্রথম দু-বছর তার একলার খরচে, আবার প্রকাশিত হতে লাগল তখন মজুমদার মশায়ের কাছ থেকে তাঁর কর্মজীবনের কয়েকটি চমৎকার সরস স্মৃতিকথা প্রকাশ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। নাত-জামাই দ্বিজেন্দ্রনাথ, পুতি রমেন, একতলার মজুমদার মশাই সবাই এখন স্বর্গে গেছেন। তবু তাঁদের জন্য আমার মনে একটা কোমল উষ্ণ জায়গা রাখা আছে।

সে যাই হক রমেনের ছেলেমেয়ে এবং দিল্লিতে পোস্টেড্ আমার ভাসুরপো কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়ে আমাদের দিল্লি আগ্রা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল। নিউ দিল্লির পরিপাটি ব্যবস্থার প্রশংসা না করে পারলাম না, কিন্তু মনে মনে নোংরা

কলকাতার ঘরোয়া অন্তরঙ্গতার অভাবও টের পেলাম। অনেক বাড়ির সামনেটা যত সাজানো-গোছানো পাশ এবং পেছনটা তত নয়। একবার অরোরা স্টুডিওতে ফিল্ম তোলা দেখতে গেছিলাম। সেখানেও ঐ রকম সামনে-সাজানো, পাশ নেই, পাশ নেই পেছন নেই ঘরবাড়ি দেখেছিলাম।

তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওখানকার ঘরকন্না তখন ভারি সুবিধার ছিল। রোজ সকালে একজন লোক গরম কোট মাংকি-ক্যাপ পরে, ঠেলা-সাইকেল বোঝাই রসদ নিয়ে গেটের কাছে হাঁক দিত—'মীটওয়ালা'! এমন অভিনব ডাক শুনে দোতলার বারান্দা থেকে দেখলাম রমেনের দক্ষ গৃহিণী লোকটির কাছ থেকে দেড়টাকা সেরে (তখনো কিলোর চল হয়নি) তাজা পোনা মাছ, মটন কিনল। ঐ ভাবে ঘরে বসে ফল তরকারি, রুটি মাখন ইত্যাদি কেনা যেত। সে তরকারি দেখবার মতো। দামও খুব সুবিধার। বিকেলের জলখাবার করার হাঙ্গামা করতে হত না। চওড়া ফুটপাথে ও তার পার্শ্ববর্তী চালাঘরের মতো দোকানে উৎকৃষ্ট দই-বড়া, আলুর চাট, পকৌড়া, ছোলে ইত্যাদি তখন পর্যন্ত আমার অজানা, (কিন্তু এখন কলকাতার নিত্যনৈমিত্তিক ভোজ্য, যদিও ঝালের চোটে আমার একটুও উপভোগ্য নয়) নানা রকম খাদ্য কিনে লোকে নিশ্চিন্ত মনে ও অপ্রত্যাশিত ভাবে বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে হানা দিত। মোট কথা সেই প্রথমবার থেকেই দ্বিজেন মৈত্রের বাড়িতে বড় সুখে দিন কাটিয়েছিলাম। এবং এর পরে রেডিওর কাজে যতবার দিল্লি যেতে হয়েছিল দ্বিজেনবাবুর বাড়িটাকে নিজের বাড়ির মতো ব্যবহার করেছি। হয়তো ওঁদের নানা অসুবিধা করেছি, কিন্তু সৌজন্যের জন্য তাঁরা কখনো কিছু বলেননি, সর্বদা সমান আদর করেছেন। সে আস্তানা ৫ নং হনুমান রোড থেকে উঠে গিয়ে আমার মনে বাসা বেঁধে আছে।

এ সবের থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে দিল্লীর জীবন যাত্রা আমি খুবই উপভোগ করতাম। তবে স্থায়ীভাবে বাস করতে রাজি ছিলাম না। এসব কথা পরে প্রকাশ্য।

মিটিং সেরে, তার বিফলতার জন্যে মনে একটা অতৃপ্তি নিয়ে, থলি বোঝাই নান্‌খাটাই, হালুয়া-সোহন, ফল ইত্যাদি নিয়ে সেবার ফিরে এসেছিলাম। মনে আছে হ্যাণ্ডিক্রাফ্‌টসের দোকান থেকে শান্তিনিকেতনের নতুন বাড়ির জন্য হাতে বোনা সুন্দর ছাপা বেডকভার, পরদার কাপড়, কুশন কভার ইত্যাদি এনেছিলাম। তার কিছু কিছু এখনো জীর্ণ অবস্থায় ব্যবহার করি।

তখনো স্বাধীনতার নতুন নতুন গন্ধটি লেগে ছিল, নিউ দিল্লির পথ-ঘাটে অনেক জায়গায় একটা নির্মীয়মান অসম্পূর্ণ চেহারা ছিল, যেখানে সেখানে চালাঘরে নানা রকম সুদৃশ্য গেরস্থালীর জিনিসপত্র মোড়া, পাপোষ, টুকরি, ঝোলাঝুলি, বাতিদান, বাজার ব্যাগ, চটি ইত্যাদি আশ্চর্য রকম কম দামে পাওয়া

যেত। সস্তা চটিগুলি অবিশ্যি টিকত না, কিন্তু অন্য জিনিস বছরের পর বছর কাজে দিত।

এ সব ব্যবসা যাঁরা করতেন, তাঁদের অধিকাংশকে পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ ইত্যাদি নবনির্মিত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু বলে মনে হয়েছিল। এঁরা সরকারি সাহায্যের আশায় পুর্নবাসন উপনিবেশে বাস করতেন না। নিজেরা কাঠ, চাটাই ইত্যাদি দিয়ে একটা করে চালাঘর বানিয়ে, উদয়াস্ত ঐ সব হাতে তৈরি জিনিস বানিয়ে, পথের ধারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করতেন। সরকারি সাহায্য কিছু পেতেন কি না জানি না। এর পর বারংবার দিল্লি যেতে হয়েছে, প্রতিবারেই এঁদের অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করেছি। মোটা মোটা আটার রুটি একটু চাটনি দিয়ে এদের প্রধান আহার বলে শুনেছিলাম। এঁদের সঙ্গে আমাদের দেশের দুর্বলদেহ ম্লানমুখী নিরুৎসাহ নিরুদ্যম উদ্বাস্তুদের সরকারের উপর একান্ত নির্ভরের কথা মনে করে, মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠত। ভাবতাম আমাদের দেশের লোকদের শাক-ভাত কুচো মাছ আহারই কি এর জন্য দায়ী ? এঁরাই আমাদের আপন জন, এঁরা অসৎ নন, নির্বুদ্ধি নন। তবু কেন এত অসহায় এবং অলস ? দেশ বিভাগের পর ৩৫ বছরের বেশি কেটেছে তবু আমাদের উদ্বাস্তু-সমস্যা ঘুচল না কিসের জন্য ? সে যাক গে, এসব দুঃখের কথা বলে পাতাভরানো আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলি কি উদ্বাস্তু আবার কাকে বলে ? এঁরা আমাদেরি স্বদেশবাসী, আমাদের দেশই ওঁদেরও দেশ, ওঁদের মাতৃভাষা বাংলা, ওঁরা আবার উদ্বাস্তু নাম নেবেন কেন ? আমার মায়ের পূর্বপুরুষরা ফরিদপুরে থাকতেন, আমার ঠাকুরদা পর্যন্ত বাপ পিতেমোর বাসস্থান ছিল ময়মনসিংহ। তফাৎ শুধু এঁরা রাজনীতির বলি হয়েছেন। এঁরা আমাদের ঘরের লোক বই তো নন। আর কতদিন উদ্বাস্তু বলে আলাদা করে রাখব ?

দিল্লীতে হুমায়ুন কবীরকে দেখে আমার মনে হতে লাগল জীবনটাকে কি নষ্ট করে ফেলছি ? মনে মনে যে কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করেছি, সে কি আর করা হবে না ? ভারি একটা অসন্তোষ আমাকে পেয়ে বসেছিল ঐ সময়। সুখের সংসার আমার, স্বামীর ভালো প্র্যাক্‌টিস্, ছেলেমেয়ে ভালোভাবে বড় হচ্ছিল, কোনো বড় রকম সমস্যা দেখা দেয়নি। তবু ঐ আমার প্রথম দিল্লী যাওয়ার আগে থেকেই মাঝে মাঝে মনটা ভারি নিরুৎসাহ হয়ে পড়ত। সুখী হবার সব উপকরণ পেয়েও খুব সুখী হতে পারছিলাম না, অহেতুক অসন্তোষের কারণও নিজেই খুঁজে পেতাম না, তা বলব কাকে ? অবিশ্যি একেবারেই অহেতুক বললে ভুল হবে। আমার আধখানা আমি দিনরাত আমাকে নীরবে গঞ্জনা দিত, কেন বৃথা সময় নষ্ট করছি। সমবয়সীরা যখন অবসর নেবার কথা ভাবছিলেন, (অন্ততঃ কারো কারো সে-কথা ভাববার সময় এসেছিল) তখনো আমার সামনে

অকর্ষিত ভূমি ধূধূ করত। মনে মনে মরে যেতাম। ভাবতাম সেই অন্য আমিটা কারো মেয়ে নয়, বোন নয়, স্ত্রী নয়, মা নয়, বন্ধু নয় ; নিজেকে ছাড়া তার কোন বাইরের সাহায্যকারীও নেই। সুখের বিষয় তার সেই অন্তরবাসী অদৃশ্য সত্তাটি তাকে এক মুহূর্তের জন্য এ-সব কথা ভাবতে দিত না।

অনেকে একটি যুগান্তকারী রচনা লিখে ঝপ্ করে রাতারাতি সাফল্যের সোপানের তিন ভাগ উঠে যায়। আমি এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছিলাম। বলেছি তো গিরিজা ভট্টাচার্যর মতো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুও সুশোভন সরকারকে বলেছিলেন—'ভদ্রমহিলাকে এ-ভাবে কাগজ নষ্ট করতে বারণ কর।' প্রিয় বন্ধু সুনীল সরকার আমাকেই বলেছিলেন, 'এগুলো সাহিত্য নয়, সাহিত্য নিয়ে ইয়ার্কি', নীরেন রায় বলেছিলেন, 'লিন ইউটাঙের মতো লিখতে না পারলে, কলম ছাড়ো !' এ-সবের কোনো উত্তর হয় না। আমার মনের মুকুরে যাকে দেখি, তার আত্মপ্রত্যয় এতে বিঘ্নিত হত না। কমলির আই-এ পরীক্ষার এক মাস আগে, সে বলেছিল, 'এই একটা মাস শান্তিনিকেতনে গিয়ে পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করছে।' তাই গেলাম। আমার স্নেহময়ী সুদক্ষা ননদের হাতে সংসার দিয়ে গেলাম দুজনে। সে পড়ত, আমি ছুটি উপভোগ করতাম। শিল্পী প্রশান্ত রায় ছিলেন, এখনকার চেয়ে অনেক বেশি কোমল, সুকুমার এক শান্তিদেব ঘোষ ছিলেন, আরো অনেকে ছিলেন। সময় মন্দ কাটত না। বাড়ির বন্ধ দরজার তালা খুলেই দেখলাম ৫ সপ্তাহ আগে পৌষমেলার কেনা চন্দ্রমল্লিকা ফুলগুলি মাটির ফুলদানিতে প্রায় নির্জলা অবস্থায় তখনো তেমনি জ্বল জ্বল করছে, অমনি মনটা অনেকখানি ভালো হয়ে গেল।

কমলি পড়ত আর আমি আমার প্রথম নাটিকা 'বক-বধপালা' একটু একটু করে লিখতাম। আট-দশ দিন আগে এক ছোট সাংবাদিক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কোন বই আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল ?' টপ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছিল, 'বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ।' ঐ বই পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আবিষ্কার করেছিলাম, কাগজে কয়েকটা আঁকিবুকি দেখে অন্যের মনের কথা বোঝা যায় এবং তার চেয়েও আশ্চর্য কথা যে নিজের মনের কথা যা কাউকে মুখে বলা যায় না, তাও প্রকাশ করা যায়। বোধ হয় সেই দিন থেকেই আমার নিজের কাজ কতকটা আঁচ করে নিয়েছিলাম। তখন আমার ৫ বছর বয়স। তার পরেই বড়দার আবোলতাবোলের কবিতাগুলি এবং কালক্রমে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' আমার চিন্তাধারাকে নীরবে যেভাবে প্রভাবিত করেছিল, তেমন আর কেউ করেনি। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ-ও নয়। তাঁরা আমার চিন্তাকে পুষ্ট করেছেন, পুলকিত করেছেন। কিন্তু দিক্-নির্দেশ

করেছেন আমার বড়দা সুকুমার, যাঁর মৃত্যুকালে আমার বয়স ছিল পনেরো বছর।

বক-বধ-পালা এই প্রভাবের ফলস্বরূপ। আমার মতে নাট্য গুণে ওতে অনেক দুর্বলতা দেখা যায়। যাত্রা প্যাটার্নে লেখা নাটিকা। ভেবেছিলাম পৌষমেলায় বিশ্বভারতীর ছাত্ররা যে যাত্রা অভিনয় করে, তার জন্য খাসা হবে। দুঃখের বিষয় ঐ বছর থেকে বিদ্যালয়ের যাত্রা করা বন্ধ করা হল। পরের বছর আমি রেডিওর এক প্রযোজক হয়েছিলাম। জানুয়ারি মাসে রেডিও সপ্তাহ পালিত হত। ১ নং গার্স্টিন প্লেসের দোতলার ছাদে মঞ্চ তৈরি করে ছোটদের নাটক হত। জয়ন্ত চৌধুরী প্রায় এক হাতে মহড়া দিয়ে সুকুমার অভিনেতাদের তৈরি করতেন। প্রথম বছর লক্ষ্মণের শক্তিশেল করালাম। ঐ নাটকের কত সম্ভাবনা অমনি প্রকট হল। আমি স্তম্ভিত। ছাদ প্রায় ভেঙে পড়ে!

পরের বছর জয়ন্তর ইচ্ছায় বক-বধ-পালা অভিনয় হল। এত ভালো অভিনয় আমি কম দেখেছি। এক মাস ধরে মহড়া চলল। তার গল্প পরে বলব। এক প্রকাশক নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করলেন, ছোট ছোট ছবি দিয়ে। ১৯৬৩ সালে ঐ নাটকটি দিল্লীর সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির পুরস্কার পেল।

এখানে একটি কথা বলি। কোনো সত্যিকার লেখক প্রশংসা বা পুরস্কার পাবার জন্য লেখে না। প্রশংসা পুরস্কার পেলে সে খুশি হয়, কারণ ওগুলি হল স্বীকৃতিস্বরূপ। কিন্তু ওগুলি উদ্দেশ্য নয়। যোগ্য লোক পুরস্কার পেল না এ বড় হতাশার কথা। তার চেয়েও বড় হতাশার কথা হয় যখন অযোগ্য লেখক পুরস্কার পায়, কারণ তাতে পুরস্কারের সম্মান চলে যায়। নাটক দেখে লোকে খুশি হবে চেয়েছিলাম বটে, কিন্তু পুরস্কারের কথা ভাবিনি। তবে পেয়ে খুশি হয়েছিলাম, এ-কথা বলা বাহুল্য। এর পর আরো অনেক নাটিকা লিখেছি, সবই রসের ব্যাপার। এমনিতেই জীবন নানা দুঃখে ভরা, তার ওপর আবার নাটক দেখেও কাঁদতে হবে এ আমার সহ্য হয় না।

॥ ১২ ॥

আমার ৭ বছরের রেডিও জীবন শুরু হয়েছিল এপ্রিল ১৯৫৬ আব শেষ হয়েছিল জুন ১৯৬৩। দিল্লী থেকে বেতার বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল, মাথুর সাহেব, আই-সি-এসের নিমন্ত্রণ পেয়ে ১ নং গার্স্টিন প্লেসে গিয়ে শুনলাম বেতার বিভাগে কয়েকজন নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষ এবং উৎসাহী লোক নেওয়া হবে প্রযোজকের পদে, প্রডিউসার, অ্যাসিস্টান্ট প্রডিউসার ইত্যাদি। আমাকে মহিলা ও ছোটদের আসর পরিচালনা করার ভার দিতে চান তাঁরা। কনট্র্যাক্ট সার্ভিস, মাইনে অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ক্ষমতা অনেক। এঁরাই প্রোগ্রাম তৈরি

করবেন, প্রযোজনা করবেন। এঁদের সাহায্যও করবেন প্রোগ্র্যাম এক্‌জেকিউটিভরা আর স্টাফ্‌ আর্টিস্টরা। এঁদের মাথার ওপর থাকবেন শুধু স্টেশন-ডিরেক্টর। এঁরা জবাবদিহি করবেন শুধু দিল্লীর কর্তৃপক্ষের কাছে। শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম যে আমার পদটি অ্যাসিস্টান্ট প্রডিউসারের। সোজাসুজি বললাম, আমি কোনো প্রডিউসারের হুকুমে চলতে পারব না। শুনলাম প্রডিউসার-ট্রডিউসার থাকবে না। কিন্তু পদটা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রডিউসারের। সে কি করে সম্ভব হতে পারে বুঝলাম না। পরে জেনেছিলাম পুরো প্রডিউসারদের বেশি মাইনে দিতে হয়, তাই এই ব্যবস্থা। আমাকে মাসে ৪৫০ দিতে চাইলেন। চটে গেলাম। ও আবার কি একটা মাইনে হ'ল নাকি! তাড়াতাড়ি সেটাকে ৫৫০ করে দেওয়া হল। আমি গলে জল। আসলে টাকাকড়ির আমার সত্যিকার প্রয়োজন ছিল না, তাই ব্যাপারটাকে এতটুকু তলিয়ে দেখলাম না। যদি দেখতাম, তাহলে তখনি একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করতাম। তাতে হয়তো সব প্রযোজকদের কাজ করার পথটা অনেকখানি সুগম হত।

ব্যাপারটা খুলে বলি। কারণ অন্য জায়গাতেও হয়তো ঐ রকম একটা অযৌক্তিক পরিস্থিতি গড়ে উঠতে পারে। আসলে স্বাধীনভাবে কাজ করার কথাটা বাজে কথা। তাই কখনো হয়? আমাদের মতো প্রবীণ লেখকদের এ সব পদ নেওয়াটাই ভুল। এ কথা বুঝেছিলাম অনেক পরে।

আমার মনে হয় যাঁরা একটা শিক্ষিত ও সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, বিশেষ করে যদি তাঁদের নিজেদের কোনো মানসিক সংগতি থাকে, অর্থাৎ লেখেন, কি আঁকেন, কি গানবাজনা করেন—টাকাকড়ির মান-মূল্য সম্বন্ধে তাঁরা ততটা সচেতন হন না। তবে যদি তাঁদের টাকার অভাবে কাজের উপকরণের অসুবিধা হয়, তাহলে অন্য কথা। আমি ছোটবেলা থেকে যে-সব লোকের মধ্যে বড় হয়েছি, তারা কেউ বড়লোকও নয়, আবার অভাবগ্রস্তও নয়। যাদের শ্রদ্ধাভক্তি করেছি খুব বেশি, তাঁরা লেখক, কিম্বা গাইয়ে, কি ছবি আঁকেন। সাধারণ সাদাসিধে জীবনযাত্রা; যা আছে তাতেই চলে যায়। নিজের শখের কাজটি করতে পেলেই হল।

আমারো হয়েছিল তাই। ঘরকন্নার মধ্যে মধ্যে একটু আধটু লিখে লিখে জীবনের ৪৮টা বছর কাটিয়েছিলাম। বিধাতা যেটুকু গুণ দিয়েছিলেন, তার অনুপাতে কাজ বিশেষ কিছুই দেখাতে পারিনি। মনে হয়েছিল এই একটা সুযোগ এল, নিজের মূল্য কর্মক্ষেত্রে যাচাই করার। আর মাসে মাসে ৫৫০ টাকা হাত-খরচা তো অনেক টাকা। এই রকম ভেবে-টেবে, রাজি হয়ে গেলাম। আমার স্বামীও উৎসাহ দিলেন। ছেলে ডাক্তারি পড়ে, মেয়ে বি-এ পড়ে। কাজের ই ষ্টি অবকাশ।

যটা বুঝিনি সেটা হল যে লেখকরা, শিল্পীরা যেভাবে চিন্তা করুন না কেন, কর্মজগতে মাইনের হার দিয়েই মান-সম্মান বিতরণ করা হয়। প্রযোজক হবেন কর্তা আর তাঁর নির্দেশ পালন করবে যে সব প্রোগ্র্যাম একজেকিউটিভরা তারা পাবে বেশি মাইনে, বাড়ি ভাড়া, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, অবসর নিলে পেনশন ইত্যাদি এ রকম ব্যবস্থা একেবারে অচল। যারা বেশি টাকা রোজগার করে তারা কম-টাকা পাইয়েদের অশ্রদ্ধার চোখে দেখে। যদি না তাদের নিজেদের এতটা গুণ কিম্বা গুণগ্রাহিতা থাকে যে কম-মাইনের গুণীর কাছে মাথা নিচু করতে প্রস্তুত থাকে। আশ্চর্যের বিষয় যে এই দিকটা আমার আগে মনেই হয়নি। আমারো হয়নি এবং আমার সঙ্গে যে ক-জন প্রতিভাবান সাহিত্যিক সাঙ্গীতিক প্রযোজনার কাজ নিয়েছিলেন, তাঁদেরো কারো মনে হয়নি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যিনি নাটক বিভাগের প্রযোজক হয়েছিলেন। এখানে অবিশ্যি প্রচারের যান্ত্রিক ও কার্যকরী দিকটার অধিবেশন ছিল না। তখনকার যন্ত্রপাতিগুলিও কম জটিল ছিল না। মঞ্চের নাটক, কি চলচ্চিত্রের নাটকের প্রযোজনা আর বেতার নাটকের কাজ এক নয়। হয়তো এই কারণে শৈলজানন্দকে অনেক কষ্ট সইতে হয়েছিল। সে সময়েও শ্রীবীরেন ভদ্রের মতো সব দিক দিয়ে সুদক্ষ বেতার নাটক প্রযোজক, লেখক এবং অভিনেতা ঘরের মধ্যে থাকলেও, কেন যে বাইরের প্রতিভা আমদানি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা ভেবে পাই না। টিকতে পারেননি শৈলজানন্দ। আমাকে বলতেন, 'আমার সঙ্গে সবাই অসহযোগিতা করে, কাজ করতে পারি না। আপনার সঙ্গে করে না?'

প্রথম প্রথম করত আমার সঙ্গেও। হয়তো ঐ ১৯৫৬/৫৭ সালে। ওতে আমার কিছু এসে যেত না। রেগে যেতাম অবিশ্যি, কিন্তু কাজের ক্ষতি হতে দিতাম না। সব কাজ রপ্ত করে ফেললাম। নিজেই খাতাপত্র তৈরি করে, হাতে করে যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে সই করিয়ে, পাকা করে ফেলতাম। আমার ক্ষতি করবার চেষ্টার হয়তো মাস তিনেক আয়ু ছিল। আরেকটি কথা হল সমস্ত স্টাফ আর্টিস্টদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলাম। শ্রীমতী বেলা দে, ইন্দিরা দেবী আর জয়ন্ত চৌধুরী—এরা ছিল আমার সহায় ও সম্বল। জয়ন্ত আমাকে ধরে এঞ্জিনিয়ারিং রুমে নিয়ে গিয়ে রেকর্ডিং-এর যান্ত্রিক দিকটা হাতে ধরে শিখিয়ে, তবে ছেড়েছিল। এক বছরের মধ্যে আমিও দক্ষ হয়ে উঠলাম। তবে জয়ন্তর মতো কাউকে দেখিনি। যেমনি লিখত, তেমনি বলত, তেমনি অভিনয় করত, রেকর্ডিং করত। সকলের সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করত, এত দয়া মায়া ছিল ওর শরীরে যে যত দেখছি তত অবাক হয়েছি। আমার ও আমার স্বামীর সঙ্গে তার গভীর স্নেহের সম্বন্ধ হয়ে গেছিল। তার সঙ্গে কাজ করাই ছিল একটা

আনন্দের ব্যাপার। সে কথা পরে বলব।

তবে প্রোগ্রাম অ্যাসিস্টান্টদের ক্ষোভের কারণটা খুব অস্বাভাবিক নয়। কতকগুলো অনভিজ্ঞ বাইরের লোক এসে, ওদের নিজের এলাকায় প্রাধান্য পাবে, এটা সহ্য করা শক্ত। বিশেষ করে যদি ক্ষুব্ধ ব্যক্তিটির নিজের গুণ কম থাকে, জ্ঞানের দৌড় বেশি না হয় এবং মনের উদারতা না থাকে। এদের সঙ্গে পরে আমার খুব ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরস্পরকে আমরা বুঝে নিয়েছিলাম।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের অন্য ব্যাপার। তাঁর মতো স্বাধীনচেতা, অতিশয় গুণী মানুষের কোনো রকম বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়াই উচিত হয়নি। তিনি তখন সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠ রত্নদের একজন। এমন ছোট গল্প, এমন কবিতা ক-জনই বা লিখতে পেরেছেন। সিনেমার শখ তাঁর সাহিত্য কর্ম থেকে অনেকখানি সময় খাবলে নিয়েছিল। আমার মনে হত ক্ষমতার তুলনায় খুব কম লিখতেন। ধর-পাকড় করে অনেক সময় লেখাতে হত। মনে হত সিনেমার কাজ ছাড়লেও, মোহটা মন থেকে কাটেনি। সিনেমার চাঞ্চল্যকর কাজের পর, রেডিও-র রুটিন কাজ তাঁর নিশ্চয় অসহ্য লাগত। বেশি দিন থাকনেওনি। কিন্তু সে সময়টাতে আমাদের অশেষ আমোদের সামগ্রী দিয়েছিলেন।

মাথা ভরা কালো কোঁকড়া চুলের তলায় নানা অপ্রত্যাশিত বিষয়ে নির্ভুল এবং অপর্যাপ্ত জ্ঞান গিজগির্জ করত। মাঝে মাঝে হাঁ করে শুনতাম। অসম্ভব আমুদে মানুষটা, আশ্চর্য রসবোধ, আশ্চর্য বুদ্ধি। আমাদের বাড়ির আজীবন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছেন। উনি একা নন, ওঁর স্ত্রী বীণাও যে কি অসাধারণ নারী ছিলেন, না জানলে ভাবা যায় না। এদের আমরা হারিয়েছি, জয়ন্তকে, বীণাকে, শৈলজানন্দকে। তবে প্রেমেনবাবুর মতো মানুষ যে একটা বেতার কেন্দ্রের অধ্যক্ষের, কিম্বা অধ্যক্ষের অ্যাসিস্টান্টের আদেশ পালন করে চলবেন, এমন চিন্তাও হাস্যকর। নিজের ইচ্ছামতো কিছুদিন চলে, আমাদের মতো কয়েকজন লোকের আজীবনের বন্ধুত্ব আহরণ করে, বেতার বিভাগ থেকে কেটে পড়লেন।

থেকে গেলাম আমি সাত বছর। বহু প্রিয় বন্ধু লাভ করেছি ওখান থেকে। সাহিত্যকর্মের যে দরজাটা খুলতে পারছিলাম না, সেটা আপনা থেকেই এবার খুলে গেল। সকালে এগারোটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা ছ'টা, কিম্বা তারো পরে বেতারের কাজ করে, রাতে দেখি কলমের আগায় কথার ভিড়! ঐ সাত বছরে আমি আমাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। চুপচাপ ভালো মানুষের মতো কাটাইনি কাল। সহকর্মীদের সঙ্গে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে, অনেক তুফান নিজেই তুলেছি। তারপর পায়ের নিচে মাটি পেয়েছি। ৭ বছর বাদে যখন বুঝলাম এ পরিবেশ

থেকে চলে যাবার সময় এসেছে, তখন ছেড়েও দিয়েছি। তবু বলব বড় আনন্দে আমার ঐ ৭টা বছর কেটেছিল। এত ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, এত সব উপভোগ্য ব্যাপার ঘটত, যা আর কোথাও সম্ভব হত না। তার কিছু কিছু ভাগ সবাইকে দিতে ইচ্ছা করে।

১৯৫৬ সালের পর প্রায় ৩০ বছর কেটে গেছে। কথায় বলে এক পুরুষের মেয়াদ হল মাত্র ৩০ বছর। কিন্তু সে সময়কার অনেক বেতারকর্মী এখনো দক্ষভাবে কাজ করে যাচ্ছে, বরং তখন ছিল কাঁচা এবং অনভিজ্ঞ, এখন তারা বিশেষজ্ঞের কোঠায় পড়ে। ২৭ বছর আগেকার ঐ প্রায় শিক্ষানবিশের দল আজকাল কলকাতার বেতার বিভাগের বড় অবলম্বন। যেমন পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারি রসবোধ তার। কিংবা বেলা দে। কিম্বা দেবদুলাল, সে যখন বেতারে কাজের জন্য প্রথম এল, আমি তার পরীক্ষকদের একজন ছিলাম। লাজুক, সুকুমার, তালঢ্যাঙা শ্যামলা ছেলেটিকে দেখে মায়া লেগেছিল। মনে আছে সাদাসিধে শার্ট আর একটু খাটো ধুতি পরে, কায়দা দুরস্ত পরীক্ষকদের সামনে বসেছিল। তখন যেমন নিয়ম ছিল, মধ্যিখানে একটা বোধহয় কার্ডবোর্ডের যবনিকা ছিল। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু কানে যেই এল দেবদুলালের স্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক কণ্ঠস্বর, সকলে একবাক্যে তাকে মনোনয়ন করে ফেলেছিলেন। চেহারা দেখলে দিল্লীওয়ালারা ততটা আকৃষ্ট হতেন কি না জানি না। লিখিত পরীক্ষাতেও ভালো করেছিল। এখন সে বেতারের একজন দক্ষ কর্মী ভাবতে ভালো লাগে।

ছোটদের প্রোগ্রাম ইন্দিরা সুন্দরভাবে পরিচালনা করত। মাঝে মাঝে আমিও থাকতাম। তারকদা বলে একজন সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গেও যেমন, তেমনি পঙ্কজ মল্লিকের মতো নামকরা গাইয়ের সঙ্গেও বন্ধুত্ব হয়ে গেল। কি মধুর তাঁদের ব্যবহার, কি নিখুঁত তাঁদের কাজ। কোমল, নিরহংকার কত মানুষের সঙ্গে যে স্টুডিওতে দেখা হত তার ঠিক নেই। সুধীর মুখুজ্জে বলে একটি ছেলে, সুকুমার বলে একজন সঙ্গীতজ্ঞ। কেউ এদের সেকালে কোন স্বীকৃতি দিত না। স্টাফ্ আর্টিস্টদের আবার স্বীকৃতি কিসের? ভালো করে গান বেঁধে, সুর দিয়ে ছোটদের তৈরি করে নিখুঁতভাবে ব্রডকাস্ট করা তাদের কাজ। সেই জন্য তারা যৎকিঞ্চিৎ—খুবই কিঞ্চিৎ, প্রায় আতস কাচ দিয়ে দেখার মতো—মাইনে পায় না! ওটুকু ওদের কর্তব্য। এই সব শুনতাম দোতলার প্রোগ্রাম এক্‌জেকিউটিভদের মুখে। নাকি কারো কারোর মাসে মাসে কনট্র্যাক্ট, কারো তিন মাসের, কারোর বা এক বছরের নতুন কনট্র্যাক্ট নির্ভর করত উপরওয়ালাদের মর্জির ওপর। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা অন্য কোনো সুবিধা ছিল না। আরো শুনলাম প্রযোজকরাও ঐ পর্যায়ে পড়েন, তা তাঁরা যত গুণী লেখক বা

সঙ্গীতজ্ঞ হন না কেন। ঐ সব সুবিধা তাঁরাও পান না। পেনশন্‌ও না। শুনে শুনে এবং দেখে দেখে ওদের জন্য ভারি সহানুভূতি হত। লক্ষ্য করতাম একজন উপরওয়ালা কামাই করলে অন্য যে-কেউ তার কাজ চালিয়ে দিতে পারত। কিন্তু একেকজন বিশেষ স্টাফ্-আর্টিস্ট না এলে, অমনি হুলস্থূল কাণ্ড হত। অবাক হতাম ভেবে যে প্রযোজকরা পরিকল্পনা তৈরি করবেন ; কে কি করবে, কি বলবে ঠিক করে দেবেন ; অজস্র স্ক্রিপ্ট লিখবেন, ভাষণ দেবেন, মহড়া দেবেন, রেকর্ড করাবেন ; সমস্তই স্টাফ্-আর্টিস্টদের সাহায্যে। কিন্তু মান-মর্যাদা-মাইনে এদের কিছুই নেই। অবিশ্যি নামকরা লেখক বা গায়কের মান-মর্যাদা তো আর এরা কেড়ে নিতে পারত না। পারত শুধু কিছু নিন্দামান্দা আর অসুবিধা করতে আর লম্বা লম্বা বিপরীত রিপোর্ট দিতে। আমার নামেও এক আধবার দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সবাই খসে পড়লেন, বাকি রইলাম আমি আর দীপালি আর জ্ঞান ঘোষ, তার পদটি অবিশ্যি ঠিক আমাদের মতো ছিল না। তাছাড়া সে ছাড়লে আধুনিক সঙ্গীতকে মান দেবে কে ? সে আমাকে বলত, 'খবরদার, মামিমা, ওদের কথায় কক্ষণো ছাড়বে না। ছাড়লে নিজের ইচ্ছায় ছাড়বে। নইলে পরাজয় স্বীকার করা হবে।' তা তো আর হতে পারে না। তাছাড়া অল্প সময়ের মধ্যে কি উপরওয়ালা, কি স্টাফ্ আর্টিস্ট সকলের সঙ্গে আমার সদ্‌ভাব হয়ে গেল। আর একজন বাদে যত স্টেশন-ডিরেক্টর দেখলাম, সকলেই অতি ভালো। তাই ৭ বছর মহানন্দে কাটিয়েছিলাম। ঊষা ভট্টাচার্য আর সুকুমার রায়, আমার ঘরে এই দুজন প্রোগ্রাম একজেকিউটিভ বসত। সুধীন চট্টোপাধ্যায় প্রেমেনবাবুর সঙ্গে কাজ করত। লেখাপড়া জানা, সঙ্গীতজ্ঞ, দক্ষ, সুপটু সব, সৌজন্যের প্রতিমূর্তি, বহু গুণের অধিকারী। জেদ করে যদি লেগে না থাকতাম, এদের আসল পরিচয় পাবার সময় পেতাম না। ঐ যারা সরব হয়ে উঠত প্রযোজকদের বিরুদ্ধে, তারাই সংখ্যায় কম ছিল। এরা নীরবে কাজ করত বলে হঠাৎ চোখে পড়ত না। এ সব মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমার জীবনে অনেক সুখ জমেছে। সুনীল বসু ছিলেন অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন ডিরেক্টর, সঙ্গীতজ্ঞ, ভারি রসিক।

ঐ আরেকটি জিনিস। গান-বাজনা, নাটক, গল্প, কবিতা, রসালাপের মিলিত প্রভাবে একরকম আবহাওয়া তৈরি হয়। সে হল রসের আবহাওয়া। ভারি উপভোগ্য ; অন্য জায়গা থেকে তার স্বাদ একেবারে আলাদা। খুব সরস, হয়তো সামান্য একটু অসামাজিক, নিতান্ত নির্দোষ, ভারি উপভোগ্য। তবে আর কোথাও চলে না। বাড়িতে দু একটা উদাহরণ দিতেই প্রতিক্রিয়া দেখে সেটা বুঝলাম। জয়ন্ত বলল, 'আহা, আপিসের ঠাট্টা-তামাসা কক্ষণো বাড়িতে বলতে হয় না, এ-ও জানেন না।' জানতাম না সত্যি, তবে এবার জানা হল। সবাই এক বাক্যে

বলল, 'এখানকার কথা আমরা কক্ষণো বাড়িতে বলি না !' ঐ একটা শিক্ষা হল।

তবে মজার মজার ঘটনাও ঘটত। জানুয়ারি মাসে রেডিও সপ্তাহ পালন করা হত মহা ধূমধামে। বিশেষ প্রোগ্র্যাম হত। লোকজন নেমন্তন্ন করে গান-বাজনা শোনানো হত। মঞ্চের ওপর চারটি নাটক হত। তার জন্য এক মাস আগের থেকে মহড়া চলত। শিশুমহলের পক্ষ থেকে ছোট একটি। গল্পদাদুর আসরের পক্ষ থেকে একটি, মহিলা-মহলের পক্ষ থেকে একটি। তাছাড়া নাটক বিভাগ থেকে ভালো কিছু হত। ঐ প্রথম তিনটি আমার দায়িত্বে ছিল। সুযোগ্য সাহায্যকারী থাকাতে আমি নির্ভয়ে কাজে নামলাম। যেমন দক্ষ ঊষা, তেমনি ইন্দিরা, আর জয়ন্ত তো একাই একশো। আমার নাটক প্রযোজনার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু প্রচুর আইডিয়া এবং পড়াশুনো ছিল। নাটক বাছাই হল। ছোটদের জন্য নাচ-গান মিলিয়ে ছোট্ট এবং সুন্দর কিছু। ইন্দিরা আর ঊষা তৈরি করে নিল। গল্পদাদুর আসরে জয়ন্তর দাদা নামকরা লেখক ও নাট্য-পরিচালক প্রশান্তর লেখা 'কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ' হল আর মহিলামহল থেকে আমার 'মোহিনী' নাটক হল। সে এক আনন্দযজ্ঞ। প্রতি বছর করা হত। আজ পর্যন্ত সে কথা মনে করলেই মন খুশি হয়ে যায়।

রোজ মহড়া হত। খুদে অভিনেতাদের অভিভাবকরা স্কুলের পর, তাদের নিয়ে আসতেন। তাঁরা নিচে অপেক্ষা করতেন। মহড়া হত দোতলায় বড় ৬ নং স্টুডিওতে, যাকে সবাই ভূতুড়ে স্টুডিও বলত। এক দিনের কথা বলি। যদ্দূর মনে হয় একটা শনিবার। বিকেল থেকে বৃষ্টি পড়ছে, চারদিকের আলো কমে গেছে। তাতে কি ? ছাতা বর্ষাতি নিয়ে খুদেরা অভিভাবক সহ এসে, স্টুডিও জমিয়ে দিয়েছে। কর্মীরা যে যার বাড়ি গেছে। যারা ডিউটিতে তারা ব্যস্ত। ভূতুড়ে স্টুডিও হাসি কলরবে মুখরিত। এমন সময় দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে, অমনি দরজা বন্ধ করে, তাতে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রেমেনবাবু বললেন, 'আমাকে বাঁচান !' সঙ্গে সঙ্গে হাসি তামাশা বন্ধ, ঘরময় থমথম। আমরা বললাম, 'কি হল ?' 'কি হল ?' 'আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে !' 'কি সব্বনাশ ! কে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে ?' 'এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন ষণ্ডামতো ছেলে !'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'কেন এসেছে ?' 'ওদের বার্ষিক উৎসবের প্রধান অতিথি আসেননি, তাই।' আমি বললাম, 'আশা করি আপনি সেই প্রধান অতিথি নন্।' প্রেমেনবাবু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'না, কক্ষণো না !' তখন জয়ন্তকে বললাম, 'তুই গিয়ে তাকে ভাগিয়ে দিয়ে আয়। প্রেমেনবাবু এখানে বসুন।' প্রেমেনবাবু ভারি বিরক্ত, 'আহা, ওর কম্ম নয়। তাহলে তো সেপারজিও পারতেন ! ওকে দিয়ে হবে না, আপনাকে একবার যেতে হবে।' সেপারজি

ছিলেন আমাদের হিন্দী প্রডিউসার। দক্ষ প্রযোজক, নামকরা হিন্দী লেখক এবং এমন অমায়িক বুদ্ধিমান লোক কম দেখা যায়। দুঃখের বিষয়, কয়েক বছর আগে হৃদ্‌রোগে তিনি মারা গেছেন। যাই হোক, সেই ১৯৫৭ সালের জানুয়ারিতে সন্ধ্যায় প্রেমেনবাবুকে আগে পাঠিয়ে, আমি একটু বাদে গিয়ে তাঁকে ডাকলাম ছোটদের মহড়ায় কিছু সাহায্য না করলেই নয়।

দেখি লম্বা চওড়া মিষ্টিমুখো যুবক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে ওঁর ঘরে বসে আছে। আমার কথা শুনেই বলল, 'উনি তো যেতে পারবেন না। আমি ওঁকে শিবপুরে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি নিয়ে এসেছি।' আমি তাকে অনেক কষ্টে বোঝালাম যে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী। ও-ভাবে কর্তব্যের অবহেলা করতে পারি না। তখনো ৬টা বাজেনি, এই বেলা বিকল্প কাউকে পাওয়া যেতে পারে। আর দেরি করলে তাও যাবে না। এই বলে কয়েকজন সম্ভাব্য হতভাগ্যের নাম-ও বলে দিলাম, যাদের মধ্যে এক-আধজন শীতের বাদলা সন্ধ্যাকে ডরাবে না। কে গেছিল শেষ পর্যন্ত তা জানি না। তবে ছেলেটি বলেছিল কাউকে না কাউকে নিয়ে যেতে না পারলে অপেক্ষমান সহপাঠীরা ওকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলবে! কাজেই সে-ও বাড়ি চলে যাবে।

আরেকটা গল্প বলি। বোধ হয় তার পরের বছরের ব্যাপার। সেবার হয় লক্ষ্মণের শক্তিশেল, নয় আমার বক-বধ-পালা হয়েছিল। মোট কথা পোশাক আশাক স্টেজ-সাজানো ইত্যাদির জন্য বেশ কিছু উপকরণের দরকার হয়েছিল। বেতার নাটক নিত্য হয়, কিন্তু সে-তো অন্তরীক্ষের ব্যাপার, সাজসজ্জার দরকার হয় না। শেষ পর্যন্ত বিভাগীয় প্রোগ্র্যাম এক্‌জেকুটিভের পরামর্শে সেগুলো কেনাই স্থির হল। এক্‌জেকুটিভ বলল, 'যা খরচ পড়ে, বিল করে দেবেন। অ্যাকাউন্ট বিভাগ থে'কে টাকা পেয়ে যাবেন। মহড়ার সময় ছেলেমেয়েদের যে জলখাবার খাওয়ান, তারো দাম পেয়ে যাবেন।' খুব বড় একটা অংক নয়, তবে মোট শ-দেড়েক মতো হবে। ইন্দিরা, জয়ন্ত আর আমি কলেজ স্ট্রীটে গিয়ে ফুটপাথের স্টল থেকে সব কিনে আনলাম।

বলা বাহুল্য খুব সফল নাটক হল। প্রতি বছর-ই ঐ উৎসবের সব নাটক ভালো হত, এটা লক্ষ্য করেছিলাম। সব চুকেবুকে গেলে, আমাদের হিসাব খাতা দেখে নিখুঁৎ এক বিল তৈরি করলাম। স্কুলে-কলেজে আমি অংকে খুব কৃতিত্ব দেখাতাম। এত দিনে সে বিদ্যাটাকে কাজে লাগাতে পেরে আমার আহ্লাদের শেষ ছিল না।

দুঃখের বিষয় নিখুঁৎ বিল ফেরত এল। কোণায় লাল কালিতে লেখা—"সঙ্গে ভাউচার না থাকলে এ অপিসে কোনো বিল গ্রহণ করার নিয়ম নেই।" অনেক বোঝালেও যখন অ্যাকাউণ্টাণ্ট বললেন, 'তা হতে পারে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে

ভাউচার না আনলে টাকা দেওয়া যায় না।' মুশকিল হল ফুটপাথের ঐ দোকানদাররা বিল বা ভাউচার জাতীয় কিছু দিতে রাজি হয় না। বোধ হয় লাইসেন্সই নেই বেচারিদের। একবার ভাবলাম আমিই দিয়ে দিই টাকাটা। তারপর মনে হল ওরা হয়তো নিতে চাইবে না। তাছাড়া নিজের অক্ষমতা স্বীকার করা হবে। গেলাম স্টেশন ডিরেক্টরের কাছে পরামর্শের জন্য। সব শুনে মুচকি হেসে বললেন, 'তা দিয়েই দিন না গোটা কতক ভাউচার।' আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, 'বলছি, ফুটপাথের দোকানদাররা ভাউচার দেয় না!' 'তাতে কি হয়েছে? আপনি বানিয়ে বানিয়ে এত ছোটগল্প, নাটক নবেল লিখতে পারেন আর সামান্য কয়েকটা ভাউচারের জন্য এত দুশ্চিন্তা করছেন! উঠি, আমার আবার একটা মিটিং আছে!' এই বলে সরে পড়লেন।

তখন আমার ঘরে ফিরে গিয়ে কে কোন ভাউচার আনবে তাই নিয়ে পরামর্শ হল। আমি দু একটা নমুনা তৈরি করে দেখালাম। কিন্তু জয়ন্ত বলল, 'ওতে চলবে না, বড্ড বেশি শিক্ষিত হাতের লেখা হচ্ছে! ভাউচার ও-রকম হয় না!' আমি তো চটে কাঁই! 'কি! বাঁ হাতে লিখলাম, বললেই হল বড্ড বেশি শিক্ষিত!' তখন পাশের টেবিল থেকে প্রসন্নবদন নীরব দর্শক ও শ্রোতা মোহন সিং সেঙ্গার বললেন, 'বলেন তো আমি লিখে দিতে পারি। আমার ডান হাতের বাংলা লেখাটাও বেশ অশিক্ষিৎ মতো!' আমরা তখুনি রাজি হয়ে গেলাম। চমৎকার কতকগুলো নানাবিধ হস্তাক্ষর সম্বলিত ভাউচার সহ বিলটি আরেকবার পেশ করতেই মঞ্জুর হয়ে গেল। যে যার টাকা পেয়ে গেল। কিন্তু আমাদের ঐ খুদে অভিনেতাদের জলখাবারের খরচটা আমরা নিজেরা সানন্দে বহন করেছিলাম। তার ভাউচার তৈরি করিনি।

এই রকম ছোট ছোট বহু মজাদার ঘটনা দিয়ে আমার ঐ সাতটা বছর ভরে ছিল। ওগুলোকে আমি আমার জীবনের একটা আনন্দময় অংশ বলে মনে করি। তখন অবিশ্যি মাঝে মাঝে সাময়িকভাবে মাথা গরম হয়ে যেত। সকলের কাছ থেকে তো আর সমান ব্যবহার পাওয়া যেত না। স্টাফ্ আর্টিস্টদের ওপর অনেক অবিচার হত। কিছু বলতে গেলে পরিচালকরা বিরক্ত হতেন। একবার আমার প্রিয় বন্ধু এবং স্টেশন ডিরেক্টর পি সি চ্যাটার্জি বলেছিলেন, 'সব অবিচার নিয়ে আপনি মাথা ঘামান কেন, আপনি তো আর ভগবান নন।' তার অনেক বছর পরে, তিনি যখন দিল্লীতে ডিরেক্টর জেনারেল হলেন, আমি তাঁকে লিখেছিলাম, 'আমি কোনো সময়ই ভগবান না হলেও, তুমি তো এখন হয়েছ। এবার দেখব তুমি কত অবিচার নিয়ে মাথা ঘামাও।' মানুষটি বড়ই ভালো, এবং দক্ষ কর্মচারীও বটে। আজকাল স্টাফ্ আর্টিস্টদের দুঃখের দিন শেষ হয়েছে! যত দূর বুঝি অন্য অফিসারদের সঙ্গে তাদের পদমর্যাদা ও মান কিছু কম নয়।

গোড়ার পরিকল্পনায় একটা বড় ভুল ছিল। দুজনার কাজের এলাকা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল এবং টাকাকড়ির দিক থেকে কোনো তফাৎ রাখা ঠিক হয়নি। আজকালকার দুনিয়ায় তেঁতুলপাতা সেদ্ধ খাওয়া পরম পণ্ডিতদের কেউ আদর করে না।

নাটকের বিষয়ে ফিরে আসি। বীরেনদা একদিন আমাকে বলেছিলেন যে নাটকের জগতে এসে তিনটি জিনিস ত্যাগ করে আসতে হয়, যথা লজ্জা ঘৃণা ভয়। তা সে ফিল্মেই হক, বা মঞ্চে, কিংবা বেতারেই হক। মহড়া দেবার সময় জয়ন্ত তার ছোট অভিনেতাদের শেখাত, 'ভয় ছাড়ো, লজ্জা ভোল! যতদূর সম্ভব নিজেকে ছেড়ে দাও, বাড়াবাড়ি কর, সত্যি সত্যি কুম্ভকর্ণ কিম্বা বকরাক্ষস হয়ে যাও!' ঐ বয়সের ছেলেমেয়েরা এমনিতে স্বাভাবিক আচরণ করে, খুব বেশি কৃত্রিমতা জানা থাকে না তাদের। বেশির ভাগকেই যা শেখানো যায়, তাই মেনে নেয়। কেউ কেউ শিক্ষকের হুবহু অনুকরণ করে। আমার মনে হয়, তারা বেশিদূর এগোয় না। আরেক দল আছে, তারা শিক্ষকের শিক্ষার সঙ্গে নিজের বুদ্ধিও জুড়ে দেয়। হয়তো খানিকটা সামলে দিতে হয়, কিন্তু তাদের যে নাট্যবোধ আছে, সেটুকু প্রমাণ হয়ে যায়। বীরেন্দ্রকিশোর ভদ্র আর জয়ন্ত চৌধুরী এই দুটি মানুষ যদি অন্য কোনো অগ্রসরবান দেশে জন্মাতেন, পৃথিবী জোড়া নাম হত। দুজনের পদ্ধতি দেখতাম আলাদা। বীরেনদার মধ্যে কতকগুলো ধ্রুপদী নিয়ম দেখতে পেতাম। জয়ন্ত একেবারে আধুনিক, যার চোখে নাটকে আর সত্যিকার জীবনের সংলাপে কোনো তফাৎ নেই। আমি ভাবতাম ধ্রুপদী বিষয়ে বীরেনদার জুড়ি নেই, সমসাময়িক নাটকে জয়ন্তর হাতের তুলনা হয় না। এসব আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য। ইংরিজি সাহিত্যে এম-এ পড়ার সময়ে নাট্যশিল্প নিয়ে যে সমস্ত পড়াশুনো করেছিলাম, হয়তো আমার মতামতের ওপর তার প্রভাব আছে। ব্রাহ্মবাড়ির মেয়েরা সেকালে স্টেজের নাটক দেখার কতটুকু সুযোগ পেত, মহড়া দেখার কথা ছেড়েই দিলাম।

শব্দ সম্বন্ধে আগে এতটা সচেতন ছিলাম না। এখানে শব্দ বলতে আওয়াজ বুঝছি, কথা নয়। আমাদের চারদিকে রোজ রোজ সারা দিন ধরে কত রকমারি আওয়াজ হচ্ছে আর বৃথা নষ্ট হচ্ছে, এ-কথা আগে কখনো ভাবিনি। আমার আসল কাজ যে লেখা ছাড়া আর কিছু নয়, এ আমি চিরকাল জানি। লেখক যা দেখবে শুনবে ভাববে এবং যত দেখবে শুনবে ভাববে, ততই মনের প্রসারতা বাড়বে। আমার আরেকটা সুবিধাও হয়েছিল। কলকাতা ও তার আশেপাশে যত লেখক বাস করতেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। বহু গাইয়েদের ব্যক্তিগতভাবে চিনলাম। অভিনেতাও অনেককে কাছের থেকে দেখলাম। সজনীকান্ত দাশ, কি প্রমথ বিশী, কি নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, এই সব দূরের

মানুষরা কাছে এসে গেলেন। কত আজীবনের বন্ধু পেলাম। যাদের সঙ্গে চাক্ষুষ দেখার সম্ভাবনা ছিল না, তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ হল। সে কি আমার পক্ষে কম লাভ।

বন্ধুরা মাঝে মাঝে বলতেন, 'ছোটদের প্রোগ্র্যাম নিয়ে এত চিন্তা করলে, তোমার সাহিত্যরচনা মাথায় উঠবে।' তা কিন্তু নয়, আমি মনে মনে জানতাম এদের নিয়ে আমার আসল কাজ। জয়ন্ত ছিল আমার মানস পুত্র। ওর সহযোগিতায় কত যে নতুন ধরনের প্রোগ্র্যাম করেছি, এখন আর কেউ তেমন করে না। কত সময় ভোরে যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, গোটা কতক ছেলেমেয়ে, যন্ত্র চালাবার দক্ষ কর্মী দু-একজনকে নিয়ে, রেডিওর গাড়ি করে বেরিয়ে বাইরে থেকে রেকর্ডিং করে আনতাম। সেগুলো যেমন উপভোগ্য, তেমনি শিক্ষাপ্রদ হত। চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষের সঙ্গে একবার ঘোরা হল। এমন কি সাপের গর্জানি পর্যন্ত জয়ন্ত তুলে নিল। আরেকবার এখন যেখানে লেকটাউন, ঐ অঞ্চলে মস্ত মৎস্য প্রকল্প দেখতে গেলাম। দুটো নৌকো করে পরিদর্শক সহ মাছের চাষ দেখলাম। কত যত্ন, কত ব্যবস্থা। কয়েক ঘর রাজবংশীর সঙ্গে আলাপ হল। আমাদের গরম মাছভাজা খাওয়াল। মাছধরাই তাদের জীবিকা। তাদের বড় ভয় সরকার নাকি প্রকল্প তুলে দেবেন। তাই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। সে লোকগুলো কোথায় গেল কে জানে। মনে আছে জেলেদের নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিলাম। মাছ বড় হলে, কিম্বা সংখ্যায় বড় বেশি বেড়ে গেলে, ধরা হত। দেখলাম বেড়াজাল দিয়ে মাছ ধরছে। এক কোমর জলে নেমে। প্রকাণ্ড জাল অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফেলা হল। তার মধ্যে কত যে মাছ পড়ল তার ঠিক নেই। তারপর জালের মুখ ক্রমে ছোট করে আনা হতে লাগল। ছোট মাছরা জালের ফাঁস গলে পালিয়ে গেল। বড়গুলো আটকা পড়ল। কি তাদের আকুলি-বিকুলি ! লাফ দিয়ে জাল ডিঙিয়ে অনেকে পালাল। জয়ন্ত তাদের লাফ দিয়ে পড়ার ঝুপ ঝাপ শব্দটি পর্যন্ত তুলল। জেলে সরদার সব বুঝিয়ে দিল। কি দক্ষ, সরল, বুদ্ধিমান মানুষ তারা। আমার 'নাটঘর' বইতে ওদের কথা একটু লিখবার চেষ্টা করেছিলাম।

আরেকবার বেহালার দিকে অনাথ ছেলেমেয়েদের আধা সরকারি আশ্রমে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে রেকর্ড করে আনলাম। এ-সব জিনিস বারে বারে শোনাবার যোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত কষ্টের ধনগুলোকে একবার শুনিয়ে টেপ্‌গুলি মুছে ফেলে অন্য কাজে লাগানো হল। ভারি ক্ষোভ হয়েছিল। পি সি চ্যাটার্জি বলতেন, 'কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বেন না, লীলাদি। তাহলে ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকবে না।' আমি বলতাম, 'তা কি করে হয়, কোনো জিনিসের জন্য মনে একটা দুর্বলতা না থাকলে, সে বিষয়ে আমি জোর পাই না।'

বছর পাঁচেক ঐ সব কাজ করেছিলাম। তারপর জয়ন্ত ভয়েস অফ অ্যামেরিকাতে কাজ পেয়ে বিদেশে গেল। প্রেমেনবাবু পদত্যাগ করলেন। সেঙ্গার দিল্লীতে বদলী হল। শৈলজানন্দ আগেই ছেড়েছিলেন। আমাদের ঐ পুরনো দলটির মধ্যে আমি ছাড়া আর বিশেষ কেউ বাকি রইল না। জ্ঞান ঘোষ আমাদের আগেই এসেছিলেন। বীরেনদাকে রেডিওরই লোক বলা যায়। তাঁর সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। তাঁর বন্ধুত্ব পেয়েছি বলে আমি গর্বিত।

১৯৬১ একটা বিশেষ বছর। সারা বছর ধরে রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী পালন করা হল। দিল্লীতে প্রবীণ সাংবাদিক এবং সমালোচক অমল হোম গেছিলেন শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রধান প্রযোজক হয়ে। কলকাতাতেও ঐ কাজে দু-তিনবার যাওয়া আসা করলেন। কাজটি তাঁর মনের মতো। সবচেয়ে উপযুক্ত কর্ণধার-ও তিনি। রবীন্দ্রভক্ত, সাংবাদিক, পড়াশুনো আছে। লেখেন ভালো, বলেন ভালো। সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন। সস্ত্রীক গিয়ে গুছিয়ে বসতে না বসতে ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকি জীবনটা অচল নির্বাক হয়ে কাটাতে হল। এর ১৪ বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর কথা মনে করলেও আমার কষ্ট হয়। কিন্তু ১৯৬১ সালে তাঁর অসুখের প্রথম ফল হল যে আমাকে দিল্লী গিয়ে তাঁর কার্যভার গ্রহণ করতে হল। বাড়িঘর ছেড়ে সেখানে বাস করতে রাজি হলাম না। শেষ পর্যন্ত রফা হল, প্রতি মাসের ১৫ দিন দিল্লীতে থাকব, বাকি ১৫ দিন কলকাতায় বসে শতবার্ষিক উৎসবের কাজ করব। আমার কাজের একটা নতুন পর্যায় শুরু হল। ছোটদের সঙ্গে আর কোন কারবার ছিল না। বাইরের রেকর্ডিং-ও দেখলাম আস্তে আস্তে উঠে গেল।

॥ ১৩ ॥

সেই যে ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানের ভার নিয়ে দিল্লী যাওয়া আসা ধরলাম, আর কখনো ছোটদের অনুষ্ঠান করিওনি, করতে ডাকেওনি। অন্য কর্মীরা দক্ষভাবে পরিচালনা করতে লাগলেন, কিন্তু মনে হত জাদুগুণটা চলে গেছে। দিল্লীর কাজ অন্য মেজাজের। সেটাকে সাহিত্যের মেজাজ বলা যায় না। বরং সাহিত্য পরিচালনার মেজাজ। এখন হলে সে কাজটি যত সহজে পারতাম, তখন পারতাম না। তখনো সাহিত্যকে প্রথম স্থান দিতাম, পরিচালনাকে দ্বিতীয়। পরিচালনার একটা নিজস্ব নীতি আছে। সেটিকে রপ্ত করতে অনেক সময় নিল। সুখের বিষয় নামে Chief Producer, Tagore Centenary Programme হলেও, বরাবর আমার মনে হত, এ আমার নিজের কাজ নয়। সাময়িকভাবে অন্য লোকের কাজ করে দিচ্ছি। এ ক্ষেত্রে সেই লোকটি হলেন অমল হোম। তাঁকে আমরা ডাকতাম ননী-কাকা। আমার

বাপের বাড়ির সঙ্গে তাঁদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ননীকাকার বাবা গগনচন্দ্র হোম ছিলেন আমার মেজ-জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজে আকৃষ্ট করবার আদি কারণ। এমন কি ময়মনসিংহে জ্যাঠামশায়ের স্কুল জীবন থেকে গগনদাদামশাই ঐ কুকর্মটি শুরু করেছিলেন। নিজে কলকাতায় যাওয়া-আসা করতেন আর বন্ধুর কানে একটা শিক্ষিত উদার সামাজিক ব্যবস্থার বিষ ঢালতেন। তার ফলে পরে যখন জ্যাঠামশাই নিজে কলকাতায় এসে প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ এবং তার পরে আর্ট স্কুলে পড়াশুনা করতে লাগলেন, তিনিও যে তখনকার নবীন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বলিষ্ঠ আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে, ক্রমে একদিন স্বার্থত্যাগী, উচ্চশিক্ষিত যুবকের এবং তাদের নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি ? পরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষা নিয়ে, দ্বারিক গাঙ্গুলীর মেয়েকে বিয়ে করে, স্থায়ীভাবে ব্রাহ্ম হলেন। আমার ছোট জ্যাঠামশাই, কুলদারঞ্জন, বাবা, কিম্বা এইচ বসুর স্ত্রী ছোট পিসীমা-এঁরা সকলেই আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম, কিন্তু কেউ দীক্ষা নেননি। এই পুরনো ইতিহাসের ফলে ননীকাকারা নিজেদের আমাদের অভিভাবক সম্প্রদায়ের অংশীদার মনে করতেন। আমরা অবিশ্যি তাতে কিছু খুশি হতাম না এবং উপযুক্ত ব্যবহারও করতাম না। ননীকাকা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। লম্বা-চওড়া ফরসা শৌখীন মানুষটি, অতি চমৎকার কণ্ঠস্বর ও বাচনভঙ্গী, অতিশয় কর্তব্যপরায়ণ ও স্নেহশীল। অনেকগুলি ছোট ভাই এবং একটি বোন—সকলেই কাকামণি বলতে অজ্ঞান। এরকম বড় একটা দেখা যায় না।

কলেজে পড়েননি ননীকাকা, ম্যাট্রিক পাস করেই সাংবাদিকতায় তালিম নিয়েছিলেন এবং দেখতে দেখতে বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এলাহাবাদে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাগজেও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটে অবধি তাঁকে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের স্বনামধন্য সম্পাদক বলে জানতাম। সৌজন্যে, সামাজিকতায় অদ্বিতীয় হলেও, মাঝে মাঝে স্পষ্টভাষায় লোকের মুখের ওপর নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্য, তাঁর সমালোচকের অভাব ছিল না। আমি সেগুলিকে প্রাধান্য দিতাম না। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দক্ষ। অভিজ্ঞ পরিচালক। সাংবাদিক-সুলভ তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে যে গুণটি সব চাইতে বিরল, তার অধিকারী। অর্থাৎ পরম গুণগ্রাহী। আমার মনে হয়েছিল রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য এঁর চেয়ে ভালো লোক পাওয়া শক্ত।

তাঁর বয়স তখন ৭০। মহাউৎসাহে চমৎকার পরিকল্পনা তৈরি করলেন। প্রথম দর্শনে আমার সেটি যে খুব পছন্দ হয়েছিল তা বলতে পারি না। দেখলাম গুরুত্বপূর্ণ বহু অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তারা অ-বাঙ্গালী। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ

নেই যে শুধু অনুবাদের মাধ্যমে একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয় থাকলে, ঐ সাহিত্যিকের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। তার ওপর রবীন্দ্রনাথের কটা বইয়েরি বা ইংরিজি কি হিন্দী অনুবাদ উপযুক্তভাবে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, বা প্রবন্ধ রচনা, বা গল্প উপন্যাস, বা জীবন-দর্শন বিষয়ে মূল ভাষণ দেবেন এমন একজন কেউ, যিনি বাংলা জানেন না, বা যৎসামান্য জানেন ?

দিল্লী গিয়ে আমার নিজস্ব মস্ত অপিসঘরে মস্ত টেবিলে, উঁচু-পিঠ সুন্দর চেয়ারে বসে যখন দেখলাম আমার পা-জোড়া পর্যন্ত মাটি থেকে চার ইঞ্চি উপরে ঝুলছে, তখন আমার সমস্ত আত্মপ্রত্যয় প্রচণ্ড নাড়া খেল। আমার সহকারী ছিলেন শ্রীগোপাল দাস। অতি দক্ষ, অতি চমৎকার স্টেশন ডিরেক্টর আচার্য বলে সুদর্শন কম-বয়সী সুপটু প্রোগ্রাম একজেকুটিভ ; নাম ভুলে গেছি চালাক-চতুর অদর্শনপটু দক্ষিণ দেশী পার্সনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রথমটা তার অস্তিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকতে নানা অসুবিধায় পড়তাম। সুখের বিষয়, ততদিনে আমার পুরনো বন্ধু পি সি চ্যাটার্জি স্টেশন ডিরেক্টর তখন দিল্লীতে আরো উঁচু পদে ছিলেন। সেক্টার জি ওয়ান হিন্দী চীফ প্রোডিউসার। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বীরেন ভদ্র, জ্ঞান ঘোষ এবং আরো বহু চেনা মানুষকে দিল্লী আসা-যাওয়া করতে হত। তাই দেখতে দেখতে আমি ওখানকার হালচাল শিখে ফেললাম। ক্রমে বুঝলাম ভারত সরকারের নীতিই হল সব বড় ব্যাপারে, সব রাজ্যই যেন প্রতিনিধিত্ব পায়। গোপাল দাস বুঝিয়ে বললেন যে অবাঙ্গালীরা ভাষণটি লিখলেও, তথ্য সংগ্রহ করে দেবার জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যে পণ্ডিত, এমন সব মানুষকে কনট্র্যাক্ট দেওয়া হয়েছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বিষয়ে যদিও মূল ভাষণ দিচ্ছেন বেনারসের একজন হিন্দীভাষী অধ্যাপক, তাঁর সামগ্রী জোগাচ্ছেন অধ্যাপক সরোজকুমার দাশ, যাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না। কথাটা এত বেশি সত্য যে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, এমন মানুষটি নিজে ভাষণ দেবার সুযোগ পাবেন না। নাকি ঐ বিষয়ে চারটি ভাষণের তথ্য সরোজ দাশ সংগ্রহ করছেন। এ ব্যাপারের ঐখানেই শেষ নয়। পরিণামটির কথা ভাবলে বোঝা যাবে তখনকার পণ্ডিতদের আর লেখকদের সাহিত্যের প্রতি কি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আজ থেকে ২২ বছর আগেও তাঁরা নিজেদের রচনাকে প্রধানতঃ একটা রোজগারের পন্থা বলে মনে করতেন না। তবে জিনিসপত্রের দামও ছিল এখনকার ১/৫ থেকে ১/১০ কিম্বা আরো কম। এখন কতকটা প্রয়োজনের তাগাদায়, কতকটা মূল্যায়নের দিক্ বদলেছে বলে, যে বইয়ের যত বেশি বিক্রি তাই দিয়ে তার সাহিত্যিক মান-ও স্থির হয়ে যায়। মোট কথা সরোজ দাশ তাঁর সমস্ত বিদ্যা আর যত্ন ঐ চারটি তথ্যমূলক প্রবন্ধে ঢেলে দিয়েছিলেন, যৎসামান্য পারিশ্রমিক নিয়ে। তাঁর, এই নিষ্ঠা কতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছিল ?

ঐ প্রোগ্র্যামগুলির জন্যে তাঁর সতীর্থ বন্ধুবান্ধব সাগ্রহে অপেক্ষা করে ছিলেন। কাজের সময়ে দেখা গেল প্রবন্ধগুলি ভাষা ভাষা, অগভীর ভাষণমাত্র। আসল ব্যাপারের তল পর্যন্ত কোনোটাই পৌঁছয়নি। এমন কি সরোজ দাশের জ্ঞানগর্ভ উপাদানগুলি তার মধ্যে খুঁজে পাওয়াই শক্ত। যেটুকু ছিল তাও ইংরিজিতে ভাষান্তরের ফলে, ঠিক চেনা যাচ্ছিল না। বলা বাহুল্য সরোজ দাশ ভারি ক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধ। কলকাতার বেতার কেন্দ্রই তাঁর সঙ্গে যোগস্থাপন করেছিল। অমল হোম তখনো কর্ণধার এবং তিনিই অবাঙ্গালী লেখকদের পাণ্ডুলিপিগুলি অনুমোদন করে ছিলেন। এ-সব আমি অনুপ্রবিষ্ট হবার আগে। কিন্তু আমি মাসান্তে কলকাতায় ফিরলেই আমার হাতে তাঁর কাছ থেকে একখানি কড়া চিঠি এল। কলকাতার স্টেশন ডিরেক্টরকে লেখা। কন্‌ট্র্যাক্টের শর্ত-ভঙ্গের দায়ে আইনের শরণ-নেবার কথাও ছিল তাতে। স্টেশন ডিরেক্টর দেখলাম বেশ ঘাবড়ে গেছেন এবং সরোজ দাশের ক্ষোভের কারণ বুঝতে তিনি একেবারে অক্ষম।

কিন্তু আমি তাঁর মনের কথা ঠিকই বুঝেছিলাম। স্টেশন-ডিরেক্টরকে বুঝিয়ে সরোজ দাশকে একদিন আমার ঘরে নিমন্ত্রণ করে, তাঁর ক্ষুব্ধ চিত্তে যথাসাধ্য সহানুভূতির প্রলেপ দিলাম। সব লেখকরাই স্পর্শকাতর হন, অনাদরে সকলেই বেদনা বোধ করেন, যদিও কড়া চিঠি সকলে লেখেন না। কিন্তু আমি ঐ বুড়ো মানুষটির তেজ দেখে খুশি না হয়ে পারিনি। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে রফা হল যে ঐ চারটি প্রবন্ধ আগাগোড়া আমাদের কলকাতা কেন্দ্রের সাহিত্য বাসরে প্রচারিত হবে। তার জন্য নতুন করে চুক্তিপত্র হল এবং এখানকার নিয়মে যতটা বেশি ফী দেওয়া যায়, তারো ব্যবস্থা হল। এই ব্যাপার থেকে আমার শিক্ষা হল যে কোনো সরকারি সংস্থার মূল্যায়ন আর সাহিত্যিক বা সাহিত্য প্রেমিকের মূল্যায়ন এক হয় না।

এর দু-বছর পরে আমার নিজেরও একটা এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে বিবেকানন্দস্বামীর জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে ইংরিজিতে একটি সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান করেছিলাম। তার জন্য প্রাণপাত করে খেটেছিলাম। বেলুড় মঠের আর রামকৃষ্ণ কাল্‌চারাল ইন্সটিটিউটের কর্তৃপক্ষের কাছে যথেষ্ট উপদেশ ও সাহায্য পেয়েছিলাম। খুব যত্ন করে প্রায় ১ ঘণ্টার অনুষ্ঠানটি টেপ করা হল। যাঁরা কণ্ঠ দিলেন, তাঁদের চেষ্টার আর শ্রদ্ধার তুলনা হয় না।

২৩ জানুয়ারি প্রোগ্র্যামটি প্রচারিত হল। তখন দিল্লীতে ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন মিঃ ভাট। ১৯৬১ সালে তাঁর কাছ থেকে অনেক সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। তিনি ঐ প্রোগ্র্যাম শুনে টেলিগ্রাফ করে তাঁর

অভিনন্দন জানালেন। হিমালয়ের কোনো সামরিক ঘাঁটি থেকে একজন বাঙালী জোয়ান লিখলেন, 'এখানকার জীবনযাত্রা এমন যে আমি ক্রমে ভগবানের মঙ্গল বিধানে আস্থা হারাচ্ছিলাম। বেতারে ঐ অনুষ্ঠানটি শুনে আবার আমার ভগবানে বিশ্বাস ফিরে এল।' ঐ চিঠির কপি মিঃ ভাট আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের কলকাতার আপিসে দিল্লী থেকে তাঁদের অনুষ্ঠান সমিতির বিচারকরা লিখলেন, 'প্রোগ্র্যামটি খুব ভালো উৎরোয়নি, কারণ গ্রন্থনা যথেষ্ট দৃঢ়-সংবদ্ধ হয়নি।' অবিশ্যি তাতে আমি এতটুকু ক্ষুব্ধ হইনি, কারণ সেই জোয়ানের চিঠিখানি আগেই পেয়েছিলাম। তাছাড়া আরেকটা কঠিন সত্য-ও আছে। কি সঙ্গীতজ্ঞ, কি শিল্পী, কি নাট্যকার বা অভিনেতা, কিম্বা লেখক, হাজার চেষ্টা করেও সব সময় সব শ্রোতা ও দর্শকদের খুশি করতে পারেন না। এই সত্যটি বেতারের মতো অনুষ্ঠানে আরো তিক্তভাবে প্রতিফলিত হয়। কারণ, বিচারকরা সেখানে কদাচিৎ বিশেষজ্ঞ হন।

এই রকম ভালোয়-মন্দয় দিন কেটেছিল। সমস্ত ১৯৬১ সালটিতে ৬ বার দিল্লী গিয়ে, প্রতিবার ১৫ দিন করে থেকে এসেছিলাম। দুঃখের বিষয় যাওয়া আসার এবং থাকার জন্য যা আমার খরচ হত, (যদিও হনুমান রোডের মৈত্র পরিবারের আতিথেয়তার জন্য আমার কোনো কষ্টই হত না) তার অর্ধেকের বেশি প্রাপ্য হত না। হিসাবের নড়চড় হবার জো ছিল না এবং আমিও দিল্লীতে থাকতে রাজি ছিলাম না। কিন্তু যে আনন্দ উপভোগ করেছিলাম তার তুলনা হয় না। ওঁরা ভারতের শ্রেষ্ঠ গাইয়ে, বাজিয়ে, নাট্যকার, অভিনেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক এক জায়গায় জড়ো করার চেষ্টা করেছিলেন। সে-সব টেপগুলি যদি উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করে থাকেন, তাহলে ১৯৬১-এর ভারতীয় সংস্কৃতির চমৎকার একটি চিত্রশালা তৈরি হতে পারে।

বেতার কেন্দ্রে আমার ঐ ঘরটি ক্রমে শান্তিনিকেতনের আর কলকাতার বন্ধুদের মিলনস্থল হয়ে দাঁড়াল। আমার পুরনো বন্ধু ক্ষিতীশ রায় তখন গান্ধী স্মারক নিধিতে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। বোধহয় মন কেমন করত। আমার প্রোগ্র্যাম এক্‌জেকিউটিভ আচার্য আমাকে একদিন তার ছিমছাম বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল। বুঝতে পারলাম আমার শৈশবে, শিলং-এ তার দিদিমা (রবীন্দ্রনাথের ভাইঝি) মণীষা দেবীর কাছে হতাশাজনকভাবে গান শিখতে যেতাম এবং মনে পড়ল তার মা, আমার চেয়ে হয়তো বছর তিন-চারের বড় রুবি ভারি দুরন্ত ছিল। এমনি করে জীবনের সূত্রগুলো পাক খেয়ে খেয়ে আবার হাতে ফিরে আসে।

ঐ যে মাঝে ৭ বছর বেতারে কাজ করে কাটালাম, তাতে কিন্তু আমার জীবনের স্রোতটা এতটুকু বিচলিত হয়নি, বরং জোর পেয়েছিল। তখনো মনে

হত বড়দের জন্য লেখাটা হবে আসল পেশা, ছোটদের জন্য লেখাটা থাকবে মধুর নেশা। বেতারে নিয়মিত আমার গলা শুনে শুনে আমার বহু ভক্ত জুটেছিল। তারা নানা রকম চিঠি-পত্র লিখত। বেশির ভাগই মহিলা কিম্বা, কিশোর-কিশোরী আর কলেজের পড়ুয়া। প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে কম চিঠি পেতাম। তার কারণ একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হলে পর উচ্ছ্বাস করার ইচ্ছাটা চলে যায়। অনেক লাভও হয়েছিল। আপিসের জীবনযাত্রা বিষয়ে একেবারে মুখ্যু ছিলাম, ফাইল বলতে ঠিক কি বোঝায় জানতাম না। আমার টেবিলে ফাইল এলে তাকে নিয়ে কি করতে হবে, তাও আমাকে অতুল বলে ফোঁটাকাটা লম্বাচুল অতি ভদ্র পিওন বুঝিয়ে দিয়েছিল। পিওনদের কাজ যে কাগজপত্র আনা-নেওয়া করা আর টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা উল্টে দরকারি কাগজপত্র নষ্ট হবার উপক্রম হলেও তাতে তারা যে হাত লাগাতে পারে না, যেহেতু সেটা ফরাসদের কাজ, এটা বুঝতে সময় নিয়েছিল। যখন বুঝলাম তখন তাদের মান-সম্ভ্রমে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না করে বাড়ি থেকে আনা ঝাড়ন দিয়ে চা মুছতে, কাগজপত্র বগলে নিয়ে টেবিল থেকে টেবিল গিয়ে সই সংগ্রহ করে, নিজের কাজের সুষ্ঠু নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে লাগলাম। শেষটা মনে হত বেতারের যে কোনো বিভাগে আমাকে ভরতি করে নিলে, কাজ চালিয়ে দিতে পারব। বলেছি তো প্রথম কয়েক মাসের পর, (মাঝে মাঝে দু-একজন উটকো পদাধিকারী ছাড়া) সকলের কাছ থেকে খুবই ভালো ব্যবহার পেয়েছিলাম। তারা সকলে মিলে আমাকে নানা বিচক্ষণ উপদেশ দিয়ে একজন জবরদস্ত কর্মচারী করে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করত। ঐ আমার সকলের সঙ্গে সমানে সমানে ভাব করার বদভ্যাসটি না থাকলে, বোধ হয় কালে একজন দক্ষ অপিসের বড়বাবু হয়ে উঠতে পারতাম। সুকুমার একদিন বলল, 'এ-এস-ডি'র ঘর থেকে ঐ সব নোট্ এলে, অমন ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি লাগান কেন? পত্রপাঠ পৃষ্ঠার নিচে লিখে দেবেন ও সব কাগজপত্র আমার কাছে নেই, ছিলও না কোনো দিন, এখন কোথায় আছে তা-ও জানি না।—তারপর আমাকে বললেই আমি খুঁজে দেখব কোথায় গুঁজে রেখেছেন!'

এ-এস-ডি হলেন অ্যাসিস্টান্ট স্টেশন ডিরেক্টর। আমি প্রথমে ছিলাম এ-পি-সি-ডব্লু, অর্থাৎ অ্যাসিস্টান্ট প্রডিউসার চিলড্রেন্স এণ্ড উইমেন্স প্রোগ্রাম্স। দিল্লীর পদটি ছিল সি-পি-টি-সি-পি, অর্থাৎ চীফ প্রডিউসার ট্যাগোর সেন্টেনারি প্রোগ্র্যাম্স। উৎসবান্তে ফিরে এলে তো আর আমাকে অ্যাসিস্টান্ট প্রডিউসার করা যায় না। বিশেষতঃ অন্য লোকে যখন এক বছর ধরে ঐ পদে অধিষ্ঠিত। তাছাড়া হয়তো এতকাল পরে আমার দক্ষতা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে, প্রেমেনবাবুর পুরনো পদে আমাকে পি-এস-ডব্লু করে দেওয়া হল। তার মানে

প্রডিওসার স্পোক্‌ন্‌ ওয়ার্ডস্‌ ! যেখানে প্রায় সব-ই স্পোক্‌ন্‌, সেখানে ও নামের তাৎপর্য কি তা না বুঝলেও, এটুকু টের পেলাম যে, বাংলা সাহিত্যের দিকটা আমাকে দেখতে হবে এবং সব বিভাগের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি চেষ্টা করলে আমার ঘাড়ে চাপানো যাবে। ততদিনে কিছুদিন অ্যাডভাইজর, অর্থাৎ মন্ত্রণাদাতার পদে থাকার পর প্রেমেনবাবু খসে পড়েছিলেন। বেতার আপিসে কদাচিৎ আসতেন, ওঁর সরস কথা শোনার মজা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। তবে আগেও বলেছি, প্রেমেনবাবু সত্যিকার সৃষ্টিকার, কোনো আপিসের নিয়ম মেনে বা উচ্চতর পদাধিকারীদের নির্দেশ মেনে চলা তাঁর কুষ্ঠিতে লেখে না। আমিও মাঝে মাঝে গণ্ডগোল করতাম। অনেক কাল আগে আমি বাইরে থেকে এসে যখন ভাষণ দিতাম, তখন একদিন ১ নং গার্সটিন প্লেসে এসে স্টুডিওতে চ্যাঁচামেচি শুনে গিয়ে দেখি, আমার বোনঝি কল্যাণী কার্লেকরকে নীলিমা সান্যাল বৃথাই বোঝাবার চেষ্টা করছে যে গণিকা কথাটি চলতে পারে বারাঙ্গনা বা জনপদবধূতেও আপত্তি নেই, কিন্তু বেশ্যা অচল। কল্যাণী তা মানবে কেন ? সে বলছে 'আমার আলোচ্য বিষয়ই হল বেশ্যা-সমস্যা, তা বেশ্যা শব্দটাকেই উচ্চারণ করতে পারব না ? তাহলে আমার আলোচনাটাও অচল। আমি চললাম।' শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে বেশ্যার বদলে গণিকা বলতে তাকে রাজি করানো গেল।

ঐ সমস্যাটা আমার মনে লেগেছিল। সেই সঙ্গে একটা যুক্তিযুক্ত কথাও মনে হয়েছিল। যে-সব দুঃখিনী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে, তাদের নামটাকে পর্যন্ত অশ্রাব্য প্রতিপন্ন করে তাদের প্রতি কতটুকু সহানুভূতি দেখানো হয় ? তাদের দুঃখ দূর করার তো কোনো চেষ্টাই হয় না। আমিও বেতারের ঐ হাস্যকর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনেক বছর কিছু করিনি, করার সুযোগও পাইনি। এবার একদিন আমাদের পুরনো বন্ধু শৈলজানন্দর এক পাণ্ডুলিপি আমার কাছে এল। সাহিত্যবাসরের জন্য একটি নতুন ছোট গল্পের কাগজ। মধ্যিখানে দাগ দেওয়া। 'চাকর' কথাতে আপত্তি। দাস চলতে পারে, ভৃত্য চলতে পারে, কিন্তু মীরার ভজনে চাকর শব্দ চললেও সাহিত্য বাসরে কোনো মতেই চলবে না। খচ্‌ করে সেই পুরনো অসন্তোষটা মনের মধ্যে সাড়া দিল। আমি বললাম, 'কেন চলবে না ? চাকরের কথাই তো হচ্ছে।' কর্মচারীটি একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কথাটা ভালো না।' 'ভালো না কেন ? তোমরা চাকর রাখ না ? চাকরটাকে বাজারে পাঠাও না ? চাকর শব্দ উচ্চারণ কর না ?' সে বলল, 'তা হতে পারে, কিন্তু বেতারে' নিয়ম নেই।' তখন আমার জিদ্‌ চেপে গেছে, বললাম, 'নেই বুঝি ? দাও তো কাগজটা। স্বচক্ষে দেখেই আসি বেতারের নিয়মাবলী এ বিষয়ে কি বলে।'

নিয়মাবলী থাকত স্টেশন ডিরেক্টরের ঘরে। বলেছি তো একজন বাদে সব

স্টেশন ডিরেক্টরের সঙ্গেই আমার সদ্ভাব ছিল। গেলাম তাঁর ঘরে। প্রথমে তিনিও বললেন, 'না, লীলাদি, ও-সব কথা রাখলে পাবলিক চিঠিপত্র লিখবে। আমরা মুশকিলে পড়ব। সত্যিই নিয়ম নেই।'

আমি বললাম, 'কই দেখি নিয়মাবলীতে কি রকম নিয়ম নেই।' শেষ পর্যন্ত নিয়মাবলী এনে, ঐ প্রসঙ্গটি খুঁজতে ডিরেক্টর মহাশয়ের পার্সনেল অ্যাসিস্টান্ট শম্ভু রায়চৌধুরীকে ডাকা হল। তার মতো দক্ষ লোক শুধু বেতারে কেন ভূভারতেও কম ছিল। পাঁচ মিনিটে যথাস্থানে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। জনসাধারণের জ্ঞাতব্য বলে, কি দেখিয়ে দিল তা বলে দিচ্ছি। নিয়মাবলীতে শুধু এই কথা আছে যে বেতার ভাষণে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যাতে করে কারো বা কাদের প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, অপমান প্রকাশ পাবে। কাজেই 'চাকর' বা 'বেশ্যা' যদি সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার হয় তো চলতে পারে। কিন্তু 'পণ্ডিত' বা 'সাধু'-ও অবজ্ঞার্থে চলবে না। অর্থাৎ 'ওঃ! ভারি সাধু হয়েছেন!' কি 'ও-সব পণ্ডিতগিরি ঢের দেখেছি' কখনো বেতারে বলবেন না। ও-সব হল অসামাজিক। বলার নিয়ম নেই।

আরেকটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করি। হাজার হাজার অর্থহীন আধুনিক গান আমাকে প্রতি মাসে পড়তে হত। যেগুলি অনুমোদন করতাম, সেগুলি জ্ঞান ঘোষের কাছে সুর সংযোজনের জন্য যেত। সকলের দুঃখ এক হাজার গান পড়লে লীলাদির একটা পছন্দ হয়। এখন বেতারে আধুনিক গান শুনলেই টের পাই আমি আর সেখানে নেই!

আবার বলব আমার বেতার জীবন আমি ভারি উপভোগ করেছিলাম। আমার মনের বিস্তারও অনেক বেড়ে গেছিল। অজস্র ছোট গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস লিখেছিলাম। সারা দিন কাজে ব্যস্ত থাকতাম আর মনটা চরকির মতো ঘুরত। ক্রমে প্রকাশকদের সঙ্গেও আলাপ হল। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির। আর বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি। প্রেমেনবাবু একদিন আমাদের দু-তিনজনকে সেখানে নিয়ে গেছিলেন। সেখানে পরিচালক ছিলেন জিতেন মুখোপাধ্যায়। এমন একাগ্রচিত্ত দক্ষ পরিচালক না হলে কোনো প্রকাশনালয় অল্প সময়ে অমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। দেখতে দেখতে বন্ধুর মতো হয়ে গেলেন। ওঁরা প্রতি বাংলা মাসের ৭ তারিখে নতুন বই বের করতেন। আমার প্রথম দিককার বহু বই ওঁরা ছেপেছেন। এখনো ওদের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। ওঁদের মালিক হলেন শ্রীত্রিদিবেশ বসু, স্বনামধন্য অ্যালজেব্রা-সম্পাদক কে পি বসুর ছেলে। ওঁরা বড়দের বইয়ের মধ্যে 'ঝাঁপতাল' উপন্যাস আর 'গাওনা' বলে নাটক সংগ্রহ ছাড়া ছোটদের জন্য আমার অনেকগুলি বই প্রশান্ত রায়ের আঁকা ওয়াশ দেওয়া ছবি হাফ্‌টোন ব্লকে ছাপিয়ে,

অনবদ্য চেহারা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে বক-ধার্মিক, গুপির গুপ্ত খাতা, জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে সহযোগিতায় লেখা 'টাকা-গাছ', 'টংলিং', 'হলদে পাখির পালকে'র নাম করতে হয়। বেতারের যত দোষই থাকুক, সব সময় একটা সৃষ্টির হাওয়া বইত। যেখানেই শিল্পীদের কারবার সেখানেই একটা অন্য রকম আবহাওয়া তৈরি হয়। ৪৮ বছর বয়সে সেই আবহাওয়া আমাকে নতুন প্রাণ দিল, উৎসাহ দিল, পদার্থ দিল। আমি বেঁচে গেলাম। ঘরে বসে ফরমায়েসি লেখা এক আর রেডিওতে পড়া হবে, কিম্বা অভিনীত হবে যে লেখা, সে আলাদা। সে বেশি ভালো তা বলছি না। মোটেই বেশি ভালো নয়। কিন্তু তার মধ্যে এক রকম ডিসিপ্লিন, বা শৃঙ্খলা থাকে, যার কারণে কোনো অবান্তর তথ্য বা প্রকাশের জায়গা থাকে না। থাকলে আমরা সেগুলোকে ব্র্যাকেট করে বাদ দিতাম। ফলে জিনিসটাতে একটা শক্ত বন্ধন এবং প্রকাশের বলিষ্ঠতা দেখা যেত। অবিশ্যি অনেক চিন্তাশীল লেখাকে বা সমালোচনাকে, বা কবিতাকে এইভাবে বেঁধে দেওয়া যায় না। কিন্তু নাটককে, ছোট গল্পকে যায়। তাতে তাদের সাহিত্যগুণ বাড়ে তা-ও বলছি না। কিন্তু লেখকদের একটা নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস হয়ে যায়, তার সাহায্যে নিজেদের এলোমেলো চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নেবার সাহায্য হয়। এবং অবান্তর কথা বাদ দিতে শিখে যান।

আমার ঐ সব ছোটদের উপন্যাস গল্পদাদুর আসরে ধারাবাহিকভাবে পড়া হত। টাকা-গাছও তাই। 'হলদে পাখির পালক' কাজের তাড়ার মধ্যে আমার মনে জ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। আমি ৬ দিনের ছুটি নিয়ে এই আমাদের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে বসে বইটি আগাগোড়া লিখেছিলাম। ওর মধ্যে এখানকার বাতাস বয়, রোদ ওঠে। ফিরে গেলে, প্রেমেনবাবু ওর নামকরণ করেন। তারপর জয়ন্ত গল্পদাদুর আসরে পড়ল। বইটি অনেকের ভালো লাগে। বহু পুরস্কারও পেয়েছে। আমার মনে হয় লেখকদের সচেতন মনের গভীরে একটা অবচেতন মনও থাকে। গল্প কবিতা তৈরি করে সে। মাঝে মাঝে হঠাৎ সেই সব গল্প কবিতা মনের ওপর ফুটে ওঠে। কোনো একটা কথা শুনে, এক ছত্র কবিতা পড়ে, আচমকা একটা সুর শুনে, বা ছবি দেখে, কতবার আমার চেতনার কাছে গোটা একেকটা গল্প ধরা দিয়েছে, যাকে তৈরি করার কৃতিত্ব আমার নয়। আবার তেমনি কত সময় মনটা শুকনো মরুভূমি হয়ে যায়। হয়তো ঠিক পুজোর আগে এমনি হল। তখন আমি একটিও ভালো গল্প লিখতে পারি না। কিন্তু বেতারের ঐ ৭ বছরে কেন আমার মনে এত গল্প উপন্যাস প্রায় তৈরি হয়ে ধরা দিত, এ আমি বলতে পারব না। তখনি যে লিখে ফেলতাম তাও নয়। মনের রসে কিছুদিন জারিয়ে নিয়ে তবে হয়তো লিখতাম। যদিও আমি বলে

থাকি সাহিত্যের প্রধান উপজীব্যই হল সরসতা আর সততা, তবু এ-ও সত্যি যে সব লেখার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত। তা যদি না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে লেখক তাঁর মনের ভাবটি ঠিক প্রকাশ করতে পারেননি।

কয়েকটি ছোটদের উপযুক্ত সরস নাটক লিখেছিলাম এই সময়ে। তার মধ্যে ছিল বকবধ-পালা। জয়ন্ত সেটি একবার রেডিও সপ্তাহে মঞ্চস্থ করে, বলাকা প্রকাশনী থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশও করিয়ে দিয়েছিল। 'লংকা-দহন' লিখেছিলাম, ক্ষণস্থায়ী, কনটেম্পোরেরি পাবলিশার্স বই করেছিলেন ১৯৬৪ সালে, আমি রেডিও ছাড়বার পর।

বেতারে কাজ করতাম বলে যে আমার সাংসারিক দায়িত্ব সব এর-ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম তা নয়। ছেলে-মেয়ে কলেজে পড়ে তখন, ভাগ্নী সরোজনলিনী থেকে পাস করে কৃতিত্বের সঙ্গে বাটানগর স্কুলে সেলাই শেখায়। তার মেয়েদের কেউ কাজকর্ম করে, কারো বা বিয়ে হয়ে গেছে। ঐ ছিল আমার নিজের কাজ করার উপযুক্ত সময়। আমি পরিবারকে খুব উঁচুতে বসাই। মানুষের তৈরি সব অনুষ্ঠানের মধ্যে এর জুড়ি খুঁজে পাই না। পরিবার মানে মা বাবা দু একটি ছোট ছেলেমেয়ে, এক-আধজন আত্মীয়, যারা সবাই মিলে একই বাড়িতে বাস করে, একই সুখ দুঃখ ভাবনা-সাফল্য, সব কিছুর অধিকারী। যে-সব মেয়েরা চাকরিকে গৃহকর্মের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করেন, আমি তাদের মধ্যে নেই। বোধ হয় কিঞ্চিৎ সেকেলে আছি। আমি রান্নাবান্না ঘরকন্নাকে খুব বড় কাজ বলে মনে করি। যে মেয়েরা রান্না করতে জানে না, বা ছেঁড়া কাপড় রিপু করে না, বা সব কিছু দরজিকে দেয়, আমি তাদের নিন্দা করি। সুখের বিষয়, আধুনিক মেয়েরা দক্ষভাবে দুদিক সামলাতে জানে। এই সব নাটক নবেল লেখার মধ্যে মধ্যে আমার আধুনিক নিয়মে রান্নাবান্না ঘরকন্না আর শিশুপালনের কথা লিখতে ইচ্ছা করত। মহিলামহলের অনুষ্ঠানে এ-সবকে প্রাধান্য দেবার আমি পক্ষপাতী ছিলাম। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা, যেমন রমা চৌধুরী, নলিনী দাশ ইত্যাদি এসব বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহী হলেও, যাদের শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কম তারা এগুলিকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। আমি রেডিও ছাড়ার প্রায় কুড়ি বছর পরে মনের এ বাসনা কিছুটা পূর্ণ করতে পেরেছি। রান্নার বই বেরিয়েছে, ঘরকন্নার বইও আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করার ব্যবস্থা করছেন। একথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলাম, কারণ রেডিওর জন্যেই শখটা শুধু বেড়ে যায়নি, বাস্তবমুখীও হয়ে পড়েছিল।

১৯৫৮ সালে আমার মেয়ে কমলার বিয়ে হল অবনীন্দ্রনাথের বোন সুনয়নী দেবীর নাতি মনীষীর সঙ্গে। এ বিয়ে দুটি পরিবারের অশেষ সুখের ও আনন্দের কারণ হয়েছে।

॥ ১৪ ॥

এই কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমার নিজের বিয়ের গল্প দিয়ে। তার পরে, ১৯৮৩ সালের মে মাসে আমার মেয়ের বিয়ের কথায় এসে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে আমার জীবনের আরো ২৫ বছর কেটে গেছিল। মেয়ের বিয়ে হল দুই পরিবারের দিক থেকে সন্তোষ-জনক ও সুষ্ঠু ভাবে। হিন্দু মতে। গোঁড়ামি বাদ দিয়ে। যেমন আধুনিক ভাবাপন্ন হিন্দু বাড়িতে আজকাল হয়ে থাকে। এই ২৫ বছরে বোধহয় হিন্দুরাও যেমন, ব্রাহ্মরাও তেমনি অনেকখানি উদার হয়ে গেছিলেন। কিম্বা হয়তো আত্মসচেতনতা কমে গেছিল। ও-সব বিষয়ে মতভেদকে কেউ আর তেমন গুরুত্ব দিত না। মূল্যবোধই বদলে গেছিল। মোট কথা হিন্দু ও ব্রাহ্ম সব আত্মীয়স্বজনরাই আনন্দের সঙ্গে বিয়ের উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। চাঞ্চল্যকর কিছু দেখা যায়নি। যা যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি হল। আগেও বলেছি আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলি, কারণ আমি মূর্তি পুজো করি না, জাত মানি না। আর তো কোনো তফাৎ দেখি না। আমি না করলেও, মূর্তি পুজোতে আমি কোনো দোষ দেখি না এক জীব-বলি ছাড়া। তাছাড়া উপনিষদের ধর্মকে আমি অ-হিন্দুই বা বলি কি করে। মোট কথা, আমার মেয়ের হিন্দু মতে বিয়ে হল। সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে।

এত কাল ধরে যত আত্মীয় বন্ধুদের ছেলে মেয়েদের বিয়ে-থা-তে আমাদের নেমন্তন্ন হয়েছিল, সবাইকে ডাকা হল। বরের আত্মীয়স্বজন আর আমাদের গুরুজনদের ছাড়া সবাইকে ডাকে চিঠি দেওয়া হল। প্রায় সকলেই এলেন। সমাজ অনেকখানি উদার হয়ে গিয়েছে তত দিনে। শুধু উদার নয়, অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত আচরণ করতে আর পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হতে শিখেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে এই মনোভাবের আরম্ভ বলে মনে হয়।

শিক্ষিত সংস্কৃতিবান পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ করা আর সব জিনিস থেকে আলাদা।

ছেলের বাবা ডঃ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় নামকরা জিওলজিস্ট, এক সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলজি বিভাগের প্রধান। বিয়ের সময় অবসরপ্রাপ্ত। ওর মা শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোঁসাইবাড়ির মেয়ে। ঠাকুমা হলেন অবনীন্দ্রনাথের ছোট বোন, নাম করা চিত্র শিল্পী সুনয়নী দেবী। বহুকালের চেনা ঘর, বহু শ্রদ্ধা আর প্রীতির পাত্র-পাত্রী। ছেলে ডুন স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের গ্রাজুয়েট। তেল কোম্পানিতে কাজ করে। মাথায় ৬ ফুট ২ ইঞ্চি, দেখতে ভাল।

এত সব দেখে বিয়ে দিলেও সব সময় তার পরিণাম সুখের হয় না, এ আমি বহুবার দেখেছি। কত দুঃখী মেয়ের কথা মনে হয়েছিল। মনে মনে বলেছিলাম যার যত দুর্বলতাই থাকুক, যদি একান্তভাবে শুভেচ্ছা আর সু-সঙ্কল্প থাকে, তাহলে সুখী হবার সম্ভাবনা বেশী হয়। ওটা শুধু স্তোক বাক্য নাকি সত্যি, তাও জানি না। কিন্তু এ বিয়ে বড় সুখের হয়েছে। শুধু পাত্র-পাত্রীর দিক থেকে নয়, দুটি পরিবারের পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসার দিক থেকেও।

বিয়ে যেন শুধু আমাদের মেয়ের নয়, বেতার আপিসেরো কিছুটা দায়িত্ব ছিল। আমার প্রিয় বান্ধবী বেলা দে-র তুলনা হয় না। কোথায় কাকে, কি এবং কিভাবে দিতে হয়; কলকাতার কোন দোকানে সবচেয়ে ভালো দেখতে ও খেতে কি মিষ্টি হয়; তার শুধু নাম ঠিকানাই নয়, ঐ সব সুখাদ্যের নমুনাসহ নায়কদের আমাদের বাড়িতে এনে উপস্থিত করা এবং উপযুক্ত সময়ে সে সব যাতে অকুস্থলে হাজির হয় তার ব্যবস্থা করা—কিছু বাদ দিল না! তার ফলে শিখলাম যে উত্তর কলকাতার মতো কারিগর অন্য কোথাও নেই আর বেলা দে-র মতো করিৎকর্মা মেয়ে যদি কেউ থাকেও থাকে, তার সঙ্গে আমার দেখা হবার সৌভাগ্য হয়নি।

প্রকাশক বন্ধুরাও কম যাননি। ত্রিবেণী প্রকাশনীর বন্ধু কানাই সরকার বলা কওয়া নেই লোক মারফৎ একটি চিরকুট দিয়ে প্রায় হাজার টাকা নগদ পাঠিয়ে দিলেন। চিরকুটে লেখা ছিল, 'মেয়ের বিয়ে দিতে টাকা লাগে না নাকি?' সে সময় হাজার টাকার দাম হাজার টাকা ছিল।

গায়ে-হলুদের আগে সিগনেট প্রেসের নীলিমাদেবী একটা চার সেরি, আগাগোড়া ক্ষীরের তৈরি পোনামাছ আর রেশমী শাড়ি পাঠালেন। অমনি আরো কতজনা, যে যার সাধ্য মতো। লেখক বন্ধুদের বলতে শুনি, এমন কি লিখতেও দেখেছি যে প্রকাশকরা সবাই তাঁদের ক্ষতি করতেই তৎপর। আমার অভিজ্ঞতা অন্য রকম। মাঝে মাঝে আশানুরূপ রয়েল্টি পাই না; বইতে অজস্র ছাপার ভুল দেখলে রেগে যাই; আগ্রহ করে পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়ে অনেক দিন ফেলে রাখলেও রেগে যাই। তবু তাঁদের আমার বন্ধু বলেই মনে করি। তার যথেষ্ট কারণও আছে। লেখকের লেখা না পেলে তাঁদের চলে না, তেমনি আবার বই প্রকাশের সমস্ত ঝামেলা এবং অনিশ্চয়তা ঘাড়ে নেবার এমন লোক আমরাই বা কোথায় পাচ্ছি। শুধু এইটুকু বলি, বৎসরান্তে সে বছরের বিক্রি-মূল্যের নির্ধারিত অংশটুকু যদি তাঁরা নিজের থেকে নববর্ষে লেখকদের হাতে তুলে দেন, ঐ বিশেষ দিনটি আরো মধুর হয়। কেউ কেউ দেন-ও। মিত্র ঘোষ থেকে কেউ সেদিন খালি হাতে ফেরে না। আনন্দ পাবলিশার্সও সে বছরের সমস্ত প্রাপ্য বাড়িতে পৌঁছে দেন। বিশ্বভারতী, ওরিয়েন্ট লংম্যান, সবসময় খুব উদ্যোগী বিক্রেতা না

হলেও এঁদের নিখুঁৎ ব্যবহার। কত নাম করব ? মৌসুমী, নাথ, বিমলা, শৈব্যা, দে-জ, উদয়, এশিয়া, সকলেই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। বিশেষ করে এশিয়া তো আছেই। মেয়ের বিয়ের স্মৃতি মনে জাগতেই এত কথা মনে পড়ল। সিগনেট, নিউ স্ক্রিপ্টের, সঙ্গে হৃদয়ের যোগ। এ-সব কথা না বললে আমার স্মৃতিকথা অসম্পূর্ণ থাকবে। আরো কাউকে কাউকে হয়তো বাদ দিলাম। প্রসঙ্গ উঠলে বলা যাবে।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করতেই হবে যে মেয়ের বিয়েতে আমার ব্যবহারে অনিচ্ছাকৃত অনেক ত্রুটি ধরা পড়েছিল। অনেক প্রিয় বন্ধুকে নেমন্তন্ন করতে ভুলে গেছিলাম। মনে হয় নেমন্তন্ন না করার চেয়েও ভুলে যাওয়াটা বড় অপরাধ। অনেকে একটু সেকেলে, ডাকে চিঠি যাওয়াতে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফোন করলেই হত। তাও ভুলেছিলাম। আমার বাল্যবন্ধু মীরা দত্তগুপ্ত এতই দুঃখিত হয়েছিল যে বিয়েতে এলই না। কারণটি অনেক দিন পরে জানলাম। এত অতিথির মধ্যে সবাইকে বোধহয় সমান আদর জানাতে পারিনি। এই সঙ্গে এ-ও বলব নতুন কুটুম্বদের নিখুঁৎ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সেই থেকে স্বর্গীয় মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়দের বংশধররা আমাদের নিকট আত্মীয় হয়ে গেছেন। আমাদের দেশে তো শুধু দুটো মানুষের বিয়ে হয় না ; দুটো বংশের বিয়ে হয়। এত সৌভাগ্য আমাদের। আমার নন্দাই বাঘশিকারী কুমুদ চৌধুরীর মে ফেয়ারের বাড়ীতে আমার বিয়ে হয়েছিল। আমার মেয়েরও সেইখানেই বিয়ে হয়েছিল। ননদ নন্দাই অনেক দিন স্বর্গে গেছেন।

এসব হল ১৯৫৮-এর কথা। মনে আছে বেতার থেকে ১৩ দিনের ছুটি নিয়েছিলাম। বিয়ের পর আবার ভালোমানুষের মতো আপিসে গিয়ে এপিসিবি বনে গেছিলাম। ঐ সময় থেকে কেমন যেন লেখার হাত খুলে গেছিল। মনে একটা দারুণ তাগাদা অনুভব করতাম। মনে রাখতে হবে অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেনবাবু, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে, সুধীন দত্ত, আশাপূর্ণা ইত্যাদি—কেউ আমার চেয়ে ৫ বছরের বড়, কেউ বা সমবয়সী কিম্বা দু-এক বছরের ছোট। এঁরা সবাই ততদিনে নামকরা লেখক বলে স্বীকৃত। এমন কি কারো কারো কলমের জোর কমেও আসছিল। অথচ আমার কাজ সব-ই প্রায় পড়ে ছিল। বয়সটা এদিকে বেড়েই চলেছে যদিও টের পাচ্ছি না। এখনো পাই না।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩-র মধ্যে কিন্তু অনেক লিখে ফেললাম। দিনে সময় হত না, রাত জেগে লিখতাম। আমার স্বামী কিছু খুশি হতেন না। হুমায়ুন কবির তখন দিল্লীতে, কিন্তু চতুরঙ্গ বলে বড়দের জন্য সুন্দর একটি সাহিত্য পত্র প্রকাশ করতেন। যতদূর মনে পড়ে ত্রৈমাসিক। আতওয়ার রহমান বলে একজন স্বল্পায়ু, সুন্দর ছেলে হাসিমুখে সব ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিত। আমাকে বলা হল

একটি ছোট ও সরস উপন্যাস লিখে দিতে। তবে বিষয়বস্তু হবে আধুনিক শহুরে সমাজ। 'চীনে লণ্ঠন' লেখা হল। বলাবাহুল্য বড়দের জন্য। পুরনো বন্ধু কানাই সরকার ত্রিবেণী বলে একটি প্রকাশনালয় করেছিলেন। সেখান থেকে বই হয়ে বেরোল। পরের বছর 'ইষ্টকুটুম' বেরোল ওখান থেকেই। সেকালের ইঙ্গবঙ্গ সমাজের নানা রকম সরস ছোট গল্প। তার নায়ক নায়িকারা সকলেই আমার তথাকথিত আত্মীয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ মনগড়া। গল্পগুলো তার আগে আনন্দবাজার, যুগান্তর, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কথা-সাহিত্য, গল্প-ভারতী ইত্যাদিতে নানা সময়ে বেরিয়ে ছিল। সরস গল্প অনেকগুলির পটভূমি স্বচক্ষে দেখা, ঘটনাগুলো বানানো। 'ইষ্টকুটুম' নাম দিয়েছিল বেতারের উষা ভট্টাচার্য। সে-ও বড় গুণী মেয়ে, সার্থক পদাধিকারিণী হয়ে মৌলিক সৃষ্টি করার পথে বেশী এগোতে পারেনি। এত ভালো কর্মীর আমি শতশত প্রশংসা করি। ঐ ১৯৫৮ সালেই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি থেকে 'ঝাঁপতাল' বেরোল, একজন বঞ্চিত মেয়ের জীবনে জয়ী হবার গল্প। কিসে যেন ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল ভুলে গেছি। বই হয়ে বেরুতেই জনপ্রিয় হয়েছিল। পরের বছর আরেকটি বড়দের ছোট গল্প সংগ্রহ 'লাল নীল দেশলাই' প্রকাশ করলেন 'আর্ট ইউনিয়ন' বলে এক অল্পায়ু সংস্থা। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীকে বইখানি উৎসর্গ করেছিলাম। বড় খুশি হয়েছিলেন। একজন নির্যাতিত নারীর পুনর্বাসনের গল্প 'নাটঘর' লিখলাম, ত্রিবেণী থেকে প্রকাশিত হল। এসব-ই বড়দের জন্য লেখা। বেতারের জন্য বেশ কয়েকটি সরস নাটক লিখেছিলাম। 'গাওনা' নাম দিয়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড বইটি প্রকাশ করলেন।

এত দিন শুধু যে বড়দের বই রচনা করেছি তা-ও নয়। বড়দের জন্য যতই লিখি, মন ততই বিষণ্ণ হয়। ও তো আমার আসল কাজ নয়। আমার আসল পাঠক যারা, তাদের বয়স ১২ থেকে ১৬ ; ক্রমে এ বিষয়ে আমি সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। সচেতনতা থেকে কাজে নামতে আমার খুব বেশী সময় লাগেনি। 'হলদে পাখির পালক' আমার এই সময়কার একটি রচনা। কোথাও ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়নি। মনের মধ্যে কেবলি ঘুরত। মনে হত দম বন্ধ হয়ে আসছে। অন্য কাজে মন দিতে পারতাম না। শেষটা এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসে লেখা হল, এ-কথা আগেও বলেছি। ফিরে গিয়ে প্রেমেনবাবুকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলাম। উনি নামটি দিলেন এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড সেই থেকে আজ ২০ বছরের বেশি ধরে অনেকগুলি মুদ্রণ করেছেন।

গল্পদাদুর আসরে সপ্তাহে একদিন জয়ন্ত গল্পটি ধারাবাহিক ভাবে পড়ত। শুনে শুনে অবাক হয়ে ভাবতাম ও যে আমার লেখাটাকে দশগুণ ভালো করে

দিচ্ছে। শ্রোতাদের কি উৎসাহ, কত চিঠি। স্বপ্নের মতো মনে হয়। এখনো মাঝে মাঝে পাঠকদের সুন্দর চিঠি পাই। মন ভরে যায়, কিন্তু কুড়ি বছর আগেকার সেই অনাবিল উচ্ছল আনন্দ কোথায় পাব ? যে যোগান দিত সেই নেই। হলদে পাখির পালকের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে লীলা পুরস্কার আর পশ্চিম বাংলা থেকে আর দিল্লী থেকে দুবার দুটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলাম। তার চেয়ে ঐ আনন্দটির মূল্য ঢের বেশী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড আমার কথায় আমাদের প্রিয় বন্ধু প্রশান্ত রায়কে দিয়ে ৫টি ওয়াশ্ প্রথার ছবি আঁকিয়ে বইয়ের যে রূপ দিলেন তার তুলনা হয় না। হলদে পাখির পালকের কথা আগেও বলেছি। আমার বড় প্রিয় গল্প, তাই বার বার বলতে ইচ্ছা করে।

সেটা ছিল ১৯৫৯-৬০। 'বাঘের চোখ' বলে ছোটদের একটা গল্প সংগ্রহ বেরিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, তার একটিও কপি পাচ্ছি না। গল্পগুলি এশিয়া প্রকাশিত আমার রচনাবলীতে ছড়িয়ে আছে। নিজেই তাদের চিনতে পারি না। ঐ বছরেই 'গুপির গুপ্ত খাতা' বলে আমার একটা দুঃসাহসিক অভিযানের সরস গল্প ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড বই করে বের করলেন। তার ছবিও প্রশান্ত আঁকল। এই সংস্করণটি এখন দুষ্প্রাপ্য। নতুন সংস্করণ অন্য ছবি দিয়ে এশিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটি এর কিছুদিন আগে রংমশালে 'ভয় যাদের পিছু নিয়েছে' নামে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়ে ছিল। বকধার্মিক ঐ পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পরে হীরের প্রজাপতি নামে শান্তি চৌধুরী ছবি করে ১ম পুরস্কার পেয়েছিল। তবে খানিকটা বদলে দিয়েছিল। এ দুটিই একটু চাঞ্চল্যকর মজার গল্প।

এই রকম কাজকর্মের আবর্তের মাঝখানে ১৯৫৮, ৫৯, ৬০ কেটে গেল। বয়স হল ৫২। তাও টের পেলাম না। বাড়িতেও কাজকর্মের অন্ত ছিল না। ততদিনে আমার সেই ভাগ্নী আর তার তিন মেয়ে স্বাধীন ও সুষ্ঠু জীবন যাপন করছিল। আমার মেয়ের বিয়ের পর সেও তার তেল কর্মী স্বামীর সঙ্গে জামসেদপুরের একটি ছোট এবং সুন্দর ফ্ল্যাটে নিজের ঘরকন্না দক্ষভাবে পরিচালনা করছিল। সেখানে দু-চার দিনের জন্যে যাওয়া আমাদের এবং মেয়ের শ্বশুর শাশুড়ির পক্ষে অতিশয় আনন্দের ব্যাপার ছিল। ফ্রক্ পরা অবস্থা থেকে বেয়ানকে চিনতাম। তার নাম মণিমালা। আমার চেয়ে ৫½ বছরের ছোট, সুন্দর মিষ্টি মানুষটি। তাই বলে মিন্‌মিনে স্বভাবের নয়। মাঝে মাঝে তেজও দেখাতে পারত। তাদের আমরা বড়ই ভালোবাসি। বালিগঞ্জ পার্কের ভাড়া বাড়িতে থেকে, কাছেই তাঁদের নিজেদের বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে দেখতে যেতাম। অবনীন্দ্রনাথের ছোট বোন সুনয়নীদেবী মণিমালার শাশুড়ি।

তখন অনেক বয়স হয়েছে, শরীরটা কিছু ভেঙেছে। যতই দেখতাম ততই আশ্চর্য হতাম। ছোট্ট খাট্টো মানুষটি, চোখমুখ ঝকঝক করত। ওদের সঙ্গেই থাকতে ভালোবাসতেন। এক দিন দেখি চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে কেবলি ডান হাতটা কব্জি থেকে নাড়ছেন। ভারি কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করাতে, চোখ খুলে, হেসে বললেন, 'মনে মনে ছবি আঁকছি। হাত তো আর তুলি ধরতে পারে না।'

মনে আছে বুকের মধ্যে ধুক্ করে উঠেছিল। সত্যিই তাই। মানব জীবনের সব কীর্তিই তৈরি হয় মনের মধ্যে। তারপর তাকে শাবল দিয়ে খুপরি দিয়ে হাতুড়ি-বাটালি-ছেনি দিয়ে, ওলন দিয়ে দোলন দিয়ে, মাপকাঠি দিয়ে, হাত দিয়ে, পা দিয়ে, চোখ-কান দিয়ে, গলা দিয়ে, যেখানে যার স্থান সেখানে নামানো হয়। কিন্তু তৈরি হয় সব একই জায়গায়, মানুষের মনে। সব বিজ্ঞান, সব জ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য দর্শন। সেইখানে জন্ম নেয়। আর আমরা তারি সব চেয়ে অযত্ন অবহেলা করি।

এমনি করে ১৯৬১ সাল এসেছিল। ঐ সময় আমার প্রধান চাকরি-স্থল বদলাবার কথাও অনেক বলেছি। আর নয়। তাছাড়া তার চেয়েও বড় ঘটনা আমার জীবনে ঘটল। দুই নাতনির জন্ম অবশ্য খুবই বড় ঘটনা। কারণ তারা একেকজন উদয় হয়ে আমার বয়সটাকে দশ বছর করে কমিয়ে দিল। পরে ছেলের ঘরে যখন দুই নাতি উপস্থিত হল, তখন বয়সটা আরো এত বেশী কমে গেল যে প্রায় অপোগণ্ড হয়ে গেছি। সমবয়সীদের ধরে ফেলবার আর সময় নেই। অন্য বড় ঘটনাটি হল আমার বড়দা সুকুমার রায়ের ছেলে সত্যজিৎ 'সন্দেশ' পত্রিকাকে পুনর্জীবিত করল। একরকম একলা, সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে। এবং আমরা বড়রা যারা ছিলাম, তাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে। একটুও যে দুঃখ হয়নি, তা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। কিন্তু কাজটা এতই ভালো যে আনন্দ হয়েছিল তার শতগুণ বেশী।

সেই ইস্তক সব সময় মনের সব চেয়ে অন্তর কথাগুলো বলবার সুন্দর একটা জায়গা পেয়েছি। জায়গা না বলে ধারা বললে ভালো হয়। এমন প্রাণবন্ত গতিশীল কিছুকে মাটির সঙ্গে তুলনা করলে মন ওঠে না। কিন্তু আমাদের সন্দেশের মূলের নিচে যদি তাকে স্থিতি দেবার জন্য মাটি থাকে, তার স্রোত কখনো বিভ্রান্ত হবে না। এই সব ভাবি মাঝে মাঝে, বলবার লোক পাই না। আমার মেজ-জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর যেদিন প্রথম বর্ষের সন্দেশের প্রথম সংখ্যাটি ৫ বছরের আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন, উপস্থিত সকলের আনন্দ দেখে আমিও বেজায় খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ঐখানেই যে আমার প্রাণের পথ এবং পাথেয় পেয়ে গেলাম তা বুঝিনি।

একদিক থেকে বলা যায় আমার এবং আমার জ্যাঠতুতো, পিসতুতো

ভাইবোনদের আর তাদের বংশধরদের চিন্তাধারার ধাতা ছিল সন্দেশ। নিজেদের অজ্ঞাতসারে একটা বলিষ্ঠ, সরস সততা আমাদের মনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছিল। তাতে কয়েকটা বংশগত গুণ ফুটবার সুবিধা হয়েছিল। শিখবার, আঁকবার, সঙ্গীত সাধনার, বিজ্ঞানচর্চার নানা গুণ নানা জনের মধ্যে অল্পবিস্তর ভাবে দেখতে পাই। আর উপেন্দ্রকিশোরের মতো সুকুমার সুবিনয়ের এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাবে সত্যজিতের মধ্যে এর অনেকগুলি গুণের একসঙ্গে সমাহার হয়েছে। এসব প্রকৃতিদত্ত জিনিস নিয়ে বড়াই করতে হয় না, কিন্তু ঋণকে সর্বদা স্বীকৃতি দিতে হয় এবং যে গুণই হক, তার সাধনা করতে হয়। সত্যজিৎ খুব সহজে এত সাফল্য পায়নি। এর প্রতিটি কণার জন্য সারা জীবন ধরে তাকে সাধনা করতে হয়েছে। এর পর কি হবে তা জানি না। কিন্তু সন্দেশকে যদি উপযুক্ত প্রাণশক্তি দিতে আমরা না পেরে থাকি, তাহলে সেইখানে আমাদের বিফলতা। কম সময় তো পাইনি।

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে 'সন্দেশ' প্রাতিষ্ঠা করে, তার দু-বছর পরে বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনের হাতে সব কিছু ফেলে উপেন্দ্রকিশোর চলে গেছিলেন। সুকুমারের বয়স তখন ২৭—২৮। তার ৮ বছর পরেই তিনিও স্বর্গে গেলেন। তার আগের বছর তাঁরই (বলা যায়) প্ররোচনায় আমার প্রথম গল্প লেখা ও পত্রিকায় ছাপা হল। সে গল্প আমার কোনো সংগ্রহে দিইনি। লেখা খুব খারাপ হলে বড়দা কখনোই ছাপতেন না। কিন্তু ঐ গল্পে এক মৎলবী ভাগ্নে তার মামার ভালোমানুষটির সুবিধা নিয়ে নিজে কিছু লাভ করেছিল। কোনো রকম সাজাও পায়নি। ও আমার পছন্দ নয়। লাভ হোক সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটা একটু জব্দ হলে খুশি হতাম। বড়দার মৃত্যুর অল্প দিন পরে সন্দেশ বন্ধ হল। ইউ রায় এণ্ড সন্স উঠে গেল। কয়েক বছর পরে আমি যখন কলেজে পড়ি তখন আমার মণি দা, অর্থাৎ সুকুমারের মেজো ভাই সুবিনয়ের সম্পাদনায় বছর তিনেক সন্দেশ পত্রিকা বেরিয়ে ছিল। ১৯৩১ সালে একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছিল। মণিদা আমার কাছ থেকে প্রতি মাসে একটি করে গল্প না নিয়ে ছাড়তেন না। তার প্রথম গল্প 'দিন দুপুরে'। ঐ যে একটা পথ পেয়ে গেলাম, আর ছাড়লাম না। সন্দেশ উঠে গেলে মৌচাক, রামধনু, রংমশালের নিয়মিত লেখক হয়ে গেলাম। ১৯৫৬ সাল থেকে বেতারের ছোটদের অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে হাতটা আরো জোরালো হতে থাকল। কিন্তু মনের মতো পত্রিকা আর একটিও পেলাম না।

সুকুমারের স্ত্রী, আমার বড়বৌদি সুপ্রভা (তাঁর ডাক নাম ছিল টুলু) অসাধারণ মেয়ে ছিলেন। ২৯ বছর বয়সে বিধবা হয়ে অবধি সারা জীবন কত যে কাজ করেছিলেন তার ঠিক নেই। তাঁর কথা আগেও বলেছি। ৭০ বছর বয়সে

হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। শুনেছি কোনো সময়ে তিনি মানিককে বলে ছিলেন সন্দেশ পত্রিকা আবার বেরোলে তিনি খুশি হতেন। ১৯৬১ সালে ৩০ বছরের ব্যবধানের পর, মানিকের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো অপূর্ব চেহারা নিয়ে আবার সন্দেশ বেরোল এবং সেই ইস্তক আজ ২২ বছর ধরে নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে। তার প্রধান কারণ অবশ্য মানিকের আর নলিনী দাশের অক্লান্ত সহায়তা। নিজের টাকা দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে পত্রিকাটিকে মানিক প্রতিষ্ঠা করল। প্রথম সম্পাদক হলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর নামের আর সাহায্যের গুণে সন্দেশের একটা প্রতিষ্ঠা হল। পরে পত্রিকা পরিচালনার নানা অসুবিধার কারণে সুকুমার সমবায় সমিতি বিধিমতে অনুষ্ঠিত হল এবং আজ পর্যন্ত তাঁরাই কাগজ চালিয়ে আসছেন। আমাদের তিনজন সম্পাদক। তার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা আমি ; তারপর উপেন্দ্রকিশোরের মেজো মেয়ে পুণ্যলতার মেয়ে নলিনী দাশ, সবার ছোট সত্যজিৎ। তারো ৬২ বছর বয়স হল। ১৯৮১ সালে সন্দেশের কুড়ি বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষ্যে গত কুড়ি বছরের সন্দেশ থেকে বাছাই করা লেখা দিয়ে 'সেরা সন্দেশ' বেরুল। সম্পাদক সত্যজিৎ। সে-ই সমস্ত নতুন ছবি এঁকে দিল। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশক। আমরা আরো পাঁচজনাও আপ্রাণ খেটেছি।

সারা জীবন ধরে যত রকম কাজ করেছি, তার মধ্যে সন্দেশের কাজ সবচেয়ে আনন্দদায়ক। যত সম্মান পেয়েছি, সন্দেশের সম্পাদক হবার কাছে তার কিছুই লাগে না। আমি ভালো করেই জানি যে জ্যাঠামশাই কিম্বা বড়দার কাজের তুলনায় আমাদের চেষ্টাগুলো কিছুই নয়। তবু এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও আনন্দ। এখন শান্তিনিকেতনে থাকি, কার্যালয়ের দৈনন্দিন কাজে অংশ নিতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সরে দাঁড়ানো উচিত। আবার ভাবি তাহলে আমি কি নিয়ে থাকব ?

মোট কথা ১৯৬১ থেকে আমার অধিকাংশ ছোটদের ছোট গল্প প্রথমে সন্দেশে বেরিয়েছে আর যদ্দুর মনে হয় পক্ষিরাজে প্রকাশিত 'ময়না-শালিখ' আর, রোশনাইতে নাকুগামা ছাড়া সব উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে সন্দেশে বেরিয়েছে। এইভাবে একে একে টংলিং, মাকু, নেপোর বই, বাতাস-বাড়ি, হাওয়ার-দাঁড়ি, হট্টমালার দেশে (প্রেমেনবাবুর সঙ্গে লেখা), লংকাদহন নাটক, ভূতোর ডাইরি ইত্যাদি সব গল্পই সন্দেশের পাতায় প্রথম ছাড়া পেয়েছিল। অবিশ্যি শুভমের নতুন পত্রিকা 'সবজান্তা মজারু'-তে এখন আমার 'জল-মানু' বেরোচ্ছে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের শত বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ত্রিবেণী থেকে ছোটদের জন্য কবির জীবনের গল্প 'এই যা দেখা' লিখেছিলাম। সরকারী অনুরোধে লেখা

শুরু করে, ভুল বোঝার ফলে কানাই সরকারকে পাণ্ডুলিপিটি দিয়েছিলাম। ঐ বছর দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমির অনুরোধে ১৬ পৃষ্ঠায় অতি সংক্ষেপে 'কবি-কথা' লিখেছিলাম। তার নব নব মুদ্রণ এখনো চলেছে।

এত কথা উঠল আমার ঐ সাতটি কেজো বছরের সাহিত্যকীর্তি প্রসঙ্গে। লেখাই ছিল আমার বাড়ির কাজ। আমাদের গুছনো সংসারে সব কিছু ছিল সময় ধরা। ফলে হাতে যথেষ্ট অবসর থাকত। সে সময়টা লেখা-পড়ায় ভর' থাকত। মৌলিক লেখা ছাড়াও খান কতক বিখ্যাত বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেছি। তবে তার বেশির ভাগই বেতার ছাড়ার পর। এরি মধ্যে কোনো সময়ে, সাল তারিখ কিছুই মনে নেই, সাহিত্য আকাদেমির সাধারণ সদস্যরূপে মনোনীত হয়েছিলাম। মাঝে মাঝে দিল্লী যেতে হত। বহু লেখক, প্রকাশক, শিক্ষাবিৎ, সম্পাদকের সঙ্গে চেনাজানা হবার সুযোগ পেলাম। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনি ছিলেন আকাদেমির অধ্যক্ষ। সকলের সঙ্গে তাঁর সমান ভালো ব্যবহার। আমার সঙ্গে বহুদিনের আলাপ, যদিও খুব ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়নি। আকাদেমির খরচের তুলনায়, কার্যকরী দিকের সমালোচনা শোনা যায়। আমি শুধু একটি কথাই বলব, আকাদেমি সর্বদা চেষ্টা করেন যাতে ভারতের সব রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা পরস্পরের কাছে পরিচিত হয়। অনেক দেশী ও বিদেশী বই-ও একেবারে ১৩-১৪টি ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হত। আমি জনাথান সুইফ্‌টের একটি বিখ্যাত ইংরিজি মূল বইয়ের আগাগোড়া বাংলা করে দিয়েছিলাম। তার নাম গালিভারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। চার খণ্ডে লেখা ঐ ইংরিজি বইটির সবটা পড়ার সুযোগ সকলের হয় না। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল এমন সরস সার্থক বই পৃথিবীতে কম আছে। ইংরেজ পণ্ডিতরা কাব্যকে বলেছেন—জীবনের উপর মন্তব্য। এ বই-ও তাই। অথচ এক নাবিকের দুঃসাহসিক অভিযানের আকারে গল্পটি রচিত রসে ভরপুর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বইয়ের একটি। পড়ে যত আনন্দ পেয়েছি, অনুবাদ করতেও ততই। কিন্তু বড় বেশি পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই হলে ১৪টি ভাষায় অনুবাদ করা গেলেও, ক্রেতা পাওয়া যায় না।

১৯৬১ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড 'টাকা-গাছ' প্রকাশ করলেন। জয়ন্ত চৌধুরী আর আমি যুগ্মভাবে গল্প দাদুর আসরের জন্য পালা করে ওর একেকটি অধ্যায় লিখেছিলাম। জয়ন্ত পড়েছিল। জয়ন্তর গল্প পড়া যারা শোনেনি, তাদের কাছে আর কি বলব। একমাত্র আমার ছাত্রীজীবনে শোনা অধ্যাপক প্রফুল্ল ঘোষের শেক্সপীয়র পড়ার সঙ্গে ওর তুলনা হয়। প্রফুল্ল ঘোষের মৃত্যুর পর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকায় লিখেছিলাম যে আমাদের চোখের সামনে আমাদের গলা-বন্ধ কোট আর ধুতি পরা পুরুষ্টু প্রফেসারটি সুন্দরী ডেস্‌ডিমোনা হয়ে যেতেন, যাকে দেখলেই না পাওয়ার বেদনায় বিধুর হতে হয়। আদর্শবাদের

গল্প, কিন্তু বাস্তব ভিত্তিক, সমবেদনায় ভরপুর সরস। এ বই ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রকাশ করেছিলেন সুন্দর ছবি দিয়ে, প্রায় নির্ভুল ছাপা। ওঁদের সব বই-ই যেমন হত। দুঃখের বিষয়, জয়ন্তর জীবনকালে ওর আর দ্বিতীয় মুদ্রণ হয়নি ; এখন আবার ছাপার কথা হচ্ছে।

১৯৬২ সাল যে কোথা দিয়ে কি ভাবে কেটে গেছিল, কিছুতেই মনে করতে পারি না। মনে হয় ঐ সময় আমাদের চীনে আক্রমণের লজ্জাস্কর অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল। আমি অবিশ্যি মনে করি তাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়েছিল, কারণ বেশ কিছু শিক্ষা হয়েছিল। সে যাইহোক, ঐ বছর আমার কোনো বই বেরোয়নি। বেতারে নানা রকম চাঞ্চল্যকর সংবাদ ঘোষিত হত, হাঁ করে শুনতাম। কিছুদূর অনুপ্রবেশ করে, তারা নিজের থেকেই ফিরে গেছিল। সে-ও আরেক রহস্য।

সে যাইহোক ৬২-র পর ৬৩ এল। উপেন্দ্রকিশোরের শতবর্ষ পূর্তির বছর। জ্যাঠামশায়ের চিন্তাধারা দ্বারা যতই না প্রভাবিত হই, আমার সেই পাঁচ বছর বয়সের পর তাঁকে আর দেখিনি। তবু তিনি আমার জীবনের একটি জলজ্যান্ত নেতা। তার একটা কারণ হল আমার মা-কে তিনি মানুষ করেছিলেন। তাঁর কথা উঠলেই মায়ের মুখ স্নিগ্ধ মধুর হয়ে উঠত। কত যে ছোট ছোট ঘটনা তাঁর কাছে শুনেছি, তাতে জ্যাঠামশায়ের মূর্তিটি আমার মনের মধ্যে চলমান শক্তির মতো আজ-ও কাজ করে। মেজোমেয়ে পুণ্যলতার লেখা অপূর্ব বই 'ছেলেবেলার দিনগুলি'র প্রতিটি অক্ষর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে ছিল। সেই অসাধারণ পুরুষের বাস্তব সান্নিধ্য যে কত কম পেয়েছিলাম, তা আমি টের পাইনি। শতবর্ষ উৎসবের জন্য একটি কমিটি করা হল। কমিটির সিদ্ধান্ত হল আমি তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে দিই, ছোটদের উপযুক্ত করে।

কৃতার্থ হয়ে গেছিলাম। মায়ের কাছে শোনা সেই সব অবিস্মরণীয় ঘটনা আর বর্ণনা নিজের ছোটবেলা থেকে যে সব কথা মনে জমা ছিল, মেজদির বই পড়ে যা শিখেছিলাম, এই সবের সঙ্গে আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সমস্ত নিয়ে ছোট বই 'উপেন্দ্রকিশোর' বেরুল। তার-ও বেশ কিছু মুদ্রণ হয়েছে। নিউ স্ক্রিপ্টের প্রকাশনা। নিউ স্ক্রিপ্টের কর্মকর্তা হলেন অশোকানন্দ দাশ, পুণ্যলতার জামাই এবং জীবনানন্দের ছোট ভাই। এখনো ৮২ বছর বয়সে সমানে খেটে যাচ্ছেন।

কোন সময় যে প্রথম চিল্‌ড্রেন্স বুক ট্রাস্টের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম তা মনে পড়ে না। হয় তো যখন সেন্ট্রাল অ্যাডভাইজরি বোর্ড অফ এডুকেশনের সদস্য ছিলাম, তখন ঐ সংস্থার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। ছোটদের নিয়ে কারবার, তক্ষুণি আকৃষ্ট হলাম। তাছাড়া সংস্থার প্রাণপুরুষ শংকর পিল্লেইকে একবার

দেখলে ভোলা যায় না। শংকরস উইকলি বলে প্রধানতঃ রাজনীতি বিষয়ক ব্যঙ্গপত্রিকার মালিক, সম্পাদক, শিল্পী শংকরকে চেনে না এমন কেউ ছিল না। আমিও ছবিগুলো দেখে চমকে যেতাম। কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কি হাতের টান! তখনো মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখিনি। যেই দেখলাম, মুগ্ধ হলাম।

লোকটির একটু বর্ণনা দিই। রোগা, লম্বা, কালো, কালো রঙের জোব্বা টাইপের কি একটা পরনে স্রেফ একটি চতুর দাঁড় কাগের মতো দেখায়। মুখের দিকে তাকালে সরসতার ঝকমকে স্রোতে ভেসে যেতে হয়। এমন মানুষ খুব কম দেখেছি। কতবার যে আমাকে বলেছেন ওঁর সংস্থায় যোগ দিতে। তা কি করে সম্ভব হয়? আমি দিল্লী যাব না। তা ছাড়া উনি চান চারদিকে রাশি রাশি গুণী সংগ্রহ করবেন, কিন্তু আশা করেন সব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সকলের মতে মিলবে! আমি আবার অন্য লোকের মতকে শ্রদ্ধা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু সব সময় মেনে চলতে রাজি নই। তাই আমার ঐ পছন্দের মানুষটির সঙ্গে যে কাজ করার সুযোগ পাই না, তার জন্য যেমনি আক্ষেপ করি, তেমনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! আমার তিনখানি ইংরিজি বই ওঁরা প্রকাশ করেছেন :—টাইগার টেল্‌স, তার বাংলাও করে দিয়েছি 'বাঘের বই' নামে, রিপ দি লেপার্ড আর দি হাউস বাই দি উড। সত্যি বলব শংকর পিল্লেই-এর দেখা পেয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি, তাঁর স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। দুজনেই ছোটদের কাজে রত, একই আদর্শ নিয়ে চলি। উনি কিছু বড় মাপে; আমি নিজের সাধ্যমতো।

১৯৬৩ সালে আমাদের ছেলে বিলেত থেকে ফিরে এল। এখান থেকে এম বি বি-এস্, বি ডি-এস্ করে, গাইজ্ হস্পিটাল থেকে প্র্যাক্‌টিকেল ট্রেনিং নিয়ে এল। কলকাতাতেই প্রাইভেট্ প্র্যাকটিসের সিদ্ধান্ত নিল। এই একটা খবর। আর জুন মাসে আমি আমার কনট্রাক্ট শেষ না করেই বেতারের কাজ ছেড়ে দিলাম। ঐ আরেকটা খবর। আরো আগেই ছাড়া উচিত ছিল। কেমন যেন আনন্দের স্রোতটা শুকিয়ে গেছিল। সাহিত্যিক অনুষ্ঠানগুলোতে মন উঠত না। নতুন স্টেশন ডিরেক্টর বড়ই মেজাজি লোক। বন্ধুরা অনেকেই চলে গেছেন। জয়ন্তও আমেরিকায়। বাতাস অন্য রকম। মাঝে মাঝে গুণী লোকেদের সঙ্গেও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। মনে মনে ভাবতাম আমার সঙ্গে ওর শতাংশ করলেও পাকা ফলটির মতো টুপ করে ঝরে পড়ব। আমার স্নেহভাজন প্রোগ্রাম একজেকিউটিভ সুকুমার রায়কে তাই বলতামও। ও ভাবত রগড করছি।

ছাড়লাম অতি তুচ্ছ কারণে। একটি ইংরিজি অনুষ্ঠানের রেকর্ড করা মালমশলা আমার কাছে পাঠিয়ে বড়সায়েব বললেন, সংলাপ দিয়ে জুড়ে এটিকে সম্পূর্ণ করতে হবে। সংলাপও লেখা ছিল। রেকর্ড করিয়ে নিতে হবে।

বিষয়বস্তু কয়লার খনি, নাম 'কালো হীরে' । এ-রকম পরের কাজ শেষ করতে আমার ভালো লাগে না । তবু বার বার বলাতে কোনো রকমে করলাম । সত্যিই ভালো হয়নি । তবে তার দায়িত্বটি একা আমার ছিল না । হয়তো সবটা নতুন করে রেকর্ড করা উচিত ছিল ; সহকারীদের উপরে অতটা নির্ভর করা উচিত ছিল না । সে যাইহোক, বড় সায়েবের মেজাজ দেখে আমারো গা জ্বলে গেল । তাঁকে কিছু স্পষ্ট কথা বলে, সেই যে বাড়ি গেলাম, আর আপিসের কাজে হাত দিলাম না । পরে শুধু একবার গিয়ে রেজিগ্নেশনটা দিয়ে এলাম । অন্যায় কথা বলব না, বড়সায়েব আমাদের বাড়ি এসে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন । দিল্লি থেকে ডিরেক্টর জেনারেল এসে অনুরোধ করেছিলেন ত্যাগপত্র তুলে নিতে । আমি রাজি হইনি । আসলে নিজেরই অজান্তে আমি ছেড়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে ছিলাম । কারণটা খুবই অযোগ্য । এর চেয়ে ঢের বেশি আপত্তিকর কথা এর আগেও শুনেছি এবং উৎসাহের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমে পড়েছি, কাজ ছাড়ার কথা ভাবিওনি । সে তো পরাজয় স্বীকার । এ এস ডি সুদেব বসুর সঙ্গে প্রায়ই আমার চটাচটি হত, তারপর মিটেও যেত । এবারকার কারণটা উপলক্ষ্য মাত্র, এ-কথা নিজেও বুঝেছিলাম । কিন্তু এক দিনের জন্যেও ফিরে যেতে ইচ্ছা করেনি । ৭ বছরের মোহ এক নিমেষে কেটে গেছিল । এখনো মনে করি রেডিওর কাজ কম বয়সীদের জন্যও । বয়স্ক প্রতিষ্ঠিত লোকদের মাঝে-মধ্যে এবং যথা সম্ভব বেশি ফী নিয়ে, বাইরে থেকে এসে পছন্দমতো প্রোগ্রাম করে বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত । যেমন আমি গত ২০ বছর ধরে করেছি । এখন তাও ইচ্ছা করে না ।

তবে ৭ বছরের অভ্যাস তো আর এক দিনে যাবার নয় । দিনগুলো ফাঁকা ফাঁকা ঠেকত । সারাদিন বেতার আপিসে কাজে ব্যস্ত থেকে, বাড়ি গিয়ে সন্ধ্যার পর থেকে রাত এগারোটা অবধি লিখতাম আর সকাল ৫½ টা অবধি এক টানা ঘুমোতাম । অনেক সময় বিকেল ৫টা থেকে ৬টা একটু বিশ্রাম করে নিতাম । রেডিও ছেড়ে, আবার দুপুরে ১½টা থেকে ৩½টা বই নিয়ে শোয়া ধরলাম । ফলে রাত দুটো অবধি চোখে ঘুম আসত না ! সব তো আর হয় না । সব জিনিসের দাম দিতে হয় । এখনো আমার রাতে ভালো ঘুম হয় না ।

ঐ বছর সঙ্গীত নাটক আকাদেমি আমার বক-বধ-পালা নাটকের জন্য আমাকে পুরস্কৃত করলেন । দিল্লী গিয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণানের হাত থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করলাম । সে বছর আমার প্রিয় মানুষ সবিতাব্রত দত্ত, তিমিরবরণ এবং আরো কেউ কেউ পুরস্কার পেয়েছিলেন । বেতারের গণ্যমান্য অনেকে সভায় উপস্থিত ছিলেন । মনে হল আমি তাঁদের ছেড়ে গেছি বলে, তাঁদের কাছে আরো আদরণীয়া হয়েছি । তবে ভুল বুঝে থাকতে পারি ।

॥ ১৫ ॥

১৯৬৩ সালে আমার বয়স ছিল ৫৫। সেকালের ঐ বয়সে লোককে অকেজো মনে করে চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হত। অথচ আমার মনে হয় অধিকাংশ কাজের মানুষদের কর্মক্ষমতার ঐ সময়েই হয় চরম বিকাশ, শরীরে সাধারণত এত আগে বার্ধক্য বাসা বাঁধে না ; অথচ যৌবনের অনিশ্চয়তা থিতিয়ে পড়ে ; অভিজ্ঞতা যথেষ্ট পরিমাণে অর্জন হয়, সুবুদ্ধির বিকাশ দেখা যায় ; মনটা স্বাভাবিক ভাবে সদয় ও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। এ সব গুণের জন্যে শারীরিক শক্তির হ্রাস অনেকখানি মিটে যায়। তাছাড়া, শিক্ষিত মানুষের বাহুবলের চেয়েও মনোবল, বুদ্ধিবলই সাধারণত বেশি কাজে লাগে। আর ঠিক তখনই তাদের বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। এ কথা যতই মনে হত, ততই আশ্চর্য লাগত।

সৃজনশীল কাজেও ঐ নিয়মই খাটা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয়, অনেক সময় কম বয়সে অনেক গুণী সাংসারিক তাড়নায় নিজেদের একেবারে উজাড় করে দেউলে হয়ে যান। হাত থেকে যখন শ্রেষ্ঠ কাজ বেরোবার কথা, হাত তখন ক্লান্ত হয়ে এসেছে। আমার বেলায় এর উল্টোটি হয়েছিল। বহু বছর নানা কাজে নিজেকে নিবিষ্ট করে রেখেছিলাম, সাহিত্যরচনা ছিল শখের ব্যাপার। তাকে ভালো করে রাখতেও পারতাম না, ছাড়তেও পারতাম না। অবনীন্দ্রনাথ মনের পুঁজির কথা বলতেন। আমিও ছোটবেলা থেকে আমার সব গভীর অনুভূতিগুলোকে মনের মধ্যে জমা করে রেখেছি। এখন পর্যন্ত চোখ বুজলেই ছোটবেলাকার সেই নীল আকাশের বুকে গাঢ় সবুজ পাহাড়ের সারি, সরল গাছের ঝুলো পাতার ফাঁকে বাতাস বওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দ দেখতে পাই, শুনতে পাই। নাকে আসে ধূপ কাঠের ধুনো-ধুনো গন্ধ। ছোট ছোট দৃশ্য, ছোট ছোট কথা হয়তো ষাট-সত্তর বছর কানে লেগে আছে। শিলং-এর সেরেস্তার এক দপ্তুরি নাকি ধর্মভাবাপন্ন হয়ে ব্রাহ্ম হয়েছিল। তার একটি মা-মরা ছোট ছেলে ছিল। তার নাম গোবিন্দ। সে তিন সাইজের বড় জামা-পাজামা পরত। তার চোখে বিশ্বের সমস্ত বিষাদ মাখানো ছিল। একবার কি কাজে ভুল করেছিল বলে ঝিনুক দিয়ে সৎ-মা তার গাল ছিঁড়ে দিয়েছিল। আজ পর্যন্ত গোবিন্দর ছেঁড়া গাল আর সজল চোখ ভুলতে পারি না। আশা করি বিধাতা তাকে পরে আরাম দিয়েছিলেন, সুখ দিয়েছিলেন।

এত দিনে ছোটদের বড়দের জন্য অজস্র ছোট গল্প লিখেছিলাম। সেগুলি নানা বই হয়ে, নানা প্রকাশকের হাতে বেরিয়েওছিল। তাতে খুব যে একটা বড়লোক হয়ে গেছিলাম, তাও নয়। কিন্তু মনে মনে কেমন একটা আরাম পেয়েছিলাম। আগেও বলেছি ছোট গল্প মনের মাটিতে আপনি জন্মায়। বড়

জোর তাকে খানিকটা ঘষা-মাজা করা যায়। কিন্তু ভালো গল্প কোনো নির্দিষ্ট মালমশলা দিয়ে চেষ্টা-কৃত হবার নয়। আপনি হল তো হল, নইলে না লেখাই ভালো। প্রেমেনবাবু একবার কোনো নামকরা বিদেশী সাহিত্যিকের উক্তির কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে যৌবন হল ছোট গল্প লেখার বয়স। ৪৫-এর পর কেউ যেন ছোট গল্প লিখতে চেষ্টা না করে। আমার কিন্তু মনে হয় চেষ্টা করে লিখবার জিনিসই নয় ছোট গল্প। সে মাটিতে ফুলের মতো, আকাশে তারার মত ফোটে। তার বয়স ধরে দিলে মুশকিল। আমার খুব অসুবিধা হবে। আমি এখনো সারা বছরে বেশ কিছু ছোট গল্প লিখি। নিয়ম করেছি প্রতি পুজোয় ১০টা ছোট গল্প লিখব। তার বেশি লিখতে গেলে কষ্ট-কল্পিত হবে। মাঝে মধ্যে অনুরোধে পড়ে, তাও লিখেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস। পূজা সংখ্যায় উপন্যাস কখনো লিখি না।

উপন্যাস বরং অনেক দিন ধরে, ভেবে চিন্তে, মাল-সামগ্রী সংগ্রহ করে গড়ে তোলা যায়। তবে অনেক সময় উপন্যাসের মূল বক্তব্যটিও বিদ্যুতের মতো মনের মধ্যে ঝলসে ওঠে। হয়তো লেখা হয় অনেক পরে।

১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এর মধ্যে লেখা আমার প্রকাশিত বইয়ের কথা ভাবতে চেষ্টা করি। মনে আছে ঐ সময়ের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সে বছরের লীলা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। অবনীন্দ্রনাথের লেখা ও ছবির বিষয়ে। তিনটি বক্তৃতা। আশুতোষ বিল্ডিং-এর যে ঘরটিকে আমরা লাইব্রেরি বলতাম, সেই ঘরে। বোধ হয় শ্রীপ্রমথ বিশী সভাপতিত্ব করেছিলেন। ঘরে যত লোক ধরে, তার অর্ধেক হয়েছিল। প্রিয় বন্ধু শিল্পী প্রশান্ত রায় এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথ যখন মূল বাগেশ্বরী বক্তৃতা দিতেন, তখন আরো কম শ্রোতা উপস্থিত থাকত। ঐ বক্তৃতার সঙ্গে কিছু সংযোজন করে দেবার পর, বিশ্বভারতী থেকে বক্তৃতাগুলি বই হয়ে প্রকাশ পায়। কোন বছরে এসব হয়েছিল মনে নেই।

এর কিছুদিন পরে হয়তো ১৯৬৭ সালে ঐ একই জায়গায় শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা দিয়েছিলাম সুকুমার রায়ের সাহিত্য রচনা বিষয়ে। এ বই প্রকাশ করেছিলেন মিত্র ঘোষ। পরে আমার রচনাবলীর ৩য় খণ্ডে সম্বলিত হয়েছে। আরো অনেক তথ্য দেওয়া উচিত ছিল বলে মন খুঁৎ-খুঁৎ করে। কোনো সময়ে ওটির পুনর্লিখন করার ইচ্ছা আছে। বই করার সময়ে তথ্যের অপ্রাচুর্যের জন্য প্রকাশকরা সুকুমারের রচনা থেকে রাশি রাশি অপূর্ব উদাহরণ জুড়ে দিয়েছেন। তাতে আমার সাহিত্য খ্যাতি একটুও বাড়েনি। মনে হয় ৪৫ মিনিট ব্যাপী তিনটি বক্তৃতা দিয়ে ঐ মানুষটির প্রতি সুবিচার করা যায় না।

অবনীন্দ্রনাথের বাগেশ্বরী প্রবন্ধমালার আগাগোড়া ইংরিজি করেছি। বেশ

কিছু বছর ধরে। তবে আমার জীবনকালে প্রকাশক পাব বলে আশা করি না। এই তো গেল গভীর বিষয়ে গভীর চিন্তার কথা। এ ছাড়া গল্পের বইও কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রী প্রকাশ ভবন থেকে 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প'-এর দুটি মুদ্রণ হয়ে, মনে হয় বন্ধ হয়ে গেছে। 'বাঘের চোখ' হয়তো ১৯৫৯ সালে বেরিয়েছিল। 'গুণু পণ্ডিতের গুণপনা' ১৯৬৬ সালে। ছোট ছোট অস্থায়ী প্রকাশনালয়ের সুন্দর বই দুটি। এখন দুষ্প্রাপ্য।

ঐ বছর 'হট্টমালার দেশে' পুস্তকাকারে বেরোল। প্রেমেনবাবুর সঙ্গে যুগ্ম প্রচেষ্টা। সে এক মজার গল্প। তখন তিনি নিয়মিত প্রযোজকের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। তবে পরিদর্শক হিসাবে মাঝে মধ্যে আসেন। সন্দেশের যুগ্ম-সম্পাদক হয়েছি, কি তখনো হইনি। তা সন্দেশের জন্য একটা বড় গল্প চেয়ে বসলাম। প্রেমেনবাবু আকাশ থেকে পড়লেন, যেন এমন অবুঝের মতো কথা জন্মে শোনেননি। শেষটা বললেন, 'নতুন কিছু দিতে টিতে পারব না। তবে একটা শুরু করেছিলাম রং মশালের যুগে, তার গুটি তিন অধ্যায় হয়েছে। ঐটে নিয়ে শেষ করে নিন না। আমিও সাহয্য করব।' বলা বাহুল্য তাতেই রাজি হলাম। কপিগুলি পাঠিয়ে দিলেন। সত্যি বলব গোড়ায় খুব একটা উৎসাহী হইনি। ২০-২৫ বছর আগেকার অসমাপ্ত গল্প। তাও আবার আমাকে লিখতে হবে! কিন্তু পাণ্ডুলিপি পড়ে আমি অবাক! ওঁকে ধরলাম, 'আমি না হয় লিখছি, কিন্তু শেষটা কি হল বলে দেবেন তো?'

প্রেমেনবাবু বললেন, 'তাই যদি মনে থাকবে তবে আর আপনাকে দিয়ে লেখাবার তালে আছি কেন?' সত্যিই বলতে পারলেন না। অগত্যা ঐ গল্পের একমাত্র পরিণাম যা হতে পারে, তাই লিখে ফেললাম। উনিও খুব খুশি! ঐ বইয়ের নতুন সংস্করণ সম্প্রতি 'অন্য ধারা' নামক প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। দুই জাত চোরের গল্প। শেষটা তারা—নাঃ, থাক, রসভঙ্গ করতে নেই।

কলের পুতুল 'মাকু'র গল্প সন্দেশে ধারাবাহিক ভাবে বেরোল। পরে ১৯৬৯ সালে নিউ স্ক্রিপ্ট থেকে বই-ও হল। 'নেপোর বই'-ও সন্দেশে বেরোল ধারাবাহিক ভাবে। মিত্র ঘোষ পুস্তকাকারে ছাপলেন। বেড়ালীয় ব্যাপার। খুব রসের।

এবার হাসির কথা রাখি। ১৯৬৫ সালে আমার সবার ছোট ভাই যতিরঞ্জনের ৪৯ বছর বয়সে মৃত্যুর পর মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত লাগল। সংসারে সুখী হবার সব উপকরণ তার ছিল। রূপ, গুণ, বিদ্যা, ভালোবাসা, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। কিন্তু আসলে ও সব কিছু নয়। ১৯৫৪ সালে ওর স্ত্রী ওর প্রাণপ্রিয় ছেলে দুটিকে নিয়ে বিদেশে চলে গেল। ওর জীবনে সুখের সামগ্রী কিছু বাকি

রইল না। কাজ-কর্ম, অন্য ভালোবাসা দিয়ে সে ফাঁক ভরাবার চেষ্টাও করল না। সকলের কাছ থেকে মনটাকে সরিয়ে রাখত। বাইরে মেলামেশা, বাড়িতে লোক আসা সবই করত। প্রার্থীকে কখনো ফেরাত না। বলত দুঃখীর আবার যোগ্য-অযোগ্য কি? সামান্য কারণে বড় বেশি আহত হত। শেষটা একদিন বলেছিলাম, 'ডিভোর্স যখন হয়েই গেছে, ছেলেদের আনাবে না?' বলেছিল, 'মার কাছ থেকে ছেলে ছিনিয়ে আনার মতো নিষ্ঠুরতা হয় না।' এমনি করে দশ বছর কাটল, তারপর ১৯৬৫ সালে হৃদ্‌রোগে মারা গেল। হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ডে। দু-পাশে দু-জন দীন-দরিদ্র রুগীর মধ্যিখানে শুয়ে। তাই হয়তো সে চাইত। চোখের সামনে রাখবার জন্য ক্যাবিনে রাখেননি ডাক্তার। এই একটা আঘাত আমি কিছুতেই জয় করতে পারিনি। তার কথা মনে হলেই বুকটা আজ পর্যন্ত টন্‌টন্ করে। কত রূপ. কত গুণ, কত সাফল্য, কিন্তু ভাগ্যে সুখ ছিল না।

কষ্ট হলে কাঁদতে পারি না আমি। অন্তরের অন্তঃস্তলে কোথায় একটা ঘট রাখা আছে, সব চোখের জল সেইখানে জমা হয়। তবে ছোটবেলার স্মৃতিগুলো হঠাৎ কেমন সজাগ সচেতন হয়ে উঠল। মনে আর কিছুতেই শান্তি পাই না। সেই সময় আমার প্রিয় বন্ধু গজেন মিত্র একদিন বললেন—'যা মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলুন। আমি কথাসাহিত্যে ধারাবাহিক ভাবে ছাপি।' তাই করলাম। মনটা হাল্কা হল। পরের বছর ঐ বই রবীন্দ্র-পুরস্কার পেল। তখন আজকালের মতো আনুষ্ঠানিক ভাবে পুরস্কার দেওয়া হত না। মনে আছে তখনকার শিক্ষাবিভাগের বিশিষ্ট কর্মী আমার স্নেহভাজন অমিয় সেন, ঠিক কাগজে মোড়া এক বাক্স সন্দেশের মতো করে নোটের তোড়া বেঁধে, আমাদের চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়ে গেছিল। আজ সে-ও নেই। সে রাত্রি খুব দুঃখে কেটে ছিল। কেবল মনে পড়ছিল যতু আমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী ছিল। ১৯৬৩ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদেমি থেকে পুরস্কার নিয়ে যেদিন সকালে দিল্লি থেকে ফিরলাম, সে দিন বিকেলে কথা নেই, বার্তা নেই, আরো কয়েকটি প্রিয়জনকে জুটিয়ে এনে, যতু আমাদের নানা রকম ভালো ভালো খাবার খাইয়েছিল। ভাবি কাকে সুখ বলে, কাকে দুঃখ বলে বুঝতে পারি না। বুকের মধ্যে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকে।

ঐ টাকাগুলোও আকাদেমি পুরস্কারের টাকার মত আমাদের কলকাতার বাড়ি-তৈরির কাজে ঢেলে দিয়েছিলাম। আমার স্বামীর আপত্তিতে কান দিইনি। বাড়িটাকে অনেক যত্ন নিয়ে করেছিলাম। তবে অক্ষমতার ত্রুটি থেকে গেছে। নক্সা তৈরি থেকে, আলো-পাখা কেনা অবধি সব কিছুর ভার নিয়েছিলাম। কিন্তু সংসার করিনি ওখানে। একটা তলা মেয়েকে, একটা তলা ছেলেকে দানপত্র করে, একটা তলা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। আমরা সর্বদা চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে বাস

করেছি। সেখানে বাস করার একটা অন্য রকম ছন্দ আছে। লেখক নিরঞ্জন মজুমদারও ঐ বাড়ির অন্য একটা ফ্ল্যাটে থাকতেন। চৌরঙ্গী-জীবনের বই আছে তাঁর, যদিও তিনি নেই। তবে আমি ওখানে ছাড়া-ছাড়া ভাবে সর্বদা ক্যাম্পে বাস করার মতো থেকেছি। জায়গাটাকে কখনো অধিকার করিনি। সুখ-সুবিধাগুলো উপভোগ করেছি। হাট-বাজার, নিউমার্কেট, ব্যাঙ্ক, পোস্টাপিস, মায় ইনকাম ট্যাক্স অপিস, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, সব হাতের কাছে।

এই বাড়িতে ত্রিশ বছর ধরে কত আনন্দোৎসব, কত সাহিত্যসভা, কত কার্যকরী সভার মিটিং হয়েছে। কবি অন্নদাশঙ্কর শান্তিনিকেতনে যাবার আগে আমার ওপর পি-ই-এনের দায়িত্ব চাপিয়ে বন্ধুর কাজ করলেন। তার মিটিং হত। ছানার পুডিং খাওয়াতাম, ফ্যানি ফার্মারের রান্নার বই দেখে। নরেন দেব, (আমাদের সকলের নরেন দা) ফোন করে মনে করিয়ে দিতেন। তখনো মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষৎ হয়নি। শিক্ষা বিভাগ থেকে একটি অস্থায়ী পরিষৎ করা হল। অপূর্ব চন্দ্র, চারু ভট্টাচার্য, পুলিন সেন, মীরা দত্তগুপ্ত, সজনী দাস ও অন্তত আরো ৪০ জন পুরনো বন্ধু মিলে তর্কাতর্কি হত। মনে আছে একবার আলোচ্য বিষয় ছিল মোটার্নিটি লীভ্ কিভাবে দেওয়া হবে, শিশুর জন্মের ক-দিন আগে থেকে ক-দিন পরে অবধি। বকে বকে সবাই যখন থেমে গেছে, তখনো অপূর্ব চন্দের আর মীরা দত্তগুপ্তের প্রায় লাঠালাঠি ভাব। তখন আমি উঠে বললাম, 'আমার তো মনে হচ্ছে আলোচ্য বিষয়ে যে দুজন সদস্যের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে কম, তাঁদেরি মতামত সবচেয়ে জোরালো!' তর্ক অমনি থেমে গেল। এককে দিন ছোট কমিটির মিটিং আমাদের বাড়িতে হত। ভালোমন্দ খাওয়া হবে এই আশায় সকলে উপস্থিত হতেন। ঐ সব মিটিং ভারি আনন্দের ব্যাপার ছিল। কাজও অনেকখানি সম্পাদিত হত, একটা ঘরোয়া আবহাওয়ায়। সে সব দিন আর নেই, কাজে আনন্দ নেই; পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কে প্রীতির বদলে তিক্ততা। মিটিং করা ছেড়ে দিয়েছি। এই মন্তব্য থেকে শিশু-সাহিত্য-পরিষদকে বাদ দিচ্ছি।

বলা বাহুল্য ঐ সব ঘটনার সাল তারিখের একটা মোটামুটি ধারণা ছাড়া সব গুলিয়ে গেছে। তবে আমার বহু ভালোবাসার নরেনদা যে অনেক অনাছিষ্টির আদি কারণ, তাতে সন্দেহ নেই। যত দূর মনে পড়ে শিশু-সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে আমাকে জড়িত করার মূলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যেও নরেনদা অগ্রণী। উনি আর রাধারানী বৌদি এক সময়, যুগ্ম-সভাপতি ছিলেন। তারপর আমাকে গাছে তুলে দিয়ে মই নিয়ে সরে পড়লেন। আশাপূর্ণাও এক সময় সভানেত্রী হয়েছিল। কেউ বেশি দিন থাকেনি। টাকা-কড়ি নেই। সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে উৎসাহী যারা, তাদের তেমন প্রতিপত্তি নেই। এ সব কাজে কোনো আর্থিক বা

পারমার্থিক লাভ তো নেই-ই, শিশু-সাহিত্যের সেবা করে অবজ্ঞা অবহেলা ছাড়া কিছু পাওয়াও যায় না। এমন কি আজ থেকে অল্প কিছু দিন আগেও একজন ক্ষুব্ধ শিশু-সাহিত্যিক বন্ধু এসে বললেন চেতলায় কোনো স্কুলের উৎসবে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ অধিবেশনে অরুণবাবু বলে নাম-করা অধ্যাপক সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে অবজ্ঞার সঙ্গে বলেছিলেন, আগে কিছু হলেও, এখন শিশু-সাহিত্যে ভালো কিছু লেখা হয় না। তারপর আমার আর সত্যজিতের নাম করে বললেন, এঁরা আজকাল খুব ছড়ি ঘোরান শুনতে পাই—আমি পড়ি না অবিশ্যি ওসব—তবে কাজ কিছু হয় না ইত্যাদি।

এই রকম ধরনের কথা তাঁরাই বলেন, যাঁরা নিজেদের বিষয়টুকুর বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ। শুধু আজ নয়, যারা শিশুদের বই পড়ে না, তারা এই ধরনের মন্তব্য বরাবর করে আসছেন। সেকালে যে মৌলিক কাজ কম হত, আজকাল বাংলা শিশু সাহিত্য কত সমৃদ্ধ, কত মৌলিক, এ খবর দেশবাসীদের জানাতে হলে, একটা শিশুসাহিত্য পরিষদের দরকার আছে। এই সব মনে করে জড়িয়ে পড়লাম। সত্যি কথা বলতে কি ভালবেসেও ফেললাম। ভালোবাসা বড় জ্বালা। এখনো প্রায় ১০০ মাইল দূরে থেকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখি। কেজো অকেজো পরামর্শ দিই। নরেনদা নেই, আশাপূর্ণা দূরে থাকে, ঐ ছোট দলটি এখনো কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার, পূর্ণ চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী,উপেন মল্লিক ইত্যাদি প্রবীণরা আর একদল নবীন কর্মী পরিষদকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এদের সঙ্গে সহযোগিতা করে সন্দেশের নলিনী দাশ আর উৎসাহী "সন্দেশী"রা। আমাকে দলে টানবার আগেই আমাকে আজীবন শিশুসাহিত্য সেবার জন্য ভুবনেশ্বরী পদক দিয়ে ওরা সম্মানিত করল। পূর্ণদার অপূর্ব ডিজাইন। চারকোণা রূপোর ফলকে, সোনার পদকটি খচিত। এমন সুন্দর পদক আর আছে কি না সন্দেহ। সেই ইস্তক আমি এদের একজন হয়ে গেছি।

ক্রমে কাজের ক্ষেত্র আরেকটু বাড়ল। আগেও বলেছি দিল্লীর চিল্‌ড্রেন্স বুক ট্রাস্ট আমার টাইগার টেল্‌স্ ও ক্রমে আরো দুটি বই প্রকাশ করলেন। টাইগার টেল্‌স্-এর বাংলাও করে দিলাম। বিশাল প্রতিষ্ঠান। গোড়ায় নেহরুর সময় সরকারি অনুদানে প্রতিষ্ঠিত, এখন নিজের খরচ নিজে বহন করে। যা কিছু লাভ হবে, নিয়ম হল খরচ বাদ দিয়ে, তার সবটাই আবার ঐ প্রতিষ্ঠানেই ঢালতে হবে। দিনে দিনে প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ হচ্ছে। কয়েকটা পত্রিকা বেরোয়, লেখক-শিবির বসে, নানা রকম প্রতিযোগিতা, ছোটদের বই মেলা, আলোচনা সভা হয়। সব কিছুর কেন্দ্রে ৮০ বছরের শঙ্কর পিল্লেই। চমৎকার ছবি দিয়ে, চমৎকার সব বই। ছোটবেলায় বাবার মুখে শোনা ময়মনসিংহের নানা বাঘের

ব্যাপার, বইয়ের পাতায় জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। এই ভেবে দুঃখ হয় বাংলায় এত প্রতিভা, এত ভালো ভালো বই লেখা হয়—তা অরুণবাবু যা-ই বলুন না কেন—কিন্তু এমন চমৎকার ব্যবস্থাপনা কোথাও নেই। এখন তবু বই-মেলা হয়ে সে অভাব কিছুটা মিটেছে।

ছোটদের নাট্য পরিষৎ আছে ওখানে। তাঁরা ১৯৬৬ সালেই যতদূর মনে হয়, দিল্লীতে একটা নাটক বিষয়ে পাঠ-চক্র করলেন। কলকাতা থেকে বিমল ঘোষ (মৌমাছি), অখিল নিয়োগী আর আমি গিয়েছিলাম, আলোচনায় যোগ দিতে। কিছু বিদেশীও এসেছিলেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী মজুমদারের চেষ্টাতেই অনুষ্ঠানগুলি এত সফল হয়েছিল। কলকাতাতেও সহজেই ঐ রকম আয়োজন করা যায়। বাংলা শিশুসাহিত্যে নাটকের দিকটাই দুর্বল মনে হয়।

এর দু-এক বছরের মধ্যে হাইদ্রাবাদে শ্রীমতী লক্ষ্মীকান্তাম্মার চেষ্টায় চমৎকার এক মহিলাদের সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাণী রায়ও গিয়েছিল এবং ওর মুখে স্বরচিত কবিতা পাঠ শুনে সকলে মুগ্ধ। এক বর্ণ মানে না বুঝেও ভাষার লালিত্যে এতগুলি লোককে অভিভূত হতে দেখে আমার এক নতুন শিক্ষা হল।

তখন গরমের ছুটি। নব-নির্মিত মেয়েদের ছাত্রাবাসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। নিরামিষ খাওয়া দাওয়া। কিন্তু হস্টেলের ফিরিঙ্গি মেট্রন রোজ আমার প্লেটের পাশে একটি ঢাকা পাত্রে নিজের হাতে তৈরি আমিষ সুখাদ্য রেখে একটু হেসে বলতেন, 'খাও, ডার্লিং, নিরামিষ খেয়ে খেয়ে হাঁপিয়ে উঠবে।' মেমের কালো খাঁদা মুখটি তখন অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠত। যেখানে গেছি, বারেবারে, এই দেখে মুগ্ধ হয়েছি লোকে কত ভালো ব্যবহার করে। ঐ মানুষটিকে আর দেখিনি, কিন্তু তার স্নেহের স্পর্শটি মন থেকে মুছে যায়নি।

বাণীর বিষয়ে একটা ভাল গল্প না বললে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকে। বাণীকে আমি তার প্রথম যৌবন না বলে বরং কৈশোরের শেষ বলা উচিত, তখন থেকে চিনি। আমিও এম-এ পাশ করে এক বছর শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে, আশুতোষ কলেজের নব-প্রতিষ্ঠিত মহিলা শাখার একমাত্র মহিলা অধ্যাপক হয়ে এসেছি আর বাণীও ম্যাট্রিক পাস করে কলেজের প্রথম বর্ষে ভরতি হল। এখনো তার উজ্জ্বল সম্ভাবনায় ভরা মুখখানি আমার মানস চোখের সামনে ভেসে উঠলে, মনটা খুশিতে ভরে ওঠে। সে দিন থেকে ওকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। ওকে একবার দেখলে ভোলা যেত না। সুন্দর অসুন্দর কাকে বলে আজও বুঝতে পারি না। কিন্তু ঐ নীরস ইঁটের ঘরটাতে ও আলোর মতো জ্বলত। আরো অনেক কাজ ওর বাকি আছে মনে হয়। গল্প ওর ক্ষেত্র নয়। কিন্তু এমন বুদ্ধিদীপ্ত ন্যায়-যুক্ত সাহিত্য সমালোচনা সকলের কলম থেকে বেরোয় না। আর মনটি কাব্যে ভরা। কেন সে কাব্য উৎসারিত করে দু-হাতে দান করছে না জানি না। ও

বাণী, আমি যে কালের ঘন্টাধ্বনি শুনতে পাই। আর কত দেরি করবে?

সে যাই হক হাইদ্রাবাদে সে দিন এই দুটি মূর্তির কোনোটাই দেখিনি। তার বদলে একটা দৃঢ়চিত্ত কেজো মূর্তি দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম। হয়েছিল কি, ডেলিগেটদের ফিরতি রেজার্ভেশন করে দেবার ভার কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে নিয়েছিলেন। কোন গড়বড় হয়ে থাকবে। মোট কথা শেষ দিন সকালে যখন সকলে ফেরার চিন্তা করছে, বাণী শুনে এল কলকাতার কোনো রেজার্ভেশন নেই। আমাকে সে কথা বলতেই বললাম, 'আমি মাদ্রাজে পুরনো বন্ধু শম্ভুর কাছে দুদিন কাটিয়ে যাব। প্লেনে যাব ঐটুকু পথ, সে সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। কিন্তু তুমি কি করবে, ভাই?' বড় ভাবনা হল। ও দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'যা করে সব ক্ষেত্রে সবাই জয়যুক্ত হয়, তাই করব।' 'সেটা কি?' শুনে বাণী আশ্চর্য হল, 'ওমা! জানেন না, এসব ক্ষেত্রে অ্যাজিটেশন ছাড়া উপায় নেই। ঐ যে গোপাল রেড্ডি ইত্যাদি হোমরা চোমরারা এসেছেন। এই হল অ্যাজিটেশনের সময়।'

আমি বললাম, 'তা হলে আমি দূরের ঐ গাছতলায় দাঁড়াই। তুমি অ্যাজিটেশন করে এসো।' সেই গাছতলা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম ভিড়ের মধ্যে বাণী হাত নেড়ে অ্যাজিটেশন করছে এবং বলাবাহুল্য কিছুক্ষণ পরেই হাসিমুখে রেজার্ভেশন স্লিপ হাতে নিয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত হল!

দাক্ষিণাত্যের মেয়েদের নতুন করে চিনেছিলাম ঐ চারপাঁচ দিনে। এ দেশে যদি প্রমীলা রাজ্য থাকে, তবে সে ঐখানে। এমন দলেদলে দক্ষ, কর্মক্ষম, নির্ভীক, উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে ভারতের আর কোথাও নেই। দেখতে খুব রূপসী নয়, সাজে বিলিতিয়ানার নামগন্ধ নেই, কিন্তু তবু বলব সুবেশা। অত বড় একটা নারীসম্মেলন বিনা বিভ্রাটে সুপটুভাবে লক্ষ্মীকান্তাম্মা আর তার সখীরা চালালেন দেখে মুগ্ধ হলাম। কোনো ঝগড়াঝাটি পর্যন্ত হল না।

ওখানকার মহিলা সমিতির কাজ দেখবার মতো। একটি কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান চালান ওঁরা। হাতের কাজের পেশাদারী মান দেখে প্রশংসা না করে পারা যায় না। নিজেদের রোজগারেই চলে। সরকারি সাহায্যের জন্য হাত পেতে থাকেন না। তাছাড়া একটি অনাথাশ্রমও দেখলাম। মহিলারা বেশিদিন অনাথার ভূমিকা নিয়ে হাত পেতে থাকেন না। একটা কাজ শিখে নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে যান। ছোট ছেলে-মেয়েরা স্কুলে পড়ে। তারপর কৃতীরা কলেজে যায়। অন্যরা কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে।

আমরা যা গল্পে কাহিনীতে দিবা-স্বপ্নে আর নানা সংস্থার পরিকল্পনায় দেখি, ওঁরা তাকে মাটির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ওখানেও কি বধূনির্যাতন হয়? মনে তো হয় না।

চলে আসবার আগে সুন্দর একটি বিদায় অধিবেশন হল। কোনো খ্যাতনাম্নী

অভিনেত্রী আগন্তুক অতিথিদের সকলকে একটি হিমরু স্কার্ফ আর বিদ্‌রি কাজের বাক্স উপহার দিলেন। মন ভরে গেল।

১৯৬৮ সালেই বোধ হয় ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শিমলায় শিশুসাহিত্য বিষয়ে একটা সর্বভারতীয় আলোচনা শিবির হয়েছিল। কলকাতা থেকে প্রেমেনবাবু আর আমি গেছিলাম। মহাশ্বেতাকেও ওঁরা আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু সে মানালী বেড়াতে গিয়ে কোনো ভূস্বর্গে কাঁধে নিদারুণ ব্যথা আর মনে আশাভঙ্গ নিয়ে পড়ে থাকল। আলোচনায় যোগ দিতে পারল না।

এবার সরকারি ব্যবস্থা হলেও খুব ভালো হয়েছিল। সারা ভারত ঢুঁড়ে ওঁরা প্রত্যেক রাজ্য থেকে জনা ৩/৪ অভিজ্ঞ শিশুসাহিত্যিক জড়ো করেছিলেন। সেই বিচিত্র জনসমাগমের মধ্যে ক্রমে একটা পরিচ্ছন্ন নিয়মানুবর্তিতা ধরা পড়ল। তার একমাত্র কারণ সকলেই যথার্থ শিশুসাহিত্যের নানা ক্ষেত্রকে জীবনের কাজ বলে বেছে নিয়েছিলেন এবং তার চেয়েও বড় কথা শিশুসাহিত্যকে ভালোবাসেন। 'মেল' হবার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছুর প্রয়োজন থাকে না। সম্পাদিকা মোহিনী রাওয়ের সঙ্গে সেই প্রথম আলাপ এবং ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সূত্রপাত। বেতারের ডুগাল সাহেব ঐ সংস্থার অধ্যক্ষ ছিলেন। চমৎকার লোক এঁরা, সাহিত্য ভালোবাসেন, লেখেন। এ-সব জায়গায় ভারি উপভোগ্য একটা আবহাওয়া তৈরি হয়। তার ফলে ছোট ছোট অসুবিধাগুলো গায়ে লাগে না।

যেখানে আমাদের বাসস্থান হয়েছিল, সেখানে নাকি এক সময় হিমাচল প্রদেশের শাসনকর্তাদের অনুচররা থাকত। লম্বা তিনতলা বাড়ি। পিঠটা তার পাহাড়ের গা ঘেঁষে। দুপাশে অন্য ঘর থাকাতে সেদিকও বন্ধ। খালি সামনের দিকটা খোলা। ডবল দরজা, তার দুপাশে জানলা, ওপরে স্কাইলাইট। ঐ দিকটা বোধ হয় দক্ষিণ। তবে আমার দিক্‌ভ্রমও হয়ে থাকতে পারে। দুজন করে একেক ঘরে থাকার ব্যবস্থা। আমার সঙ্গে বেতার কর্মী শ্রীমতী লীলাবতী ভাগত ছিলেন। তিনি বোধ হয় উত্তরপ্রদেশীয়, তবে পুণেতে বাড়িটাড়ি আছে। মনে হয় বম্বে হল কর্মস্থল। সঙ্গে গরম স্কার্ফ আর একটা পাতলা কম্বল ছাড়া কিছু আনেননি। বললেন পুণে নাকি সিমলার চেয়েও ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডাকে ওঁরা ভয় পান না। আমাদের বাংলা রুটির মতো চ্যাপ্টা এবং গরম, আমাদের কথা আলাদা। কিছুতেই মানলেন না যে সিমলা পুণের চেয়ে উঁচু এবং ঠাণ্ডা।

বৃষ্টি হওয়াতে রাতে খুব ঠাণ্ডা পড়ল। মিসেস্ ভাগত একটা সুজনি গায়ে শুয়েছিলেন। তারপর অনেকটা সেই প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতারের পুনরভিনয় হল। দ্বিতীয় প্রহরে ধনুতে টংকারের সময়ে তিনি স্কার্ফটা মাথায় জড়িয়ে শুলেন। তৃতীয় প্রহরে যখন কুকুর কুণ্ডলী হলেন, আমি আর সইতে না পেরে, আমার বাড়তি কম্বলটা নিঃশব্দে ওঁর গায়ে চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে জেগে দেখি বেগের পুঁটুলি হয়ে ভদ্রমহিলা অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছেন। এইভাবে তাঁর সাথে ভাব হয়ে গেল।

আমার ভাষণের দিন ডঃ নীহার রঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করলেন। তিনি তখন ওখানকার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। সবই ভালো হল। খালি উনি ছোটদের কোনো বই না পড়াতে ভাষণটা খোঁড়ার মতো নেংচে চলল। তারপর যখন সেই মামুলী কথাটা বললেন যে আগে ভারতে ভালো ভালো ছোটদের বই লেখা হত, তখন আমি কিছু বলবার আগেই লক্ষ্ণৌ থেকে আগত উর্দু লেখিকা বেগম ওয়াজির না কি যেন, উৎকৃষ্ট যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে বেচারাকে এমন করে মাটিতে বিছিয়ে দিলেন যে বাকি সময়টা ভালো ভালো কথা ছাড়া নীহারদার মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোল না। পরে প্রেমেনবাবুকে আর আমাকে তাঁর জীপে করে নিজের চমৎকার বাংলোতে নিয়ে গেলেন। সেখানকার গোছলখানার কমোডটা রাজসিংহাসনের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয় দেখে আমরা দুজন দেহাতী তো হাঁ! তবে তার পরে ওঁদের হস্টেলে সকলের সঙ্গে যে মধ্যাহ্ন ভোজ খাওয়ালেন সেটা নিতান্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর। ও-ই খাবারই সকলেই খেতেন। নীহারদাকে একটা 'আর কোনখানে' উপহার দিলাম। একদিন সেটার প্রথম অধ্যায় ইংরিজি করে শুনিয়েছিলাম। অনেকে বলেছিলেন ওটা অনুবাদ করে ফেলুন। সে আজও হয়নি।

ফিরবার পথেও মজা। আশিস্ সান্যালকে গুণী কবি ও লেখক বলে এখন সবাই চেনে। ১৫ বছর আগে সে নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিল এবং প্রেমেনবাবুর ভারি ভক্ত। রোজ বিকেলে গল্প করতে আসত। তাতে প্রেমেনবাবুও খুব অখুশি ছিলেন না, কারণ ও না এলে আমরা হয়তো সবাই মিলে ওঁকে পাহাড়ে চড়াতাম। তাতে ওঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। আশিস্ আলাদা নিজের দায়িত্বে গেছিল, কালীবাড়িতে উঠেছিল। ফেরার দিন ছোট ট্রেন থেকে নেমে দেখি কিউলে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের রেজার্ভেশন ছিল, কিন্তু আশিসের ছিল না। এ দিকে গাড়ি বোঝাই সব ছুটি-ফেরতা আর বেঙ্গল জোয়ান! ঐ শেষের গাড়িতে ছাড়া, মাছি মশারাও ঢুকতে পারছে না। ঢুকতে পারছিল না। শুনেই প্রেমেনবাবু নেমে গেলেন। আমি খুব বিরক্ত। আশিস্ ছেলেমানুষ, সে-ই পারল না আর ওঁর ৬৪ বছর বয়স, উনি ওকে ওঠাবেন! আধঘণ্টা পর ফিরে এসে বললেন, 'দিয়েছি ঢুকিয়ে জোয়ানদের গাড়িতে। সত্যি আমাদের জোয়ানদের তুলনা হয় না।' পরদিন সকালে শুনলাম কোথাও জায়গা নেই দেখে জোয়ানদের গাড়ির দরজার সামনে গিয়ে বলেছিলেন—'আমার নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র। আমার এই বন্ধুটির কি তোমাদের গাড়িতে জায়গা হবে না?' সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল, আশিসকে ওরা আদর করে নিয়ে নিল। আমিও খুশি হলাম।

আমাদের জোয়ানরা তাহলে কবিতা পড়ে। ভেবেও মনটা ভালো হয়ে গেল। আর ঐ ছোটখাটো ছিপছিপে মানুষটার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। যদিও ১৯৫৭ সালে আমেদাবাদ যাবার সময় অ্যাটাসে কেস উল্টে ফেলে, আমাদের সবাইকে—মায় বিভূতি মুখোপাধ্যায়কে সুদ্ধু—গাড়িময় হামাগুড়ি দিয়ে পিন কাঁচি ওষুধের কৌটো চিঠিপত্র কলম হেনাতেনা সাত-সতেরো খুঁজিয়ে তবে ছেড়েছিলেন। সুখের বিষয়, বাক্সে কি কি ছিল সে বিষয়ে ওঁর নিজেরি কোনো ধারণা না থাকাতে, হারানো জিনিস নিয়ে কাউকে মাথা এবং শরীর ঘামাতে হয়নি! এই রকম মানুষটাকে শ্রদ্ধা না করে, ভাল না বেসে থাকি কি করে?

আমার মনে হয় দিল্লীর ঐ আলোচনা-চক্রটা বেশ ফলপ্রসূ হয়েছিল। জওহরলালের স্মৃতিতে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট সংকল্প নিয়েছিলেন একশোটা ছোটদের নতুন বই প্রকাশ করবেন। পরিকল্পনার নাম নেহরু চিল্‌ড্রেন্স লাইব্রেরি। আমাদের সকলের কাছেই বই চেয়েছিলেন। প্রেমেনবাবুও 'ভারতের তীরভূমির কথা' লিখবেন বলেছিলেন। মনে হয়েছিল কতই না উৎসাহ। অপ্রত্যাশিত সব বিষয়ে ওঁর মগজটি একটা তথ্যকেন্দ্র বিশেষ। বলা বাহুল্য ঐ বইটি দিনের আলো দেখেনি। আমাকে ফরমায়েস দেওয়া হল 'নদী কথা' লিখে দিতে হবে। আমি উত্তর ভারতের নদ-নদী নিয়ে নির্দিষ্ট মাপের একখানি বই করে দিলাম। পরে আরেকটি চাইলেন, আমি 'বড়-পানি' লিখলাম, গল্পের আকারে। শিলং-এর উপকণ্ঠবাসীদের জীবনযাত্রার গল্প। মূল ঘটনাটি সন্দেশে লিখেছিলাম। তাকে কেন্দ্র করে এই বই। ১৯৮০ সালে আরেকটি চেয়েছিলেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের শৈশব কৈশোরের কথা। তাঁর প্রথমবারের বিলেতযাত্রা দিয়ে শেষ। নদী-কথা ১৪টি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্য দুটি বোধ হয় ইংরিজিতে আর বাংলায়। হিন্দীতেও হবে হয়তো।

শিমলার সভার সদস্যরা সকলেই বাছাই করা শিশুসাহিত্যিক। অনেকেই ভালো ভালো বই লিখেছেন ঐ পরিকল্পনার জন্যে। কেউ কেউ আগেই লিখে ঐখানে পাণ্ডুলিপি পেশ করেছিলেন। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ মজার ব্যাপারও হত। একজনের রামায়ণের গল্প নিয়ে মহা তর্কাতর্কি উঠল। তিনি লিখেছিলেন বন-পর্বে রাম-লক্ষ্মণ পাখি ও অন্য জানোয়ার শিকার করে আনতেন। মা সীতা সেগুলি রাঁধতেন। রাম-লক্ষ্মণের খাওয়া হলে যা অবশিষ্ট থাকত, সীতা তাই খেতেন। এ-কথা পড়ে দু-তিন জন সদস্য মহা আপত্তি করলেন। এ কি সাংঘাতিক কথা! দেবতা তাঁরা. মাছ-মাংস তাঁদের কাছে অস্পৃশ্য! লেখকও ছাড়বেন না। তিনি মূল রামায়ণ থেকে ঐ তথ্য আহরণ করেছেন। মূল রামায়ণ এনে দেখিয়ে দিতে পারেন। অনেক কষ্টে শান্তি স্থাপন হল, বিষয়-বস্তুটিকে মুলতুবি রেখে!

বড় সুন্দর জায়গা শিমলা। অনেক বাঙ্গালীর বাস। তাঁদের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা দেখে বড় আনন্দ হয়েছিল। কলকাতায় বসে থাকলে সংস্কৃতির একটা দিক অজানা থেকে যায়। সেটি হল এর সর্বভারতীয় রূপটি।

আমি বই না লিখলে এবং সে বই কেউ কেউ না পড়লে, কোনো সম্পাদক আমার জীবনকথা ছাপতেন না, এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমিও সেই সুযোগে সারা জীবন ধরে যে হাজার হাজার লোকের কাছে নানা ভাবে ঋণী, সে-কথার স্বীকৃতি দেবার চেষ্টা করেছি। সকলকে মনেও করতে পারি না, সব ভুলে ভুলে যাই। হঠাৎ একটা মুখ স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করে ওঠে। যেমন আমার ৫ বছর বয়সে হ্যারিসন রোডে আমার ছোট পিসেমশাই কুন্তলীন আবিষ্কারক এইচ্ বোসের বাড়িতে যখন আমার চেয়ে সামান্য বড় দাদারা, গণেশদা, কার্তিকদা ইত্যাদি স্রেফ্ ঠেঙিয়ে আমার আদুরে পুতুলের ঠ্যাং খুলে আনল আর আমি কেঁদে কেটে একাকার করলে ছিঁচকাঁদুনে বলে অপমান করল, তখন আমার ১২ বছর বয়সের মুকুলদা, (এককালে চলচ্চিত্রের বিখ্যাত ফটোগ্রাফার মুকুল বোস) আমার গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার সত্যিকার স্টীমে চলা রেলগাড়ি চালাতে দিয়েছিল। সে আদরটুকু আমার গা থেকে মুছে গেলেও মনের মধ্যে চিরকালের মতো লেগে আছে, ৭০ বছরেও মিলিয়ে যায়নি। পরে অবিশ্যি অন্য সঙ্কটের সময়েও মুকুলদার সস্নেহ সহযোগিতা পেয়েছি। ঐ সব বন্ধুদের দলে মুকুলদা সবার আগে।

সবাই তারা মানুষও নয়। কুকুর, বেড়াল। ছোটবেলা থেকে কুকুর বেড়াল পোষার শখ। দুঃখের বিষয়, বড়দের বিশ্বাস মুরগি পরিষ্কার, কারণ ভালো ভালো ডিম দেয়, টাট্টু ঘোড়া পরিষ্কার, কারণ জরীপের সময় বাবাকে পিঠে নিয়ে যায়। এরা ছাড়া সব জন্তু জানোয়ার অকথ্য নোংরা, ছুঁলে কার্বলিক সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয়! অথচ রোজ সকালে কান্হাই আর পন্নু-সহিস কোদাল দিয়ে মুরগির ঘর আর আস্তাবল থেকে রাশি রাশি ইয়ে বের করে মস্ত গর্তে জমা করে,এ তো আমাদের সকলের নিজের চোখে দেখা। হ্যাঁ, তবে অবিশ্যি ঐ সব দিয়ে আমাদের ফল-ফুল-তরকারির বাগানে সার হত। বড়দের কি করে বোঝাব যে অনেক অকেজো জিনিস কেজো জিনিসের চেয়েও শতগুণ উপভোগ্য। নিজেরাই সে কথা ভালো করে বুঝতাম না। ঐসময়ে একটা নিষিদ্ধ ছাই রঙের বেড়াল, সম্ভবতঃ স্কাইলাইট দিয়ে, রোজ রাতে আমার পায়ের তলায় লেপের নিচে এসে শোয়া ধরল। বিষম মায়া পড়ে গেল। কাউকে কিছু বলিনি। খালি পাশে শোয়া দিদি জানত। সারা জীবনে সে কখনো আমার নামে লাগায়নি। তাই বলে আমার কার্য-কলাপ অনুমোদনও করেনি।

ছাই বেড়ালের নরম গরম গায়ে আমার ঠাণ্ডা পা লাগিয়ে সুখে ঘুমোতাম। তার রাজত্ব আরো কতদিন চলত বলতে পারি না, যদি না আস্কারা পেয়ে তার লোভ বেড়ে যেত। শেষে একদিন রান্নাঘর থেকে এটা-ওটা অদৃশ্য হতে লাগল। ছোট ছোট নোংরা আঙুলের ছাপ দেখে যামিনীদা আমাদের সন্দেহ করত! তারপর একদিন রান্নাঘরের শিকে থেকে থালা ভরা ভাজা মাছ নিচে ফেলে, কতক খেয়ে, কতক ভেঙে কে যেন সব নাশ করল, তখন আমার চোখ ফুটে গেল। সকলের সঙ্গেই ছাই বেড়ালকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। পাওয়াও গেল কয়লার গাদার পেছনে কিন্তু এক ঝলক কালো বিদ্যুতের মতো সে হাওয়া হয়ে গেল। যামিনীদার বেঁটে লাঠি গায়ে লাগতেই বিকট ইঁ-য়াঁ-ও শব্দ করে চিরকালের মতো আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও, প্রায়ই তাকে দেখা যেত পাশের বাড়ির সাহেবের পেয়ারের বিলিতী বেড়ালদের জন্য সারি সারি পাতা মাছের পাত্র থেকে টুপ করে মাছ তুলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে!

আমার বিয়ের পর প্রথম যে পোষা জানোয়ার আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তার নাম ছিল ডিকি। ৬ মাস বয়স, শাদা কালো উঁচু জাতের ফক্স-টেরিয়ার। বেঁড়ে ল্যাজটা সারাক্ষণ নাড়ত, মুখ দেখে মনে হত বেজায় হাসি পাচ্ছে! দুঃখের বিষয়, প্রয়োজনীয় ইন্‌জেক্‌শন দিইনি, অকালে সে মারা গেছিল।

ডিকিকে দেখে শিখলাম ট্রেনিং দিলে কুকুররা ঘর নোংরা করে না। দু-বেলা একটু হাঁটাতে হয়। ব্যস্। ডিকির পর আমাদের ল্যাডি বন্ধু। আমাদের বন্ধু হলেও এবং সারা দিন আমাদের ঘরে কাটালেও, দোতলার বাসিন্দাদের কুকুর। একটু একটু বুল্-ডগ্, একটু একটু নেড়ি। মহা পাজি। বাড়ির লোকদের ছাড়া সবাইকে তাড়া করে, ধরতে পারলে কামড়ে দেয়। ওর জন্য যে কত পুলিশের লোকদের নানা রকম মিষ্টি কথা বলে শান্ত করতে হয়েছিল সে আর কি বলব। কুকুরের মালিক অতি শান্ত মিষ্টি বিধবা মানুষ। তাঁর চারটি নবালক ছেলেমেয়ে। অগত্যা আমাকেই ঠেকাতে হত।

তারপর অন্য বাড়িতে গেলাম। সেখানে ব্রাউনি বলে এক অপরূপ সুন্দর কুকুর উপহার পেলাম। ৬ মাস বয়স। বিরাট চেহারা। মা কালি, বাপ রামপুর হাউণ্ড। কুকুর তো নয়, ঠিক একটা মানুষ। আমরা যা খাই প্রায় তাই খায়। সকালে চা টোস্ট দুপুরে ভাত দিয়ে হাড় সেদ্ধ, নুন ছাড়া। রাতে একটু মাংসের ঝোল কি পুডিং দিয়ে এক ডজন হাত রুটি। আমার ছেলেমেয়ের চিরসঙ্গী। কোনো উৎপাত নেই। খালি নোংরা-কাপড় পরে কেউ এলে তাকে কামড়ায়। আর বাড়ি থেকে কেউ কিছু নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে, তাকে কামড়ায়। সে জিনিসটা আগন্তুক নিজে এনে থাকলেও, কামড়ায়। কেউ কিছু ধরে টানলে কামড়ায়। নিচু হলে কামড়ায়; আমাদের কাউকে মজা করেও জোরে কিছু

বললে বা গায়ে হাত দিলে কামড়ায়। আমাদের খুব কম বন্ধুই অক্ষত দেহে আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করতে পেরেছিল। ১৪ বছর পরে যখন জলাতঙ্ক হয়ে হাসপাতালে ব্রাউনি মারা গেল, আমাদের বাড়ি নিরানন্দ হল। জিমি বলে একটা বুড়ো এবং অতি ভদ্র কুকুর-ও ছিল কিছুদিন। কিন্তু মনে তেমন দাগ কাটেনি।

রোশ্‌ফুকো বলেছিলেন, 'যতই মানুষ দেখি, ততই কুকুর ভালোবাসি।' আমার ঠিক ততটা না হলেও যতই কুকুর দেখেছি, ততই তাদের ভালোবেসেছি। ব্রাউনি মারা গেলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কুকুর রাখব না, বড় কম দিন বাঁচে। খালি দুঃখটা টিকে থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সতীশ দাশ বলে যে-বন্ধু ব্রাউনিকে জিমিকে দিয়েছিলেন, তিনিই একদিন সন্ধ্যায় ১ বছর বয়সের আইরিশ সেটার, লাল রূপের ডালি জনিকে রেখে চলে গেলেন। বলে গেলেন, "যারা একবার কুকুর ভালোবেসেছে, তারা কুকুর ছাড়া বাঁচে না। দু-দিন ওকে বেঁধে রাখলে, আর কোথাও যাবে না।'

প্রকাণ্ড কুকুর। দাঁড়ালে খাবার টেবিলের ওপর থুতনি রাখতে পারে। ছেলেমেয়ের প্রাণের বন্ধু হয়ে গেল। তাদের স্কুল-কলেজ থেকে ফেরার ১৫ মিনিট আগে থেকে সদর দরজার কাছে দাঁড়াত। কোনো খুঁৎ ছিল না জনির। খালি খুব ছোটবেলায় কোনো নিষ্ঠুর ছেলের হাতে পড়ে ল্যাজের কাছে জখম হয়েছিল। দেখা যেত না, কিন্তু ঐখানটা কমজুরি ছিল। দুই বছর পরে জনি বড় কষ্টে মারা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ফক্সটেরিয়ার ভুলো এল। ততদিনে ছেলেমেয়ে যে যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আসীন। বাড়িতে আমরা দুজন। ভুলো ১০/১২বছর ধরে আমার আর আমার স্বামীর নিত্যসঙ্গী হয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত হয়তো রোশফুকোর সেই কথাই বলতে হত, 'যতই মানুষ দেখি, ততই কুকুর ভালোবাসি!' ভাগ্যিস সারা জীবন ধরে এত ভালো ভালো, এত ভালোবাসার মানুষ দেখেছি, তাই আমার মুখে ও-কথা সাজে না।

অভিনেতা রাধামোহন।স্বর্গেগেলেন। ভাগ্যিস তাঁকে 'উদয়ের পথে' অভিনয় করতে দেখেছিলাম। আজকাল শান্তিনিকেতনের পথে তাঁকে মাঝে মাঝেই দেখতাম। গোড়ায় চিনতে পারিনি। যাঁর কাছে এত আনন্দের ভাগ পেয়েছি তাঁর চেহারা চিনতে পারিনি। তিনিই পরিচয় দিলেন। রাধারমণ মিত্রের কথা বলেছি কি? তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন শুনেই মনটা আনন্দে নেচে উঠল। দেশ-প্রেমিক বটে ; দেশপ্রেমিক হবার আক্কেল-সেলামীও স্বচ্ছন্দে দিয়েছেন। কোথায় কবে প্রথম আলাপ হল মনে নেই। আমার উপেন্দ্রকিশোরের খুদে জীবনী পড়ে, বাড়িতে এসে বকে গেলেন—'নিজের জ্যাঠামশায়ের বাড়ির নম্বর ভুল লেখ, ছিঃ!' বারবার করে বললাম, 'কি করব, আমি তখন জন্মাইনি। ওঁর

মেয়ে, আমার মেজদির কাছে নম্বরটা পেয়েছি।' বললেন, 'সে তো আরো খারাপ। নিজেদের বাড়ির নম্বর ভুল করা! স্ট্রীট ডিরেক্টরি কেন আছে?'

বুঝলাম এই একজন নিখুঁৎবাদী পারফেক্‌শনিস্ট পেলাম! আমাদের দেশের পণ্ডিতদের বইতেও রাশি রাশি ভুলচুক থেকে যায়। হয় কারো চোখে পড়ে না, নয়তো অকিঞ্চিৎকর মনে করে শুধরোনো হয় না। চমৎকার সব জিনিসে কলঙ্ক লেগে থাকে। কিন্তু জ্ঞানের জগতে ভুলের একমাত্র সার্থকতা হল কোনো একজন ভবিষ্যৎ জ্ঞানসাধক তাকে দূর কবার সুযোগ পাবেন। জ্ঞানে ভুলের স্থান নেই। নাম, ঠিকানা, সময়, স্থান, পরিচয়, সম্পর্ক, যত তুচ্ছ তথ্যই হক না কেন, তার হওয়া দরকার নির্ভুল নিখুঁৎ। কত ভালো ভালো বইতে বিদেশী নামের ভুল উচ্চারণ লেখা দেখি। যার একটা বই রচনা করার সাধ্য আছে, তার একটা উচ্চারণ বিশুদ্ধ ভাবে লিখবার তৎপরতা নেই, এ কি আশ্চর্য ব্যপার! একদিন রাধারমণ দুপুর দুটোয় আমাদের বাড়িতে এসে দেখেন আমরা ঘুমোচ্ছি। আর আসেননি।

রাধারমণ বলতে আমাদের কুটুম্ব রাধাচরণ বাগচীর কথা মনে পড়ল। অতি গুণী শিল্পী। শান্তিনিকেতনের কলা ভবনে অধ্যাপনা করে দীর্ঘকাল কাটিয়ে, সেখানেই অকালে দেহ রেখেছেন। নিখুঁৎ সব ছবি তাঁর। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট, আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্বন্ধ ছিল, যদিও ওর শ্বশুর আর আমার স্বামী আপন মামাতো পিসতুতো ভাই। রাধাচরণের ভারতজোড়া নাম। ডাকটিকিটের নক্সা চান কেন্দ্রীয় সরকার, রাধাচরণেরটাই শ্রেষ্ঠ বলে গৃহীত হয়। কিন্তু তার নিজের বাড়ি আর তৈরি হয় না। জমি কেনা, টাকা রাখা। জিজ্ঞাসা করাতে রাধাচরণ বলল, 'একেবারে নিখুঁৎ নক্সা করতে চাই, কাকিমা, তার কাজও নিখুঁৎ হওয়া চাই।' জানতে চাইলাম কেমন নিখুঁৎ। যা বলল তার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি, তবে তার ভাবার্থটুকু মনে আছে। মানুষের চারপাশ ঘিরে আটটা দিক, মাথার ওপর উর্ধ্ব, পায়ের নিচে অধঃ। সব তো আর সমান এবং একরকম নয়। প্রত্যেকের নিজেস্ব রূপ আছে। নক্সাতে সেটা ধরতে পারা চাই। কাজেও সেটা সপ্রকাশ হওয়া চাই। বলেছিলাম, 'তবেই তোমার বাড়ি হয়েছে!'

এর অনেক দিন পরে যখন সত্যি করে রাধাচরণের বাড়ি হল, সে আমাকে বাড়ি দেখাবে বলে নেমন্তন্ন করল। আমার বেয়াই মশাই-ও ছিলেন। তিনি সুনয়নীদেবীর ছেলে শুনে মহা উৎসাহে তাঁকেও যেতে বলল। ওর উৎসাহ দেখে বেয়াইমশায়েরো উৎসাহ বেড়ে গেল। সারাটা পথ রিক্‌শায় বসে, 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে' গাইলেন। গিয়ে দেখলাম চমৎকার সব ছবি আঁকা দেয়ালে দেয়ালে। খুব আদর যত্ন করল রাধাচরণ। তারপর বলল, 'কেমন মনে হচ্ছে?' সেই দশদিকের কথাটা পাড়তেই কেমন যেন উদাস হয়ে গেল রাধাচরণ।

তারপর লজ্জিত ভাবে বলল, 'ইয়ে সিঁড়িটার জায়গাও রাখিনি।' চেয়ে দেখি দেয়াল জোড়া অপূর্ব ছবির পাশ দিয়ে মঞ্চের মাথায় উঠে পরী কিম্বা রথ নামাবার জন্য সেকালে যেরকম উইংসের আড়ালে সরু সিঁড়ি থাকত বলে শুনেছি, সেই ধরনের একটা সিঁড়ি। সত্যিকার শিল্পী ছিল রাধাচরণ। রাধাচরণ মারা যাবার আগে অনেক দিন দেখা হয়নি। আমরাও মাঝে এক বছর শান্তিনিকেতনে যাইনি আর ও-ও অসুস্থ হয়ে ঘোরাঘুরি কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। স্বপ্নগুলিকে নিয়েই বোধহয় চলে গেছে। ওর স্ত্রীর কথাও একটু বলতে হয়। সে বড় গুণী মেয়ে। সারা জীবন শিক্ষকতা করে, এখন দক্ষিণ-পল্লীর ঐ বাড়িতে একটা চমৎকার স্কুল করেছে। বাস্তব কর্মীদের ভূমিকা স্বপ্ন বিলাসীদের চেয়ে একটুও কম গুরুতর নয়।

বাস্তব কর্মী বলতে আমাদের নেপোর কথা বলতে হয়। নেপো মানে নেপোলিয়ন। সেই আদি যোদ্ধা নেপোলিয়ন নয়। তাকে কোথায় পাব? পেলেও মহা অনর্থ ঘটাবে। আমাদের নেপো একটা বৃহদাকার হুলো বেড়াল। সে-ও কম অনর্থ ঘটায়নি। কিন্তু বড়ই উপকারী ছিল। চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটের নিচে একটা বড় স্টোরের গুদোমঘর। চিজ্, বিস্কুট, টিনের মাছ, নানা রকম মাংসজ বস্তু দিয়ে ঠাসা। সেখানে নেংটি ইঁদুর কিলবিল করে। তারা যখন তখন যে কোনো পথে ওপরে উঠে এসে, সব কেটেকুটে খেয়ে দেয়ে, অবাঞ্ছিত বাচ্চা পেড়ে, জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে তুলল। অগত্যা একজন ফিরিঙ্গি প্রতিবেশী নেপোকে প্রদান করল। সে অবিশ্যি মহিলা বেড়াল পাচার করবার তালে ছিল! কিন্তু পোড়-খাওয়া জীবন আমার, তাতে রাজি হইনি। সে বলেছিল, 'মেয়ে বেড়াল যেমন বাচ্চা দিয়ে বাড়ি ভরে, ছেলে বেড়াল তেমনি বাড়িতেই থাকে না। পাড়া জ্বালায়।'

বাস্তবিকই তাই। নেপোর আকৃতি দিনে দিনে শশীকলার মতো বৃদ্ধি পেতে লাগল। সব খাবার জিনিস বন্ধ করে রাখতে হত। আমাদের খাটে নিমন্ত্রিত ও অযাচিত ভাবে শুয়ে থাকত। ঠেললেও নামত না। তেমনি আবার ওর মুখে একসঙ্গে তিনটে ইঁদুর দেখেছি। তাছাড়া সারাদিন ও টো-টো করে ঘুরে বেড়ালেও ওর গায়ের গন্ধেই বাড়ি থেকে দেখতে দেখতে চিরকালের মতো সব ইঁদুর বিদায় হল! নেপো সুখে বিরাজ করতে লাগল। ওর ভয়ে অন্য বেড়াল এ তল্লাটে আসত না। যখনি ওর শিকারী স্বভাব তৃষিত হয়ে উঠত, কোনো সময়ে বেরিয়ে গিয়ে মারামারি করে বিজয়-গর্ব এবং কিছু আঁচড় কামড় নিয়ে ফিরত। ক্রমে নেপো বুড়ো হল। মনে হত চোখে ভালো দেখে না। আঁচড় কামড়ের সংখ্যাও বাড়ল। অন্য বেড়ালরা মাঝে মাঝে আমাদের পাঁচিলে বসে, বেড়ালীয় ভাষায় বোধ হয় ওকে টিটকিরি দিত। কাছে আসত না।

আমরা নেপোর দুঃসময়ে ওর কম যত্ন করিনি। সকলে মিলে বোঝাতাম, 'কেন বাড়ির বাইরে যাস্ ? দ্যাখ্ তো কি রকম কামড়েছে।' মুখের সামনে খাবার ধরা হত। ও সব কিছু চেটেপুটে সাবাড় করত। এইভাবে আরো কত দিন চলত কে জানে। এমন সময়ে একদিন কোথাও যাব বলে নিচে গেছি, হঠাৎ দেখি কম্পাউণ্ডের উঁচু পাঁচিলের ওপর দিয়ে দশটা হুলো বেড়াল ল্যাজ খাড়া করে জঙ্গী কায়দায় চলেছে। তাদের লীডার আমাদের নেপো ছাড়া কেউ নয়! আমাদের ড্রাইভার তার পা চেপে ধরে বলল, 'নেপো, নেপো, নেপো! ওরা তোকে খেয়ে ফেলবে!' নেপো 'ফঁড়া—শ্' করে একটা বিশ্রী শব্দ করে, পা টেনে নিয়ে, পাশের বাড়ির দোতলার রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দলবল সহ ঢুকে পড়ল!! ঝন্ঝন্ করে বাসন ভাঙার আর বকাবকির শব্দের মধ্যে আমাদের প্রস্থান। এইসব নানা অভিজ্ঞতার মাঝখানে বেড়ালদের সঙ্গে আমার কোনোদিনই ভালোবাসা জমেনি। কি করে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে জীবনের এতগুলো বছর কেটে গেল সে কথা যত ভাবি ততই আশ্চর্য হই। নিজের মনের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ টের পাই না। সেই একই ভাল-লাগা মন্দ লাগাগুলো, নিজের ওপর সেই অসহিষ্ণুতা। খালি এটা চাওয়া, ওটা চাওয়া, হাজার রকম দাবি-দাওয়াগুলো কেমন যেন সকাল বেলার শিশিরের মতো কখন জানি নিজের অজ্ঞাতসারে উপে গেছে। এখনো ভালো জিনিস ভালো লাগে, কিন্তু সেগুলোকে আয়ত্ত করতে আর ইচ্ছা করে না। বন্ধুত্বের দাম যেন অনেকখানি বেড়ে গেছে। কেউ ভালো বললে মনটা খুশি হয়: কিন্তু মন্দ বললে রাগ হয় না; খোশামোদ করলে বিরক্ত লাগে। সবাইকে কেমন যেন ভালো লাগে। কারো কাছে কিছু আশা করি না। সর্বদা কাজ করবার তাগাদা দেয় মন। ছোটদের চলচ্চিত্রসংস্থা হল একটা। শৈল চক্রবর্তী তার সঙ্গে জড়িত আর দিলীপ ভট্টাচার্য বলে স্বল্পায়ু সুদর্শন একজন ছেলে। কিছু মিটিং হয়, খুব বেশি কাজের নমুনা দেখি না। কোন সময় ছেড়েও দিই।

এদিকে ছোটদের গল্পগুলো তৈবি হয়ে কলমের আগায় অপেক্ষা করে। এক সময়ে সন্দেশের পাতায় ধারাবাহিক ভাবে ছাড়া পায়। কলের মানুষ 'মাকুর গল্প', বেড়ালের ছায়া-লাগা 'নেপোব বই'। কয়েকটা বড়দের গল্পও লিখি সম্পাদক বন্ধুদের অনুরোধে। 'পাখি' প্রকাশ করেন মিত্র ঘোষ। অমৃতে 'ফেরারী' বেরোয়, পরে মিত্র ঘোষ থেকে পেপার-ব্যাক্ হয়ে ছাড়া পায়। ৭১ সালে নিউ স্ক্রিপ্ট গোটা কতক রস ও রহস্যের গল্প এক সঙ্গে করে ছাপে। তিন বছর পরে আরেক খণ্ডও বেরোয়। ৭২ সালে চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট থেকে 'রিপ দি লেপার্ড' বেরোল; ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে 'বড়-পানি'। প্রথমটিতে বন্ধুবান্ধবদের কাছে শোনা জানোয়ারের গল্প, দ্বিতীয়টিতে ছোটবেলায় দেখা শিলংএর মুলুকি পাহাড়ের

পরিবেশ। ৭১ সালে ওরিয়েন্ট লংম্যান ছোটদের জন্য বাংলায় গল্পের বই প্রকাশের প্রকল্প নিলেন। প্রেমেনবাবুর, আমার এবং হয়তো আরো কারো কারো অমনিবাস বেরোল, খুব জনপ্রিয়ও হল। ৭৪ সালে এশিয়া সম্পাদিত 'রোশনাই' পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে দুটি ছোট ছেলের দুঃসাহসিক অভিযানের গল্প, 'নাকু-গামা' বেরোল। ১৯৬১ সালে সন্দেশ প্রকাশিত হবার পর, এটি ছাড়া অন্য কোনো ছোটদের পত্রিকায় ধারাবাহিক গল্প দিইনি। রোশনাইয়ের সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত সম্বন্ধ না থাকলেও, এশিয়া আমার রচনাবলী এবং অন্য কয়েকটি ছোট বইয়ের প্রকাশক। এশিয়ার মালিকরা বহুকাল আগে আমার 'ঠাকুমার চিঠি'কে মণিমালা নামে বই করেছিলেন। বর্তমান মালিক মৃণাল তাদেরি ছোট ভাই আর আমার স্নেহের পাত্র। যদিও কটুভাষী বলে অনেকে ওর কথায় আহত হয়। তাই মাঝে মাঝে ওকে বকি-টকি।

৭৪ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে আমার প্রথম বই 'বাতাসবাড়ি' বেরোল, নিরাভরণ চেহারা নিয়ে, নিঃশব্দে। বিশেষ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করল বলে মনে হয় না। যাকে বলে ফ্যান্টাসি। আগে সন্দেশে বেরিয়ে গেছিল। আমাদের পাঠকরা মহা খুশি। এখানে ফ্যান্টাসি, কল্প বিজ্ঞানের গল্প, বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প, আজগুবি ও গাঁজাখুরি গল্পের মধ্যে একটু তফাৎ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যায়। কারণ এর ভিতরে একটা মারাত্মক ফাঁদ পাতা আছে, যার মধ্যে পা পড়লেই সর্বনাশ। ফ্যান্টাসি বিজ্ঞান নয়।

ছোটদের জন্য লিখতে হলে বড় সাবধানে পা ফেলতে হয়। এর মধ্যে আমি যে কবে বড়দের জন্য গল্প লেখা কমিয়ে এনে, প্রায় বন্ধই করে দিয়েছি নিজেই টের পাইনি। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও, ছোটদের জন্য লেখাকে আমি যতটা গুরুত্ব দিই, বড়দের ততটা দিই না। বড়দের বই হল সময় কাটানোর উপায় এবং খুবই উৎকৃষ্ট উপায়। এমন কি শ্রেষ্ঠ উপায়ও বলা যায়। কিম্বা মন ভোলাবার পন্থা। জীবনের ব্যর্থতা হতাশার মহৌষধ। তাছাড়া থীসিস্ লেখার এন্তার সামগ্রী থাকে বড়দের উপন্যাসে। স্রেফ বড়দের গল্পের বই পড়ে পড়ে বহু লোক ডক্টরেট লাভ করেছেন। তাঁরা নিজেরা মৌলিক কিছু লেখেন না। কিন্তু অন্য লেখকদের বইয়ের ভালোমন্দ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আমার অনেক সময় মনে হয় বড়দের গল্পের বই তথ্যান্বেষীদের অনেক কাজে লাগলেও সাধারণ মানুষদের ততটা উপকারে আসে না, যতটা আসে ছোটদের ভালো বই। তাই দিয়ে মানুষ তৈরি হয়। সব বড়রাই একদিন ছোট থাকে। সেই সময়ে যা শুনল, যা দেখল আর বিশেষ করে যা পড়ল, তার ছাপ তারা মনে মনে সারা জীবন বহন করে।

বড়রা মন্দ বইয়ের ছাপ, ভুলে-ভরা বইয়ের প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে। কিন্তু ছোটদের অশেষ ক্ষতি হয়। মানুষ তৈরি করতে হলে সব

চাইতে ভালো জিনিসের দরকার। সততা, সৎসাহস, সরসতা—এইসব দিয়ে ছোটদের বই তৈরি করতে হয়। বাস্তব-বিরোধী হলেও চলবে না। কাল্পনিকতা, বলিষ্ঠতা, আদর্শবাদ ইত্যাদি ভুল শিক্ষার জায়গা নেই। যা হয়নি, হবেও না বলে মনে হয়, তার মধ্যে এক রকম যুক্তি-যৌক্তিকতা থাকা চাই।

কাজেই বোঝাই যাচ্ছে আজগুবি গল্প লেখাও খুব সহজ নয়। বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প আমি চেষ্টা করি না। ফ্যান্টাসি লিখি। প্রকাশকরা বলেন কল্প-বিজ্ঞানের গল্প। কথাটা অদ্ভুত। পুত্র-কল্প মানে যদি পুত্রের মতো হয়, তাহলে কল্প-বিজ্ঞান মানে দাঁড়ায় বিজ্ঞানের মতো কিছু। অর্থাৎ ঠিক বিজ্ঞান নয়, তবে দেখলে বিজ্ঞান বলে ভুল হতে পারে। এ তো বড় সাংঘাতিক ব্যাপার !! ছোট ছোট পাঠক, যাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে প্রায় কোনো জ্ঞানই নেই, তাদের যদি এমন সব গল্প শোনানো যায় যা পড়লে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার বলে মনে হবে, কিন্তু আসলে তা নয়—তাহলে ঐ কচি পাঠকদের কপালে ভবিষ্যতে দুঃখ থাকতে পারে। তার চেয়ে সোজাসুজি আমি বলি 'আজগুবি গল্প'। ফ্যান্টাসি। তার মধ্যে যেটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্য পুরে দিই, সেগুলি বাস্তব সত্য। কিন্তু তাদের সম্ভাব্য পরিণামগুলো স্রেফ আজগুবি ব্যাপার। তার সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধ নেই, যে গল্প পড়বে সে-ই এ-কথা বুঝবে।

সত্যিকার বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লেখেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, অজেয় রায়, সঙ্কর্ষণ রায় এবং আরো কেউ কেউ। অদ্রীশ বর্ধনও বিশেষ করে বিখ্যাত বিজ্ঞান ভিত্তিক বিদেশী গল্প অনুবাদ করে। এ সব গল্পকে আমি অনেক উঁচুতে স্থান দিই। অতি ভালো জিনিস। যারা সব সময় চমক চায়, তারা কিন্তু বিজ্ঞান চায় না, অন্তত গল্পে চায় না। তারা সত্যজিতের গল্প, আমার গল্প পছন্দ করে। ফ্যান্টাসি। আজগুবি। পড়লে মন ভালো হয়। কল্পনা শক্তি চন্‌মন্ করে ওঠে। মজা লাগে। অন্তত আমার ঐ ধরনের গল্পের ঐ উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে যদি একটু ইকলজি বা পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠকদের সচেতন করে দেওয়া যায় তো মন্দ কি ? ঐ সচেতনতাটাই অনেকখানি। তবে একে বিজ্ঞান শেখানো বলে না। বিজ্ঞান শেখানো অত সহজ নয়। অনেক অনুশীলন চাই। এক বিখ্যাত লেখকের জনপ্রিয় বইতে এবং তার চলচ্চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল তেজস্ক্রিয় বস্তু পিণ্ডের চারধারে একটু ঘেরা আছে আর সবাই ভিড় করে সেটি দেখে, দিব্যি সুন্দর অক্ষত দেহে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে !! বিজ্ঞানের ব্যবহার বড় সাবধানে করা দরকার। নয়তো ফ্যান্টাসি লিখতে হয়, যাকে বিজ্ঞানের পাঠ বলে কেউ ভুল করবে না। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে হলে, আজগুবির ভারি একটা মাধুর্য আছে, অনেকটা কাব্যের মতো। মন ছাড়া পায়। অসীম অবাধের স্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু আজগুবিটাকে বুদ্ধির ঠেকো দিয়ে

রাখতে হয়। যাতে ননসেন্স হলেও, রাবিশ না হয়। মানব হৃদয়ের সব অনুভূতির জায়গা আছে আজগুবিতে। কিন্তু যতই অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাক না কেন, যুক্তি দিয়ে তাকে দাঁড় করাতে হবে। নিজের আজগুবির কাছে নিজে হার মানলে চলবে না। ভালো আজগুবির বই ছোটদের চেয়ে বড়রা হয়তো আরো বেশি উপভোগ করে। তাই করাই উচিত। নইলে বুঝতে হবে আজগুবিটা উৎরোয়নি।

ছোটদের ছবির বেলাও তাই। যে দুটি শিশু চলচ্চিত্র কমিটির সদস্যা ছিলাম, সে দুটিই ব্যর্থ হয়েছিল। ছবি যদি এমন হয় যে তার জন্য প্রেক্ষাগৃহ ভিক্ষে করতে হয়, এমন কি ছোটদের সঙ্গে যাবার লোক পর্যন্ত পাওয়া যায় না, তাহলে সে ছবি উৎরোয়নি। আমাদের দেশে সার্থক শিশু চলচ্চিত্র আঙুলে গোনা যায়। শিল্পের আর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছোটদের জন্য দিতে এক্ষেত্রেও আমরাও অনিচ্ছুক। যে দু-একজন দিয়েছেন, তাঁদের মাথায় তারার মুকুট পরানো উচিত। আমাদের সৌভাগ্য যে এমন লোকও আছে।

এমনি করে ১৯৭১, ৭২, ৭৩ কেটে গেল। ৭৪ থেকে আমাদের সুখ-শান্তিতে—এবং মাঝেমাঝে উত্তেজনাময় তর্কাতর্কিতে-ভরা জীবন যাত্রায় বাধা পড়ল। আমার স্বামীর চোখের কষ্ট শুরু হল। তাঁর কর্মময় জীবনে ছেদ পড়ল। তাঁর অবসর যাপনের দুটি প্রধান উপায়—ক্যালকাটা ক্লাব থেকে রাশি রাশি বই এনে পড়া এবং ইংরিজি, বাংলা ভালো চলচ্চিত্র এলেই গিয়ে দেখা—দুই-ই বন্ধ হল।

যাদের কোনো প্রিয় কাজকর্ম নিয়ে দিন কাটে, বয়স তাদের সহজে স্পর্শ করে না। ১৯৭৪ সালে আমার স্বামীর বয়স ৭৫, আমার ৬৪। বুড়ো হয়ে গেছি অথচ টের পাইনি। জেনেশুনে অস্বীকার করেছি তা নয়, ও বিষয়ে ভাবিনি, তাই টের পাইনি। এবার ভাবতে হল। আমার স্বামী প্রথমে অর্ধেক দিন প্র্যাক্টিস করতেন। বন্ধুবান্ধব ম্যাগনিফাইং গ্লাস এনে দিয়েছিলেন, তার সাহায্যে পড়তেন। অস্ত্র করার সময় হয়নি তখনো। মনে পড়লো তার ১২/১৪ বছর আগে সজনী দাসকে বেতারে ভাষণ দিতে দেখেছিলাম, আধ ইঞ্চি বড় হরপে লেখা পাণ্ডুলিপি ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পাঠ করে। কেমন একটা বেপরোয়া ভাব ছিল সজনীদার। সহজে পরাজয় স্বীকার করতেন না, নিজে ভুল করে ফেললেও, না। লোকে তাকে ভুলে যাচ্ছে। আমিও কতদিন দেখিনি। চোখে ভালো দেখছেন না তবু যেমন করে পারেন ভাষণ দিয়ে গেলেন।

নিজের চোখ বুজে ভাবতে চেষ্টা করতাম দেখতে না পাওয়া কেমন জিনিস। ওঁকে সাহস দিতাম ছানি তুলে দিলেই আবার আগের মতো দেখবে। চেনাজানাদের মধ্যে থেকে উদাহরণ দিতাম। বুঝতে পারি অন্যের কষ্টের কথা

শুনে মোটেই নিজের কষ্ট কমে না। বহুকাল ধরে মাসে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে এক সপ্তাহ থাকতাম। জীবনটা একটা প্যাটার্ণের মধ্যে পড়ে গেছিল। বন্ধুরা আশা করে থাকত। সব বন্ধ হল। এক বছর সেখানে যাওয়া হল না। তারপর একজন নামকরা ডাক্তার ডান চোখের ছানি তুললেন। সুস্থ হয়ে উনি বাড়িও এলেন। আরো পরে শান্তিনিকেতনেও যাওয়া হল। সকলে মিলে আনন্দ করা গেল। মনে আছে সেটা ফেব্রুয়ারি মাস। আমার জন্মদিনে ভাইবোনরা সবাই এসেছিল.। সেইদিন থেকে চোখে ব্যথা। সে ব্যথা আর সারল না; ঐ চোখটাকে বাঁচানো গেল না।

মনে আছে অন্য চোখটাতেও তত দিনে কম দেখেন। জয়ন্ত চৌধুরী আমাদের শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দিত, ছেলে গিয়ে নিয়ে আসত।এই প্রথম পর-নির্ভরশীল হলাম। যত ভালোবাসাই থাকুক। তারপর সব দুঃসময়ের মতো, এর-ও অবসান হল। কমবয়সী ডাক্তার সুনীল বাগচির যত্নে বাঁ চোখটি সুস্থ হল। মনে আছে আমার স্বামী অনেক দিন পরে আবার পৃথিবীর রূপ দেখে অবাক হলেন। ক্রমে এই সব কষ্টের স্মৃতি মনের মধ্যে ক্ষীণ হয়ে এল।

১৯৭৪-তে আমার ৬৬ বছর বয়স। সবাই ততদিনে কাজ শেষ করার কথা ভাবে আর আমি ভাবি কি কি করা বাকি আছে। কয়েকটা আক্ষেপ মনে মনে পুষে রেখেছি। নিজের ওপর আক্ষেপ। ছবি আঁকাটা ছাড়া ঠিক হয়নি। ভালো করে সংস্কৃত পড়া উচিত ছিল। এই সব। তার বদলে বই-বই করে মেতে উঠেছি। ছোটবেলা থেকে কিছু তৈরি করতে, কিছু গড়তে, কিছু বানাতে ভালোবাসি। আগে এই ভালোবাসাটাকে বাগ মানাতে পারতাম না, ঠিক বুঝে উঠতেও পারতাম না। স্কুলে তখনো ভরতি হইনি, হয়তো পাঁচের নিচে বয়স। পাশের বাড়িতে পাহাড়ি সান্যালের শ্বশুর শাশুড়ি থাকেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা আমাদের বয়সী। একসঙ্গে খেলাধূলা করি। একদিন বিকেলে দাদা আর আমি গেছি ওদের বাড়ি। ওদের মা ছাড়া কেউ বাড়ি নেই। দাদা চলে আসতে পারলে বাঁচে। আমার চেয়ে দু-বছরের বড়, ওর শাসনও মানি না। ভালোমানুষ। কি যেন মনে হল, মাসিমাকে বললাম, 'দাদাকে আমাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছিল।'

শুনে মাসিমার চেয়েও দাদা বেশি অবাক। আমাকে টেনে নিয়ে যাবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগল। আমি গ্যাঁট হয়ে বসে, লম্বা এক কাহিনী পেশ করলাম। কি নিষ্ঠুর ডাকাতরা, কি আশ্চর্য সাহস দেখিয়ে আমরা—বিশেষ করে আমি—শেষ পর্যন্ত নিজেদের মুক্তি সাধন করলাম। দাদার মুখে কথা নেই। কোনমতে আমাকে নিয়ে বাড়ি এল। কাকেও কিছু বলল না। ও না বললেও মাসিমা মাকে এসে বিস্তারিত গল্প করলেন। তিনি সব বিশ্বাস করেছিলেন। পরে মা আমাকে

খুব বকাবকি করলেন, 'ছিঃ, এতগুলো মিথ্যা কথা বলে এলি !' কিছুতেই বুঝলেন না বানানো গল্প আর মিছে কথা এক নয়। মনে আছে বকুনি খেয়েও আমি উল্লসিত। মাসিমা তাহলে সব বিশ্বাস করেছেন !! মা বললেন, 'বানানো গল্প বললে আগে বলে দিবি এটা সত্যি নয়। নইলে মিছে কথা বলা হয়।'

এই কথাটা আমার খুব পছন্দ হয়নি। সারা জীবন বানানো গল্প লিখে কাটিয়েছি। অনেক সময় সত্যিকার সামগ্রী দিয়ে। ভাবি—যা হয়েছে তা সত্যি বটে। যা হয়নি, কিন্তু যে-কোনো সময়ে হতে পারে—তাই বা মিথ্যে হবে কেন ? ঐ সব বানানো গল্পের জোরে কত যে বন্ধু লাভ করেছি তার ঠিক নেই। কত পাঠক, কত লেখক, কত সম্পাদক আর প্রকাশক। ও-সব গল্প দুঃখ ব্যর্থতার ওষুধ। সুখের বাড়। প্রথম প্রকাশক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের কথা বলেছি। দ্বিতীয় প্রকাশক দিলীপ গুপ্তের কথাও বলেছি। তারপরের প্রকাশক এশিয়ার মৃণাল দত্তর দাদা বৌদি এবং তারা বিদেশে চলে গেল। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের ত্রিদিবেশ বসু ও তাঁর দক্ষ সহকারী জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দিলীপ কিন্তু সবার সেরা। সে শুধু আমার বই ছেপে বের করত না। ডুবুরি নামিয়ে মনের কথা তুলে আনত। তাকে ভুলতে পারি না। সে সময়ে আমার সব লেখা হয় সিগনেট প্রেস্, নয় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের হাত দিয়ে বেরোত। অন্য কারো কথা ভাববার কথা মনেও হত না। সেকেলে বইয়ের সামান্য দাম হত, রয়েল্টির অঙ্ক ছোট হত। কিন্তু সিগনেট বৎসরান্তে নিয়মিত হিসাব, রয়েল্টি ও এক বাক্স সন্দেশ বাড়ি দিয়ে যেত। আর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের জিতেনবাবু পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করেই সেই সংস্করণের ২০%হিসাবে রয়েল্টির সবটাই অগ্রিম দিয়ে দিতেন। রয়েল্টি নিয়ে যে মনভেদ হতে পারে, তা-ও জানতাম না !

ছোট বড় অন্য প্রকাশকদের কথা এর পরে বলব। ১৯৭৩ সালের একটা কথা এখানে না বললেই নয়। সে বছর দিল্লীর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কলকাতায় প্রথম সর্ব-ভারতীয় বই-মেলা করলেন। খোলা ময়দানে নয়, অতটা সাহস তখনো হয়নি, ময়দানের পাশে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন্ আর্টসে। আমার পুরনো বন্ধু মোহিনী রাও ওঁদের সম্পাদক। ভারি করিৎকর্মা মানুষটি। সাদাসিধে, দক্ষ এবং বন্ধুবৎসল। তার থাকার অসুবিধা হচ্ছে খবর পেয়ে আমাদের বাড়িতে ধরে আনলাম এবং ফলে নিজেও বই-মেলায় জড়িয়ে পড়লাম।

এ যে কি আনন্দের ব্যাপার, আগে বুঝতে পারিনি। এখন প্রতি বছর বাংলার নানা জায়গায় কত বইমেলা হয়। আগে কেন এর কথা মনে হয়নি, তাই ভাবি। লাভ না হলেও, চমৎকার বিজ্ঞাপন হয়। আমরা সন্দেশ কার্যালয়ে ও নিউস্ক্রিপ্টের সহযোগিতায় প্রায় প্রত্যেক বছর শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় বইয়ের দোকান দিই। অন্যান্য পুস্তকালয়ও দেন। গ্রামের আর ছোট শহরের

ছেলে মেয়েদের আর তাদের অভিভাবকদের প্রতিক্রিয়া একটা দেখবার জিনিস। যারা বলে বাংলার প্রাণ নেই, তারা কিছুই বোঝে না। একাধারে আমোদের আর শিক্ষার এমন আয়োজন আর কোথায় হতে পারে?

এমনি করে ১৯৭৫ সাল এসে গেল। আমরা ক্রমে ক্রমে কলকাতার পাট তুলে, শান্তিনিকেতনবাসী হবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। ঝপ্ করে নয়, অল্পে অল্পে।

॥ ১৬ ॥

এখন মনে হচ্ছে ১৯৭৩ সালকে অত অল্পে বিদায় করা যায় না। তার একটা বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সে বছর আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর নারীরা নাকি এত দিনে স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত হলেন। এখন থেকে কেউ তাঁদের স্বীয় নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। মূল সভা বসেছিল আর্জেন্টিনা না কোথায় যেন। সভাপতি ছিলেন একজন পুরুষমানুষ। অকুস্থলে রাজনীতিঘটিত বিক্ষোভ হয়েছিল। এঁরা তবু সাহস দেখিয়ে সভা করেছিলেন। ভাবলেও হাসি পায়। আমাদের দেশেই সবার আগে সব মেয়েরা—তা যতই নিরক্ষর হক না কেন—ভোটাধিকার পেয়েছিল আর নারীবর্ষের ১০ বছর পরেও আমাদের দেশের শ্বশুরবাড়ির লোকরা যথেষ্ট যৌতুক না পেয়ে অসহায়া ছেলেমানুষ বৌগুলোকে পুড়িয়ে মারছে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন ঘটনা হয় না। বলা বাহুল্য আন্তর্জাতিক সভায় আমাদের প্রতিনিধিরাও ছিলেন।

ভাবি নিজেদের দেশকে আমরা আর ভালোবাসি না বলেই এমন হতে পারে। দেশকে ভালোবাসি না, ধর্মকে মানি না। সদসৎ বিচার হারিয়েছি। নীতি-শিক্ষাকে বিদ্রূপ করি। স্কুলপাঠ্য থেকে তাকে তুলে দিয়েছি। বিধাতাকে ভক্তি করি না। দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ এসবকে দুর্বলতা মনে করি। লোভ আর ভোগ ছাড়া সব ছাড়তে প্রস্তুত। তাই আমাদের সুন্দর দেশের এই দশা! তবু মনে হয় এ ক্ষণিকের, এ কেটে যাবে, আবার সুবুদ্ধি হবে, আবার মানুষ হব। আরো আলো আছে দিগন্তের নিচে। নারীবর্ষ বলতে এত কথা বেরিয়ে এল। প্রতি বছর যেন নারীবর্ষ হয়।

তা সেই বছরে মনে ভারি একটা উৎসাহ এসেছিল। 'কথা-সাহিত্যে' একটা ধারাবাহিক ছোট উপন্যাস লিখে ফেলেছিলাম। কিছুটা বাস্তব পরিবেশ নিয়ে। চরিত্রগুলির কেউ কেউ সত্যি মানুষের ছায়া। নাম দিলাম 'যাত্রী'। স্বাধীনতার পথে তো আর থেমে থাকা যায় না। সব সময় চলতে হয়, তাই যাত্রী। চলার পথের যাত্রী। সে বই মিত্র-ঘোষ গত বছর প্রকাশ করলেন। প্রথমে ভেবেছিলাম বড় বেশি দেরি করে ফেললেন। এখন বুঝেছি যদি দয়া, ক্ষমা, উদারতা,

সৎসাহসের কথা বলতে হয়, তবে এই হল তার সময়। যদি বলিষ্ঠ হতে হয়, ন্যায়ের পথ ধরতে হয়, তবে এই হল যাত্রীদের বেরিয়ে পড়ার সময়। আলো আছে দিগন্তের নিচে।

মনে আছে ঐ বছর রবীন্দ্রসদনের বিশাল প্রেক্ষাগৃহে কলকাতার কয়েকজন উৎসাহী মেয়ে, শ্রীমতী চিত্রা ঘোষের নেতৃত্বে মস্ত এক সভা করেছিল। সেই সভায় পুণ্যলতা চক্রবর্তী, গিরিবালা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, শান্তা দেবী ও সীতা দেবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেওয়া হল। তাঁরা সবিনয়ে অল্প কিছু বললেন। শুনে সবাই মুগ্ধ। ঘরে লোক ধরে না। এমন সুন্দর সুপরিচালিত অনুষ্ঠান এ শহরে খুব বেশি হয়নি, এ কথা অনেকে বলেছিলেন। সব ব্যবস্থাপনা খরচপত্র মেয়েরাই করেছিল, আমি শুধু অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাটি এঁচে দিয়েছিলাম।

ঐ সভার কথা ভাবলে মন ভালো হয়ে যায়। এই দশ বছরে শান্তাদেবী আর জ্যোতির্ময়ী দেবী ছাড়া সকলেই একে একে বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের জায়গা কে নেবে তা ভেবে পাই না।

আরো কত কথা মনে পড়ছে। আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে বোধ হয় ঐ সময়েরি কাছাকাছি এবং ঐখানেই মস্ত অনুষ্ঠান হয়েছিল। দুঃখের বিষয় উপলক্ষ্যটা কি তা ভুলে গেছি। চমৎকার স্মারক-সংখ্যা প্রকাশ করে সভায় ওঁরা বিতরণ করেছিলেন। তাতে আমি 'স্বাধীনতা লিব্ নয়' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধে আমাদের দেশের মেয়েদের সচেতন করে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। যাক সে-সব দুঃখের কথা। আমার স্বাধীনতাই পছন্দ, লিব্ দিয়ে কি হবে ? সভ্যতাই আমার যথেষ্ট, আধুনিকতা নিয়ে কি করব ? আজ যা আধুনিক, পাঁচ বছর পরেই তা সেকেলে হয়ে যায়। তাছাড়া পেট বের করে কাপড় পরতে আমার লজ্জা করে, তাই আর আধুনিক হওয়া হল না। এবং যারা নিজেদের বাড়ির সেবা করাকে দাসীগিরি বলে, তারা আবার আধুনিক কোথায় হল ? দাসী তো সেকেলে জিনিস। বাড়ির সেবা চিরকালের।

স্কুল কলেজের বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই চলে গেছে। মীরা দত্তগুপ্তা, কল্যাণী ভট্টাচার্য, এরাও গেল। আমি তবু ভাবি হাতের কাজগুলো শেষ হলে, আসছে বছরে কি কি করব। পুরনো ব্যক্তিগত বন্ধুদের সংখ্যা খুব কমে গিয়েছে। তবে নিজের ভাইবোনেরা, মাসতুতো পিসতুতো জ্যাঠতুতো ভাইবোনেরা অনেকে এখনো আছে। তাদের কথা ভাবলে শিরার মধ্যে রক্ত উদ্বেল হয়ে ওঠে। আমার দিদিমার, ঠাকুমার রক্ত এদেরো শিরায় বইছে। দেখা হক না হক, এরা আমার আপনজন, আমার জন্মগত উত্তরাধিকার।

তবে আপনজন আরো আছে। যারা আমার জীবনকে ভরপুর করে রেখেছে।

তাদের নইলে আমার চলে না। এরা আমার প্রকাশক, সম্পাদক, পাঠক, আমার প্রিয় পত্রিকা সন্দেশের লেখক আর অগুন্তি উটকো মানুষ, যারা নিজের থেকে আমার চারদিকে জুটেছে। কিছু চায় না তারা খালি সঙ্গ দেয়, সঙ্গ নেয়। অনেকে গ্রামের মানুষ, কিম্বা দূরের কোনো ছোট শহরের। তাদের আগে হয়তো কখনো দেখিনি, এখন তারা আমার জগৎটিকে ভরিয়ে রাখে। লেখে কেউ কেউ, ভালো লেখে কয়েকজন। পড়ে প্রায় সকলেই। এদের কথা আরো বলব।

প্রকাশকদের কথা শেষ হয়নি। অনেকে বলেন তাঁরা মন্দ লোক। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য লেখকদের ঠকিয়ে নিজেদের পকেট ভরানো। হিসাব দেন না, রয়েল্টি দেন না। বারবার চাইতে হয়। আমি প্রকাশকদের বন্ধু বলে মনে করি। তাঁদের নইলে আমার চলে না, আমি নইলে তাঁদের চলে না।

এক সময় ছিল যখন বইয়ের দাম ছিল কম, এক টাকা. কি দু টাকা, কি আরো অনেক কম। গোটা সংস্করণের পাওনা হত হয়তো ৩৫০ টাকা। লিখতামও না এত বেশি। নানা সাংসারিক কাজের চাপ ছিল। আমার দুটি ছেলেমেয়ে ছাড়া, ভাগ্নীর তিনটি মেয়ে ছিল। সবাই বাড়িতে আমার কাছে পড়ত। ঐ সব চলত রাত ৮½ টা অবধি। তারপরে খাওয়া-দাওয়া চুকলে, আরো রাতে নিজের ঘরে নিরিবিলিতে বসে সাহিত্যসাধনা করতাম। আমার স্বামী বই পড়তেন। হয়তো ১১টার পরে আলো নিবিয়ে দিতাম।

নিরিবিলি বলতে, বন্ধুরা ভাবতেন যে-মানুষ পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়ে বাস করে, সে আবার নিরিবিলি কোথায় পায় ? আসলে যান্ত্রিক গোলমাল আমার কানে পৌঁছলেও মনকে স্পর্শ করত না। কিন্তু বাড়িতে এতটুকু অশান্তি হলে, লেখা মাথায় উঠত। এই পরিবেশে আমার সব বড়দের গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। পরে সাংসারিক অশান্তিও আমার মনের নাগাল পেত না। কলম নিয়ে বসলে সব কিছু দূরে সরে যেত। এখনো তাই হয়। খালি শরীর খারাপ হলে, দুশ্চিন্তা হলে আর গুমোট গরমে পাখা বন্ধ হলে, লিখতে পারি না।

প্রকাশকদের কথা বলতে এত কথা উঠল। বলেছি তো রয়েল্টি জিনিসটার খুব গুরুত্ব ছিল না। বছরে দেড় হাজার টাকা রয়েল্টি পেলেও সন্তুষ্ট থাকতাম। খালি কেউ যদি ফাঁকি দিত, খুব রাগ হত। কড়া চিঠি লিখতাম। একবার আমার সম্পর্কে ভাগ্নে দুর্গা চক্রবর্তী তিনজন অবুঝ প্রকাশকের কাছ থেকে সব রয়েল্টি তিনদিনে আদায় করে দিয়েছিল ! ওর একটা কায়দা আছে, আমার রপ্ত হয়নি। ঐ দু-একজন উটকো প্রকাশক ছাড়া রপ্ত করার দরকারও হয়নি। কিন্তু কারো সব দিন সমান যায় না। আমারো যেমন সংসারের চাহিদা বাড়ল, ওঁর শরীরও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা কর্মক্ষমতা হারাল, তখন রয়েল্টিগুলোর গুরুত্বও বাড়ল।

ততদিনে সিগনেট প্রেসের আকাল শুরু হয়েছে। দিলীপকে প্রথমে অন্য জায়গায় চাকরি নিতে হল। তারপর গুরুতর ভাবে অসুস্থ হয়ে, শেষ পর্যন্ত অকালে চোখ বুজল। সিগনেট প্রেসের দুর্দিন শুরু হল। দিলীপের শাশুড়ি নীলিমা দেবী সংস্থাটির পুরনো ঐতিহ্য রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সবই বৃথা হল। ক্রমে অবস্থা আরো পড়ে গেল। আমার প্রথম দুটি সার্থক বই 'দিন দুপুরে,' 'পদিপিসির বর্মী বাক্স' এবং বড়দের প্রথম দুটি উপন্যাস এককালে জনপ্রিয় 'শ্রীমতী', 'জোনাকি' আর আমার বাবার অতুলনীয় 'বনের খবর' ওঁদের হাতেএক সময় এত মান মর্যাদা পেয়েছিল, এখন তুলে নিতে মন সরছিল না। আজ পর্যন্ত 'দিন দুপুরে' আর 'পদিপিসি' ওঁদের হাতেই রয়েছে। নীলিমাদেবীও নেই। দিলীপের স্ত্রী নন্দিনী আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সাফল্য আসুক তাদের।

যখন বেতারে ঢুকলাম, আমার বয়স ৪৮, কিন্তু প্রকাশক বলতে ঐ একজন। তার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারত ? দুঃখের বিষয় তাঁদের মন্দ সময় এল। প্রেমেনবাবু আমাকে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেডের জিতেনবাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। 'হলদে পাখির পালক' দিয়ে তাঁরা আমার বই ছাপা শুরু করলেন। জিতেনবাবু অন্যত্র যাওয়ার পর এঁদেরো ছোটদের বইয়ের কাজ একটু থিতিয়ে এল। আমাকে অন্য প্রকাশকের কথা ভাবতে হল। এইভাবে চক্রবৃদ্ধির মতো আমার প্রকাশকদের বৃত্ত বড় হতে লাগল। ১৯৬৮ থেকে মিত্র-ঘোষও আমার কিছু বই ছেপেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্বন্ধ।

তারপর আরো নবাগতরা আছেন, বিমলারঞ্জন, মৌসুমী, অন্নপূর্ণা, নাথ, শৈব্যা, নির্মল বুক এজেন্সি, বিশ্বভারতী, শিশুসাহিত্য সংসদ। এশিয়ার সঙ্গে ১৯৫৬ থেকে সম্পর্ক। মনে আছে দেখতে দেখতে সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক হয়ে গেল। এর মধ্যে একবার মহা অসুবিধায় পড়েছিলাম। হঠাৎ এক সঙ্গে অনেকগুলো টাকা ট্যাক্স বাবদ দিতে হবে। সবে বাড়ি তৈরি হয়েছে। পুঁজি প্রায় খালি। তখন কোথায় কি পাওনা আছে একটু ভেবে নিয়ে, শেষ মুহূর্তে কয়েকজন প্রকাশকের কাছে চেয়ে বসলাম এবং তাঁরা প্রায় সকলে রাতারাতি টাকাগুলো জোগাড় করে পরদিন সকালে আমাদের বাড়িতে নিজেরা এসে নগদ পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মনে আছে আমার মন ভরে গেছিল। এই তো বন্ধুর কাজ। এঁদের মধ্যে একজনের কথা না বলে পারছি না। বিমলারঞ্জনের সঙ্গে অল্পদিনের সম্পর্ক, একটিমাত্র বই ছেপেছেন। ছোট ব্যবসা তখন, হিসাব করে খরচ করতে হয়। তিনি অমনি একটা রুমালে খুচরো ও নোটে অনেকগুলো টাকা আমার হাতে দিয়ে গেলেন। হয়তো দোকানের দুদিনের সমুদয় বিক্রির টাকা।

এঁদের আমি ফেলি কি করে ? কেউ কেউ এমনিতে হয়তো বাকি ফেলে

রাখে, আমার দরকার হলেই দেয়। কেউ নিজেরা বিপদে পড়েছে, দিতে পারছে না। তবে জেনে শুনে বঞ্চিত করছে বুঝলে খুব রাগ হয়। হিসাবপত্র খুব একটা পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়নি আমার। আমাকে বঞ্চিত করা খুব শক্ত নয়। তবু করে না বিশেষ কেউ।

১৯৭৫ থেকে একটু একটু করে অনেকটা আমার নিজের অজ্ঞাতসারে আমরা শান্তিনিকেতনবাসী হয়ে গেছি। গত ৫ বছর খুব অল্প সময়ের জন্যই কলকাতায় যাই। সেখানে গেলেই আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। এদিকে আমি কলকাতার মেয়ে। সেখানে জন্মেছি। বারো বছর বয়স থেকে বাস করেছি। সেখানেই লেখাপড়া শিখেছি, বিয়ে হয়েছে, সমস্ত বিবাহিত ও কর্মজীবন কাটিয়েছি। কলকাতাকে আমি ভালোবাসি। কলকাতার কেউ নিন্দা করলে আমার কষ্ট হয়। কলকাতা হল পৃথিবীর সবচেয়ে নোংরা শহর, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। খুব নোংরা জায়গা আছে মানছি। সে-রকম নোংরা অন্য শহরেও আছে। পুরনো দিল্লীতেও খুঁজলে পাওয়া যায়। নোংরা দিয়ে কলকাতা তৈরি নয়। ইঁটকাঠ, কাচ আর ইস্টিল দিয়েও নয়। দুশো বছরের স্বপ্ন দিয়ে কলকাতা তৈরি। বাংলার শ্রেষ্ঠ চিন্তার জন্ম এইখানে। রাস্তা ঝাঁট না দিলে, কিম্বা কর্পোরেশনের গাড়ি না এলেও সে কলকাতা এতটুকু টসকায় না। তাছাড়া সমস্ত মধ্য কলকাতা আর ভবানীপুর বালিগঞ্জে আমি হেঁটে দেখেছি, বাজারের কাছে ছাড়া মোটেই সে-রকম নোংরা নয়। চৌরঙ্গীপাড়া আমি কি দারুণ ভালোবাসি। সব দোকানদারদের সঙ্গে আমার চেনা ছিল। সব দরকারের জিনিস হাত বাড়ালেই পেতাম। আর স্বপ্নের জিনিস আমাকে ঘিরে থাকত। খালি বিলাসিতা আর স্বেচ্ছাচারের পাড়া নয় চৌরঙ্গী।

সেই কলকাতা ছেড়ে শুধু আমার অসুবিধাই হয় না, কষ্টও হয়। সেখানে আমার ভাইবোন, ছেলে মেয়ে, কর্মসঙ্গীরা। সন্দেশ কার্যালয় সেখানে, শিশুসাহিত্য পরিষৎ সেখানে। শান্তিনিকেতন হাজার সুন্দর হলেও আমার আধখানা আমি কলকাতাবাসী। সত্যি সুন্দর জায়গা শান্তিনিকেতন। যে দিকে চাই, চোখ জুড়োয়। এই নিরিবিলি সাদাসিধে বাড়িটি আমার পরিকল্পনা মতো আমার তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল প্রায় ৩০ বছর আগে। এই ৩০ বছরের স্মৃতি এ-বাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আমার ৪৫ বছর বয়স থেকে এ আমাকে ক্রমে ক্রমে বুড়ো হতে দেখেছে। কত সুখ-দুঃখের সাক্ষী এ। তবু আমার সবখানি একে দিতে পারিনি। এখানে ৭ দিনে আমার 'হলদে পাখির পালক' লেখা হয়েছিল। 'খেরোর খাতা' এখানে লিখেছি। 'পাকদণ্ডী'র আগাগোড়ায় এখানকার জল-হাওয়া-মাটির গন্ধ লেগে আছে। গত ১০ বছরের বেশির ভাগ রসের গল্প, আজগুবির গল্প, কল্পবিজ্ঞানের গল্প এখানে, এই ঘরে, এই ডেস্কে বসে লেখা।

লেখা আবার কি ? সে তো শুধু শেষ পর্যায়টুকু। সব তৈরি হয়ে গেলে, তবে লেখা কাগজে নামে। তৈরি হয় মনে মনে। তার আবার এখানে ওখানে কি ? শিলং-এর সরলবনের মর্মরে আর ধূপধুনোর মতো সুবাসে যে-মন প্রথম সচেতন হয়েছিল, এ-ও সেই মন। একে নিয়েই আমার জীবন কেটেছে। এ কলকাতাতেও যা, এখানেও তা। তবে এখানকার শান্তি আর নৈঃশব্দ্য সেই মনের কথাগুলোকে কাগজে নামাতে সাহায্য করে। কেমন একটা প্রসন্নতা আছে এখানকার বাতাসে। বাতাসে, কি আমার নিজের জীবনে তা বলতে পারি না। লাভ-ক্ষতির হিসাব কষতে গেলে, গল্প লেখা হয় না আমার। যা পেয়েছি তাতে মন ভরে আছে, যা পাইনি তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি।

তবে একটা কথা আছে। এখানকার জীবনযাত্রা অনেক বেশি সরল এবং অকপট। বেশি উন্নত, তা বলছি না। বেশি নিরাবরণ। কৃত্রিমতার ইচ্ছা যদি বা কারো থাকে, তার স্কোপ কম। এই সরলতা ও অকপটতা সাহিত্যসৃষ্টির সাহায্য করে। কত ভালো ভালো লেখা লিখেছে কত লোকে এখানকার মাটিতে। খ্যাত অখ্যাত কতজন। আমারো লেখার যে সাহায্য হয়, তাতে সন্দেহ নেই। তবে সম্পাদক প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগের অসুবিধা আছে। শেষ প্রুফ দেখে দিতে পারি না, অনেক বইতে বহু ভুল ছাপা থাকে। আগে এমন হত না। ভুলগুলো মনকে পীড়া দেয়। সময় করে কোনো কোনো প্রকাশক এখানেও আসেন। কথা হয়, কিন্তু তাঁদের কাজে সহযোগিতা করা যায় না।

আগে যাঁরা সবচেয়ে কাছের ছিলেন, তাঁরা কালের ফেরে যেমন সরে গেলেন, তেমনি নতুন প্রকাশকদের পেলাম। সকলে খুব নতুন-ও নন। 'আনন্দ পাবলিশার্স' থেকে আমার বাতাস বাড়ি প্রকাশের কথা বলেছি। তাঁদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠতা হল। তাহলে আনন্দবাজারের কথা বলতে হয়। প্রয়াত অশোক সরকারের মা নির্ঝরিণী দেবী থেকে শুরু করতে হয়। শান্তিনিকেতনে আমাদের পাশের বাড়িটি ওঁদের। প্রথমেই নির্ঝরিণী দেবীর সঙ্গে চেনা হল। বুদ্ধিমতী, স্নেহশীলা। তখনো সাহিত্যের জগতে তত নাম হয়নি আমার। তবে আনন্দবাজারে গল্প লিখি বহু দিন থেকে। তখন একজন ছেলেমানুষ নীরেন চক্রবর্তী সলজ্জ ভাবে ফোন করে আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়ের জন্য গল্প চাইত। বলতাম 'কিসের গল্প' ? না, 'হয় ভূতের, নয় চোরের, নয় প্রেমের।' ভাবতাম এ ছেলে অনভিজ্ঞ হলেও গল্পের মর্মকথা বোঝে! কত যে ঐ রকম গল্প লিখে দিয়েছি, তার ঠিক নেই। সামান্যই বই হয়েছে। ভাবছি যাবার আগে ঐ সব চোরের আর প্রেমের ব্যাপারগুলো দিয়ে মোক্ষম একখানা বই করে ফেলব !

নীরেন চমৎকার কবিতা লেখে। ওর 'নীল নির্জনে'র জুড়ি নেই। আধুনিক কবিতা বলতে আমি এই জিনিস বুঝি। সহজ ভাষায় গভীর কথা। বেদনায়

বিধুর, আনন্দে ভরপুর। যা পড়লে সংসারের দুঃখ-কষ্টগুলোকে অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। সাহসী, সৎসাহসী। আমার নীরেনের কবিতার মতো। আর নানা চালাকি দিয়ে ভরা, চটকদার জিনিস এক পুরুষও টিকবে না। বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় ভরা।

আরেকজন আসত কি একটা পত্রিকার জন্য লেখা নিতে। বেশ একটা গালভরা নাম, স্বদেশ, কি স্বাধীনতা, কি ঐ ধরনের কিছু। বলত সম্পাদক বলেছেন টাকা দেবেন। কিন্তু সে টাকা ও নিজেই সম্পাদকের কাছ থেকে আদায় করতে পারত না, তা আমাকে দেবে কোত্থেকে! সুখের বিষয়, আমিও কিছু আশা করতাম না, রাগও হত না, মনেও থাকত না। দিনকাল অন্যরকম ছিল। মোটা চালের দাম ছিল চার টাকা মণ। কিন্তু গৌর ঘোষ বলে ঐ ছেলেটির মনে ব্যাপারটা খচ্খচ্ করত। সে আমাকে এড়িয়ে চলত। আমি নিজের এবং অপরের ৫/৬টা অপোগণ্ডকে সামলাতে এতই ব্যস্ত থাকতাম যে তাও লক্ষ্য করিনি। অনেক বছর পর গৌর নিজে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

তবে ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ ছিল আমার কাজের সময়। আগেও বলেছি লোকে যখন কাজ ছাড়ে, আমি কাজ আঁকড়ে ধরি। লোকের যখন সব কথা বলা হয়ে যায়, লেখা না ছাড়লেও ছাড়াই উচিত, সেই বয়সে পৌঁছে আমার না বলা কথাগুলো এত বেশি দেরি করার জন্য আমাকে গঞ্জনা দেয়। মনে হয় ঐ দশ বছরের মধ্যে, কিম্বা হয়তো বছর দুই আগে থেকেই অনেক কাজ সেরেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা বক্তৃতা দেওয়ার কথা বলেছি, আধা-শূন্য হলে। সে বক্তৃতার বিষয় ছিল অবনীন্দ্রনাথের শিল্প আর সাহিত্য। পরে বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছিলেন সুন্দর ছবি দিয়ে। শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতার বিষয় ছিল সুকুমার রায়। ঘর ভরা লোক শুনতে এসেছিল। সে বই মিত্র ঘোষ ছেপেছিলেন। এখন আমার রচনাবলী ৩য় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। এসব কথা আগেও বলেছি।

সংক্ষিপ্ত জীবনী যারা চায়, তারাও বলে পুরস্কার ইত্যাদির কথা লিখবেন। সারা জীবন ধরে দেখেছি যোগ্য ব্যক্তিরা সব সময় পুরস্কার পায় না, আবার অনেক সময় অযোগ্যরা পায়। মাঝে মাঝে অযোগ্য উপায়েও। কাজেই আমার পুরস্কার পাওয়াকে খুব একটা গুরুত্ব দিই না। আমার সতীর্থদের দেওয়া শিশুসাহিত্য পরিষদের ভুবনেশ্বরী পদক নিয়ে আমার সবচেয়ে বেশি গর্ব। সতীর্থদের সমর্থন পাওয়া খুব কঠিন। সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার, সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়ে আমার বা অন্য কোনো প্রাপকের লেখার কোনো উন্নতি না হলেও, আনন্দ হয়েছে যথেষ্ট। পাইনি শুধু সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার! আর পাবার সময়ও নেই। আক্ষেপও নেই। অবিশ্যি যে-বই কোনো পুরস্কার পায়, সে হাজার অযোগ্য হলেও হু-হু

করে বিক্রি হয়। পুরস্কার বা বিক্রি দিয়ে সাহিত্যের মাপ হয় না।

আমার 'রান্নার বই'য়ের কথা বলি। ছোটবেলা থেকে মা-কে দেখতাম 'মিসেস্ ডীন্স্ কুক্-বুক্' বলে একটা ইংরিজি বই থেকে কেক, বিস্কুট, পুডিং, মুরগীর স্ক্যালপ ইত্যাদি রোমাঞ্চময় নামের ও স্বর্গীয় আস্বাদের জিনিস করতে। কয়লার উনুনের ওপর একটা লোহার পাত ফেলে, তার ওপর বাক্স-তন্দুর চাপিয়ে ঐ সব হত। সব সময় সব উপকরণ পাওয়া যেত না। তখন মা বিকল্পের সাহায্য নিতেন। দিদি আর আমি জোগাড় দিতাম। দুজনারি ভারি কৌতূহল। আরো ছোটবেলায় শিলং-এ বাড়ির গাছে পীচ্, প্লাম, ন্যাসপাতি হত। বাড়ির পেছনে পাহাড়ের গায় নানা রকম বেরি হত। সেই সব তুলে এনে মা জ্যাম জেলি করতেন। হলুদ-সবুজ পীচ চিনি দিয়ে সিদ্ধ করলে গাঢ় লাল রং ধরত দেখে আশ্চর্য হতাম। তখনি শিখেছিলাম কোনো জিনিস খেতে হলে তাতে পারতপক্ষে জল দিতে হয় না। টক ফলের জ্যামে খানিকটা নুন দিতে হয় আর প্রায় ফলের সমান পরিমাণে চিনি দিতে হয়। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মেপে নয়, পেয়ালা করে মেপে। এই সব টুকরো পাঠগুলো মনের মধ্যে জমা ছিল। পরে নিজের সংসারে কাজে লাগিয়ে ভালোফল পেয়েছি। আমার বইতেও কিছু দিয়েছি।

লেখাপড়া নিয়ে জীবন কাটাই বলে ও সব কাজে আমার এতটুকু অরুচি নেই। ওগুলোকেও সৃজনশীল কাজ মনে করি। এবং মুখে যে যাই বলুক, কার্যতঃ দেখেছি শতকরা ৯০ জন লোক একটা ভালো ছবি দেখে যতই আনন্দ পাক, একটা নতুন রকম ভালো জিনিস খেয়ে তার শতগুণ আনন্দ পায়। সবাই স্বীকার করে না। মায়ের একটা রান্নার খাতা ছিল, কয়েকটা বাছাই জিনিস লেখা। আমি কখনো খাতা করিনি। মহিলাদের ইংরিজি মাসিক পত্রিকাতে নানা রন্ধন প্রণালী থাকলেও যে-সব উপকরণ, বাসনপত্র, যন্ত্রপাতির কথা থাকে, তা আমাদের মেয়েরা চোখেও দেখেনি। কিন্তু আমার স্বামীর কথায়, এক অ্যামেরিকাবাসী বন্ধু আমাকে ফ্যানি ফার্মারের রান্নার স্কুলের রান্নার বই এক কপি পাঠিয়ে দিলেন। একশো বছরের চল ঐ বইয়ের। প্রতি সংস্করণে সংশোধন ও সংযোজন। ঐ হল আমার কাল। দেখলাম মা-র সেই বিকল্প প্রয়োগের প্রচুর সুবিধা। কলকাতাই বাসন ও জিনিসপত্র দিয়ে, গ্যাস কিম্বা জনতা স্টোভে ঐ বই থেকে এবং বইয়ের বাইরে থেকে শত শত পরীক্ষা করে দেখলাম ভালোই উৎরোয়।

কি করে যে খবরের কাগজের লোকরা যা নেই তারো গন্ধ পায় জানি না। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে, পুজোর মুখে আনন্দবাজার থেকে ফরমায়েস এল মহালয়ার ড্র-আউটের জন্য 'পুজোর ক-দিন কি রাঁধব, কি খাব'—এই বিষয়ে

একটি লেখা দিতে হবে। তাই তো আমি চাই। এতে আমি অপমান বোধ করা দূরে থাকুক, ভারি গর্ব হল। আমি তাদের দলে নই যারা নিজের বাড়ির রান্নাঘরের কাজকে দাসীর কাজ বলে ঘেন্না করেন। এই প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। আমাদের সময়কার এবং তার ঠিক পরের যুগের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্তা মেয়েদের ঐ রকম মনোভাব থাকলেও, এখনকার আধুনিকারা সাহায্যকারীর আকালে এবং মাগ্যিগণ্ডার বাজারে, খুশি হয়ে শুধু রান্নাবান্না করে না, হাট-বাজার পর্যন্ত করে আনে। তাদেরি জন্য আমার ঐ খুদে লেখাটি। সহজ-প্রাপ্য উপকরণে (এক নুড়নুড়ি শাক ছাড়া) সহজ উপায়ে রান্নার নিয়ম। যাতে খেতেও ভালো হবে, খাদ্যগুণও নষ্ট হবে না, খেয়ে অসুখও করবে না। দিলাম রসিয়ে লিখে।

ঐ খুদে লেখাটির পর আমার এবং প্রকাশকদের মাথায় যে-সব চিন্তা ঘুরতে লাগল, তার-ই ফলে আমার রান্নার বই লেখা হল। দু বছর লেগেছিল। কারণ প্রণালীগুলো নিজে, কিম্বা আমার নির্ভরযোগ্য কারো দ্বারা রান্না করা এবং খেয়ে দেখা চাই। যতটা পারি আদি রচয়িত্রীদের পরিচয়ও দিয়েছি বইতে।

মজার কথা হল ঐ একটা বই থেকে আমি যত রয়েলটি পাই আর সমস্ত বই একসঙ্গে জুড়েও তা পাই না। শুনেছি এখানকার পুস্তকালয়ে একজন খদ্দের এসে রান্নার বইটি চাইতেই, আরেকজন বললেন 'এ বই নিশ্চয়, ঐ নামের সাহিত্যিকের লেখা নয়?' বিক্রেতা বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁরই।' সে ভদ্রলোক বললেন 'আশ্চর্য!' একজন দর্শক আর থাকতে না পেরে বললেন, 'কেন, আশ্চর্যের কি হল? যিনি বানিয়ে বানিয়ে এতগুলো গল্প উপন্যাস লিখতে পারেন, তিনি সামান্য একটা রান্নার বইতে কতকগুলো রান্না বানিয়ে লিখতে পারবেন না!' তাই শুনে আমার এক কম-বয়সী বন্ধু লাফাতে লাফাতে আমার কাছে রিপোর্ট করল! আমি বলি কি বানিয়ে বানিয়ে এতগুলো ভালো খাদ্যের প্রণালী লিখবার ক্ষমতা যদি আমার থাকত, তাহলে তো কথাই ছিল না। এসব হল বহু কালের বহু রাঁধিয়ের অভিজ্ঞতা আর অধ্যবসায়ের ফল।

সে যাই হোক, ঐ সময়, অন্নপূর্ণা প্রকাশনীর জন্য দুটি ইংরেজি বইয়ের বাংলা করে দিয়েছিলাম। একটি হল লালবিহারী দে-র ফোক টেলস অফ বেঙ্গল। অপরটি তাঁরই বেঙ্গল পেজেন্ট লাইফ। প্রথমটি ঠিক অনুবাদ নয়। অনেক গল্পের শুধু কাঠামো দেওয়া। বয়স্ক ইংরেজ পাঠকের জন্য লেখা। আমি কাঠামোতে দেহ গড়ে, ছোটদের উপযুক্ত করে দিয়েছিলাম। খুব জনপ্রিয় হয়েছে ঐ বই। দ্বিতীয়টি অনুবাদ। নাম দিতে চাইলাম 'বাংলার কৃষি জীবন'। তা প্রকাশকের পছন্দ হল না। নাম দিলেন 'গ্রাম-বাংলার উপকথা'। বইটি কৃষি বিদ্যার্থীদের অবশ্য পাঠ্য। অথচ নামের জন্য তাঁরা বইটির খবর রাখেন না।

দু-তিন জায়গায় একটু সংশোধন করেছি, নইলে মূল বইটি অক্ষুণ্ণ আছে। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হল বাংলার গ্রাম গত দেড়শো বছরে এতটুকু অগ্রসর হয়নি। টিপ-কল আর অকেজো বিজলি তার ছাড়া।

অনুবাদের কথা বলতে হয়, কারণ আমি ভাবি পৃথিবীর সব ভাষায় শ্রেষ্ঠ রচনার অন্য সব ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত। শুধু উড়োজাহাজ বেতার টি ভি নয়, তার চেয়েও মানবজাতির বড় সম্পদ মানুষের লেখা বই, পুঁথি। অনেক অনুবাদ করেওছি। সব যে খুব মনের মতো বই তাও নয়। এক আধটা স্রেফ আর্থিক কারণেও করেছি, তবে খুব কম। হয়তো চমৎকার সাহিত্যকর্ম, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের মনের মতো নয়। আমাদের প্রফেসার প্রফুল্ল ঘোষ বলতেন, সাহিত্যে অচল বলে কিছু নেই। যা কিছু মানুষ চিন্তা করে, তার সবই সাহিত্যের উপকরণ হতে পারে। সব নির্ভর করছে সেই উপকরণের ব্যবহারের উপর। কলম যেন নির্মল থাকে।

আগরতলার ঝরণা প্রকাশনীর জন্য ঈনিড ব্লাইটনের দশটি বাছাই করা ছোটদের রহস্যের বই অনুবাদ করে দিয়েছি। মূল বইগুলি ভবিষ্যৎ লেখকদের পথ দেখাতে পারবে। ঝরঝরে ভাষা, কৌতূহলোদ্দীপক রহস্য, বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধান। রহস্যের বই লেখাও একটা শিল্প বিশেষ। গালিভারের ভ্রমণবৃত্তান্তের কথা আগেও বলেছি। হেমিংওয়ের 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী' করেছি। চিল্‌ড্রেন্স বুক ট্রাস্টের অনেক বই করে দিয়েছি। পড়ুক সবাই। কোথায় কি ভালো লেখা হচ্ছে, জানুক। বন্ধুরা বলেন, 'কেন অনুবাদ করে সময় নষ্ট করছ ? মৌলিক গল্প লিখলে কি অনেক ভালো হয় না ?' তাই কি ? অন্য কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ বইয়ের চেয়ে আমার মৌলিক বাংলা বই অনেক ভালো হবে, এ-কথা বলতে পারলাম না। এইটুকু বলি সব কৃতিত্ব মৌলিক লেখকের, অনুবাদক কেউ না, বাহকমাত্র। অনুবাদ করে খুব একটা আনন্দও পাই না।

হয়তো ১৯৭২-৭৩ থেকে মাঝেমাঝে আমাদের চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে একজন ফরসামতো, অমায়িক ও বিনয়ী মানুষ দেখা দিত। কি, না আমার একটা ছোটদের বই ছাপবে। খুদে বই হলেও আপত্তি নেই। বড় হলে তো কথাই নেই। আমি সর্বদা ভালোমন্দ কথা বলে ভাগিয়ে দিই। অমনি চলে যায়, কখনো রাগ বা ক্ষোভ প্রকাশ করে না। ৬ মাস ৮ মাস পরে আবার আসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটু গোলগাল, অতি ভদ্র মানুষটি। ওর ওপর কেমন মায়া পড়ে গেল। সে লোকটি বিমলারঞ্জন চন্দ্র।

সে সময়ে অমৃতে আমার পাকদণ্ডীর প্রথম পর্যায়ের তিন পৃষ্ঠা করে প্রতি সপ্তাহে বেরোয় আর যুগান্তরে 'খেরোর খাতা' বেরোয়। বিমলা মাঝে মাঝে ওগুলোর কথা বলত, আমি বলতাম পাকদণ্ডী ছোট প্রকাশককে দেব না, খেরোর

খাতার বিষয়ে কিছু স্থির করিনি। তার বদলে বিমলাকে হাতির গল্পে ভরা হাতি! হাতি! বইখানি দিলাম। গল্পগুলো আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। কতক শুনেছি, কতক কাগজে পড়েছি, কতক আমার চেনা জানার মধ্যে ঘটেছে। তাপস দত্তর আঁকা সুন্দর ছবি দিয়ে, সুন্দর বই করল। পাঠকরাও খুব পছন্দ করল। ততদিনে 'খেরোর খাতা' শেষ হয়ে গেছে। তাপসকে দিয়ে, তার ছবিও আঁকিয়েছি। শেষটা বিমলাকেই দিলাম। সে খুশি হলেও, এতদিন ফেলে রাখল যে আমি ধৈর্য হারিয়ে তুলেও নিলাম। ১৯৭৮-এ ঐ বই 'আনন্দ পাবলিশার্স' প্রকাশ করেছেন। বিমলাকে পর পর আরো দুটি বই দিলাম, 'আরো ভূতের গল্প' ১৯৮১ আর সন্দেশে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত 'ভূতোর ডাইরি' ১৯৭৯। ভালো করে সব বই ছাপে বিমলা। তবে ছোট প্রকাশকদের যে অসুবিধা বিমলাকেও তার সম্মুখীন হতে হয়। বিজ্ঞাপনের বড় বেশি খরচ। ফলাও করে যেসব বইয়ের বিজ্ঞাপন বেরোয়, সেগুলোই বেশি বিক্রি হয়। তা সে ভালোই হোক কি মন্দই হোক। বিমলা কখনো আনাড়ি বই প্রকাশ করে না।

ততদিনে আমরা শান্তিনিকেতনবাসী হয়ে গেছি। গোড়ায় হয়তো ৬ মাস এখানে ৬ মাস ওখানে করতাম। তারপর কলকাতার মেয়াদ কমতে কমতে তিন মাসে দাঁড়াল। আমার যা লিখবার, তা কলকাতাতেও যেমন, এখানেও তেমন করা যায়। কিন্তু খোপ-খোপ দেওয়া ৪৮ বছরের পুরনো ডেস্কটার জন্যও মন-কেমন করে। ভাবি গোল চেয়ারটি হলেও বেশ হত। হয়তো ৩০ বছর আগে রাসেল স্ট্রীটে একটা পুরনো আসবাবের দোকান থেকে ৪০ টাকা দিয়ে কিনে এনেছিলাম। আনা-নেওয়ার অসুবিধা আছে, তবু ভাবি ও-দুটোকে নিয়ে এলেও হয়।

আমার স্নেহাস্পদ সমরেশ বসুর ছেলে দেবকুমার। সে কলকাতায় আমার সঙ্গে আলাপ করল। ওদের প্রকাশনীর নাম মৌসুমী। তাদের আমার ছোটদের আরব্য রজনী দিলাম। আগে অন্য প্রকাশক নিয়েছিল। তার ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য আমাকে না বলেই দেবকুমারকে পাণ্ডুলিপি দিয়ে দিয়েছিল। দেবকুমার এসে সব কথা বলে আমার অনুমতি নিয়ে সুন্দর করে বইটি প্রকাশ করল। রয়েলটির সবটাই আমাকে অগ্রিম দিয়ে গেল। আমি এত খুশি হলাম যে খানিকটা রিবেট দিয়ে দিলাম! ঐ বইয়ের তিনটি সংস্করণ হয়ে গেছে। চতুর্থ-ও হবে। অরেকটি বইও দু-খণ্ডে প্রকাশ করেছে। সেটি হল ছোটদের জন্য দেশ-বিদেশের সেরা গল্প। অনুবাদ নয়। গল্পগুলির সারাংশ সরস বাংলায় লেখা।

বয়স থেমে নেই, তবে ঐ যা বললাম, টের পাই না। প্রায় তিন বছর আগে আমার দাদা কলকাতায় পথের দুর্ঘটনায় মারা গেল। দাদা ছাড়া জীবন আমি

ভাবতে পারতাম না। আমার চেয়ে দু-বছরের বড়। চুপচাপ, 'তীক্ষ্ণ মেধা, অমন অংকের মাথা আর দেখলাম না। ছোটবেলা থেকে যত সব জটিল অংক জলের মতো করে বুঝিয়ে দিত। পেশায় স্ট্যাটিস্টিশিয়ান। ক্রিকেট খেলা বিষয়ে এত জ্ঞান কম বাঙালীর দেখা যায়। সেই দাদা স্কুটারের ধাক্কায় মাথায় চোট লেগে, মারা গেল।

পড়াশুনো ভালোবাসত। গল্প লিখত। বিজ্ঞান-নির্ভর বাস্তব গল্প। তার একটির নাম 'তুষারমানবের সন্ধানে'। তিনটি সংস্করণও হয়েছে। পরেরগুলি বিমলা করেছে। আরো দুটি গল্প 'গ্রহের অবসান' আর 'অন্য গ্রহের আমি' ধারাবাহিক ভাবে সন্দেশ ও অন্য কাগজে বেরিয়েছে। বই হয়নি। বড্ড বেশি জটিল তথ্যে ভরা। ভাবি একটু সরস করে পুনর্লিখন করে দিই। দাদা রসটসের ধার ধারত না। আমাকে বলত তুই লিখে দে নতুন করে। ভাবি অই দেব। যদিও আমার বিজ্ঞানের বিদ্যা খুব গভীর নয়।

দাদা নেই এ-কথা মেনে নিতে কিছু দিন লাগল। তার মধ্যে আমার মেজ ভাই কল্যাণের টি-বি হল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে ওর আট মাস সময় আর বারো হাজার টাকা লাগল। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম মরণের দোরগোড়া থেকে কেমন দিব্যি সুন্দর ফিরে এল। না বলে দিলে এখন কেউ বুঝবে না সে বিপদের কথা।

আমার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনি ভাই-বোন কলকাতায় থাকে। আমরা এখানে থাকি। খুব সুখে থাকি। তবু বলেছি তো মনের অর্ধেকটা সেখানে পড়ে থাকে। লেখার কোনো অসুবিধা হয় না। আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু, মৌসুমীর দেবকুমার, বিমলা, অন্নপূর্ণার অজয় দাশ, নাথ ব্রাদার্সের সমীর, শৈব্যার রবীন বল, নবম-দশমের নীরদ হাজরা, এবং আরো অনেকে দরকার হলেই এসে যায়। অসুবিধাকে ওরা ভয় পায় না। আনন্দ পাবলিশার্সের বাদলের কথা বলি। লম্বা শ্যামলা মানুষটি, বয়স বেশি নয়। কত তা বলতে পারছি না, কারণ পঞ্চাশের নিচে সবাইকে আমার ছেলেমানুষ মনে হয়। পঞ্চাশের ওপরের কাউকে কাউকেও। বাদল হল বুদ্ধিমান ও সহৃদয়। প্রকাশকের কাজ খুব সহজ নয়। বিশেষ করে যদি সে কোনো বিশাল সংস্থার কর্মচারী হয়। তখন তাকে কতকগুলো বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে যেতে হয়। ইচ্ছামতো ঝুঁকি নিতেও পারা যায় না। দিলীপ গুপ্তর ব্যাপার ছিল আলাদা। সে স্বাধীনভাবে কাজ করত। লাভ-লোকশান দুই-ই বহন করত। নতুন লেখক খুঁজে বেড়াত। পুরনো লেখকদের অনুপ্রেরণা দিত। আমি তার চেয়ে ১০ বছরের বড়, আমাকেও বারবার বলত, 'আপনার মধ্যে কি সম্পদ আছে, আপনি নিজেই জানেন না। সব উজাড় করে দিন।' অমন আর দেখলাম না। আমার নতুন

প্রকাশকরা ও-কথা বলার সাহস না পেলেও, সম্ভব হলেই সুযোগ করে দেয়। বাদল তো বটেই।

মনে আছে তিন বছর আগে নববর্ষে তাদের আপিসে গিয়ে দেখি বাদল, ফণীবাবু, অভীক তো আছেই, উপরন্তু পূর্ণেন্দু পত্রীও আছে। আমি বললাম, 'তোমাদের আগ্রহ থাকে তো একটা প্রস্তাব দিই।' ওরা বলল, 'খুব আগ্রহ, বলুন কি প্রস্তাব।' তখন আমি সেরা সন্দেশ প্রকাশের কথা পাড়লাম। নতুন সন্দেশের ১৯৮১-এ ২০ বছর পূর্ণ হল। এই কুড়ি বছরে প্রকাশিত রচনা থেকে বাছাই করে একটি বড় বই ওরা প্রকাশ করতে রাজি কি না। রয়েলটির ভিত্তিতে। তক্ষুণি রাজি। বাদলের কি উৎসাহ। তাই দেখে আমার উৎসাহ আরো জোর পেল। লেখা আমরা দেব, বাছাই করে। সব খরচ এবং দায়িত্ব ওদের। তখুনি রাজি এবং যত শীঘ্র সম্ভব কাজ আরম্ভ। সকলে মিলে খেটেছিলাম। সত্যজিৎ সব নতুন ছবি, প্রচ্ছদ, লেআউট করে দিয়েছিল। বই করতে কত খরচ পড়েছিল ভাবতেও সাহস হয় না। সন্দেশ পত্রিকা সেই প্রথম সংস্করণে ৩০ হাজার টাকা রয়েল্টি পেয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন দামটা বড্ড বেশি, রিবেট পেলেও অনেকে কিনতে পারবে না। কিন্তু ওর মান খর্ব না করে, ওর চেয়ে কমে হয় না। লেখকরা, কর্মীরা এক পয়সা নেননি।'

কয়েক মাসের মধ্যেই সংস্করণটি শেষও হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল। তাতে কয়েকটা বাড়তি লেখা আছে আর সবচেয়ে ভালো কথা পিছন দিকে লেখক পরিচয় দেওয়া আছে। বিদেশে আজকাল প্রায় সব বইতেই লেখকের বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া থাকে। আনন্দ পাবলিশার্স ঐ একটি চমৎকার নিয়ম পালন করেন। গোড়া থেকেই আমার ঐ রকম ইচ্ছা ছিল। প্রথমবার হয়ে ওঠেনি, দ্বিতীয় সংস্করণে সন্দেশের কয়েকজন ভক্তের সাহায্যে জনা ৭/৮ বাদে সকলেরই পরিচয় সংগ্রহ করা হয়েছে। পাঠকদের জানা উচিত এ-সব তথ্য।

আরেকজন প্রবীণ প্রকাশকের নাম ভুলে গেলে চলবে না; তিনি সকলের ওপরে। সাহিত্য সংসদের শ্রীমহেন্দ্র দত্ত। ইনি আমার সম্পাদনায় সুকুমারের কিছু বই আর আমার যুক্তাক্ষর বর্জিত গল্প সংগ্রহ 'জানোয়ার' প্রকাশ করেছেন। মহেন্দ্রবাবু শিশুসাহিত্য পরিষদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক। প্রতি বছর পরিষদের হাত দিয়ে দুটি হাজার টাকার পুরস্কার দেন। একটি হল সে-বছরের শ্রেষ্ঠ ছোটদের বইয়ের লেখককে, একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে। মুশকিল হল বইগুলি দশ বছরের নিচে যাদের বয়স তাদের যোগ্য হওয়া চাই। ঐ বয়সের জন্য ভালো বই কত কম বেরোয় দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমি নিজেও লিখি আরেকটু বড়দের জন্য। উপযুক্ত বই খুঁজে হদ্দ হতে হয়। তবে ক্রমে দেখছি অনেক

প্রতিভা সম্পন্ন এবং সুরসিক ইলাস্ট্রেটর দেখা দিচ্ছেন। এই একটা নতুন লাইন তরুণ শিল্পীদের জন্য খোলা হয়ে গেল। জল রঙের, তেল রঙের দামী ছবি আর ক-জন কেনে ? কিন্তু প্রতি বছর হাজার হাজার সচিত্র বই বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, তার জন্য শিল্পী দরকার হয়। শুনেছি আর্ট কলেজে এ-সব শিক্ষা দেওয়া হয় না। তবে কমার্শিয়াল আর্টে কিছুটা প্রশিক্ষণ পাওয়া যায়,আর অভিজ্ঞতার মতো আছে কি ?

অনেকে বলে এই বয়সে এত লেখ কি করে ? আমি বলি লেখার আবার এখন তখন কি ? কত লেখা বহু বছর ধরে মনে ঘোরাঘুরি করেছে, এতদিনে তাদের নামিয়েছি। কতক আপনা-আপনি লেখা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রতি বছর পুজোর সময় গোটা দশ-বারো গল্প লিখতে হয়, বই হয় না, ফাইলে জমে থাকে। আজকাল সেগুলোকে বিষয়বস্তু অনুসারে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। বিমলা হাতির বই ছেপেছে, এবার কুকুর এবং অন্যদের বিষয়ে একটা নতুন বই করছে। নিউস্ক্রিপ্ট আরো হাস্য ও রহস্যের গল্প ছেপেছিল, এ বছর 'আজগুবি' ছাপল। শৈব্যা ছাপল 'কল্প-বিজ্ঞানের গল্প', আনন্দ পাবলিশার্স ছাপল 'সব ভূতুড়ে'। এর আগে তারা 'কাগ নয়' বলে বাছাই করা ছোট গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এ-সব গল্প আগে বই হয়নি। 'কাগ নয়' গল্পটি আমার ১৯/২০ বছর বয়সে লেখা। আজগুবি। আজগুবির প্রতি আমার বড় দুর্বলতা। কিম্বা বলিষ্ঠতাও বলা যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড 'হাওয়ার দাঁড়ি' প্রকাশ করেছেন। পরিবেশ বিজ্ঞানের গল্প। স্রেফ আজগুবি। উদয় থেকে 'ময়না-শালিখ' বেরিয়েছে, আজগুবি নয়, একটু খামখেয়ালী। বাস্তবিকই বইয়ের মধ্যে গেঁথে না দিলে গল্প হারিয়ে যায়। একথা ৫২ বছর আগে আমার প্রথম বই বেরোবার অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন।

শান্তিনিকেতনবাসী হয়ে অন্য একরকম দিগন্ত দেখতে পাই। আগে যেমন বহু দূরে নীল আকাশের সঙ্গে নীল বনানীকে মিলে যেতে দেখতাম, সে আর এখন নেই। এখানেও দেখি কেবলি বসতি হচ্ছে, বন সরে যাচ্ছে। আগে সন্ধ্যাবেলায় অদ্ভুত চেহারার ছোট ছোট ডানাওয়ালা কচ্ছপের মতো, শিরা-কাটা শুকনো পাতার মতো পোকারা বারান্দার আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা সব ঐ নিয়ত অপসৃয়মান বনান্তরেখার সঙ্গে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। তবু আপিস আদালত বিদ্যালয় ছুটি হলেই এখানে গভীর শান্তি বিরাজ করে। কোনো অস্থায়ী শোচনীয় ও হিংসাত্মক ঘটনা তাকে দূর করতে পারে না। বরং সেগুলোকেই অবাস্তব বলে মনে হয়। এই হল শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত রচনার আদর্শ স্থান। এখানে চাহিদা খুব কমে যায় ; আগে যাকে অতি আবশ্যক বলে ভাবতাম, এখন দেখছি তাকে ছাড়া দিব্যি চলে যায়।

এখানে আমাদের পুরনো বন্ধুরা আছেন, ৯১ বছর বয়সের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৭৯ বছরের প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়। হীরেন দত্ত, শ্যামল ঘোষ, রসরচনায় ও পৌরুষে অতুলনীয়। আমার প্রায় সমবয়সী রণজিৎ রায় যেমন দক্ষ আই-সি-এস, তেমনি অতুলনীয় শিকারী আবার তেমনি লেখক ; কিছু কমবয়সী ডাঃ সুবোধকুমার দাশগুপ্ত। তার চেয়েও ছোট অজেয় রায়, যে বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং অন্য স্বাদের চমৎকার গল্প লেখে ; সাংবাদিক অশেষ চট্টোপাধ্যায় গল্প লেখকও বটে ; কবি অশোকবিজয় রাহা। সম্পাদনার কাজে দক্ষ পুলিন সেন থাকেন মাঝে মাঝে ; তাঁর হাতে তৈরি অধ্যাপক অনাথনাথ দাশ আছে। আরো বহু লোক আছে, সুরসিক প্রিয় বন্ধু সব। ডাক দিলেই এসে জড়ো হয়। ডাক না দিলেও। বোলপুরে থাকে স্বপন ঘোষ, লাইব্রেরিতে কাজ করে এবং বিশ্বের সকলের সব সমস্যার সমাধান করে। লেখক বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। উদীচী বলে সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করেন, স্বপন ঘোষের সাহায্য নিয়ে। গাইয়েরা আছে, শান্তিদেব ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন, সুচিত্রা মিত্রও আসে মাঝে মাঝে। আর আছে এখানকার প্রাণের প্রাণ ছোট বড় শত শত ছাত্র-ছাত্রী। কতখানি দরকার হয় পরিপূর্ণরূপে বাঁচতে হলে ? আমার মনের পিছনে মহানগরের কোলাহল শুনতে পাই। দূর থেকে শুনি বলে কান জুড়োয়। পুরীর সমুদ্রে ঢেউ ভাঙার শব্দের মতো। ছোটবেলায় মাঝরাতে জেগে উঠে ঝাউবনে বাতাস বওয়ার শব্দের মতো। গ্রামে কখনো বাস করিনি। গ্রামের দুঃখ-কষ্ট শুধু বইতে পড়েছি। গাড়ি করে যেতে সেখানকার দৈন্যদশা চোখে পড়েছে। শহরের দৈন্যের গ্লানি বোধ হয় আরো বেশি। গ্রামের একটা মধুর দিকও আছে, এখানে এসে মাঝে মাঝে টের পাই। গ্রাম নিতান্ত গ্রাম্য নয়। সেখানেও বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি সযত্নে লালিত হয়।

বোলপুরে কেষ্ট বলে এক ঢ্যাঙা ছেলে আছে। সব সময় চুল ছাঁটে না, প্রায়ই দাড়িও কামায় না, কখনো সেজেগুজে আসে, কখনো আধময়লা কাপড় চোপড়ে সোজা কর্মস্থল থেকে। বোলপুর কলেজের আপিসে কাজ করে সে। গত বছর সে আমার কাছে মুরারৈ গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। তারা লেখে, কাগজ প্রকাশ করে, সভা করে, সঙ্গীত চর্চা করে। আর প্রতি বছর একজন কি আরো বেশি কজনকে শ্রদ্ধার্ঘ দেয়। নভেম্বরে আমাদের বাড়িতে তারা জনা পঞ্চাশেক চমৎকার এক অনুষ্ঠান করে গেল। বীরভূমের কবি অভয়পদ রায়কে, প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর আমাকে মাল্য চন্দন, রেশমী উত্তরীয় আর সুন্দর একটি করে স্টেনলেস্ স্টিলের থালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ সাজাল। কি সুন্দর অকপট সব ভাষণ। মুক্তি বলে একজন সুন্দর ছড়া লেখে ; তার স্ত্রী রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ ; সাগর বলে তাদের দলের নেতা ; সব নিয়ে ছোটখাটো দলটি

আমার মনের ওপর কোমল একটা ছাপ রেখে গেল। অনুষ্ঠানের পর সকলে মিলে খিচুড়ি খাওয়া। ব্যবস্থাপনা দেখে অবাক হলাম। এতটুকু অশান্তি, তর্কাতর্কি নেই, সে যে কি আনন্দে উৎসবটি সম্পন্ন হল কি আর বলব। এরাও আমার বন্ধু বটে। এখানে না এলে এদের নাগাল পেতাম না।

এর কয়েক মাস আগে বিধান নগরে শিশু উদ্যানের সুন্দর সভায় সমাদর পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কি সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান। অত বড় হলের প্রত্যেকটি মানুষের কি আগ্রহ। নীরেন চক্রবর্তী চমৎকার ভাষণ দিল। এ আমার সেই নীরেন। অনেক জায়গায় তাকে যখন তখন উঠে দাঁড়িয়ে অলিখিত ভাষণ দিতে শুনেছি। চিন্তার এত পারিপাট্য আর ভাষার মাধুর্য কম লোকের আছে। একটা সম্পাদকীয় খোলসে আত্মগোপন করলেও কবি-মন ঢাকা যায় না। আরেকজনের কথা না বললে অন্যায় হবে। তাঁর নাম অতুল্য ঘোষ। বহু বছর ধরে তাঁর নামও জানি, দেখেওছি। কিন্তু রাজনীতির লোকদের এড়িয়ে চলি, তাই আলাপ হয়নি। মানুষটিকে চিনিনি। ভুল বুঝেছি। ঐ সভার কিছুদিন আগে একজনের কাছে শুনলাম রাজনীতির মানুষ বলে আমি যা বলতে চাই উনি আদৌ তা নন। বিদ্বান লোক। বিদ্যা দান করতে ভালোবাসেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে জেল খাটার সময় একজনকে তিনি এত উৎসাহ দিয়েছিলেন আর যত্ন নিয়ে পড়িয়েছিলেন যে সে ভালো ভাবে এম এ পাশ করেছিল। এইসব শুনতে ভালোবাসি। লোকটিকে নতুন চোখে দেখলাম। শিশু উদ্যান বলতে গেলে তাঁর অনুপ্রেরণাতেই হয়েছে। বিধান রায়ের স্নেহ একসময়ে আমরা পেয়েছিলাম। মনটা নরম হয়ে গেল। এ-ভাবে আমরা কত মানুষকে ভুল বুঝি। ভাগ্যিস ওই সুযোগটি পেয়েছিলাম। ওখানকার ছেলেমেয়েগুলোর তুলনা হয় না। মনে হল গোছাগোছা ফুল রোদে ঝলমল করছে। শীতকালে একবার গিয়ে শিশু উদ্যানটি ভালো করে দেখার ইচ্ছে আছে। এসব দেখি আর ভাবি কে বলেছে আমাদের দেশটা নষ্ট হয়ে গেছে ? যেদিন এইসব ছেলেমেয়েরা তাদের উত্তরাধিকার পাবে, সেদিন দেখা যাবে অন্যরকম জগৎ। জন্মমুহূর্তে কেউ সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে মাটিতে পড়ে না। যতদিন বাঁচে তিলে তিলে তৈরি হয়। যা দেখে, যা শোনে, যা পড়ে, যা ভাবে, সব মিলিয়ে তিলে তিলে তৈরি হয়। এই বয়সেও ওইরকম করে আমার মোহ ঘুচছে, জগৎটাকে প্রসারিত হতে দেখছি।

সারা জীবনটা একটা চলচ্চিত্রের রিলের মতো মনের সামনে খোলা থাকে। আমার সব ভুলচুক, দৈন্য, অক্ষমতা, অন্যায় সুদ্ধু আমার জীবনকে আমি দেখি। এ বছর ফাল্গুন মাসে আমাদের বিয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বন্ধুবান্ধবদের ডেকে, আমাদের বাগানের গাছতলায় আমরা উৎসব করলাম। বুঝলাম কত পুরনো ব্যথা অভিমান কবে যে বুদবুদের মতো বিলীন হয়ে গেছে নিজেই টের

পাইনি। কত স্নেহ পেয়েছি, কত লোকের কাছ থেকে কত সাহায্য পেয়েছি। মা-বাপ থেকে শুরু করে এই আমার নতুন প্রতিবেশীদের পর্যন্ত সকলের কাছে আমি কত ঋণী। আমাদের ওই সুবর্ণজয়ন্তীর দিন বার বার সে-কথা ভেবেছি। যা পাইনি তার জন্যে দুঃখ নেই, যা পেয়েছি তা দিয়ে মন ভরে আছে। বিধাতা যতদিন রাখেন, যেন কাজ করে যেতে পারি আর যখন ডাক দেবেন, সব ছেড়েছুড়ে কলম নামিয়ে যেন চলে যেতে পারি।

—